শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া

দ্বিতীয় খণ্ড



মূল: ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী

ব্যাখ্যা: ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী

شرح العقيدة الطحاوية

শারহুল আক্বীদাহ আত্-ত্বহাবীয়া

(দ্বিতীয় খণ্ড)

المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي

মূল: ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ)

نقله إلى اللغة البنغالية/ محمد عبد الله شاهد

অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফাস্ট ক্লাশ

مُراجعة: الشيخ أجمل بن عبد النور

সম্পাদনা: শাইখ আযমল ইবনে আব্দুন নূর

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদি আরব।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

شرح العقيدة الطحاوية

المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي

نقله إلى اللغة البنغالية/ محمد عبد الله شاهد

مُراجعة: الشيخ أجمل بن عبد النور

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

web:www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস:

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস:

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৪০০ (চারশত) টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

(৫৭) আরশ এবং কুরসী সত্য ০৯

(৫৮) আল্লাহ তা'আলা আরশ এবং অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী ১৫

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে সমুন্নত ১৯

সালাফদের কথা থেকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলের উপর সমুন্নত হওয়ার দলীল ৩১

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, বিবেক-বুদ্ধি ও ফিতরাতের দলীল ৩৪

(৫৯) আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন ৩৯

(৬০) আমরা ফেরেশতাগণ, নাবীগণ এবং রসূলগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস করি ৪৫

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এবং তাদের কাজকর্মের বিস্তারিত বর্ণনা ৫০

ফেরেশতাগণ উত্তম? না বনী আদম উত্তম? ৫৫

যারা বলে বনী আদমের নাবীগণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম, তাদের দলীলসমূহ ৫৮

যারা বলে মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশী তাদের দলীলসমূহ এবং তার পর্যালোচনা ৬৫

নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান ৬৮

রসূলদের মধ্যে উলুল আযম কারা? ৬৯

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান ৭০

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ৭০

কুরআনের প্রতি ঈমান ৭০

(৬১) আমাদের কিবলার যে সমস্ত লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীন নিয়ে এসেছেন তার স্বীকৃতি দেয় এবং তার সকল কথা ও খবরকে বিশ্বাস করে, আমরা তাদেরকে মুসলিম মুমিন মনে করি ৭৩

(৬২) আমরা আল্লাহর ব্যাপারে অযথা তর্ক করি না এবং আল্লাহর দীন নিয়ে ঝগড়া করি না ৭৪

(৬৩) আমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করি না। আমরা সাক্ষ্য দেই যে, কুরআন আল্লাহর কালাম ৭৫

(৬৪) আহলে কিবলার কেউ কোন গুনাহ করলেই আমরা তাকে কাফের বলি না। যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে সে গুনাহয় লিপ্ত হয়। আর এ কথাও বলি না যে, ঈমান আনয়নের পর কেউ গুনাহ করলে তাতে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না ৭৯

আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করার বিধান ৮৮

(৬৫) মুমিনদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কামনা করি ৯৭

গুনাহকারী যেসব আমলের মাধ্যমে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে ১০১

(৬৬) আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করা এবং তার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। মুসলিমদের জন্য উভয়ের মাঝখানে অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তার রহমতের আশা করার মধ্যেই সঠিক পথ নিহিত ১০৭

(৬৭) বান্দাকে যে বিষয় ঈমানে দাখিল করেছে, তা অস্বীকার করা ব্যতীত সে ঈমান থেকে খারিজ হবে না ১০৯

(৬৮) জবানের স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের বিশ্বাসের নাম ঈমান ১১০

যারা ঈমানের পথে চলেছেন, ঈমান সম্পর্কে তাদের কতিপয় উক্তি ১২৪

ঈমান কি বাড়ে ও কমে? ১২৭

ঈমান ও আমলকে একসাথে উল্লেখ করার সময় প্রথমে ঈমান ও পরে আমলের উল্লেখ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ১৩১

(৬৯) সকল মুমিনই আল্লাহর অলী (বন্ধু) ১৫৫

(৭০) মুমিনদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত হচ্ছে ঐ মুমিন, যে সর্বাধিক অনুগত এবং কুরআনের অনুসরণে সর্বাধিক অগ্রগামী ১৬৩

(৭১) ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তার রসূলগণের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ ও মিষ্টতা-তিক্ততার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ১৬৫

তাকদীরের ভাল-মন্দ ও মিষ্ট-তিক্ততার প্রতি ঈমান ১৭০

(৭২) আমরা ঈমানের সকল বিষয়ের প্রতিই বিশ্বাস করি। রসূলদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করি না। তারা যা নিয়ে এসেছেন, তাতে তাদের সকলকেই বিশ্বাস করি ১৭৮

(৭৩) উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্য হতে তাওহীদে বিশ্বাসী যেসব লোক কাবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত হবে, তারা মৃত্যুর পর চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না ১৭৯

কাবীরা গুনাহ এর সংজ্ঞা ১৮১

(৭৪) আমরা আহলে কিবলার প্রত্যেক নেককার ও বদকারের পিছনে ছ্বলাত আদায় করা জায়েয মনে করি এবং তাদের মৃতদের উপর জানাযা ছ্বলাত পড়া ও তাদের জন্য দু'আ করাকেও বৈধ জানি ১৮৭
শাসকদের আনুগত্য করা আবশ্যক ১৯১

(৭৫) আমরা কোন মানুষের জন্য অকাট্যভাবে জান্নাতের কিংবা জাহান্নামের ফায়ছালা প্রদান করি না। ১৯৪

(৭৬) আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলিম থেকে কুফুরী, শির্ক কিংবা নিফাকী প্রকাশিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে কাফের, মুশরিক এবং মুনাফেক বলি না। আর মুসলিমদের অন্তরের গোপন বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার কাছেই সোপর্দ করি ১৯৫

(৭৭) যার উপর তলোয়ার উঠানো আবশ্যক হয়েছে, সে ব্যতীত উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্য কোন লোকের উপর আমরা তলোয়ার উত্তোলন করা বৈধ মনে করি না ১৯৬

(৭৮) আমরা আমাদের ইমাম ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও অস্ত্র ধারণ করা বৈধ মনে করি না। যদিও তারা যুলুম করে। তাদের উপর বদ দু'আও করি না। তাদের থেকে আমরা আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেই না। তাদের আনুগত্য করাকে আমরা আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত ও ফরয মনে করি। যতক্ষণ না তারা পাপ কাজের আদেশ করে। আমরা তাদের সংশোধন ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি ১৯৭

(৭৯) আমরা সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসরণ করি। জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, দলাদলি করা ও ফির্কাবন্দী হওয়া থেকে দূরে থাকি ২০২

(৮০) আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী ও আমানতদারগণকে ভালোবাসি এবং যালেম ও খিয়ানতকারীদেরকে ঘৃণা করি ২০৫

(৮১) যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট, সে বিষয়ে আমরা বলি, আল্লাহই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত ২০৮

(৮২) হাদীছের বর্ণনা মুতাবেক আমরা সফরে গৃহে অবস্থানকালে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ মনে করি ২১১

(৮৩) ভাল-মন্দ সকল মুসলিম শাসকের অধীনে হাজ্জ করা ও জিহাদ করা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কোন কিছুই এ দু'টি কাজকে বাতিল বা রহিত করতে পারবে না ২১৫

(৮৪) আমরা কিরামুন কাতিবীন ফেরেশতাদের উপর ঈমান রাখি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের উপর পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করছেন ২১৭

(৮৫) আমরা সৃষ্টিকুলের রূহসমূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত মালাকুল মাউতের উপরও ঈমান রাখি ২২১

নাফ্সের হাকীকত কী? ২২২

রূহ এর হাকীকত ২২৫

ইনসান বা মানুষের হাকীকত ২২৫

রূহ এবং নাফস্ কি একই জিনিস? ২২৮

'রূহ' কি মৃত্যু বরণ করে? ২৩৩

(৮৬) আমরা কবরের আযাবের প্রতিও ঈমান রাখি। আরো বিশ্বাস করি যারা এ আযাবের যোগ্য, কেবল তাদেরকেই এ শাস্তি দেয়া হবে ২৩৫

কবরে নাকির-মুনকার ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন ২৩৬

দেহের সাথে রূহ এর সম্পর্ক ২৪১

বনী আদমের ঘর মোট তিনটি ২৪৩

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রূহ এর আবাসস্থল সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ ২৪৫

(৮৭) পুনরুত্থান, কিয়ামাত দিবসে আমলের প্রতিফল, আল্লাহর সমীপে বান্দার আমলনামা পেশ- এ সবের উপর আমরা ঈমান রাখি ২৫১

আখিরাত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জবাব ২৫৮

(৮৮) আমরা আরো ঈমান রাখি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্বেই সৃষ্ট করা হয়েছে। এ দু'টি কোনো দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না ২৮৪

জান্নাত ও জাহান্নামের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ ২৯৭

(৮৯) যে শক্তি দ্বারা বান্দা কর্ম সম্পাদন করে এবং যা আল্লাহর তাওফীকের অন্তর্ভুক্ত, তা কোনো বান্দার গুণ হতে পারে না। সেটি কর্ম বাস্তবায়ন করার সময় বিদ্যমান থাকে। এ প্রকার শক্তি (তাওফীক) কেবল আল্লাহরই গুণ ৩০৮

(৯০) বান্দারা যে সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পাদন করে, সেগুলোর স্রষ্টাও আল্লাহ। বান্দারা শুধু তা অর্জন করে ৩১৭

বান্দার কাজকর্মের ব্যাপারে মুতাযিলাদের মত ৩১৭

জাবরীয়াদের দলীলের জবাব ৩২০

বান্দার কাজকর্মের ব্যাপারে মুতাযিলাদের মত ৩২২

মুতাযিলাদের দলীলের জবাব ৩২২

বান্দা প্রকৃত পক্ষেই তার কাজকর্ম সম্পাদন করে; আল্লাহ তা'আলা তার কাজের স্রষ্টা ৩৩৫

(৯১) "আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর তাদের সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেননি। আর আল্লাহ তাদেরকে যা করার শক্তি দিয়েছেন, তারা কেবল তাই করতে সক্ষম ৩৩৫

(৯২) জীবিত ব্যক্তিদের দু'আ এবং দান খয়রাত দ্বারা মৃত বক্তিরা উপকৃত হয় ৩৫৯

জীবতদের যেসব আমলে (অথচ তাতে মৃত ব্যক্তির কোনো ভূমিকা নেই) মৃত ব্যক্তির উপকৃত হওয়া ৩৬১

জীবিতদের দান-খয়রাত, ছিয়াম ও হাজ্জের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছার দলীল ৩৬৩

যারা বলে মৃত ব্যক্তির কাছে জীবিতদের কোনো আমলের ছাওয়াবই পৌঁছে না, তাদের জবাব ৩৬৫

মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়ার ব্যাপারে কারীদেরকে ভাড়া করার হুকুম ৩৬৮

কবরের নিকট কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে আলিমগণের তিনটি মত ৩৭০

(৯৩) আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের দু'আ কবুল করেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন ৩৭৩

যারা বলে দু'আ করার মধ্যে কোনো উপকার নেই তাদের জবাব ৩৭৫

(৯৪) আল্লাহ তা'আলা সব কিছুরই মালিক এবং তার মালিক কেউ নয় ৩৮৩

(৯৫) আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন ৩৮৩

(৯৬) আর আমরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদেরকে ভালোবাসি ৩৯১

(৯৭) আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বপ্রথম আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের স্বীকৃতি দেই ৪০১

(৯৮) অতঃপর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরে আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য খিলাফত সাব্যস্ত করি ৪১০

(৯৯) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পর আমরা উছমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য খিলাফত সাব্যস্ত করি ৪১৩

(১০০) অতঃপর আমরা আলী বিন আবুতালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য খিলাফত সাব্যস্ত করি ৪২০

(১০১) তারাই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, সুপথগামী খলীফা এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম ৪২৬

(১০২) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশজন ছাহাবীর নাম উল্লেখ করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি ৪২৮

(১০৩) মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবী, তার পূত-পবিত্র নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীগণ, প্রত্যেক কদর্যতা হতে পবিত্র তার সন্তান সন্ততিগণ সম্পর্কে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম কথা বলবে, সেই কেবল নিফাকী হতে নিষ্কৃতি পাবে ৪৩৪

(১০৪) পূর্বসুরী সালাফদের মধ্যকার আলেম, তাদের পরে আগমনকারী তাবেঈ, সৎকর্মশীল, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, জ্ঞানী ও গবেষকদের যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করতে হবে ৪৩৭

(১০৫) আমরা কোনো অলীকে কোনো নাবীর উপর প্রাধান্য দেই না; আমরা বলি, মাত্র একজন নাবী সমস্ত অলী থেকে শ্রেষ্ঠ ৪৩৮

(১০৬) অলীদের কারামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের কারামত সম্পর্কে বিশ্বস্ত লোকদের থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত রেওয়াতগুলোর উপরও আমরা ঈমান রাখি ৪৪৩

অলীদের কারামতের ব্যাপারে মুতাযিলাদের অভিমত ৪৫৭

ফিরাসাত বা অন্তদৃষ্টি এবং তার প্রকারভেদ ৪৫৮

(১০৭) আমরা কিয়ামাতের আলামতসমূহ যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান হতে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ, পশ্চিম গগনে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর স্বীয় স্থান হতে বের হওয়া ইত্যাদির প্রতি ঈমান রাখি ৪৫৯

(১০৮) আমরা কোনো গণক ও জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না এবং ঐ ব্যক্তিকেও সত্য বলে মনে করি না, যে আল্লাহর কিতাব, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও উম্মতের ইজমার বিপরীত কিছু দাবী করে ৪৬৪

যাদুর স্বরূপ এবং যাদুকরের হুকুম ৪৬৮

(১০৯) আমরা মুসলিমদের জামা'আতবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করি এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে গোমরাহী ও আযাবের কারণ মনে করি ৪৮২

(১১০) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আল্লাহর দীন এক ও অভিন্ন, আর তা হলো ইসলাম ৪৯৪

(১১১) এগুলোই হচ্ছে আমাদের যাহেরী-প্রকাশ্য এবং বাতেনী-গোপন দীন ও আক্বীদাহ বা মৌলিক বিশ্বাস ৫০০

মুতাযিলা মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণ ৫০১

মুতাযিলাদের মূলনীতিসমূহ ৫০১

তাক্বদীর অস্বীকারকারীরা এ উম্মতের অগ্নিপূজক ৫০৯

(৫৭) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ

আরশ এবং কুরসী সত্য।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেন,

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾

"আরশের মালিক, শ্রেষ্ঠ সম্মানিত এবং তিনি যা চান তাই করেন"। *(সূরা বুরুজ: ১৫-১৬)*
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾

"তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি"। *(সূরা গফির/মুমিন:১৫)*
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

"তারপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন"। *(সূরা আল-আরাফ: ৫৪)*

এমনি কুরআনের আরো অনেক আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। যেমন সূরা তোহার ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾

"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

"তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের তিনিই মালিক"। *(সূরা মুমিনূন: ১১৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾

"আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের হকদার নেই। তিনি মহান আরশের মালিক"। *(সূরা আন-নামাল: ২৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾

"আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চারপাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে

এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে”। *(সূরা গফির/মুমিন: ৭)* আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾

“সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে”। *(সূরা হাক্কাহ: ১৭)* আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾

“তুমি আরো দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিক বৃত্ত বানিয়ে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে”। *(সূরা আয-যুমার: ৭৫)*

ছ্বহীহ বুখারীতে বিপদগ্রস্তের দু‘আয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলতেন,

«لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّـمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

“আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি বিশাল আরশের মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি আসমান-যমীনের এবং মহান আরশের মালিক”।[১]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ), আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء»

“তোমরা কি জানো আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের দূরত্ব কতটুকু? ছাহাবীগণ বললো, আল্লাহ এবং তার রসূলই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। এমনি প্রত্যেক আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে একই রকম। প্রত্যেক আসমানের উপর থেকে নীচের পূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের

[১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩৪৬, মুসলিম হা/২৭৩০।

দূরত্ব। সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সাগর। সাগরের উপর হতে নীচের দূরত্ব (গভীরতা) হচ্ছে এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। সাগরের উপরে রয়েছে আটটি দেয়াল (বিশাল আকারের আট ফেরেশতা)। তাদের হাঁটু থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত দূরত্ব এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। তাদের পিঠে রয়েছে আল্লাহর আরশ। আরশ এত বিশাল যে, তার নীচের অংশ হতে উপরের ছাদ পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে এক আসমান থেকে অন্য আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত। বনী আদমের কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গোপন নয়"।[২] *ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।*

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্য ইমাম স্বীয় সনদে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরশের শব্দ করার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ عَرْشَهُ على سمواته لهكذا"، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، مِثْلَ الْقُبَّةِ

সমস্ত আসমানের উপর আল্লাহ তা'আলার আরশ ঠিক এরূপ। এই বলে তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহ দিয়ে তাবুর মত বানিয়ে দেখালেন।[৩]

ছ্বহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ» (بخاری: ٢٧٩٠)

"তোমরা আল্লাহর কাছে যখন জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাও। কেননা এটি হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। বর্ণনাকারীর ধারণা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপর বলেছেন, তার উপর আল্লাহর আরশ এবং তা থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে। وفوقه এর কাফ বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। সে হিসাবে

[২] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাফসীর, মুসনাদে আহমাদ, (১/২০৬)। আলেমগণ হাদীছটি ছ্বহীহ ও যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম হাদীছটি ছ্বহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান গরীব। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলায়ে যঈফা, হা/১২৪৭। যঈফ হওয়া সত্ত্বেও আলেমগণ আসমানের উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া প্রমাণ করতে গিয়ে হাদীছটিকে উল্লেখ করেছেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা উপরে হওয়ার বিষয়ে অনেক বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণ থাকার পরও এ ধরণের যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ না করাই উত্তম।

[৩] যঈফ: আবূ দাউদ হা/৪৭২৬।

শব্দটি যরফ হিসাবে মানসুব হয়েছে। মুবতাদা হিসাবে পেশ দিয়েও পড়া জায়েয। তখন অর্থ হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের ছাদ হলো আল্লাহর আরশ।

কালাম শাস্ত্রবিদদের একদল লোক মনে করে আরশ হলো সবদিক থেকে গোলাকার একটি কক্ষপথ বা নক্ষত্র, যা সকলদিক থেকে সৃষ্টিজগতকে ঘিরে রয়েছে। কখনো কখনো তারা বলেছেন যে, আরশ হলো মহাশূণ্যে মানচিত্র সদৃশ একটি বস্তু কিংবা তা হলো নবম নক্ষত্র। তাদের এ কথা সঠিক নয়। কেননা কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আরশের পায়া রয়েছে এবং ফেরেশতাগণ তা বহন করে। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَفَاقَ قَبْلِى أَمْ جُوزِىَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ»

“কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুশ হয়ে পড়বে। আমিই তখন সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাবো। তখন দেখবো যে, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আরশের একটি খুঁটি ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি আমার পূর্বেই হুশ ফিরে পেয়েছেন? না কি তুর পাহাড়ের বেহুশ হওয়ার কারণেই আজ তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে?[৪]

আভিধানিক অর্থে রাজার সিংহাসনকে আরশ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা সাবার রাণী বিলকীসের আরশ সম্পর্কে বলেন, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ “তার রয়েছে বিরাট একটি আরশ”। *(সূরা আন-নামল: ২৩)*

সুতরাং আরশ বলতে কোনো কক্ষপথ বা নক্ষত্র উদ্দেশ্য নয়। আরবরা আরশ শব্দ থেকে তা বুঝেনি। আর কুরআন তো আরবদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে। মোটকথা আরশ অর্থ হলো পায়া বিশিষ্ট সিংহাসন, যা ফেরেশতাগণ বহন করে। সৃষ্টিজগতের উপর তা তাবু স্বরূপ। মূলত আরশ সমস্ত সৃষ্টির ছাদ স্বরূপ। বিখ্যাত কবি উমাইয়া বিন আবুস সালাত বলেছেন, তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করো। কারণ তিনিই বড়ত্বের উপযুক্ত।আমাদের রব এমন বিশাল আসমানের উপরে, যা বহু উর্ধ্বে নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা মানুষকে দিশেহারা করেছে। আসমানের উপরে তিনি এমন একটি সুদীর্ঘ সিংহাসন নির্মাণ করেছেন, যা চোখের দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণ তা দেখার জন্য গলা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

الصور শব্দটি এখানে أصور এর বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আসওয়ার বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যিনি উপরের দিকে কিছু দেখার জন্য গলা বাড়িয়ে দেয়। الشرجع অর্থ হলো সুউচ্চ সুঠাম। আভিধানিক অর্থে রাজার সিংহাসনকে আরশ বলা হয়।

---

[৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ৬৯১৭।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কবিতার মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার আরশের দলীল পাওয়া যায়। একদা তার স্ত্রী যখন তাকে দাসির সাথে সহবাসের অভিযোগ করলো, তখন তিনি তা অস্বীকার করলেন। স্ত্রী বললেন, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে কুরআন পাঠ করো। তখন তিনি এ লাইনগুলো আবৃত্তি করলেন,

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর কাফেরদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম।পানির উপর ভাসছে আল্লাহর আরশ। আর আরশের উপরে রয়েছেন সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহ তা'আলা। আরশকে বহন করছে কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলার বাছাইকৃত ফেরেশতা। ইমাম ইবনে আব্দিল বার এবং অন্যান্য ইমামগণ এ কবিতা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

"أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إن ما بين [شحمة] أذنه إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ"

আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কোনো একজন ফেরেশতা সম্পর্কে কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার কান থেকে গর্দানের দূরত্ব হলো সাতশত বছরের রাস্তা।[৫] ইমাম ইবনে আবী হাতিম (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার শব্দ হলো, ফেরেশতার কানের লতি থেকে ঘাড় পর্যন্ত উড়ে যেতে সাতশত বছর সময়ের প্রয়োজন। ফেরেশতার দেহের একটি অংশ যদি এত বিশাল হয়, তাহলে দেহের অন্যান্য অংশ কত বড়! সে ফেরেশতা কত বড়! সুবহানাল্লাহ! যারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে এবং আল্লাহর আরশকে তার রাজত্ব বলে অপব্যাখ্যা করে, তারা কুরআনের এ আয়াতগুলোর কী ব্যাখ্যা করবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾

"সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে"। *(সূরা হাক্কাহ: ১৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾

"তখন তার আরশ ছিল পানির উপরে"। *(সূরা হুদ: ৭)*

এখানে কি এই কথা বলার কোনো সুযোগ আছে যে, কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপর তোমার রবের রাজত্ব বহন করবে? না এমন কোনো কথার বলার

[৫] ছহীহ: সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৭২৭।

সুযোগ আছে যে, আল্লাহর রাজত্ব ছিল পানির উপর? কিয়ামতের দিন কি মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাজত্বের পায়া ধরে থাকবেন? কোনো বিবেকবান কি এই কথা বলতে পারে? যে ব্যক্তি নিজের কথা বুঝে সে কি এই কথা বলতে পারে? কুরসী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

"তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)*

কেউ কেউ বলেছেন, আরশ এবং কুরসী একই জিনিস। তবে সঠিক কথা হলো কুরসী এক জিনিস এবং আরশ অন্য জিনিস। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। সিফাতুল আরশ নামক গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবী শায়বা এবং হাকেম তার মুস্তাদরাকে সাঈদ বিন জুবাইরের সূত্রে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক। তবে তারা তাদের কিতাবে বর্ণনা করেননি। উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত কুরসীর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তা হলো আল্লাহ তা'আলার দু'পা রাখার স্থান। আর তার আরশ যে কত বড় তার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কুরসীর ব্যাখ্যায় উপরোক্ত হাদীছটি ইবনে আব্বাস থেকে মারফু হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো ইবনে আব্বাস থেকে মাওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম সুদ্দী বলেন, আসমান ও যমীন হলো কুরসীর ভিতরে এবং তা আরশের সামনে সোপান বা সিঁড়ি স্বরূপ। ইমাম ইবনে জারীর বলেন, আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد القيت بين ظهرى فلاة من الأرض»

আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান ঠিক সে রকমই যেমন ভূ-পৃষ্ঠের কোনো উন্মুক্ত ময়দানে পড়ে থাকা লোহার একটি আংটি স্বরূপ।[৬]

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর কুরসী বলতে তার ইলম উদ্দেশ্য। এ কথাও ইবনে আব্বাসের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। তবে ইবনে আবী শায়বা তার থেকে যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন সেটিই সঠিক ও বিশুদ্ধ এবং সংরক্ষিত। যে ব্যক্তি তা ছাড়া অন্য কথা বলবে, তার নিকট নিছক ধারণা ছাড়া অন্য কোনো দলীল নেই। যারা কুরসীর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কথা বলবে, তারা নিকৃষ্ট কথার ঝুলি থেকেই বলবে। যেমন বলা হয়ে থাকে আরশের ব্যাখ্যায়। একাধিক সালাফ থেকে কুরসীর ব্যাখ্যায় যা এসেছে, তাই সঠিক। কুরসী হলো আরশের সামনে সোপান বা সিঁড়ি স্বরূপ।

[৬] হাদীছটি যঈফ, দেখুন: সিলসিলা যঈফা, হা/৬১১৮

(৫৮) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ

আর আল্লাহ তা'আলা আরশ এবং অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুরই উর্ধ্বে। সৃষ্টিজগত তাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে অক্ষম।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আরশ এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ "আল্লাহ অবশ্যই বিশ্ববাসীদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন"। *(সূরা আনকাবুত: ৬, আলে ইমরান:৯৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ "এবং আল্লাহ তো ধনী ও প্রশংসিত"। *(সূরা ফাতির: ১৫)*

শাইখ এখানে কথাটি এ জন্য বলেছেন যে, যখন তিনি আরশ ও কুরসীর কথা উল্লেখ করেছেন, তখন আরশ এবং অন্যান্য বস্তু হতে তার অভাবমুক্ত হওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি আরশ সৃষ্টি করে তার উপর সমুন্নত হয়েছেন। অথচ আরশের প্রতি তার কোনো প্রয়োজন নেই। আরশ সৃষ্টি করা ও তার উপর সমুন্নত হওয়ার মধ্যে এমন হিকমত রয়েছে, যার দাবিতেই তিনি এটি সৃষ্টি করেছেন এবং এর উপর সমুন্নত হয়েছেন। সুউচ্চ কোনো জিনিস তার নীচের জিনিসের উপরে থাকার অর্থ এই নয় যে, নীচেরটি উপরের টিকে আবদ্ধ ও পরিবেষ্টন করে রেখেছে কিংবা নীচেরটি উপরের টিকে বহন করে রয়েছে। সে সঙ্গে এটিও আবশ্যক নয় যে, উপরেরটি নীচেরটির প্রতি মুখাপেক্ষী।

আপনি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কিভাবে এটি যমীনের উপর রয়েছে। আসমান কি যমীনের প্রতি মুখাপেক্ষী? আল্লাহ তা'আলার শান এর চেয়ে অনেক বড়। তিনি আরশের উপর সমুন্নত হওয়া থেকে কিভাবে এটি বুঝা যায় যে, তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়েই তাতে সমুন্নত হয়েছেন। বরং উপরে সমুন্নত হওয়া তার সত্তাগত বিশেষণ ও বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে নীচের সমস্ত জিনিসকে ধারণ করে রয়েছেন। নীচের সমস্ত বস্তুই তার মুখাপেক্ষী। নিম্নজগতের সবকিছু থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী। নিম্ন ও উর্ধ্বজগতের সবকিছুকেই তিনি পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। তিনি আরশের উপরে থেকেও স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে আরশ ও আরশের বহনকারীদেরকে ধারণ করে রয়েছেন। তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। বরং আরশই তার প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি আরশকেও পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। আরশ তাকে পরিবেষ্টন করতে সক্ষম নয়। তিনি আরশকে

সীমায়িত করে রেখেছেন। আরশ তাকে সীমায়িত করতে পারে না। কোনো মাখলুকের পক্ষেই আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন ও সীমায়িত করা সম্ভব নয়।

যারা আল্লাহ তা'আলার উলু বা সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে, তারা যদি এভাবে বিশ্লেষণ করতো, তাহলে সঠিক পথের সন্ধান পেতো এবং বিবেক-বুদ্ধির সাথে কুরআনের দলীলের মিল খুঁজে পেতো। সে সঙ্গে তারা দলীলের অনুসরণ করারও সুযোগ পেতো। কিন্তু দলীল থেকে দূরে সরে সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি ঠিক সেরকমই যেমন ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন। তাকে যখন **{ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: ٥٤]** "দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন" (সূরা আল 'আরাফ:৫৪) -আল্লাহ তা'আলার এ বাণী এবং অন্যান্য সিফাতের ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, **كيف استوى؟** আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন? জবাবে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বললেন, **الاستواء معلوم والكيف مجهول**। আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়।[৭] উম্মে সালামা থেকে মাওকুফ ও নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফু হিসাবে এই জবাব বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, **محيط بكل شيء وفوقه** তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুরই উর্ধ্বে। আক্বীদায়ে ত্বহাবীয়ার কোনো কোনো কপিতে واو বিলুপ্ত করে محيط بكل شيء فوقه লিখা হয়েছে। তবে প্রথম কপিই অধিক বিশুদ্ধ। প্রথম কপি অনুসারে অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং তিনি সকল সৃষ্টির উপরে।

আর অন্য কপি অনুপাতে অর্থ হলো, তিনি আরশের উপরের সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী। আক্বীদাহ ত্বহাবীয়ার কোনো কোনো কপিকারী ভুলক্রমে واو বাদ দিয়েছেন। অতঃপর অন্যান্য লোকেরা উক্ত ভুল কপি থেকে বর্ণনা করেছেন। অথবা কতিপয় পথভ্রষ্ট গোমরাহ লোক মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ইচ্ছা করেই واو বাদ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করার জন্যই তারা শাইখের বক্তব্যকে পরিবর্তন করেছে। অন্যথায় দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহর আরশ সমস্ত সৃষ্টির উপরে। আরশের উপরে কোনো সৃষ্টি নেই। সুতরাং অবস্থা যেহেতু ঠিক এরকমই, তখন আরশের উপরের সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে

[৭] আমরা আল্লাহর সিফাতের ধরণ জানি না, -এই কথার অর্থ এ নয় যে, আসলেই তার কোন ধরণ নেই; বরং অবশ্যই তার সুমহান সিফাতগুলোর ধরণ আছে। কিন্তু আমরা উহা জানি না। আমাদের না জানা, না থাকা প্রমাণ করে না। আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন, তার সিফাতগুলোর ধরণ কেমন।

রয়েছেন এই কথা অর্থহীন। কেননা আরশের উপর কোনো সৃষ্টি নেই, যাকে তিনি পরিবেষ্টন করতে পারেন। সুতরাং واو ঠিক রাখাই সঠিক। তখন অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং তিনি সবকিছুর উপরে।

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। এ মর্মে কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ﴾ "আল্লাহ তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন"। *(সূরা বুরূজ: ২০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ "শুনে রাখো, তিনি সব জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছেন"। *(সূরা হামীম সাজদা: ৫৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾

"আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন"। *(সূরা আন-নিসা: ১২৬)*

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে থাকার অর্থ এই নয় যে, আসমান যেমন সবকিছুকে ঘেরাও করে রেখেছে, তিনিও সেভাবে ঘেরাও করে রেখেছেন এবং সবকিছুই তার পবিত্র সত্তার ভিতরে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরূপ ধারণার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। বরং তিনি তার বড়ত্ব, সুপ্রশস্ত জ্ঞান এবং ক্ষমতার মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের তুলনায় সমগ্র সৃষ্টি একটি সরিষার দানার পরিমাণ। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

«ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»

"সাত আসমান ও সাত যমীন এবং তার ভিতরে ও তার মাঝখানে যা আছে তা আল্লাহ তা'আলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষার দানার মতো"।[৮]

---

[৮] ছ্বহীহ হাদীছে يد الله (আল্লাহর হাত), كف الله (আল্লাহর হাতের তালু), كف الرحمن (রহমানের হাতের তালু) এবং আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংক্রান্ত ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। এ জাতিও বিষয়ে ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অনেক আলেম আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত হাদীছগুলো এবং দুনিয়ার আসমানে আল্লাহ তা'আলার নেমে আসা সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো সুসাব্যস্তও সুপ্রমাণিত বলেছেন। আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, কোন প্রকার ধারণা করা যাবে না এবং এ কথা বলা যাবে না যে, كيف؟ (তা কিভাবে?)। ইমাম মালেক, সুফিয়ান বিন উয়াইনা এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুমুল্লাহ) থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছগুলোর ব্যাপারে কথা হচ্ছে أمروها بلا كيف অর্থাৎ যেভাবে এসেছে, সেভাবেই ছেড়ে দাও। এ কথা বলো না যে, কিভাবে? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কথাও তাই।

এটা জানা কথা যে, আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। আমাদের কারো হাতে যখন সরিষার দানা থাকে তখন সে চাইলে এটিকে হাতের মধ্যে কবযা করে নেয় এবং হাতের কবযা সেটিকে পরিবেষ্টন করে নেয়। সে ইচ্ছা করলে ইহাকে হাতের নীচে রাখে। উভয় অবস্থাতেই সে দানাটি থেকে আলাদা। সকল দিক থেকেই তার উপরে।

সুতরাং যেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার যথাযথ বড়ত্ব ও মর্যাদার বর্ণনা প্রদান করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তার ব্যাপারে কিভাবে এই ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনি ইচ্ছা করলে আজই আসমান-যমীন কবযা করে নিতে পারেন। কিয়ামতের দিন তিনি আসমান-যমীনের মধ্যে যেই পরিবর্তন করবেন, ইচ্ছা করলে তিনি আজই তা করতে পারেন। কেননা কিয়ামতের দিন তার জন্য নতুন করে এমন কোনো কুদরত অর্জিত হবে না, যা এখন তার নেই। এত মহান কুদরতের অধিকারী হওয়ার পরও আরশের উপর সমুন্নত থেকে কতিপয় সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া অথবা সৃষ্টি থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে তার নিকটবর্তী করাকে বিবেক-বুদ্ধি কিভাবে অসম্ভব মনে করতে পারে? যে ব্যক্তি এটি অস্বীকার করবে সে আল্লাহ তা'আলার যথাযথ কদর করতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আবু রাযীনের প্রসিদ্ধ হাদীছে এসেছে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা মাত্র একক সত্তা। আমাদের সংখ্যা তো প্রচুর। তাই কিভাবে আমাদের পক্ষে তাকে দেখা সম্ভব হবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর নিদর্শন থেকে এর উদাহরণ দেখাবো। এই তো চন্দ্র। এটি আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন। পৃথিবীর সকল মানুষই এটিকে একসাথে দেখে। আল্লাহ তা'আলা এর চেয়ে অনেক বড়। আর যখন এটি সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে বড় তখন সমস্ত প্রশ্ন দূর হয়ে গেলো এবং প্রত্যেক বাতিল কল্পনার অবসান হলো।

কিন্তু জাহমীয়ারা এই বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করেছে। তাদের কথা হচ্ছে এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ (তুলনা) হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের অনেক জায়গায় আল্লাহর হাত, চোখ, শ্রবণ, দৃষ্টি ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। জাহমীয়ারা এই আয়াতগুলোর তাবীল (ব্যাখ্যা) করেছে। আলেমগণ এগুলোর যেই ব্যাখ্যা করেছেন, তারা এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছে। তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা আদমকে স্বীয় হাত দিয়ে সৃষ্টি করেননি। তাদের কথা হচ্ছে হাত অর্থ কুদরত (শক্তি)!! ইসহাক বিন ইবরাহীম বলেন, তাশবীহ (তুলনা) তখনই হবে, যখন বলা হবে আল্লাহর হাত মাখলুকের হাতের মতই, আল্লাহর হাত বান্দার হাতের মতই। এমনি আল্লাহর শ্রবণ, আল্লাহর দৃষ্টি বান্দার দৃষ্টির মতই। এটি তাশবীহ।

আর আল্লাহ যেমন বলেছেন যখন সেভাবেই বলা হবে অর্থাৎ হাত, শ্রবণ, দৃষ্টি এবং এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তা কিভাবে? অথবা এটি বলা হবে না যে, আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মতই এবং শ্রবণ শ্রবণের মতই, তখন কোন তাশবীহ হবে না। তখন তেমনই হবে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রেতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা শূরা: ১১) {দেখুন: তাফসীরে তাবারী, (৬/২০) ঈষৎ পরিবর্তিত)}

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হওয়া প্রসঙ্গে

আর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ "তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী"। *(সূরা আল আনআম: ১৮, ৬১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"তারা ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের উপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে"। *(সূরা আন-নাহাল: ৫০)*

ইতিপূর্বে আওআলের হাদীছে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, **والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله** "পানির উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ। আর আল্লাহ তা'আলা এসবকিছুর উপরে"।

ইতিপূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবিতাটি অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি তা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আবৃত্তি করেছেন। তিনি শুনেছেন, সমর্থন করেছেন এবং তাতে হেসেছেন। হাস্সান বিন ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই কবিতাটি পাঠ করেছেন।

شهدت بإذن الله أن محمدا... رسول الذي فوق السماوات من عل

وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما... له عمل من ربه متقبل

وأن الذي عادى اليهود ابن مريم... رسول أتى من عند ذي العرش مرسل

وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم... يجاهد في ذات الإله ويعدل

আমি আল্লাহর হুকুমে সাক্ষ্য দিয়েছি যে, মুহাম্মাদ সেই আল্লাহর রসূল যিনি রয়েছেন সাত আসমানের উপরে। আবু ইয়াহইয়া এবং ইয়াহইয়া উভয়েরই এমন একটি আমল রয়েছে, যা তাদের রবের নিকট কবুলযোগ্য। ইয়াহুদীরা মারইয়ামের পুত্রকে শত্রু মনে করেছে, অথচ তিনি এসেছেন আরশের মালিকের নিকট থেকে প্রেরিত রসূল হিসাবে। হুদ আলাইহিস সালাম যখন তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, তখন তিনি আল্লাহর দীন বাস্তবায়নে সংগ্রাম করেছেন এবং ইনসাফ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছেন, আমিও এই সাক্ষ্য প্রদান করছি।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي سقبَتْ غَضَبِي» (بخارى: ٣١٩٤)

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন সৃষ্টিকর্ম সমাধা করলেন তখন লাওহে মাহফুযে লিখে রাখলেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে। আর এ কিতাবটি আল্লাহর নিকট আরশের উপর বিদ্যমান"।[৯] অন্য বর্ণনায় تغلب غضبي এসেছে। উভয় বর্ণনায় অর্থ একই। ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন যে,

«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رءوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى:سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون»

"জান্নাতবাসীরা যখন নিয়ামতের মধ্যে থাকবে, তখন তাদের জন্য একটি নূর চমকাবে। তারা সেদিকে মাথা উঠিয়ে দেখবে। আকস্মিক তারা দেখতে পাবে যে, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা উপর থেকে তাদের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তোমাদের উপর সালাম। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ "দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে "সালাম" বলা হবে" *(সূরা ইয়াসীন:৫৮)*। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের দিকে দৃষ্টি দিবেন। তারাও আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টি দিবে। তারা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকিয়ে থাকবে, ততক্ষণ তারা জান্নাতের অন্য কোনো নিয়ামতের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না।[১০]

ছ্বহীহ মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। *(সূরা আল হাদীদ:৩)* তিনি তার দু'আয় বলেছেন,

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ»

"হে আল্লাহ! তুমিই أَوَّل (সর্বপ্রথম)। তোমার পূর্বে কেউ ছিল না। তুমিই آخِر (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমিই ظَاهِر (সকল সৃষ্টির উপরে), তোমার উপরে

[৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪২২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৫১।

[১০] হাদীছটি যঈফ, দেখুন শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া

আর কিছুই নেই। তুমিই بَاطِن (মাখলুকের অতি নিকটে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই"।[১১]

এখানে ظهور অর্থ হলো উপরে সমুন্নত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾

"ইয়াজুজ ও মাজুজ এটার উপরে উঠতে পারতো না এবং এর গায়ে সুড়ঙ্গ কাটতেও তারা সক্ষম ছিল না"। *(সূরা কাহাফ: ৯৭)* অর্থাৎ তারা উপরে উঠতে সক্ষম ছিল না। এই চারটি নাম পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক। এ থেকে দু'টি নাম আল্লাহ তা'আলার অনাদি-অনন্ত ও অবিনশ্বরতার প্রমাণ করে। আর অন্য দু'টি নাম সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হওয়া এবং তাদের নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ করে।

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) জুবাইর বিন মুহাম্মাদ বিন জুবাইর বিন মুতঈম থেকে বর্ণনা করেছেন, জুবাইর তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একজন গ্রাম্যলোক এসে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধন-সম্পদ ও গবাদি পশু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তা প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহকে সুপারিশকারী বানিয়ে আপনার কাছে তা প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! তুমি কি জানো কী বলছো? অতঃপর তিনি সুবহানাল্লাহ বললেন অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করেই যাচ্ছিলেন। এতে করে ছাহাবীদের চেহারায় ক্রোধের আলামত পরিলক্ষিত হলো। অতঃপর তিনি বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! আল্লাহর উসীলা দিয়ে কোনো মাখলুকের কাছে কিছুই চাওয়া যাবে না। আল্লাহর শান এর বহু উর্ধ্বে। অকল্যাণ হোক তোমার! তুমি কি জানো আল্লাহ কত বড়? আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে। আর তার আরশ সমস্ত আসমানের উপরে। এই বলে তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহ দিয়ে তাবুর মত বানিয়ে দেখালেন। আর আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার কারণে আরশ আওয়াজ করতে থাকে যেমন বাহন আরোহীকে বহন করতে অক্ষম হওয়ার কারণে আওয়াজ করতে থাকে।[১২] বনী কুরাইযার ঘটনায় এসেছে, সা'দ বিন মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন এই ফায়ছালা প্রদান করলেন যে, তাদের বয়স্ক পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা

---

[১১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১৩।

[১২] বর্ণনাটি যঈফ। দেখুন, শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, টিকা নং-২৯৫। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এখানে আল্লাহর সিফাতের ধরণ বর্ণনা করা হচ্ছে বুঝা গেলেও মূলত এখানে ধরণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ আল্লাহর সিফাতের ধরণ বর্ণনা করা জায়েয নয়। কারো তা বর্ণনা করা সম্ভবও নয়। এখানে মূলত মানুষের বুঝশক্তির কাছাকাছি করার জন্য এই কথা বলা হয়েছে।

হবে, তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তুমি তাদের ব্যাপারে সাত আসমানের উপরের বাদশাহর হুকুম প্রদান করেছো। হাদীছটি ছ্বহীহ। ইমাম উমাবী তার মাগাযীতে তা বর্ণনা করেছেন। মূল হাদীছটি ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।[১৩]

ইমাম বুখারী (রহমাহুল্লাহ) যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে গর্ব করে বলতেন, তোমাদেরকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ দিয়েছেন তোমাদের পরিবারের লোকেরা। আর আমাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছেন সাত আসমানের উপর থেকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।[১৪]

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা তিনি জনৈক বৃদ্ধ মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। মহিলাটি তাকে রাস্তায় থামিয়ে দিলো। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার সাথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। তখন এক লোক বলল, হে আমীরুল মুমিনীন এই বৃদ্ধ মহিলার কারণে মানুষকে রাস্তায় আটকিয়ে দিলেন? তিনি বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! তুমি কি জানো এই মহিলাটি কে? ইনি হলেন সেই মহিলা, যার অভিযোগ আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর থেকে শুনেছেন। ইনি হলেন খাওলা। তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

"যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা"। *(সূরা মুজাদালাহ: ১)*

ইমাম দারামী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের উক্তি উল্লেখ করে বলেন,

﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

"অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ-পশ্চাৎ ও ডান-বাম দিক হতে তাদের নিকট আসবো এবং এদের অধিকাংশকে তুমি শোকর গুজার পাবে না" *(সূরা আল 'আরাফ:১৭)*।

ইকরিমা (রহমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে কুরআনের এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, ইবলীস এই কথা বলতে পারেনি যে, আমি তাদের উপরের দিক থেকেও আসবো। কেননা সে ভালো করেই জানে যে, তাদের উপরের দিকে আল্লাহ তা'আলা

[১৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৪৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৬৭।

[১৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪২০।

রয়েছেন। সুতরাং সে বনী আদমকে গোমরাহ করার জন্য উপরের দিক থেকে আগমন করতে সক্ষম নয়।

যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ ও সালাফদের কথাগুলো শুনবে, সে সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার অগণিত দলীল খুঁজে পাবে। আর কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন তাদেরকে স্বীয় সত্তার ভিতরে সৃষ্টি করেননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকে কেউ জন্ম দেয়নি।

সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল যে, তিনি তার সত্তার বাইরে সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত ও সৃষ্টিজগত থেকে আলাদা হওয়ার সাথে সাথে যদি উপরে সমুন্নত হওয়ার বিশেষণে বিশেষিত না হতেন, তাহলে তা বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত হতেন। কেননা কোনো জিনিস যখন অন্য জিনিসের মুখোমুখী হয়, তখন তা তার মতই হয় অথবা তার বিপরীত জিনিস হয়। সুতরাং উপরের বিপরীত হলো নীচ। নীচ সাধারণতই নিন্দনীয় হয়ে থাকে। ইবলীস, তার অনুসারী এবং তার সৈনিকদের স্থান হলো নীচে।

যদি বলা হয়, আমরা এটি মানি না যে, আল্লাহ তা'আলা যদি এভাবে উপরে সমুন্নত হওয়ার বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার যোগ্য হন যে, তা অস্বীকার করা হলেই বিপরীত বিশেষণ সাব্যস্ত হবে। জবাবে আমরা বলবো যে, তিনি যদি উপরে সমুন্নত হওয়ার বিশেষণে বিশেষিত না হওয়ার যোগ্য হন, তাহলে তার পবিত্র সত্তার জন্য এমন কোনো হাকীকত অবশিষ্ট থাকে না, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যখন তোমরা স্বীকার করে নিয়েছো যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল মহান সত্তা এবং তিনি সৃষ্টিজগৎ থেকে ভিন্ন, মস্তিষ্কের কল্পনার মধ্যেই তার অস্তিত্ব সীমিত নয় তখন সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হলো যে, মন ও মস্তিষ্কের কল্পনার বাইরে তার অস্তিত্ব রয়েছে। জ্ঞানীগণ অবগত রয়েছেন যে, যার অস্তিত্ব ঠিক এরকমই, তার অস্তিত্ব হয় সৃষ্টিজগতের ভিতরেই হবে নতুবা তার বাইরে হবে। যারা এটি অস্বীকার করলো তারা একটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত সুস্পষ্ট জিনিসকে অস্বীকার করলো। এ বিষয়টি দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করার চেয়েও অধিক প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্য উপরে সমুন্নত হওয়া এমন একটি পূর্ণতার বিশেষণ, যাতে কোনো ত্রুটি নেই, কোনো ত্রুটিকে আবশ্যক করে না, কোনো নিষিদ্ধ জিনিসকেও আবশ্যক করে না এবং কুরআন, সুন্নাহ কিংবা ইজমার দলীলেরও বিরোধী নয়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা উপরে সমুন্নত হওয়ার হাকীকত অস্বীকার করা সম্পূর্ণ বাতিল এবং এটি এমন একটি বাতিল মতবাদ, যার অস্তিত্ব কোনো শরীয়াতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা উপরে সমুন্নত হওয়ার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত তার অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা, তার রসূলদেরকে সত্যায়ন করা, তার কিতাব ও

রসূলের সুন্নাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা সম্ভব নয়। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি এবং অপরিবর্তিত স্বভাব-প্রকৃতির সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত যে তিনি সমস্ত সৃষ্টির উপরে।

সৃষ্টির উপর তার সমুন্নত হওয়া এবং তার বান্দাদের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি শরী'আতের বিভিন্ন মুহকাম-স্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। এ বিষয়ে প্রায় বিশটির মত দলীল রয়েছে।

(১) কুরআনে সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, তিনি উপরে। فوق শব্দের আগে مِنْ হারফে জার যুক্ত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তিনি সত্তাগত দিক থেকেই সৃষ্টির উপরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"তারা (ফেরেশতারা) ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের উপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় তারা সে অনুযায়ী কাজ করে"। *(সূরা আন নাহাল: ৫০)*

(২) হারফে জার যুক্ত করা ছাড়াই উপরে সমুন্নত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

"তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী"। *(সূরা আল আনআম: ১৮, ৬১)*

(৩) তার দিকে ফেরেশতাগণ উঠেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

"ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) তার দিকে উর্ধ্বগামী হয়"। (*সূরা মা'আরিজ: ৪)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»

"তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমন করে থাকেন। তারা ফজর ও আসরের ছ্বলাতের সময় একসাথে একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল, তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? তারা বলেন, আমরা তাদেরকে ছ্বলাত আদায় করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তারা ছ্বলাতেই ছিল"। *(ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৫, মুসলিম হা/৬৩২)*

(৪) তার দিকে বনী আদমের আমল উঠে বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

"তারই দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে"। *(সূরা ফাতির: ১০)*

(৫) কোনো কোনো সৃষ্টিকে তার দিকে উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾

"বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। *(সূরা আন নিসা: ১৫৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾

"যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু দান করবো। অতঃপর তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৫৫)*

(৬) তার জন্য এমন বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় তিনি সত্তাগত, ক্ষমতাগত এবং মর্যাদাগত দিক থেকে সবকিছুর উপরে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

"আর তিনি সুউচ্চ, সমুন্নত ও মহান"। *(সূরা আল বাকারা: ২৫৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

"তিনি সর্বোচ্চ, সুমহান"। *(সূরা সাবা: ২৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾

"তিনি সুমহান ও সুবিজ্ঞ"। *(সূরা শূরা: ৫১)*

(৭) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কিতাব নাযিল হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

"হা-মীম, কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ"। *(সূরা গাফের: ২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

"এ কিতাব মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে"। *(সূরা যুমার: ১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾

"এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত"। *(হামীম সাজদাহ: ২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد

"এটা প্রজ্ঞাবান ও প্রশংসনীয় আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ"। *(সূরা হামীম সাজদাহ: ৪২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾

"এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুস সত্য সহকারে তোমার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করেছে"। *(সূরা আন নাহাল: ১০২)* আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

"হামীম। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা হয় আমার আদেশক্রমে। আমিই প্রেরণকারী"। *(সূরা দুখান: ১-৫)*

(৮) আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট করেই বলেছেন যে, কতিপয় সৃষ্টি তার নিকটে এবং আরো বলেছেন যে, কতকের চেয়ে অন্য কতক সৃষ্টি তার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

"তোমার রবের সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ কখনো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তার ইবাদতে বিরত হয় না, বরঞ্চ তারা তারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তার সামনে সিজদাবনত হয়"। *(সূরা আল-আরাফ: ২০৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾

"পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যে সৃষ্টিই আছে তা আল্লাহরই। আর যে ফেরেশতারা তার কাছে আছে তারা না নিজেদেরকে বড় মনে করে তার ইবাদত করা থেকে বিমুখ হয় এবং না ক্লান্ত ও বিষন্ন হয়"। *(সূরা আম্বীয়া: ১৯)*

এখানে সাধারণভাবে من له বলে তার ফেরেশতাদেরকে বুঝানো এবং নির্দিষ্টভাবে من عنده বলে তার খাস বান্দাদেরকে বুঝানোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপারে যেই কিতাব লিখেছেন সে সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ

তা তার নিকট আরশের উপরে রয়েছে।[১৫]

(৯) সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা في السماء তথা আসমানের উপরে। আহলে সুন্নাতের তাফসীর বিশারদদের মতে এখানে **في السماء** এর দু'টি অর্থের যে কোনো একটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। এখানে في দ্বারা على উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা السماء দ্বারা العلو (উপর) উদ্দেশ্য হতে পারে। এ দুই অর্থের যে কোনো একটি অর্থ উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এই দুই অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য হতেই পারে না।

(১০) আরশের সাথে **على** অব্যয় যুক্ত করে আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর আরশ হলো সকল সৃষ্টির উপরে। **استوى على العرش** এর আগে **ثم** যোগ করা থেকে বিলম্বের সাথে ধারাবাহিকতা বুঝা যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করা এবং আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ছিল।

(১১) হাদীছে সুস্পষ্টভাবে উপরের দিকে হাত উঠিয়ে দু'আ করার কথা বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي من عبده إِذَا رَفَعَ إليه يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা খুব লাজুক ও মর্যাদাবান। বান্দা যখন দু'হাত তুলে তার নিকট প্রার্থনা করে তখন নিরাশার সাথে শূন্য অবস্থায় তা ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ

[১৫] ছ্বহীহ। এতে আল্লাহ তা'আলা লিখেছেন যে, إن رحمتي سبقت غضبي "আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে"।

করেন”।[১৬]

যারা বলেছেন যে, উপরের দিক শুধু দু'আর জন্য; উপরে আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন, এমনটি নয়, তাদের কথা বিবেক-বুদ্ধি ও ফিতরাতের দলীল দ্বারাই বাতিল। কেননা প্রত্যেক দু'আকারী যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে তখন আল্লাহ তা'আলাকে উপরে বিশ্বাস করে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

(১২) হাদীছে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। সকল উম্মতের মতেই অবতরণ সাধারণত উপর থেকে নীচের দিকেই হয়ে থাকে।

(১৩) আল্লাহ তা'আলার দিকে ইঙ্গিত করার সময় উপরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বনী আদমের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত বান্দা তার দিকে ইশারা করার সময় উপরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তার উপর যা আবশ্যক এবং যা নিষিদ্ধ তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এভাবেই উপরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মহাপবিত্র দিবসে এবং মহাপবিত্র স্থানে মহাসম্মেলনে যত লোক তার জন্য সমবেত হয়েছিল, সেখানে ইতিপূর্বে অন্য কোনো নাবীর জন্য সমবেত হয়নি। সেখানে তিনি সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সেদিন তোমরা কী বলবে? তারা জবাব দিলো, আমরা সাক্ষ্য দিবো যে, আপনি আপনার দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি তার শাহাদাত আঙ্গুল উপরের দিকে উঠালেন। আঙ্গুলের উপরে যিনি আছেন এবং প্রত্যেক জিনিসের উপরে যিনি আছেন, তার দিকে তিনি আঙ্গুল উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। আমরা যেন এখনো সেই পবিত্র আঙ্গুল দেখছি। তা যেন এখনো উপরের দিকে উঠানো রয়েছে। আমরা যেন এখনো সেই পবিত্র জবানের কথা শুনছি, তিনি তার রবের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বলছেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।[১৭]

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সুস্পষ্টভাবেই আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তার রবের রিসালাত যথাযথভাবে আদায় করেছেন। তার উম্মতকে সর্বোচ্চ নসীহত করেছেন। সুতরাং তার বর্ণনা, তাবলীগ এবং খোলাখুলি প্রচারের পর সীমালংঘনকারীদের সীমালংঘনের কোনো প্রয়োজন নেই এবং পন্ডিতদের পান্ডিত্য দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। দীনের সকল বিষয়ের বর্ণনা সুস্পষ্ট হওয়ায় আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করছি।

---

[১৬] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩৭৬৫, তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুদ্ দাওয়াত, হা/৩৪৭৯। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। ছ্বহীহ আল-জামেউ, প্রথম খন্ড, হা/১৭৫৭, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, দ্বিতীয় খন্ড, হা/২৭২।

[১৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৮

(১৪) أين الله؟ আল্লাহ কোথায়? সুস্পষ্টভাবে এ কথাটি দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সৃষ্টির সেরা জ্ঞানী, উম্মতকে সর্বাধিক নসীহতকারী এবং সঠিক অর্থ বর্ণনায় সর্বাধিক সুস্পষ্টভাষী এ বাক্য দ্বারা প্রশ্ন করেছেন। একাধিক স্থানে তিনি এর দ্বারা "আল্লাহ কোথায়?[১৮] প্রশ্ন করেছেন। এতে কোনো বাতিল অর্থের ধারণা হতে পারে না।

(১৫) যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, তার রব আসমানে রয়েছেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পক্ষে ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

(১৬) ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, সে আসমানে উঠতে চেয়েছিল। যাতে করে সে মূসার ইলাহকে দেখতে পারে এবং মূসা আলাইহিস সালাম কতৃক আসমানের উপর আল্লাহ তা'আলার দাবিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারে। সে বলেছিল,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧)

ফির'আউন আরও বলল, 'হে হামান, আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত বানাও যাতে আমি অবলম্বন পাই। আসমানে আরোহরণের অবলম্বন, যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই, আর আমি কেবল তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' আর এভাবে ফির'আউনের কাছে তার মন্দ কাজ শোভিত করে দেয়া হয়েছিল এবং তাকে বাঁধা দেয়া হয়েছিল সৎপথ থেকে। আর ফির'আউনের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হয়েছিল। *(সূরা মুমিন :৩৬-৩৭)।*

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা উপরে সুমন্নত হওয়াকে অস্বীকার করবে, সে জাহমীয়া ও ফেরআউনী মতাদর্শে বিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি উপরে সমুন্নত হওয়াকে সাব্যস্ত করবে সে মূসা ও মুহাম্মাদের আদর্শে বিশ্বাসী।

(১৭) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ছ্বলাতের রাক'আত সংখ্যা কমানোর জন্য মিরাজের রাতে মূসা আলাইহিস সালাম ও তার রবের মাঝে যাওয়া আসা করেছেন। তিনি একাধিকবার তার রবের দিকে উঠেছেন এবং মূসার দিকে ফিরে এসেছেন।[১৯]

(১৮) কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের একাধিক দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, জান্নাতীগণ আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, পূর্ণিমা রাতে মেঘহীন আকাশে যেমন সূর্য ও চন্দ্র দেখা যায় তেমনি তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে। তারা কেবল আল্লাহ তা'আলাকে উপরেই দেখবে। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[১৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৭

[১৯] মুত্তাফাকুন আলাইহি।

"بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَإِذَا الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَقَالَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} [يس: ٥٨]. ثُمَّ يَتَوَارَى عَنْهُمْ، وَتَبْقَى رَحْمَتُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ"

"জান্নাতবাসীরা যখন নিয়ামতের মধ্যে থাকবে, তখন তাদের জন্য একটি নূর চমকাবে। তারা সেদিকে মাথা উঠিয়ে দেখবে। আকস্মিক তারা দেখতে পাবে যে, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা উপর থেকে তাদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তোমাদের উপর সালাম। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ "দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে "সালাম" বলা হবে"। *(সূরা ইয়াসীন: ৫৮)* অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের থেকে আড়াল হয়ে যাবেন। তারপরও তার রহমত ও বরকত তাদের বাড়ি-ঘরে অবশিষ্ট থেকেই যাবে"।[২০] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্য ইমামগণ জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর দিদার অস্বীকার করা ব্যতীত যেহেতু উপরে সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তাই মুতাযিলা ও জাহমীয়ারা আল্লাহর দিদারকেই অস্বীকার করেছে। এ জন্য জাহমীয়ারা দুটোকেই অস্বীকার করেছে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা একই সঙ্গে উভয়টিকেই সাব্যস্ত করেছে এবং স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আর যারা আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত করেছে, কিন্তু সৃষ্টির উপরে তার সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তারা দুই অবস্থার মাঝখানে দোদুল্যমান রয়েছে। তারা এদিকেও নয় ওদিকেও নয়।

আল্লাহ তা'আলা উপরে সমুন্নত হওয়ার দলীলগুলো যদি একটি একটি করে বর্ণনা করতাম, তাহলে প্রায় এক হাজারে পৌঁছে যেত। যারা আল্লাহ তা'আলার উলুকে অস্বীকার করে, তাদের উপর এগুলোর জবাব দেয়া আবশ্যক। কোথায় তাদের জবাব! তারা এ কয়েকটি দলীলের সঠিক জবাব দিতে অক্ষম।

[২০] যঈফ: ইবনে মাজাহ হা/১৮৪।

সালাফদের থেকে প্রমাণিত আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলের উপর সমুন্নত

আল্লাহ তা'আলার জন্য العلو বা উপর বিশেষণ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সালাফদের থেকে অনেক দলীল রয়েছে।

(১) শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আল-আনসারী স্বীয় সনদে মতী আল-বালখী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তার "আল-ফারুক" নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে বলে আমি জানি না আমার রব কি যমীনে না আসমানে? জবাবে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, সে কুফুরী করলো। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন" *(সূরা ত্বহা :৫০)।*

আল্লাহ্ তা'আলার আরশ তার সাত আসমানের উপরে। বালখী বলেন, আমি বললাম, সে যদি বলে, তিনি আরশের উপরে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলে, আমি জানি না আরশ কোথায়? আসমানে না যমীনে? জবাবে ইমাম বলেছেন, সে কাফের। কেননা সে আল্লাহর আরশ আসমানে হওয়াকে অস্বীকার করলো। সুতরাং যে ব্যক্তি আসমানে আল্লাহর আরশ থাকার কথা অস্বীকার করলো, সে কুফুরী করলো। অন্যরা আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, কেননা আল্লাহ তা'আলা ইল্লিয়্যীনের উপরে। তাকে উপরের দিকে ডাকা হয়; নীচের দিকে নয়। বালখীর বক্তব্য এখানেই শেষ।

হানাফী মাযহাবের যেসব লোক আল্লাহ তা'আলা উপরে সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে, তার কথার দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে না। মুতাযিলা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও হানাফী হওয়ার দাবী করে। অথচ তারা আক্বীদার অনেক মাস'আলায় ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর বিরোধীতা করে। অনেক লোক ইমাম মালেক, শাফেঈ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের মাযহাবের দিকে নিজেদের সম্বন্ধ করে। তারাও আক্বীদার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের ইমামদের বিরোধীতা করে।

ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক মুতাযেলী ইমাম বিশর আল-মুরাইসীকে কাফের বলার ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। সে যখন আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত হওয়ার কথা অস্বীকার করলো এবং বলল, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান তখন তিনি তাকে ডেকে আনলেন এবং তাকে কাফের হিসাবে সাব্যস্ত করে তাওবা করার আহবান জানালেন। আব্দুর রাহমান বিন আবু হাতেম এবং অন্যান্য ইমামগণ এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[২১]

[২১] ইমাম ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন যে, বিশর বিন অলীদ ইমাম আবু ইউসুফের নিকট আগমন করে বলল, আপনি আমাকে ইলমুল কালাম চর্চা করতে নিষেধ করেন। অথচ বিশর আলমুরাইসী, আলী আহওয়াল এবং

আর যারা فوق শব্দের তাবীল করে বলবে যে এখানে উপরে বলতে তিনি তার বান্দাদের চেয়ে উত্তম এবং মর্যাদাবান, তিনি আরশ থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম যেমন বলা হয়ে থাকে الأمير فوق الوزير সম্রাট মন্ত্রীর উপরে, দীনারের দাম দিরহামের উপরে সুস্থ বিবেক তাদের কথাকে অপছন্দ করে এবং বিশুদ্ধ হৃদয় তাদের কথাকে ঘৃণা করে। কারো কথা, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের চেয়ে ভালো, তার আরশের চেয়ে ভালো এই কথাগুলো আসলে ঠিক ঐ রকমই যেমন কেউ বলল, বরফ ঠান্ডা, আগুন উত্তপ্ত, সূর্যের আলো বাতির আলোর চেয়ে উজ্জ্বল আসমান ঘরের ছাদের চেয়ে উঁচু, পাহাড়ের ওজন পাথরের ওজনের চেয়ে বেশী, আল্লাহর রাসূল অমুক ইয়াহূদীদের চেয়ে উত্তম, আসমান যমীনের উপরে, -এই কথাগুলোর মাধ্যমে কোনো কিছুর মর্যাদা, বড়ত্ব কিংবা প্রশংসা নেই। বরং এগুলো নিকৃষ্ট, কুৎসিত ও নিন্দনীয় কালামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কালামের শানে কিভাবে এই ধরণের কথা শোভনীয় হতে পারে? সমস্ত জিন এবং মানুষ মিলে আল্লাহর কালামের অনুরূপ কোনো কালাম আনয়ন করার চেষ্টা করলেও এর অনুরূপ কোনো কালাম আনয়ন করতে পারবেনা। তাদের একজন অন্যজনকে সাহায্য করলেও পারবে না। এভাবে আল্লাহর কালামের তাবীল করা কুরআনের মর্যাদা কমানোর পর্যায়ভুক্ত। প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে।

ألم تر أن السيف ينقص قدره... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

তুমি কি জানো না যখন বলা হয়, তলোয়ারের আঘাত লাঠির আঘাতের চেয়ে ভয়াবহ, তখন তলোয়ারের মান খাটো করা হয়ে থাকে?

কেউ যদি বলে পেয়াজের ছালের উপরের অংশ মাছের চোচার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকার পরও জ্ঞানীগণ হাসবেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার ব্যবধান অনেক। তবে ক্ষেত্রে বিশেষে বাতিলপন্থীদের সাথে তর্ক করার সময় স্রষ্টা ও সৃষ্টির উপমা পেশ করা যেতে পারে। যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছেন,

﴿ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

অমুক অমুক শাইখ ইহার চর্চা করে। ইমাম ইউসুফ জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কী বলে? তিনি বললেন, তারা বলে, إن الله في كل مكان "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক স্থানেই বিরাজমান"। আবু ইউসুফ লোক পাঠিয়ে বললেন, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাদেরকে নিয়ে আসা হলো। বিশর তাদেরকে নিয়ে আসলেন। আলী আহওয়াল এবং আরেকজন মুতাযেলী শাইখকে নিয়ে আসা হলো। ইমাম আবু ইউসুফ এ শাইখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার শরীরের মধ্যে শাস্তি কায়েম করার মত কোনো জায়গা থাকলে আমি তোমাকে পিটিয়ে আহত করে ফেলতাম। কারণ সে ছিল অতি বৃদ্ধ। তাই তাকে বন্দী করার হুকুম করলেন। আলী আহওয়ালকে বেত্রাঘাত করা হলো এবং মহল্লায় মহল্লায় ঘুরানো হলো। ঐদিকে বিশর আল মুরাইসীকে ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) কাফের সাব্যস্ত করে তাওবা করার আহবান জানালেন। কেননা সে আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করেছিল। ইমাম ইবনে আবী হাতেম এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত। এটিই ছিল ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর পূর্ববর্তী অনুসারীগণের মাযহাব। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

"তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার উপর বিজয়ী?। *(সূরা ইউসুফ: ৩৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আল্লাহ ভালো না কি সেসব মাবুদরা ভালো যাদেরকে তারা তার শরিক করেছে?[২২] *(সূরা আন নামাল: ৫৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾

"আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই স্থায়িত্ব লাভকারী"। *(সূরা ত্বহা: ৭৩)*

প্রত্যেক দিক থেকেই আল্লাহ তা'আলার জন্য সমুন্নত হওয়ার বিশেষণ সাব্যস্ত হওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি থেকে উত্তম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা সকলের উপরে, তার মর্যাদা সকলের উপরে এবং তার পবিত্র সত্তাও সবকিছুর উপরে। যে ব্যক্তি এ থেকে কিছু সাব্যস্ত করলো আর কিছু নাকোচ করলো, সে আল্লাহ তা'আলার মান খাটো করলো। আল্লাহ তা'আলার উলু বা উপরে সমুন্নত হওয়া সকল দিক বিবেচনায় পূর্ণতার বিশেষণ।

তারা যদি বলে আল্লাহ তা'আলার مكانة বা মর্যাদা সবকিছুর উপরে। তার مكان বা সত্তাগত অবস্থা সবার উপরে নয়। তাদের জবাবে বলা হবে যে, المكانة শব্দটি المكان এর স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন المنزلة শব্দটি المنزل এর স্ত্রীলিঙ্গ। সুতরাং المكانة এবং المنزلة শব্দ দু'টি স্থানগত ও মর্যাদাগত উভয় দিক থেকেই ব্যবহৃত হয়। যেমন المكان ও المنزل শব্দ দু'টিও স্থানগত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন এই কথা বলা হয় যে, আমাদের অন্তরে তোমার জন্য বিশেষ منزلة বা স্থান রয়েছে, আমাদের অন্তরে অমুকের منزلة বা স্থান অমুকের চেয়ে বেশী, তখন এর দ্বারা মর্যাদাগত অর্থ উদ্দেশ্য। যেমন হাদীছে এসেছে, তোমাদের কেউ যদি আল্লাহর নিকট তার স্থান বা মর্যাদা সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে সে যেন তার অন্তরে আল্লাহর স্থান বা মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার মধ্যে সেই পরিমাণ স্থান প্রদান করেন, বান্দা যে পরিমাণ স্থান আল্লাহকে তার মধ্যে প্রদান করে।[২৩]

---

[২২] আল্লাহ ভালো, না এসব মিথ্যা মাবুদ ভালো? এ প্রশ্নটি আপাতত দৃষ্টিতে বড়ই অদ্ভূত মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা উপাস্যদের মধ্যে তো আদৌ কোন ভালোই নেই যে, আল্লাহর সাথে তাদের তুলনা করা যেতে পারে। মুশরিকরাও আল্লাহর সাথে ঐসব উপাস্যদের তুলনা করা যেতে পারে এমন কথা ভাবতো না। কিন্তু তারা যাতে নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়, সেজন্য এ প্রশ্ন তাদের সামনে রাখা হয়েছে।

[২৩] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি এই হাদীছ সম্পর্কে জানি না।

আসলে বান্দার অন্তরে আল্লাহর স্থান বলতে তার অন্তরে আল্লাহর মারেফত, ভালোবাসা, সম্মান ইত্যাদি উদ্দেশ্য। সুতরাং যখন জানা গেলো যে, المكانة এবং المنزلة শব্দদ্বয় المكان ও المنزل এর স্ত্রীলিঙ্গ। আর مؤنث সবসময় مذكر এর শাখা হয়ে থাকে। শব্দগত দিক থেকে এবং অর্থগত দিক থেকে مؤنث সাধারণত مذكر এর অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং মস্তিকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যেই উলু বা উপরে সমুন্নত হওয়ার ধারণা ফুটে উঠে, তা প্রকৃত অর্থ থেকেই প্রস্ফুটিত হয়। অর্থাৎ তার পবিত্র সত্তা উপরে বলেই মাথায় এই ধারণা আসে। বাস্তবের অনুরূপ ধারণা মাথায় আসলে তা সত্য হয়। আর বাস্তবের অনুরূপ ধারণা মাথায় না আসলে উক্ত ধারণা বাতিল বলে সাব্যস্ত হয়।

আর যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা উপরে থাকার অর্থ হলো বান্দাদের অন্তরের সর্বোচ্চ স্থানে থাকা উদ্দেশ্য এবং তিনি বান্দাদের অন্তরের অন্যান্য সমস্ত জিনিসের চেয়ে উপরে, তাহলে আমরা জবাবে বলবো যে, আসলেই তিনি অনুরূপ। বান্দাদের অন্তরে তার এই উচ্চ মর্যাদা সত্তাগত দিক থেকে সকলের উপরে থাকার কারণেই। তিনি যদি সত্তাগত দিক থেকে সবকিছুর উপরে না হতেন, তাহলে বান্দাদের অন্তরে তার উচ্চ মর্যাদা বাস্তবতার অনুরূপ হতো না। যেমন কেউ নীচের কোনো জিনিসকে উপরে থাকার ধারণা করলো।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, বিবেক-বুদ্ধি ও ফিতরাতের দলীল

আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টির উপরে। এটি আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত মুসলিমদের ইজমা দ্বারা যেভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, ঠিক তেমনি বুদ্ধিভিত্তিক ও ফিতরাতের দলীল দ্বারাও সাব্যস্ত। কুরআন ও ছ্বহীহ সুন্নাহ এর দলীলগুলো ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। একাধিকভাবে বুদ্ধিভিত্তিক দলীল দ্বারাও এটি সাব্যস্ত। যেমন-

(১) স্বাভাবিকভাবেই অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক দু'টি অস্তিত্বশীল বস্তুর একটি অন্যটির ভিতরে থাকে এবং অন্যের দ্বারা অস্তিত্বশীল হয়। যেমন স্বভাব ও বিশেষণ। স্বভাব ও বিশেষণকে বিশেষিত সত্তা থেকে আলাদাভাবে বুঝার কোনো সুযোগ নেই অথবা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল, স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অন্য বস্তু থেকে আলাদা হয়, এনটি নয়।

(২) আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি নিজের মধ্যেই তা সৃষ্টি করেছেন আর না হয় তার পবিত্র সত্তার বাইরে তা সৃষ্টি করেছেন। প্রথম ধারণাটি সম্পূর্ণ বাতিল। কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিমদের ঐক্যমতে এই ধারণা বাতিল। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা নিকৃষ্ট ও নাপাক বস্তুর মহল হওয়া আবশ্যক হয়। আল্লাহ

তা'আলা এর বহু উর্ধ্বে। আর যদি বলা হয় যে, তিনি তার সত্তার বাইরে সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সৃষ্টিজগৎ তার পবিত্র সত্তার বাইরে এবং তার থেকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। এতে বুঝা গেলো যে, সৃষ্টিজগৎ তার পবিত্র সত্তা থেকে আলাদা। তাই এই কথা মোটেই বোধগম্য নয় যে, তিনি সৃষ্টিজগতের সাথে যুক্ত নন এবং আলাদাও নন।

(৩) যদি বলা হয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের ভিতরে নন; বাইরেও নন, তাহলে এ থেকে আবশ্যক হয় যে আল্লাহ তা'আলার কোনো অস্তিত্বই নেই। কেননা এ জাতীয় কথা বোধগম্য নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সৃষ্টিজগতের ভিতরে, না হয় বাইরে থাকা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম ধারণাটি বাতিল। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই সঠিক। তিনি সৃষ্টিজগৎ থেকে আলাদা, বাইরে ও উপরে।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হওয়ার ফিতরাতী দলীল হলো, সমস্ত সৃষ্টিই তাদের সৃষ্টিজগত স্বভাবের মাধ্যমে এবং সুস্থ হৃদয়ের দাবীতেই দু'আ করার সময় তাদের হাত উপরের দিকে উঠায়। তারা যখন আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করে তখন অন্তরসমূহকে উপরের দিকে ধাবিত করে। মুহাম্মাদ বিন তাহের আল-মাকদেসী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, একদা শাইখ আবু জা'ফর হামদানী ইমামুল হারামাইন উস্তাদ আবুল মাআলী আল জুওয়াইনীর দারসে উপস্থিত হলেন। ইমামুল হারামাইন তখন সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া সিফাতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কথা বলছিলেন। সে বলে যাচ্ছিল, আল্লাহ ছিলেন। তখন আরশ ছিল না। তিনি এখনো সেভাবেই আছেন, যেভাবে আগে ছিলেন। শাইখ আবু জা'ফর তখন বললেন, হে শাইখ! আমাদের অন্তরে আমরা যে প্রয়োজন অনুভব করি, তা সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করুন। কেননা যখনই আল্লাহর কোনো বান্দা ইয়া আল্লাহ বলে ডাক দিয়েছে, তখনই সে তার অন্তরে উপরের দিকে টান অনুভব করেছে। ডান দিক কিংবা বামদিকে তার অন্তর দৃষ্টিপাত করে না। আমরা কিভাবে অন্তর থেকে এই দাবি দূর করবো। এতে আবুল মাআলী মাথায় আঘাত করলেন এবং মিম্বার থেকে নেমে পড়লেন। আমার ধারণা বর্ণনাকারী বলেছিল, অতঃপর তিনি প্রচুর কাঁদলেন এবং বললেন, হামাদানী আমাকে হয়রান করে ফেলেছে! হামাদানী আমাকে হয়রান করে ফেলেছে। শাইখের উদ্দেশ্য হলো, এটি এমন বিষয়, যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের ফিতরাতের মধ্যে স্থাপন করেছেন। নাবী-রসূলদের নিকট থেকে শিক্ষা করা ছাড়াই মানুষ এটি প্রাপ্ত হয়েছে। তারা তাদের অন্তরে এমন একটি দাবি অনুভব করে, যা উপরের দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলাকে উপরে অনুসন্ধান করে।

যদি বলা হয়, স্বভাবজাত বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। অধিকাংশ বিবেকবান লোকই এটি অস্বীকার

করেছে।[২৪] স্বাভাবিকভাবেই যদি সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া বুঝা যেত, তাহলে বিবেকবানগণ এ বিষয়ে মতভেদ করতেন না। বরং এটি একটি ধারণা প্রসূত বিষয় মাত্র।

এই আপত্তির জবাব যথাস্থানে প্রদান করা হয়েছে। তবে এখানে আমি সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করবো। তা হলো বিবেক-বুদ্ধি যদি তোমাদের কথা কবুল করে, তাহলে আমাদের কথা তোমাদের কথার চেয়ে বিবেকের নিকট অধিক কবুলযোগ্য। আর যদি আমাদের কথা বিবেকের নিকট প্রত্যাখ্যানযোগ্য হয়, তাহলে তোমাদের কথা আরো অধিক প্রত্যাখ্যানযোগ্য। বিবেকের নিকট যদি আমাদের কথা বাতিল বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তোমাদের কথা আরো অধিক বাতিলযোগ্য হবে। তোমাদের কথা যদি বিবেকের নিকট সত্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আমাদের কথা তার নিকট আরো অধিক সত্য ও গ্রহণযোগ্য হবে। বিবেক-বুদ্ধির দাবি আমাদের ও তোমাদের নিকট একটি যৌথ দাবি। আমরা আকলী দলীলের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তোমাদের কথা বাতিল। তোমরাও আমাদের কথাকে বাতিল বলে থাকো। আর যখন তোমরা বলবে, আমাদের কথা বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে নিছক ধারণার মাধ্যমে; বিবেক-বুদ্ধির দলীলের মাধ্যমে নয়, তখন আমরাও অনুরূপ কথার মাধ্যমে তোমাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করবো। মানুষের সমস্ত সৃষ্টিগত স্বভাব আমাদের কথাকে সমর্থন করে। মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আমরা এর মাধ্যমে তোমাদের উপর জয়লাভ করেছি। আর যদি তা অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তোমাদের কথা একেবারেই বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা তোমাদের সাথে মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব ও আকলী যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। কেননা তোমাদের দাবী অনুযায়ী তোমাদের কথার মূলভিত্তি বনী আদমের কিছু সৃষ্টিগত স্বভাব ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের ও তোমাদের আকলী ও সৃষ্টিগত দলীল যদি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের সাথে কোনো দলীলই থাকছে না। আর সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার ব্যাপারে নাবী রাসূলগণ যেসব দলীল নিয়ে এসেছেন, তা আমাদের নিকট থেকে যাচ্ছে। ঐদিকে তোমাদের সাথে কিছুই থাকছে না। কেননা আমরা কুরআন সুন্নাহ এর দলীলে বিশ্বাসী; তোমরা তাতে মোটেই বিশ্বাস করো না। আর আকলী দলীলের ক্ষেত্রে আমরা ও তোমরা উভয়েই সমান।

আর তোমরা যদি দাবি করো যে, অধিকাংশ বিবেকবানই তোমাদের কথাকে সমর্থন করে, তাহলে আমরা বলবো যে, আসলে বিষয়টি সেরকম নয়। কেননা যারা বলে সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা এমন এক সত্তা, যা সৃষ্টিজগতের উপরে নন, তা থেকে আলাদা নন এবং

---

[২৪] এ কথা সঠিক নয়। বরং অধিকাংশ জ্ঞানীই আল্লাহ তা'আলার জন্য উলু বা সৃষ্টির উপর সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করে। ছাহাবীগণ ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী। তারা এবং বড় বড় যুক্তিবিদগণ বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে। ইমাম আবুল হাসান আশআরী স্বীয় কিতাব ইবানার মধ্যে আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করেছেন। ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল-জুআয়াইনী (রহিমাহুল্লাহ)ও তা সাব্যস্ত করেছেন।

তার ভিতরেও দাখিল নন, তারা যুক্তিবাদীদের একটি দল। জাহাম বিন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরাই ইসলামের মধ্যে এ কথা প্রচার করেছে।

ফিতরাতী দলীলের উপর আপত্তি করে বলা হয়েছে যে, আসমানের দিকে হাত তুলে দু'আ করার কারণ হলো, আসমান হচ্ছে দু'আর কিবলা। যেমন কাবা হলো ছ্বলাতের কিবলা। আর সিজদার সময় যেহেতু আমরা যমীনে কপাল ঠেকাই, তাই দু'আতে উপরের দিকে হাত উঠানোতে আল্লাহ তা'আলা উপরে থাকার কথা প্রমাণিত হয় না? কয়েকভাবে এই আপত্তির জবাব প্রদান করা হয়েছে।

(১) এই উম্মতের পূর্ববর্তী কোনো আলেম এই কথা বলেননি যে, আসমান হলো দু'আর কিবলা। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোনো দলীলও অবতীর্ণ করেননি। আর দু'আ ইসলামী শরী'আতের জানা বিষয়সমূহের অন্যতম একটি জানা বিষয়। তার কিবলা যদি আসমান হতো, তাহলে এ বিষয়ে কোনো না কোনো দলীল থাকতো। আর তা থেকে থাকলে সমগ্র উম্মত এবং উম্মতের আলেমদের নিকট বিষয়টি অজানা থাকার কথা নয়।

(২) ছ্বলাতের কিবলাই দু'আর কিবলা। দু'আকারীর জন্য কিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব। অনেক স্থানে দু'আ করার সময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলার দিকে মুখ ফিরাতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি বললো যে, ছ্বলাতের কিবলা ছাড়াও দু'আর জন্য আরেকটি কিবলা রয়েছে অথবা দু'আর জন্য দু'টি কিবলা রয়েছে, একটি কাবা অন্যটি আসমান সে দীনের মধ্যে বিদ'আত তৈরী করলো এবং মুসলিমদের জামা'আতের খেলাফ করলো।

(৩) মুমিন বান্দা যেদিকে মুখ ফিরায় তাই কিবলা। যেমন আপনি ছ্বলাতে, দু'আয়, যিকির-আযকারে এবং প্রাণী যবেহ করার সময় কিবলামুখী হয়ে থাকেন। এমনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তি এবং দাফনকৃত ব্যক্তির মুখ কিবলার দিকে ফিরানো হয়ে থাকে। এ জন্যই কিবলাকে মুখ ফিরানোর দিক বলা হয়। الاستقبال সামনে রাখা الاستدبار বা পিছনে রাখার বিপরীত। ইস্তেকবাল সাধারণত চেহারার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর الاستدبار হয়ে থাকে পিঠের মাধ্যমে। সুতরাং মানুষ যা মাথা বরাবর রাখে বা উভয় হাত বরাবর কিংবা পৃষ্ঠদেশ বরাবর রাখে তাকে কিবলা বলা হয় না। প্রকৃত অর্থেও না, রূপকার্থেও না। সুতরাং আসমান যদি দু'আর কিবলা হতো, তাহলে চেহারাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে দু'আ করা শরী'আত সম্মত হতো। অথচ দু'আর সময় আসমানের দিকে চেহারা উঠানো নিষিদ্ধ। যেই স্থানের দিকে কিছু উঠানো হয়, তাকে কিবলা বলা হয় না। প্রকৃত অর্থে কিংবা রূপকার্থে তাকে কিবলা বলা হয় না। দু'আর মধ্যে কিবলামুখী হওয়া একটি শারঈ বিষয়। তাই তাতে শরী'আতের হুকুম-আহকামের অনুসরণ করা আবশ্যক। রসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে দু'আর মধ্যে আসমানকে কিবলা বানানোর হুকুম করেননি। বরং তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

আর এটি জানা কথা যে, উপরের দিকে অন্তর ধাবিত হওয়ার যে প্রয়োজন দু'আকারীগণ অনুভব করে থাকে এবং তারা তাদের নিজেদের মধ্যে উপরের দিকে প্রার্থনা করার যে দাবি অনুভব করে, তা একটি সৃষ্টিগত বিষয়। মুসলিম, কাফের, জ্ঞানী মূর্খ সকলেই এটি করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরীয়াদকারী এবং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এটিই করে থাকে। এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিপদা-পদ যখন তাকে পেয়ে বসে তখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে এবং উপরের দিকে অন্তর ও হাত উঠায়।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কিবলা রহিত করণ ও পরিবর্তনযোগ্য। যেমন বাইতুল মাকদিস থেকে কিবলা পরিবর্তন হয়ে কাবার দিকে এসেছে। আর দু'আ করার সময় উপরের দিকে মন-অন্তর ধাবিত হওয়ার বিষয়টি ফিতরাতের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এটি কখনো পরিবর্তন হয় না। কাবার দিকে মুখমন্ডল ফিরানোর সময় মানুষ অবগত থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা সেখানে নন। কিন্তু দু'আকারী আসমানের দিকে অন্তর ও হাত উঠানোর সময় অবশ্যই ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা সেখানে রয়েছেন। তার নিকট থেকেই সে রহমত নাযিল হওয়ার আশা রাখে। সিজদাহ করার সময় কপাল মাটিতে রাখা হয় বলেই বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে নেই। যারা এটি বুঝে তাদের বুঝ খুবই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ মাটিতে কপাল রেখে নত হওয়া দ্বারা বান্দা তার উপরের সত্তার জন্য সর্বোচ্চ বিনয় প্রকাশ করে থাকে। এটি উদ্দেশ্য করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার নীচে রয়েছেন। তাই সেদিকে সে ঝুকে পড়ে। সিজদাকারীর অন্তরে এই বাতিল ধারণা কখনো উদিত হয় না। তবে পথভ্রষ্ট বিশর আল-মুরাইসীকে বলতে শুনা গেছে যে, সে সিজদায় গিয়ে বলেছিল سبحان ربي الأسفل। আল্লাহ তা'আলা যালেম ও নাস্তিকদের কথার বহু উর্ধ্বে। আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করতে করতে যার অবস্থা এই পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, তার মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি না আল্লাহর রহমত তাকে তা থেকে রক্ষা করে। আর এরূপ লোকের সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

"প্রথমবার যেমন তারা এর প্রতি ঈমান আনেনি ঠিক তেমনিভাবেই আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেই। আমি এদেরকে এদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেই" । *(সূরা আনআম: ১১০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾

"এরপর যখন তারা বাঁকা পথ ধরলো তখন আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন"। *(সূরা ছ্বফ: ৫)*

সুতরাং যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে হিদায়াত তালাশ করবে না, তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করা হবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وقد أعجز عن الإحاطة خلقه সৃষ্টিজগত তাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে অক্ষম। অর্থাৎ জ্ঞান ও দেখার মাধ্যমে তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। শুধু তাই নয় অন্য কোনো ভাবেও কেউ তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। বরং আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। কোনো কিছুই তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

(৫৯) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما

আমরা আরও বলি যে, আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং মূসা আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, এর প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে, এর সত্যতা স্বীকার করে এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾

"আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন"। *(সূরা আন নিসা: ১২৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

"আমি মূসার সাথে কথা বলেছি ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়"। *(সূরা আন নিসা: ১৬৪)* ভালোবাসার পূর্ণতম স্তরকে الخلة বলা হয়।

জাহমীয়ারা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দা উভয়ের পক্ষ হতেই ভালোবাসা হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। তারা ধারণা করেছে যে, ভালোবাসা দুইজনের মধ্যকার সম্পর্কের কারণেই হয়ে থাকে। আর অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন ও অবিনশ্বর সত্তা এবং নশ্বর সৃষ্টির মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক নেই যাতে উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা আবশ্যক করতে পারে। পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার কথা বলা বিশেষণের হাকীকতকেও অস্বীকার করেছে।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে জা'দ বিন দিরহাম সর্বপ্রথম ইসলামের মধ্যে এই বিদ'আত তৈরী করেছে। ইরাক ও পূর্বাঞ্চলের আমীর খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কুসারী ওয়াসেত অঞ্চলে তাকে হত্যা করে। তিনি সেখানে ঈদুল আযহার খুতবা প্রদান করলেন। খুতবা শেষে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা কুরবানী করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কুরবানী কবুল করুন। আর আমি সর্বপ্রথম জা'দ বিন দিরহামকে কুরবানী করছি। কেননা সে ধারণা করেছে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেননি এবং মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেননি। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে নামলেন এবং জা'দকে যবেহ করলেন। আর সেই যামানার তাবেঈদের মধ্যকার আলেমদের ফতোয়া অনুসারেই তিনি এই কাজ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

জাহাম বিন সাফওয়ান জা'দ বিন দিরহাম থেকে এই মাযহাব গ্রহণ করে। জাহাম প্রকাশ্যে এই মাযহাব ধারণ করার ঘোষণা দেয় এবং এর পক্ষে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে। জাহাম বিন সাফওয়ানের দিকে জাহমীয়া মাযহাবের কথাগুলোর সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে। খোরাসানের আমীর মুসলিম বিন আহওয়াজ তাকে সেখানে হত্যা করে। অতঃপর আমর বিন উবাইদের অনুসারী মুতাযিলাদের নিকট এই মতবাদ স্থানান্তরিত হয়। খলীফা মামুনুর রশীদের আমলে মুতাযিলাদের মতবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের ইমামগণকে এই মতবাদ কবুল করার আহবান জানানো হয় এবং তা কবুল না করার কারণে তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। আসলে তাদের এই মতবাদ মুশরিক এবং বেদীনদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলীল বা বন্ধু এবং মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কলীম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। কেননা তাদের মতে প্রেমিকের প্রেমে সম্পূর্ণরূপে ঢুকে যাওয়াকে খুল্লাত বলা হয়। যেমন কবি বলেন,

قد تخللتِ مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلاً

তার ভালোবাসা আমার হৃদয়ের প্রতিটি অংশে প্রবেশ করেছে এবং তাতে মিশে গেছে। এই জন্যই অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খলীল বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা তার অন্যান্য সিফাতের মতই। কুরআনের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ভালোবাসেন বলে যে কথা এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত ছ্বহীহ বুখারীর হাদীছেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً ولكن صاحبكم خليل الله»

"আর আমি যদি আমার উম্মত হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসাবে গ্রহণ করতাম। তবে জেনে রেখো, তোমাদের এই সাথী আল্লাহর খলীল"।[২৫]

এর দ্বারা তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করেছেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। আমি যদি পৃথিবীবাসী হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম।[২৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন, ঠিক তেমনি আমাকেও খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা তার জন্য শোভনীয় নয়। যদি তা শোভনীয় হতো তাহলে আবু বকরই তার বন্ধুত্ব পাওয়ার সর্বাধিক হকদার হতেন। তবে তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন যে, অনেক ব্যক্তিকেই তিনি ভালোবাসেন। যেমন তিনি মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ভালোবাসি। এমনি তিনি আনসারদেরকে লক্ষ্য করে একই কথা বলেছেন। যায়েদ বিন হারেছাকে এবং যায়েদের পুত্র উসামাকেও তিনি ভালোবাসতেন। এমনি আরো অনেক ব্যক্তিকেই ভালোবাসতেন।[২৭]

আমর ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন,

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قال فمِنْ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا

"আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? তিনি বললেন, আয়েশা। আমর ইবনুল আস বললেন, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার পিতা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)"।[২৮]

এতে জানা গেলো যে, খুল্লাতের স্তর সাধারণ ভালোবাসার স্তরের চেয়ে উন্নত। মাহবুব বা প্রিয় ব্যক্তির সত্তার মধ্যে কামালিয়াতের সিফাত অনুযায়ী প্রিয় হয়ে থাকে। অন্য কোনো কারণে কেউ প্রিয় হতে পারে না। কেননা যাকে অন্য বস্তুর কারণে প্রিয় ভাবা হয়, তাকে সেই অন্য বস্তুর পরেই ভালোবাসা হয়। যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, তাতে অন্যের কোনো অংশীদারিত্ব থাকে না, তার তাওহীদই পরিপূর্ণ তাওহীদ এবং তার ভালোবাসাই পরিপূর্ণ ভালোবাসা।

---

[২৫] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/২৩৮৩, তিরমিযী, হা/৩৫৮৮।

[২৬] ছ্বহীহ:

[২৭] তবে المحبة এবং الخلة এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সম্ভবত ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তরকে খুল্লাত বলা হয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা একাধিক ব্যক্তির জন্য ছিল। কিন্তু খুল্লাত কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট। এখানে তিনি কোনো সৃষ্টিকে সম্পৃক্ত করেননি।

[২৮] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪০১০।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল হিসাবে গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি সৎ সন্তান প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসমাঈলকে দান করলেন। এই সন্তানটি তার অন্তরের একটি স্থান দখল করলো। এতে করে আল্লাহ তা'আলা তার খলীলের অন্তরে অন্যের স্থান দেখে রাগান্বিত হলেন বা ঈর্ষা করলেন।[২৯] তাই তিনি ইবরাহীমকে পরীক্ষা করার জন্য ইসমাঈলকে যবেহ করার আদেশ করলেন। যাতে করে সন্তানের ভালোবাসার উপর তার খলীলের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে খুল্লাতের হাকীকত যাহির করতে পারেন। সুতরাং তিনি যখন তার প্রভুর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হলেন, আদেশ বাস্তবায়নের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন অতঃপর স্বীয় সন্তানের ভালোবাসার উপর তার বন্ধুর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়ার নিমিত্তে যখন সন্তানকে যবেহ করার প্রতি অগ্রসর হয়ে পরম বন্ধুত্বে রাজত্ব জয়যুক্ত করতে অগ্রসর হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই হুকুম রহিত করে দিলেন। বেহেশত থেকে আগত একটি সুমহান প্রাণীর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলকে মুক্ত করে দিলেন। যবেহ করার আদেশ দেয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আদেশ পালনে তার মানসিক প্রস্তুতি এবং তার দৃঢ়তা যাচাই করা। সুতরাং আসল উদ্দেশ্য যেহেতু যবেহ করা ছাড়াই বাস্তবায়ন হয়ে গেল, তখন যবেহ হওয়ার মধ্যে ক্ষতি ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থ নিহিত ছিল না। সুতরাং যবেহ করার হুকুম মানসুখ হয়ে গেল। অতঃপর সেখান থেকেই কুরবানীর পশু যবেহ করা কিয়ামত পর্যন্ত ইবরাহীমের অনুসারীদের সুন্নাতে পরিণত হলো।

সুতরাং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য যেমন আল্লাহর খুল্লাত সাব্যস্ত রয়েছে, তেমনি তা আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যও সাব্যস্ত। অনুরূপভাবে মূসা আলাইহিস সালামকে যেমন আল্লাহ তা'আলা কথা বলার মাধ্যমে খাস করেছেন, ঠিক তেমনি মিরাজের রাতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মানিত করেছেন।

এখানে একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রশ্ন রয়েছে। তা হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের চেয়ে উত্তম হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তার জন্য ইবরাহীমের অনুরূপ দরুদ প্রার্থনা করা হলো? অথচ যার সাথে তুলনা করা হয় সে তুলনীয় ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। সুতরাং পরস্পর সাংঘর্ষিক এ দু'টির মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা হবে?

আলেমগণ অনেকভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছেন। সবগুলো কথা এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে একত্র করা সম্ভব নয়।

(১) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশের মধ্যে যত নাবী রয়েছেন, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর বংশের মধ্যে তত নাবী নেই। সুতরাং ইবরাহীম আলাইহিস

[২৯] আসলে কথা এতোদূর না বাড়ানোই উচিত ছিল। মোট কথা হলো আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করতে প্রস্তুত কি না, এটি পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল।

সালাম, তার বংশধর এবং তাদের মধ্যে যত নাবী রয়েছেন তাদের জন্য যে পরিমাণ দরুদ সাব্যস্ত হয়েছে, ঐ পরিমাণ দরুদ যখন মুহম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য প্রার্থনা করা হবে, তখন মুহাম্মাদের বংশধরের জন্য ইবরাহীমের বংশের অনুরূপ দরুদ অর্জিত হবে। কেননা তারা নাবীদের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়। ইবরাহীমসহ অন্যান্য নাবীদের জন্য যত দরুদ রয়েছে, তা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যও রয়েছে। সুতরাং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এমন মর্যাদা বিদ্যমান, যা অন্যদের জন্য নেই।

উপরোক্ত জবাবের চেয়ে আরো সুন্দর জবাব হলো, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে গণ্য। বরং তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। সুতরাং আমরা যখন বলবো যে, كما صليت على آل إبراهيم "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের বংশধরের উপর দয়া বর্ষণ করো যেমন বর্ষণ করেছো ইবরাহীমের বংশধরের উপর", তখন তার উপর এবং ইবরাহীমের বংশের সমস্ত নাবীর উপরও বর্ষিত হবে। সেই সঙ্গে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপরও। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর প্রাধান্য দিয়ে মনোনীত করেছিলেন"। *(সূরা আলে ইমরান: ৩৩)*

সুতরাং ইবরাহীম ও ইমরান ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইমরানের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ﴾

"আমি তাদের উপর পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠালাম। শুধু লূতের পরিবারের লোকেরা তা থেকে রক্ষা পেলো"। *(সূরা কামার: ৩৪)*

সুতরাং লুত আলাইহিস সালামও লুতের বংশধরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আমরা ফেরাউনী দলের দাসত্ব থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম"। *(সূরা আল বাকারা: ৪৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

"যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের বংশধরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো"। *(সূরা মুমিন: ৪৬)*

এখানে ফেরাউনের বংশধরের মধ্যে সে নিজেও উদ্দেশ্য। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ছ্বলাত পেশ করার অধিকাংশ হাদীছ এভাবে এসেছে, كما صليت على آل إبراهيم। তবে অনেক বর্ণনা শুধু كما صليت على إبراهيم এসেছে। তবে অল্প সংখ্যক বর্ণনায় এসেছে, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم। কেননা كما صليت على إبراهيم এর মধ্যে ইবরাহীমের বংশধরও শামিল।

আবু আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন যাকাতের মাল নিয়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন, তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন এবং বললেন, **اللهم صل على آل أبي أوفى** "হে আল্লাহ তুমি আবু আওফার বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করো। ঐ দিকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবার যেহেতু সমগ্র বিশ্বের সমস্ত পরিবারের মধ্যে সর্বোত্তম পরিবার তাই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনেক বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করেছেন।

(১) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নবুওয়াত ও কিতাব দান করেছেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পরে যত নাবী আগমন করেছেন, তারা সকলেই ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশ থেকে।

(২) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নেতা বানিয়েছেন, তারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর আদেশে মানুষকে পথ নির্দেশ করবে। সুতরাং তাদের পরে আল্লাহর অলীদের থেকে যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে তাদের তরীকা ও দাওয়াতের মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(৩) আল্লাহ তা'আলা তার বংশধর থেকে দুইজন খলীল বা বন্ধু গ্রহণ করেছেন। যেমন ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

(৪) আল্লাহ তা'আলা কাবাঘর নির্মাণকারী ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মানুষের জন্য ইমাম নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

"আমি তোমাকে সকল মানুষের ইমামের পদে অধিষ্ঠিত করবো ইবরাহীম বললেন, আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অঙ্গীকার? জবাব দিলেন, আমার এ অঙ্গীকার যালেমদের ব্যাপারে নয়"। *(সূরা আল বাকারা: ১২৪)*

(৫) আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হাতে কাবাঘর নির্মাণ করেছেন, যাকে তিনি মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ বানিয়েছেন তাদের জন্য সম্মেলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছেন। তাদের জন্য কিবলা এবং হাজ্জের স্থান বানিয়েছেন। তাই এই ঘরটি মর্যাদাবানদের স্থান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

(৬) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আরেকটি মর্যাদা হলো আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ইবরাহীমের পরিবারবর্গের উপর ছ্বলাত পেশ করার আদেশ করেছেন। এমনি তাদের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ফেরেশতা, নাবী এবং তাদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজীব

(৬০) ইমাম ত্বহাবী ((রহিমাহুল্লাহ)) বলেন,

ونؤْمنُ بالملائكَةِ والنَّبيين والكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلى المرْسَلينَ ونَشْهَدُ أَنَّهُم كانوا على الحَقِّ المبين

আর আমরা ফেরেশতাগণ, নাবীগণ এবং রসূলগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস করি। আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তারা সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

.....

ব্যাখ্যা: এই বিষয়গুলো ঈমানের রুকনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾

"রসূল তার রবের পক্ষ হতে যে হিদায়াত নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছেন। মুমিনগণও ঈমান এনেছে। তারা সকলেই আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।" *(সূরা আল বাকারা: ২৮৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

"তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করার মধ্যে কোন পূণ্য নেই; বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে"। *(সূরা আল-বাকারা: ১৭৭)*

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস করাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমান হিসাবে নাম দিয়েছেন। যারা এগুলোতে বিশ্বাস করেছে, তাদেরকে তিনি মুমিন নাম দিয়েছেন। অনুরূপ যারা এগুলোকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে তিনি কাফের হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

"যারা কুফুরী করেছে, আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রসূলদের প্রতি এবং পরকালের প্রতি, তারা বহুদূরের গোমরাহীতে পতিত হয়েছে"। *(সূরা আন-নিসা: ১৩৬)*

হাদীছে জিবরীলে এসেছে, জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বলেছেন,

(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তার ফেরেস্তাদের উপর (৩) তার কিতাবসমূহের উপর (৪) তার রাসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর"।[৩০]

ঈমানের এই মূলনীতি সমূহের উপর সমস্ত নাবী-রসূল একমত হয়েছেন। রসূলগণের অনুসারীই এগুলোর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনয়ন করেছে।

আর রসূলদের শত্রুরা এবং যে সমস্ত দার্শনিক ও বিদ'আতী তাদের পথে চলেছে, তারা এগুলোকে অস্বীকার করেছে। তবে তাদের একেক দলের কুফুরী একেক রকম।

লোকদের মধ্যে দার্শনিকরাই ঈমানের মূলনীতিগুলোকে সর্বাধিক অস্বীকারকারী। যারা দার্শনিকদেরকে সম্মান করে থাকে, তারা তাদেরকে জ্ঞানী বলে নামকরণ করে থাকে।

দার্শনিকদের কথার প্রকৃত অবস্থা যে জানতে পারবে, সে নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবে যে, দার্শনিকরা আল্লাহর প্রতি, রসূলদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না। তাদের মাযহাব হচ্ছে, তারা বলে আল্লাহ তা'আলার শুধু এমন অস্তিত্ব রয়েছে, যার কোন হাকীকত ও সিফাত নেই। তিনি সৃষ্ট বস্তুগুলোর নাম এবং পরিচয়ও অবগত নন। তাদের মতে মস্তিষ্কের বাইরের প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তুই সৃষ্টি। তারা আরো বলে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা ও ইচ্ছা দ্বারা কর্ম সম্পাদন করেন না। তাদের মতে সৃষ্টি জগতের সকল বস্তুই তার জন্য লাযেম অর্থাৎ তার পবিত্র যাতের মতই সৃষ্টি আগে থেকেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি (পৃথিবী ও অন্যান্য বস্তু) কখনই ধ্বংস হবে না। যদিও তারা বলে থাকে সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর ক্রিয়া; কিন্তু এটি তারা শুধু নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের কাতারে শামিল করার জন্যই বলে থাকে। অথচ তারা বিশ্বাস করে না যে, আল্লাহ ক্রিয়া সম্পাদন করেন, সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। (তাদের এই কথার সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ যেহেতু আগে থেকেই আছেন, তাই তার অস্তিত্বের সাথে সৃষ্টিও আগে থেকেই রয়েছে। এমনটি নয় যে তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে তিনি যেহেতু সব সময় থাকবেন, তাই তার সাথে তার অস্তিত্বের সৃষ্টিও থাকবে। কোনো কিছুই ধ্বংস হবে না। তারা

[৩০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

আল্লাহর শ্রবণ, দৃষ্টি এবং অন্যান্য সকল সিফাতই অস্বীকার করে। এই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান।

আসমানী কিতাবের ব্যাপারে তাদের কথা হচ্ছে, তারা আল্লাহকে কথা বলার গুণে গুণান্বিত করে না। তাই তিনি কথা বলেন না, ভবিষ্যতেও বলবেন না। অতীতে বলেননি এবং আগামীতেও বলবেন না। তাদের মতে কুরআন হচ্ছে এমন একটি ফাইয, যা সক্রিয় আকল (বিবেক-বুদ্ধি) থেকে নির্গত হয়ে মানবীয় একটি পবিত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করেছে। সাধারণ মানুষ হতে তার রয়েছে তিনটি আলাদা বৈশিষ্ট্য।

(১) দ্রুত আয়ত্ত করার ক্ষমতা। এর মাধ্যমে তিনি অন্যান্য মানুষের চেয়ে অধিক পরিমাণ হাসিল করতে পারেন।

(২) শক্তিশালী ব্যক্তিসত্ত্বা। এর মাধ্যমে তিনি সৃষ্টির মূল ধাতুসমূহকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়ে থাকেন।

(৩) শক্তিশালী কল্পনা। এর মাধ্যমে মস্তিষ্কের ধারণা প্রসূত বিষয়গুলোকে বাহ্যিক রূপ দিতে সক্ষম হন। তাদের নিকট এটিই হচ্ছে ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস। আসলে ফেরেশতাদের এমন কোন আলাদা সত্তা নেই, যা উপরে উঠে, নিচে নামে, আসে, যায়, দেখে এবং রাসূলদেরকে সম্বোধন করে। তাদের মতে ফেরেশতা হচ্ছে নিছক মস্তিষ্কের কল্পনার বিষয়, বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

আর আখিরাতকে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে এবং অস্বীকার করে। তাদের মতে এই সৃষ্টি জগত ধ্বংস হবে না। আসমানসমূহে ফাটল ধরবে না, তারকাগুলো খসে পড়বে না, সূর্য ও চন্দ্র আলো বিহীন হবে না। লোকেরা কবর থেকে উঠবেও না। জান্নাত এবং জাহান্নামেও যাবে না!! জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি শুধু মূর্খ মানুষকে বুঝানোর জন্য উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। বাস্তবে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। (নাউযুবিল্লাহ) যেভাবে বুঝে থাকে রসূলদের অনুসারীগণ। আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসূলসমূহ এবং শেষ দিবসের প্রতি এই হচ্ছে নিকৃষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়ের আক্বীদাহ।

এই হচ্ছে তাদের নিকট দীনের পাঁচটি মূলনীতি। এগুলোকে মুতাযিলারা তাদের পাঁচটি মূলনীতি দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং তার মাধ্যমে দীনের অনেক বিষয়কে ধ্বংস করে দিয়েছে। জিসিম এবং আরায (বিশেষ্য ও বিশেষণ) এই দু'টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তারা তাদের মূলনীতি নির্মাণ করেছে। তাদের নিকট এটিই হচ্ছে মাওসুফ ও সিফাত। সিফাত বিভিন্ন হওয়ার দ্বারা তারা মাওসুফও ভিন্ন হওয়ার ধারণা করেছে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই তারা আল্লাহর তাওহীদ নিয়ে কথা বলেছে। অতঃপর তারা আল্লাহর সকল সিফাতকেই অস্বীকার করেছে। তারা প্রথমে আল্লাহর সিফাতকে ঐ সমস্ত সিফাতের

সাথে তুলনা করেছে, যা মাখলুকের মধ্যে রয়েছে।[৩১]

অতঃপর তারা আল্লাহর কর্ম সম্পর্কে কথা বলেছে। যাকে কদরের মাস'আলা বলা হয়। এটিকে তারা আদল হিসাবে নাম দিয়েছে।[৩২]

অতঃপর তারা নবুওয়াত, শরী'আত, আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা-অঙ্গিকার এবং শাস্তি ও ভয়-ভীতি সম্পর্কে কথা বলেছে। এগুলো হচ্ছে নাম ও হুকুম-আহকামের মাসায়েল। অর্থাৎ কোনো মানুষ শরী'আতের হুকুম-আহকাম লংঘন করলে, তাকে কোনো স্তরে রাখা হবে সে বিষয়ে মুতাযিলারা কথা বলেছে। এটি হচ্ছে ঈমান ও কুফুরীর মাঝখানের একটি স্তর। অর্থাৎ মুতাযিলাদের মতে কোনো মুসলিম যদি কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হয়, তাহলে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে, কিন্তু কুফুরীতে প্রবেশ করবে না। সে ঈমান ও কুফরীর মাঝখানের একটি স্তরে ঝুলন্ত থাকে।

এরপর তারা শাস্তি কার্যকর ও বাস্তবায়ন করার মাসআলা নিয়ে কথা বলেছে। অর্থাৎ তারা বলেছে যে, কবীরাহ গুনাহকারীর ব্যাপারে যেই শাস্তির ধমকি রয়েছে, তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। (অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ হচ্ছে, আল্লাহর উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়। তিনি ইচ্ছা করলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় ইচ্ছায় কবীরা গুনাহকারীকে শাস্তি দিবেন। আবার ইচ্ছা করলে স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিবেন।)

অতঃপর তারা উপরোক্ত মূলনীতিগুলো মানতে অন্যদেরকে বাধ্য করার জন্য পঞ্চম মূলনীতি বের করেছে। তা হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। শাসকগণ যদি উপরোক্ত মূলনীতিগুলো না মানে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করা জায়েয হওয়াকেও তারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

---

[৩১] মুতাযিলাদের তাওহীদ হচ্ছে, তারা আল্লাহর সিফাত বিহীন তাওহীদে বিশ্বাসী। তাদের ধারণায় আল্লাহর একাধিক গুণ সাব্যস্ত করা হলে একাধিক সত্তা আবশ্যক হয় এবং আল্লাহর সত্তা যেহেতু একক কাদীম (চিরস্থায়ী) সত্তা, তাই একাধিক সিফাত সাব্যস্ত করা হলে তাদের ধারণায় একাধিক কাদীম আবশ্যক হয়। তাদের এই দলীলের জবাবে বলা যায় যে, একই ব্যক্তির একাধিক সিফাত থাকলেই সেই ব্যক্তি একাধিক ব্যক্তিতে পরিণত হয় না। যেমন আমরা বলে থাকি, উমুক ব্যক্তি, সাহসী, সত্যবাদী, দানবীর ও ধৈর্যশীল। এতে আমরা একই ব্যক্তির বিভিন্ন গুণ বুঝি। একই ব্যক্তির একাধিক গুণ থাকলে ঐ ব্যক্তি আরো অধিক পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং একজন মানুষের জন্য একাধিক বৈশিষ্ট্য ও গুণ সাব্যস্ত করলেই যেহেতু এক মানুষ বহু মানুষে পরিণত হয় না, তাই আল্লাহর জন্য একাধিক গুণ সাব্যস্ত করা হলেই একাধিক চিরস্থায়ী সত্তা আবশ্যক হয় না। সেই সাথে আল্লাহর সত্তা যেমন কাদীম, তেমনি তার সমস্ত সিফাতও কাদীম। এটি হচ্ছে তাওহীদের সঠিক বিশ্বাস, যা থেকে মুতাযিলারা ভ্রষ্ট হয়েছে।

[৩২] মুতাযিলারা আল্লাহ আদলকে ঠিক রাখার জন্য বলেছে যে, বান্দার কাজ বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে। আল্লাহ বান্দার কাজের সৃষ্টিকারী নয়। এমনকি বান্দা কাজ করার আগে আল্লাহ তা জানেনও না। তারা বলে, আল্লাহ বান্দার কাজ সৃষ্টি করে, আবার তিনিই তা থেকে নিষেধ করলে এবং বান্দা নিষেধ লংঘন করে তাতে লিপ্ত হলে, তাকে শাস্তি দেয়া অন্যায় ও যুলুম হবে। তাই এই মূর্খ সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহকে যুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর ঐ ফেলকে (ক্রিয়াকে) অস্বীকার করেছে, যা বান্দার কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। মূলত আল্লাহর সিফাতকে নাকোচ করার জন্যই এই সমস্ত খোঁড়া যুক্তি।

এই হচ্ছে তাদের পাঁচটি মূলনীতি। যেই পাঁচটি মূলনীতিসহ নাবী-রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, তারা সেগুলোর মোকাবেলায় এগুলোকে দাড় করেছে।

পরবর্তী যুগের রাফেযীরা মূলনীতিগুলোকে চারটিতে পরিণত করেছে। তাদের মূলনীতিগুলো হচ্ছে, তাওহীদ, ন্যায় বিচার, নবুওয়াত এবং ইমামত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার অনুসরণ করে। তাদের মতে তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তাই দীনের মূলনীতি। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত যেহেতু এই মূলনীতিগুলো একত্রিত করেছে, তাই অন্যান্য আয়াতের তুলনায় এই আয়াত দু'টির বিরাট মর্যাদা রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে আবু মাসউদ উকবা বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য এই দু'টি আয়াতই যথেষ্ট হবে।[৩৩]

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, তখন উপরের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। অতঃপর জিবরীল উপরের দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন, আকাশের এই দরজাটি কেবল আজ খোলা হয়েছে। আজকের পূর্বে আর কখনো তা খোলা হয়নি। এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেছে। জিবরীল আরো বলেন, এই ফেরেশতা আজই প্রথম যমীনে অবতরণ করেছে। আজকের পূর্বে সে আর কখনো যমীনে নামেনি। অতঃপর সেই ফেরেশতা সালাম দিল এবং বলল, হে নাবী! আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনাকে তা দেয়া হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কোন নাবীকে তা দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো। তা থেকে কিছু পাঠ করে আল্লাহর কাছে যা চাইবেন, আপনাকে তাই দেয়া হবে।[৩৪]

আবু তালেব মক্কী বলেন, ঈমানের রুকন হচ্ছে সাতটি। এই পাঁচটি এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান ও জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান। এই কথা সত্য। এর উপর মজবুত ও অকাট্য দলীল রয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের দলীলসমূহের প্রতি পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

---

[৩৩] ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ৩৭০৭, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৩৪০।

[৩৪] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮০৬।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এবং তাদের কাজকর্মের বিস্তারিত বর্ণনা

ফেরেশতাদের ব্যাপারে আমাদের কথা হচ্ছে, তাদেরকে আকাশ ও যমীনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুর নড়াচড়ার মধ্যেই ফেরেশতাদের কর্মতৎপরতা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾

"এরপর তারা সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে"। *(সূরা নাযিআত: ৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾

"অতঃপর একটি বড় জিনিস বন্টনকারী"। *(সূরা যারিয়াত: ৪)* ঈমানদার ও রসূলদের অনুসারীদের নিকট এরা হচ্ছে ফেরেশতা।

যারা সৃষ্টিকর্তা ও নাবী-রসূলগণকে অস্বীকার করে, তারা বলে থাকে যে, উক্ত আয়াত দু'টিতে তারকার কথা বলা হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার মাখলুকের দায়িত্বও সোপর্দ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। সে শুক্রবিন্দু থেকে শুরু করে শিশুর গঠন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে। বান্দা যেই আমল করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মহা শূন্যের গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। তারা তা ঘুরায় ও পরিচালনা করে। চন্দ্র-সূর্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন জ্বালানো, জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়া এবং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। জান্নাত, জান্নাতের পরিচালনা, তাতে বৃক্ষাদি লাগানো এবং তাতে বিভন্ন প্রকার নিয়ামত স্থাপন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহর সর্বাধিক বড় সৈনিক। তাদের মধ্যে রয়েছে এমন সব ফেরেশতা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾

"শপথ সেসব ফেরেশতার, যারা একের পর এক প্রেরিত হয়"। *(সূরা মুরসালাত: ১)*

﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (٣) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (٤) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾

"শপথ ঐ সমস্ত ফেরেশতার, যারা মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে। অতঃপর স্মরণ জাগিয়ে দেয়"। *(সূরা মুরসালাত: ৩-৫)*

ফেরেশতাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾

"সেই ফেরেশতাদের কসম! যারা ডুব দিয়ে টানে এবং ঐ সমস্ত ফেরেশতার কসম, খুব আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যায়। আর সেই ফেরেশতাদেরও শপথ! যারা বিশ্বলোকে দ্রুত গতিতে সাঁতরে চলে অতঃপর বারবার সবেগে এগিয়ে যায়"। *(সূরা আন-নাযিআত: ১-৪)*

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাজ সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾

"সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানদের কসম, তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয়। তাদের কসম, তারপর তাদের কসম যারা উপদেশবাণী শুনায়"। *(সূরা সাফফাত: ১-৩)*

উপরোক্ত আয়াতসমূহে ফেরেশতা ও তাদের কার্যাদি বর্ণনায় সকল শব্দের মধ্যে جمع التأنيث (স্ত্রীবাচক বহুবচন)এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এমনি فرق (ফির্কাসমূহ), الطوائف (দলসমূহ) الجماعات (দলসমূহ) এই শব্দগুলোও جمع التأنيث এর শব্দ। এগুলোর একবচন হচ্ছে যথাক্রমে الفرقة, الطائفة এবং الجماعة।

ফেরেশতাদের মধ্যে আরো রয়েছে একদল রহমতের ফেরেশতা। রয়েছে আযাবের ফেরেশতা। আরো এমন ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে আরশ বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আরো এমন ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে ছ্বলাত কায়েম, তাসবীহ পাঠ এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে আসমানসমূহ আবাদ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে আরো এমন অনেক ফেরেশতা, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। الملَك শব্দটির লাম বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে এমন অর্থ প্রদান করে যাতে বুঝা যায় যে, তারা সেই বার্তাবাহক অর্থে ব্যবহৃত, যারা বার্তা প্রেরকের বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়। তাদের হাতে কিছুই নেই। বরং সকল কিছুর চাবিকাঠি পরাক্রমশালী একক সত্তার হাতে। তারা শুধু তার আদেশ বাস্তবায়ন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

"তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তার সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধু তার হুকুমে কাজ করে"। সূরা আল-আম্বিয়া: ২৬-২৭ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾

"যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত"। *(সূরা আল-আম্বীয়া: ২৮, সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

"যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তার ভয়ে ভীত"। *(সূরা আল-আম্বীয়া: ২৮)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"তারা (ফেরেশতারা) ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের উপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে"। *(সূরা আন-নাহাল: ৫০)*

সুতরাং ফেরেশতারা হচ্ছেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তাদের মধ্যে কতক ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। কেউবা তাসবীহ পাঠে মশগুল। তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে সুনির্দিষ্ট দাড়াবার স্থান। সে তা অতিক্রম করতে পারে না। সে আদিষ্ট কর্মে ব্যস্ত রয়েছে। সেই কাজ করতে কোন প্রকার ত্রুটি করে না এবং তাকে যেই কাজের আদেশ করা হয়েছে, তার সীমালংঘন করে না। যারা আল্লাহর নিকটবর্তী, তাদের মর্যাদা সর্বোচ্চে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾

"তারা আল্লাহর ইবাদত করতে অহঙ্কার করে না এবং ক্লান্তিবোধও করে না। দিন রাত তার মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, শৈথিল্য করে না"। *(সূরা আল-আম্বীয়া: ১৯-২০)*

ফেরেশতাদের প্রধান ও নেতা হচ্ছেন তিনজন। জিবরীল, মীকাঈল এবং ইসরাফীল। তারা সকল মানুষ, প্রাণী, জীব ও উদ্ভিদের হায়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

জিবরীল আলাইহিস সালাম অহীর দায়িত্বপ্রাপ্ত। অহীর মাধ্যমেই রূহ এবং অন্তর জীবন্ত হয়।

মিকাঈল বৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত। বৃষ্টির মাধ্যমে যমীন, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ জীবিত হয়। ইসরাফীল শিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর মাধ্যমে সৃষ্টি মৃত্যুর পর পুনঃজীবন ফেরত পাবে।

সুতরাং ফেরেশতারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি ও আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর দূত। তারা তার মাঝে এবং তার বান্দাদের মাঝে দূত স্বরূপ। তারা আল্লাহর নিকট থেকে সৃষ্টি জগতের সকল প্রান্তে তার আদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অবতরণ করে এবং তার নিকট উন্নীত

হয়। ফেরেশতাদের ভারে আসমানসমূহ কড়কড় আওয়াজ করে। আওয়াজ করাই এগুলোর জন্য সমীচিন। আসমানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালী নেই, যাতে কোনো না কোনো ফেরেশতা দাঁড়িয়ে, কিংবা রুকু অবস্থায় অথবা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল নয়। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করে। তাদের কেউ তাতে দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ পাবে না। কুরআন মজীদ বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা এবং তাদের বিভিন্ন পদ মর্যাদার আলোচনায় ভরপূর। কোথাও কোথাও আল্লাহ তা'আলা তার নামের সাথে ফেরেশতার নাম যুক্ত করে উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহর ছ্বলাতকে ফেরেশতাদের ছ্বলাতের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো কখনো সম্মান জনক স্থানের দিকে তাদেরকে সম্বোধিত করেছেন। আবার কখনো উল্লেখ করেছেন যে, ফেরেশতারা আরশকে ঘিরে আছে এবং তারা আরশ বহন করে আছে। আবার কখনো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা পাপ কাজ করা হতে মুক্ত। কখনো বলা হয়েছে যে, তারা সম্মানিত, নৈকট্যশীল, তারা উপরে উঠে, তারা পবিত্র, শক্তিধর এবং একনিষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾

"তারা সবাই আল্লাহ, তার ফেরেশতাসমূহ, তার কিতাবসমূহ ও তার রসূলদের প্রতি বিশ্বাস করেছেন।" *(সূরা আল-বাকারা: ২৮৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। আর ফেরেশতা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই"। *(সূরা আলে ইমরান: ১৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

"তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দু'আ করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মুমিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান"। *(সূরা আল-আহযাব: ৪৩)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾

"আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চারপাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং ঈমানদারদের জন্য দু'আ করে।" *(সূরা গাফের: ৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾

"তুমি আরো দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারদিক বৃত্ত বানিয়ে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে।" *(সূরা আয-যুমার: ৭৫)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

"তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তার সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধুমাত্র তার হুকুমে কাজ করে"। *(সূরা আল-আম্বীয়া: ২৬-২৭)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

"তোমার রবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ কখনো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তার ইবাদতে বিরত হয় না, বরং তারা তারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তার সামনে সিজদাবনত হয়"। *(সূরা আল-আরাফ: ২০৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾

"কিন্তু তারা যদি অহংকার করে, তাতে কিছু যায় আসে না। যেসব ফেরেশতা তোমার রবের সান্নিধ্য লাভ করেছে তারা রাত দিন তার তাসবীহ বর্ণনা করছে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না"। *(সূরা ফুস্সিলাত: ৩৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে। এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানে"। *(সূরা ইনফিতার: ১০-১২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾

"কখনো নয়। এটি তো একটি উপদেশ। যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। এটি এমন সব কিতাবে লিখিত আছে, যা সম্মানিত উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র। এটি মর্যাদাবান ও পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে থাকে"। *(সূরা আবাসা: ১১-১৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾

"সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ তা প্রত্যক্ষ করে"। *(সূরা মুতাফফিফীন: ১৮-২১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾

"শয়তানরা উর্ধ্ব জগতের কথা শুনতে পারে না। তারা সবদিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত ও তাড়িত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি" *(সূরা সাফফাত: ৮)*

এমনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছগুলো ফেরেশতাদের আলোচনায় ভরপুর। এ জন্যই ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন ঈমানের পাঁচটি রুকনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ফেরেশতাগণ উত্তম? না বনী আদম উত্তম?

বনী আদমের সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ ও ফেরেশতাদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য করার মধ্যে আলেমগণ অনেক কথা বলেছেন। আহলে সুন্নাতের আলেমদের প্রতি সম্বন্ধ করে বলা হয় যে, বনী আদমের শুধু সৎলোক ও নাবীগণ ফেরেশতাদের চেয়ে মর্যাদাবান। মুতাযিলারা বলেছে, ফেরেশতাগণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আবুল হাসান আল-আশআরীর অনুসারীগণ দুই রকম কথা বলেছেন। তাদের কেউ নাবী ও অলীদেরকে ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ কোনো অকাট্য কথা না বলে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। তাদের কারো থেকে বর্ণনা করা হয় যে, ফেরেশতাগণই মানুষের চেয়ে উত্তম। এই কথা আহলে সুন্নাতের একদল আলেম এবং সুফীদের এক জামা'আত থেকেও বর্ণনা করা হয়।

শিয়ারা বলে তাদের সমস্ত ইমাম সকল ফেরেশতার চেয়েও উত্তম। কোনো কোনো আলেম আবার অন্য দৃষ্টি কোন থেকে মর্যাদার পার্থক্য করেছেন। তবে যাদের কথা গ্রহণযোগ্য তাদের কেউ এ কথা বলেনি যে, কোনো কোনো ফেরেশতা কোন কোন নাবীর চেয়ে উত্তম।

ইমাম ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই মাসআলা নিয়ে কথা বলার ব্যাপারে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলাম। কারণ এর উপকার খুবই কম। বরং এটি অযথা কাজ-কর্মের কাছাকাছি। অর্থহীন কাজ ছেড়ে দেয়া বান্দার ইসলাম সুন্দর হওয়ার প্রমাণ। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এই মাসআলায় অর্থাৎ ফেরেশতা উত্তম না মানুষ উত্তম এ বিষয়ে কোন কথাই বলেননি। সম্ভবত তিনি ইচ্ছা করেই এ বিষয়ে কথা বলা বাদ দিয়েছেন। مآل الفتاوى তে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন উত্তর দেননি। এই কিতাবে এমন সব মাস'আলা বর্ণিত হয়েছে, যাতে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) কোন অকাট্য ফায়ছালা প্রদান করেননি। নাবীগণ অধিক উত্তম না ফেরেশতাগণ- এই মাসআলাটি তার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এটিই সঠিক কথা। কেননা আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে নাবীগণ ও ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। উভয় দলের মধ্যে কোন দল উত্তম, তা বিশ্বাস করা আবশ্যক নয়। যদি এ বিষয়টি জানা আমাদের জন্য আবশ্যক হতো, তাহলে আমাদের জন্য অবশ্যই তা সুস্পষ্ট করে বলা হতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম"। *(সূরা মায়েদা: ৩)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"এবং তোমার রব ভুলে যান না"। *(সূরা মারইয়াম: ৬৪)*

ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অনেকগুলো বিষয় ফরয করেছেন, তা নষ্ট করো না। অনেকগুলো হদ (সীমা) নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা সেই সীমা অতিক্রম করো না। অনেক বিষয় তিনি হারাম করেছেন, তা লংঘন করো না। তোমার উপর রহম করে, ভুলে গিয়ে নয়- অনেক বিষয় থেকে চুপ থেকেছেন, তা সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করো না। সুতরাং বিষয়টি যেহেতু এ রকমই, তাই এ মাসআলা অস্বীকার বা সমর্থন না করে চুপ থাকাই ভালো। এটি বলা ঠিক নয় যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত হতে নিসৃত অন্যান্য মাসআলাসমূহের মতই এটি একটি মাসআলা। কেননা এখানে উভয় দিকের দলীলগুলোই সমান সমান। ইনশা-আল্লাহ অচিরেই আমি এ দিকে ইঙ্গিত করবো। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ জন্য করবো যে, কতক মূর্খ বেআদবীমূলক কথা বলে থাকে। তারা বলে, ফেরেশতাগণ আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম ছিলেন। তারা আরো বলে থাকে যে, কতক ফেরেশতা বনী আদমের খাদেম। এর দ্বারা তারা ঐ সমস্ত ফেরেশতাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন, যারা বনী আদমের দায়িত্বে নিয়োজিত। এমনি তারা শরী'আত বিরোধী এবং বেআদবী মূলক আরো অনেক শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

কারো মর্যাদা নষ্ট করার জন্য কিংবা কেবল নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য অথবা শুধু জাতিগত গোড়ামির কারণে যদি একদলকে অন্যদলের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়, তাহলে তা বিনা সন্দেহে প্রত্যাখ্যাত হবে। আর এই মাসআলা কতক নাবীকে অন্য কতক নাবীর উপর প্রাধান্য দেয়ার মাসআলার মত নয়। কেননা এ বিষয় সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

"রাসূলদের একজনকে আর একজনের উপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন"। *(সূরা আল বাকারা: ২৫৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾

"আমি কতক নাবীকে কতক নাবীর উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছি"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৫৫)*

এ বিষয়ে পূর্বে শাইখের উক্তি: আমাদের নাবী হচ্ছেন 'সায়্যেদুল মুরসালীন' সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মোটকথা দলীলকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনা করা বাদ দেয়া যাবে না। আহলে সুন্নাতের মাঝে মাসআলাটি নিয়ে মতভেদ থাকার পরও কিছু কিছু বিদ'আতীও এ বিষয়ে দলীলের অনুসরণ করেছে।

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমত বলতেন যে, ফেরেশতাগণ মানুষের চেয়ে উত্তম। অতঃপর তিনি এর বিপরীত বলেছেন। তবে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, এ বিষয়ে মন্তব্য না করে বিরত থাকা তার অন্যতম একটি মত। এই মাসআলায় উভয় পক্ষের দলীলগুলো উভয় দলের ফযীলত প্রমাণ করে। এক পক্ষের উপর অন্য পক্ষের অতিরিক্ত ফযীলতের প্রমাণ করে না। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। এ বিষয়ে শাইখ তাজ উদ্দীন ফাযারী (রহিমাহুল্লাহ) এর একটি কিতাব রয়েছে। তিনি এর নাম রেখেছেন, الإشارة في البشارة। এতে তিনি ফেরেশতাদের উপর মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিতাবের শেষের দিকে তিনি বলেছেন, জেনে রাখো! এই মাসআলাটিতে তর্কশাস্ত্র বিদদের বিদ'আতীরা কথা বলেছে। এটি এমন একটি মাসআলা, যে বিষয়ে এই উম্মতের প্রথম সারির কেউ কিংবা তাদের পরবর্তীদের কোন ইমাম কথা বলেননি। এটি আক্বীদার মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভুক্তও নয়। এটি দীনের মূল বিষয় সমূহের বড় কোন বিষয়ও নয়। তাই আক্বীদার বিষয়ে লিখিত কিতাবসমূহে এই মাসআলাটি স্থান পায়নি। একদল বড় আলেম এ বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছেন। যাহেরী মাযহাবের আলেমদের প্রত্যেকেই এ বিষয়ে তার ইলম অনুযায়ী কথা বলেছেন। তার কথা দুর্বলতা থেকে খালী নয়। শাইখ তাজ উদ্দীনের কথা এখানেই শেষ।

যারা বলে বনী আদমের নাবীগণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম, তাদের দলীলসমূহঃ

ফেরেশতাদের উপর নাবীদের ফযীলত বর্ণনায় যে সমস্ত দলীল পেশ করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদমকে সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আদম আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই কারণেই ইবলীস আদম আলাইহিস সালাম কে সিজদাহ করতে অস্বীকার করেছে এবং অহংকার করেছে। ইবলীস বলেছিল,

﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"বলো, এই যাকে তুমি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলে, তুমি যদি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহলে আমি তার বংশধরকে আয়ত্ত করে নেবো, মাত্র সামান্য কজনই আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৬২)*

অন্যরা বলেছেন, ফেরেশতাগণ তাদের রবের আদেশ পালন করে, তাদের প্রতিপালকের ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্য এবং আদমকে সম্মান করার জন্য সিজদাহ করেছেন। এতে ফেরেশতাদের উপর আদম আলাইহিস সালাম এর ফযীলত প্রমাণিত হয় না। এমনি ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কতৃক তার ছেলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে সিজদাহ করার দ্বারা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর উপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ফযীলত প্রমাণিত হয় না। আল্লাহর আদেশে কাবার দিকে ফিরে বনী আদমের লোকেরা সিজদাহ করে বলেই বনী আদমের উপর কাবার ফযীলত প্রমাণিত হয় না।

ইবলীস স্বীয় রায় ও ভ্রান্ত কিয়াস দ্বারা যুক্তি দিয়ে সুস্পষ্ট আদেশের বিরোধীতা করে বলেছিল যে, সে আদম আলাইহিস সালাম এর চেয়ে উত্তম। এটি হচ্ছে একটি ছোট কিয়াস ও যুক্তি স্বরূপ। এর চেয়ে বড় আরেকটি কিয়াস উহ্য রয়েছে। তা এই যে, অধিক সম্মানিত ব্যক্তি তুলনা মূলক কম সম্মানিত ব্যক্তিকে সিজদাহ করতে পারে না। মূলত উভয় কিয়াসই বাতিল। প্রথমটি এই জন্য বাতিল যে, মাটির অধিকাংশ বৈশিষ্টই আগুনের বৈশিষ্টের অনেক উর্ধ্বে। এ জন্যই ইবলীসের সাথে তার গঠন খেয়ানত করেছে। তাই সে সিজদাহ করতে অস্বীকার ও অহংকার করেছে। কেননা আগুনের বৈশিষ্ট হচ্ছে উপরে উঠা, হালকা হওয়া, পাতলা হওয়া, লঘু হওয়া, কোনো জিনিসকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়া, মিটিয়ে ফেলা, ধ্বংস করা এবং জ্বালিয়ে দেয়া। আদমকে তার গঠণের উপাদান উপকার করেছে। তাই তিনি তাওবা-ইস্তেগফার করেছেন, মাথা নত করেছেন, অনুগত হয়েছেন, আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পন করেছেন, ভুল স্বীকার করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কেননা মাটির বৈশিষ্ট হচ্ছে দৃঢ় থাকা, শান্ত থাকা, মজবুত থাকা, নম্র হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা এবং বিনীত হওয়া। বীজ ও শস্য দানা মাটির নিকটবর্তী হলে, তা

গজায় এবং বড় হয়, মাটি তাকে বড় করে এবং তাতে বরকত দান করা হয়। এটি আগুনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইবলীসের দ্বিতীয় কিয়াসটি হচ্ছে অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি তুলনামূলক কম মর্যাদাবান ব্যক্তিকে সিজদাহ করে না। এই যুক্তিটিও বাতিল। কেননা সিজদাহর মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য এবং তার আদেশের আনুগত্য করা হয়। আল্লাহ তা'আলা যদি তার বান্দাদেরকে পাথরকে সিজদাহ করার আদেশ করেন, তাহলে তাদের উপর সেই আদেশ বাস্তবায়ন এবং পাথরকে দ্রুত সিজদাহ করা আবশ্যক হবে। এতে প্রমাণিত হবে না যে, যাকে (যে পাথরকে) সিজদাহ করা হয়েছে সে সিজদাহকারী অপেক্ষা উত্তম। যদিও পাথরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা উদ্দেশ্য হয়। শুধু পাথরের ফযীলত প্রমাণিত হয়। আলেমগণ বলেন, ইবলীসের কথা "তুমি যে একে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো"- আদমকে সিজদাহ করতে অস্বীকার করলে তাকে বিতাড়িত করার পরই সে বলেছে। প্রথমে বলেনি। সুতরাং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সঠিক নয়।

ফেরেশতাদের উপর নাবীদের ফযীলতের আরেকটি দলীল এই যে, ফেরেশতাদের রয়েছে বিবেক। তাদের প্রবৃত্তির আকাঙ্খা নেই। আর নাবীদের বিবেক ও প্রবৃত্তির আকাঙ্খা উভয়টিই রয়েছে। সুতরাং তারা যখন নিজেদের নফসকে প্রবৃত্তির আহবান থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং প্রবৃত্তির টান থেকে বিরত রাখবে তখন এর মাধ্যমে তারা অবশ্যই ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম হবে।

অন্যরা বলেন, ফেরেশতাগণ যেহেতু সর্বদা আনুগত্যে ব্যস্ত থাকে, ইবাদতে মশগুল থাকে এবং অলসতা ও ক্লান্তি পরিহার করে, তাই তাদের এই দীর্ঘ ও অবিরাম ইবাদত নাবীদের প্রবৃত্তির আকাঙ্খা ও কামনা পরিত্যাগ করার ফযীলতের সমান করে দেয়।

ফেরেশতাদের উপর নাবীদের ফযীলতের আরো দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে তার ও নাবীদের মাঝে দূত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যারা বলেন ফেরেশতাগণ উত্তম তারাও এ কথা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তাদের দলীল গ্রহণই অধিক শক্তিশালী। এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নাবীগণের অধিক ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের নিকট অহীসহ প্রেরিত ফেরেশতাদের দূতগণের চেয়েও অধিক ফযীলত প্রমাণিত হয়। ফেরেশতাদের রাসূল মানব রসূলের নিকট দূত হিসাবে প্রেরিত হয়ে থাকে। এ মর্মে আরো দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"অতঃপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে একটু বলতো দেখি এই জিনিসগুলোর নাম?" *(সূরা আল-বাকারা: ৩১)*

অন্যরা বলেন, এখানেও আদম আলাইহিস সালাম এর ফযীলত প্রমাণিত হয়। তিনি যে ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম, এটি প্রমাণিত হয় না। আদম ও ফেরেশতাগণ কেবল তাই জানতেন, যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শিখিয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালাম যা জানতে পারেননি খিযির আলাইহিস সালাম তা জানার কারণে তিনি মূসা আলাইহিস সালাম থেকে উত্তম নন। মূসা আলাইহিস সালাম এবং তার খাদেম ইলম শিক্ষা করার জন্য খিযির আলাইহিস সালাম এর নিকট সফর করেছেন। এই জন্য তারা পাথেয় সাথে নিয়েছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম খিযির আলাইহিস সালাম এর নিকট কিছু প্রকাশ্য বিষয়ের ইলম শিখতে চেয়েছিলেন। খিযির তখন বলেছিলেন, আপনি আল্লাহর ইলম থেকে অতি সামান্যই শিখেছেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সুলায়মান আলাইহিস সালাম যা অবগত ছিলেন না হুদহুদ পাখি সেই খবর জানার কারণে সে সুলায়মান আলাইহিস সালাম থেকে অধিক জ্ঞানী ছিল না। সুলায়মান আলাইহিস সালাম যা জানতে পারেনি, হুদহুদ পাখি তা জানতে পারলেও সে সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর চেয়ে উত্তম নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾

"আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ইবলীস! আমি আমার দু'হাত দিয়ে যাকে তৈরি করেছি তাকে সিজদাহ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? তুমি কি বড়াই করছো? না কি তুমি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?" *(সূরা সোয়াদ: ৭৫)*

অন্যরা বলেছেন, এটি উত্তম হওয়ার প্রমাণ। তবে সর্বোত্তমের প্রমাণ নয়। অন্যথায় মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তার ফযীলত প্রমাণিত হবে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদম আলাইহিস সালাম এর বংশধরের অন্তর্ভুক্ত। তার বংশের মধ্যে রয়েছে সৎ এবং অসৎ লোক। শুধু তাই নয়; কিয়ামতের দিন যখন আদমকে বলা হবে, তোমার বংশধর থেকে জাহান্নামের বাহিনীকে বের করো এবং জাহান্নামে প্রেরণ করো। অতঃপর আদম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক একহাজার থেকে নয়শত নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবেন এবং মাত্র একজনকে জান্নাতে প্রেরণ করবেন।[৩৫] সুতরাং একহাজার থেকে মাত্র একজনের মধ্যে এই ফযীলত থাকার কী অর্থ হতে পারে?

ফেরেশতাদের উপর মানুষের ফযীলত থাকার আরেকটি দলীল হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কথা, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কাউকে সৃষ্টি করেননি। এটি যদি ছ্বহীহ হয়, তাহলে এর মাধ্যমে কেবল তার মর্যাদা সাব্যস্ত হয়। বনী আদমের অন্য কারো জন্য এর দ্বারা কোন ফযীলত প্রমাণিত হয় না। সেই সাথে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি ইসরাঈলী

[৩৫] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৩৩৪৭, মুসলিম হা/২২২।

বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রভু! আপনি বনী আদমকে দুনিয়া প্রদান করেছেন। তারা এখানে খায়, পান করে এবং পরিধান করে। আর আমরা প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমরা খাই না, পান করি না এবং খেল-তামাশা করি না। সুতরাং তাদের জন্য যেমন দুনিয়া নির্ধারণ করেছেন, অনুরূপ আমাদের জন্যও আখিরাত নির্ধারণ করুন। আল্লাহ তা'আলা তখন বললেন, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার বংশধরদের মধ্য হতে সৎ লোকদেরকে ওদের মত করবো না, যাদেরকে আমি 'কুন ফায়াকুন' বলে সৃষ্টি করেছি। ইমাম তাবারানী এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল উরওয়া বিন রুয়াইম থেকেও এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার কাছে আনসারী নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতাগণ বললেন, আদমের সন্তানেরা দুনিয়াতে... ঘুমায় এবং বিশ্রাম করে। সুতরাং তাদেরকে যেমন দুনিয়া দান করেছো, তেমনি আমাদেরকে আখিরাতে দান করো। আল্লাহ তা'আলা তখন বললেন, না। ফেরেশতাগণ তিনবার কথাটি বললেন। প্রত্যেকবারই আল্লাহ না বলেছেন।[৩৬]

উক্ত হাদীছ দু'টি ছ্বহীহ হলে তো কোন কথা নেই। তবে হাদীছ দু'টির সনদে সন্দেহ আছে। এর শব্দসমূহেও কিছু দোষ আছে। ফেরেশতাদের ব্যাপারে কিভাবে এই ধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার উপর তিনবার আপত্তি করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে,

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

তারা আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তারা তার আদেশেই কাজ করে থাকে। *সূরা আম্বিয়া:২৭।*

তাদের ব্যাপারে কি এই ধারণা করা যেতে পারে যে, তারা তাদের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় এবং তারা তাদের মর্যাদা পরিহার করে বনী আদমকে প্রদত্ত প্রবৃত্তির আকাঙ্খা ও বাসনার প্রতি আগ্রহী? ঘুম তো মৃত্যুর ভাই। সুতরাং বনী আদমকে এটি দেয়া হয়েছে বলে কিভাবে তারা এ জন্য ঈর্ষা করতে পারে। আর ফেরেশতাদের প্রতি কিভাবে এই ধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, বনী আদমের খেল-তামাশায় ফেরেশতাগণ ঈর্ষা করতে পারে? অথচ খেল-তামাশা একটি বাতিল বিষয়।

কিছু কিছু আলেম বলেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা ইবলীস আদমের নিকট

[৩৬] যঈফ।

এই মর্মে ওয়াস্ওয়াসা ও ধোঁকা দিয়েছিল যে, তিনি যদি তা খান, তাহলে ফেরেশতা হয়ে যাবেন। সে বলেছিল,

﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾

"তোমাদের রব যে, তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন তার পেছনে এ ছাড়া আর কোন কারণই নেই যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও অথবা তোমরা চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়ে পড়ো"। *(সূরা আল-'আরাফ: ২০)*

এটি প্রমাণ করে যে, ফেরেশতাদের উত্তম হওয়ার বিষয়টি মানুষের ফিতরাতে বদ্ধমূল ছিল। যেই মহিলাগণ ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে দেখে হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন, তা এ কথাকে সমর্থন করে। মহিলারা বলেছিল,

﴿حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾

"আল্লাহর কী অপার মহিমা! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্তা"। *(সূরা ইউসুফ: ৩১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, আমি তোমাদের এ কথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, আমি গায়েবের জ্ঞানও রাখি না এবং তোমাদের এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবলমাত্র সে অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?" *(সূরা আল আন'আম: ৫০)*

প্রথম দলের লোকেরা বলেন, এখানে ফেরেশতাদের বিষয়টি বড় করে এ জন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের মনের মধ্যে বিশেষ করে আরবদের মাঝে এটি বদ্ধমূল ছিল যে, ফেরেশতাগণ বিশাল সৃষ্টি, তারা বড় বড় কাজ করতে সক্ষম। তাদের অন্তরে ফেরেশতাদের প্রতি বিরাট সম্মান ছিল। তাই তারা বলত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

যারা বলেন, ফেরেশতাদের তুলনায় নাবীগণ উত্তম, তাদের আরো দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর প্রাধান্য দিয়ে মনোনীত করেছিলেন"। *(সূরা আলে ইমরান: ৩৩)* অন্যরা বলেন, অনেক সময় العالمون শব্দটি বহু বচন হিসাবে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু এর দ্বারা সাধারণ ব্যাপকতা বুঝায় না। বরং প্রত্যেক স্থান অনুযায়ী অর্থ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

"বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি, যিনি তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন এ ফুরকান। যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়"। *(সূরা আল-ফুরকান:১)* এখানে আলামীন দ্বারা শুধু জিন ও ইনসান উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

"তারা বলল, আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার ঠিকাদারী করা থেকে নিষেধ করিনি?" *(সূরা আল-হিজর: ৭০)* এখানে সারা দুনিয়া বলতে লুত আলাইহিস সালাম এর এলাকা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾

"তোমরা কি গোটা দুনিয়ার মধ্যে পুরুষদের কাছে যাও?"। *(সূরা শুআরা: ১৬৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

"তাদের অবস্থা জেনে শুনেই আমি দুনিয়ার অন্য সব জাতির উপর তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম"। *(সূরা আদ-দুখান: ৩২)* যারা বলেন, সৎকর্মশীল মুমিনগণ ফেরেশতাদের থেকে উত্তম তাদের আরো দলীল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির সেরা"। *(সূরা আল বাইয়্যিনাহ: ৭)*

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী আদমের সৎ লোকেরা সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যরা বলেন, তারা ঈমান আনয়ন এবং সৎকর্ম করার কারণেই সর্বোত্তম সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। আর ফেরেশতাগণ তো এ গুণে অধিক পরিপূর্ণ। কেননা তারা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয় না। সুতরাং ঈমান ও সৎকর্মের কারণে বনী আদম ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম প্রমাণিত হয় না। البرية শব্দটিকে همزه (হামযাহ) দ্বারা البريئة পড়লে এবং হামযাহকে يا (ইয়া) দ্বারা পরিবর্তন

করে البرية পড়লে উক্ত অর্থ হবে। অর্থাৎ সৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হবে। আর যদি البري-এর দিকে সম্বন্ধ করে পড়া হয়, তাহলে অর্থ হবে التراب (মাটি)। ইমাম জাওহারী الصحاح গ্রন্থে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ফাররা-এর বরাত দিয়ে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তখন এর অর্থ হবে মাটি হতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মধ্যে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলগণই হবে সর্বোত্তম। তখন তাতে ব্যাপকতা থাকবে না। কেননা সৎকর্মশীলদেরকে ছাড়াও আদমের অন্যান্য সন্তান এবং অন্যান্য সৃষ্টি মাটি হতে তৈরী করেছেন।

প্রথম শ্রেণীর আলেমগণ বলেন, আমরা কেবল মানুষের মধ্যে সৎ লোকগণকে ফেরেশতাদের উপর প্রাধান্য তখনই দিয়েছি, যখন তারা কামালিয়াত হাসিল করবে, সাফল্যের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যাবে। আর যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, নৈকট্য হাসিল করবে এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে আরোহন করবে তখনই কেবল তারা ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। তখন দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অতিরিক্ত নৈকট্য দান করবেন এবং তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন। যাতে তারা তার সম্মানিত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকার স্বাদ উপভোগ করতে পারেন।

অন্যরা বলেন, ব্যাপারটি কি এ রকম যে, তাদের অবস্থা এমন হয়েছে, যাতে তারা ফেরেশতাদের উপরের স্তরে পৌঁছে গেছে? না কি তারা ফেরেশতাদের সমান স্তরে পৌঁছে গেছে? হ্যাঁ যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, তারা ফেরেশতাদের মর্যাদার উপরে উঠে গিয়েছে তাহলে যারা বলে ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ, তাদের কথা মেনে নিবো; অন্যথায় নয়।

যারা বলে মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশী তাদের দলীলসমূহ এবং তার পর্যালোচনা:

মানুষের উপর ফেরেশতাদের ফযীলত বর্ণনায় যে সমস্ত দলীল পেশ করা হয়, তার অন্যতম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾

"মসীহ কখনো নিজে আল্লাহর এক বান্দা হবার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে না এবং ঘনিষ্ঠতর ফেরেশতারাও একে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে না। যদি কেউ আল্লাহর বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জাকর মনে করে এবং অহংকার করতে থাকে তাহলে এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে হাযির করবেন"। *(সূরা আন নিসা: ১৭২)*

ভাষাগত দিক থেকে এই কথাটি সুসাব্যস্ত যে, এই ধরণের বাক্যের মধ্যে معطوف (পরে উল্লেখিত বিষয়) معطوف عليه (পূর্বোক্ত বিষয়) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। কেননা এ রকম বলা বৈধ নয় যে, মন্ত্রী বাদশার খাদেম হওয়ার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করে না, এমনকি পুলিশ এবং দারোয়ানও রাজার খাদেম হতে লজ্জাবোধ করে না। এ ধরণের বাক্যে নীচ থেকে উপরের দিকে উন্নীত করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে কম মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু উল্লেখ করা হয়, অতঃপর বেশী মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়কে উল্লেখ করা হয়। উপরোক্ত আয়াতে তাই হয়েছে। প্রথমে ঈসা আলাইহিস সালাম কে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ফেরেশতাদের আলোচনা হয়েছে। সুতরাং যখন ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর ফেরেশতাদের ফযীলত সাব্যস্ত হলো, তখন অন্যদের উপর ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়া বাঞ্চনীয়। তবে কেউ এ কথা বলেনি যে, ফেরেশতাগণ কোনো কোনো নাবী থেকে শ্রেষ্ঠ।

অন্যন্য আলিমগণ এই কথার বিভিন্ন জবাব প্রদান করেছেন। সর্বাধিক সুন্দর জবাব এই যে, ফেরেশতাদের শক্তি ও ক্ষমতা, কঠোরতা এবং তাদের গঠনের বিশালতার দিক থেকে তাদের প্রাধান্যের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। ইবাদতের মধ্যে রয়েছে বিনয়-নম্রতা, নতি স্বীকার ও আনুগত্য। ঈসা আলাইহিস সালাম তা করতে মোটেই লজ্জাবোধ করেন না। ঈসা আলাইহিস সালাম এর চেয়ে যে অধিক ক্ষমতাবান, শক্তিধর এবং যে গঠনের দিকে তার চেয়ে অধিক বড় সেও আল্লাহর ইবাদত করতে লজ্জাবোধ করে না। সুতরাং এই ধরণের বাক্য থেকে এটি আবশ্যক হয় না যে, ফেরেশতারা সকল দিক দিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম এবং অন্যদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ। আরেকটি দলীল এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, আমি তোমাদের এ কথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, আমি গায়েবের জ্ঞানও রাখি না এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবল সে অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?" *(সূরা আল-আনআম: ৫০)*

অনুরূপ কথা এই অর্থে বলা হয় যে, আমি যদি তা বলি, তাহলে আমি আমার মর্যাদার অতিরিক্ত বস্তু দাবী করেছি বলে গণ্য হবো। যারা তা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

অন্যরা জবাব দিয়েছেন যে, কাফেরেরা যখন বলেছিল, এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ায়? কেন তার কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয়নি? *(সূরা আল ফুরকান: ৭)*

সুতরাং তাকে এ কথা বলা হয়েছে যে, তিনি যেন তাদের জবাবে বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। মানুষের যেমন জীবিকা অর্জন ও পানাহারের প্রয়োজন হয়, আমারও তেমন প্রয়োজন হয়। আমি ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নই, যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা পানাহারের প্রতি কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করেননি। সুতরাং এর দ্বারা বনী আদমের উপর ফেরেশতাদের মর্যাদা প্রমাণিত হয় না।

ইমাম মুসলিম স্বীয় সনদে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ»

"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিক উত্তম ও অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেক মুমিনের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে"।[৩৭]

এটি জানা কথা যে, মানুষের শক্তি ফেরেশতাদের শক্তির ধারে কাছেও না। অন্যরা বলেন, এখানে মুমিন বলতে বনী আদমের মুমিন উদ্দেশ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুতরাং এই হাদীছে বর্ণিত মুমিনদের মধ্যে ফেরেশতাগণ শামিল হবেন না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে কুদছীতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

[৩৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৬৪, ইবনে মাজাহ হা/৭৯।

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ»

“আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে আমি তার জন্য ঐ রূপই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে তার নফসের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার নফসের মধ্যে স্মরণ করি। যখন সে আমাকে কোন জন সমাজে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সমাজে স্মরণ করি”।[৩৮]

এই হাদীছ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ফেরেশতাগণ মানুষের চেয়ে উত্তম। অন্যরা বলেন, এখানে সম্ভাবনা আছে যে, উল্লেখিত লোকদের চেয়ে ফেরেশতাগণ উত্তম। সকল মানুষ হতে ফেরেশতাগণ উত্তম নন।

ইমামদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) তার كتاب التوحيد আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একদা আমি বসা ছিলাম। তখন জিবরীল ফেরেশতা আগমন করলেন এবং আমার দুই কাঁধের মাঝখানে খোঁচা মারলেন। অতঃপর আমি পাখির দু'টি বাসার মত একটি গাছের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটি বাসার উপর আমি বসে গেলাম। জিবরীল বসলেন অন্যটির উপর। অতঃপর জিবরীল উপরে উঠে গেলেন। বিসমিল্লাহ বলে উপরে উঠে গেলেন। তার বিশালতার কারণে আকাশের দিগন্তসমূহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন আমার দৃষ্টিসমূহ পাল্টাচ্ছিলাম। আমি যদি আকাশ স্পর্শ করার ইচ্ছা করতাম, তাহলে অবশ্যই তা করতে পারতাম। আমি জিবরীলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম সে একেবারে আকাশের সাথে মিশে আছে। এতে আল্লাহ সম্পর্কে আমার উপর তার ইলমের ফযীলত সম্পর্কে অবগত হলাম।[৩৯] অন্যরা বলেন, এই হাদীছের সনদে দুর্বলতা রয়েছে। হাদীছটি ছ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করাকে আমরা সমর্থন করি না।

সারকথা হলো, এটি একটি অর্থহীন মাসআলা। এ জন্যই অনেক উসূলবিদগণ এই মাসআলাটি সম্পর্কে বেশী আলোচনা করেননি। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এই মাসআলা কোনো জবাব না দিয়ে নিরবতা পালন করেছেন। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

[৩৮] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭৪০৫।

[৩৯] যঈফ: মু'আজুম আওসাত্ব হা/৬২১৪।

নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান

নাবী-রসূলদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যেসব রাসূলের কথা উল্লেখ করেছেন, আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করি। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা উল্লেখিত নাবীদের ছাড়াও আরো অনেক নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের নাম ও সংখ্যা সম্পর্কে জানে না। সুতরাং সংক্ষিপ্তাকারে তাদের প্রতিও ঈমান আনয়ন করা আমাদের উপর আবশ্যক। কেননা তাদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো দলীল আসেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

"এর পূর্বে যেসব নাবীর কথা তোমাকে বলেছি তাদের কাছেও আমি অহী পাঠিয়েছি এবং যেসব নাবীর কথা তোমাকে বলিনি তাদের কাছেও। আমি মূসার সাথে কথা বলেছি ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়"। *(সূরা আন নিসা: ১৬৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

"তোমার আগে আমি বহু রসূল পাঠিয়েছি। আমি তাদের অনেকের কাহিনী তোমাকে বলেছি আবার অনেকের কাহিনী তোমাকে বলিনি"। (সূরা মুমিন: ৭৮)

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে দীন ও শরী'আত দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন, তারা তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ও এমন সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, যা কারো কাছে অজানা নয় এবং নাবী-রসূলগণ যেই সুস্পষ্ট সত্যের বর্ণনা দিয়েছেন, তার খেলাফ করাও জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"তাহলে কি রাসূলদের উপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব আছে?" (সূরা আন নাহাল: ৩৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে হে মুহাম্মাদ! পরিষ্কারভাবে সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া তোমার আর কোনো দায়িত্ব নেই"। (সূরা আন নাহাল: ৮২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"বলো, আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের হুকুম মেনে চলো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তাহলো ভালোভাবে জেনে রাখো, রাসূলের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য রাসূল দায়ী এবং তোমাদের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তার আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই সৎ পথ পেয়ে যাবে, অন্যথায় পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া ছাড়া রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই"। *(সূরা আন নূর: ৫৪)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু তোমরা যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে সত্যকে স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই"। *(সূরা আত তাগাবুন: ১২)*

রসূলদের মধ্যে উলুল আয্ম কারা?

রাসূলদের মধ্যে যারা উলুল আয্ম ছিলেন, তাদের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে সর্বোত্তম কথা হচ্ছে, যা ইমাম বগবী এবং অন্যরা ইবনে আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ও কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

"আর হে নাবী! স্বরণ করো সেই অঙ্গীকারের কথা যা আমি নিয়েছি সকল নাবীর কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও। সবার কাছ থেকে আমি নিয়েছি পাকাপোক্ত অলংঘনীয় অঙ্গীকার"। *(সূরা আল আহযাব: ৭)*
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেইসব নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করেছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা এখন আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার আদেশ দিয়েছিলাম আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামকে। তার সাথে তাগিদ করেছিলাম এই বলে যে, এ দীনকে কায়েম করো এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ভিন্ন হয়ো না। হে মুহাম্মাদ! এই কথাটিই এসব মুশরিকের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় যার দিকে তুমি তাদের আহবান জানাচ্ছো"। *(সূরা আশ শূরা: ১৩)*

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হচ্ছে, তাকে সত্য নাবী ও রসূল হিসাবে বিশ্বাস করা, তিনি যে শরী'আত নিয়ে এসেছেন, পূর্ণরূপে তার অনুসরণ করা।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা রাসূলদের উপর যে সমস্ত কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যে কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন, আমরা তাতে বিশ্বাস করি। সেগুলো হচ্ছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর। আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা নাবীদের উপর এ ছাড়াও আরো অনেক কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সেগুলোর নাম ও সংখ্যা অন্য কেউ জানে না।

কুরআনের প্রতি ঈমান

কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হচ্ছে, এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাব এবং তার মধ্যে যা আছে তা মেনে চলা। অন্যান্য আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে সাথে কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন একটি আলাদা বিষয়। সুতরাং আমাদের উপর বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, রাসূলদের উপর যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে আগমন করেছে। সেই সাথে আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, সমস্ত আসমানী কিতাব সত্য, তাতে রয়েছে হিদায়াত, সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ এবং মানুষের জন্য আরোগ্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

"হে মুসলিমগণ! তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে হেদায়াত আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি। আমরা আরো বিশ্বাস করি তার প্রতি, যা দেয়া হয়েছে মূসাকে, ঈসাকে এবং অন্যান্য নাবীগণকে তাদের রবের পক্ষ থেকে। তাদের কারোর মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। আমরা সবাই আল্লাহর অনুগত মুসলিম"। *(সূরা আল বাকারা: ১৩৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الم (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾

"আলিফ লাম-মীম। আল্লাহ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা, যিনি বিশ্ব জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি তোমার উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যের বাণী বহন করে এনেছে এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে। এর আগে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল করেছেন। আর তিনি নাযিল করেছেন ফুরকান"। *(সূরা আলে ইমরান: ১-৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

"রাসূল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, যা নাযিল করা হয়েছে তার উপর তার প্রভুর পক্ষ হতে। মুমিনগণ ঈমান এনেছেন। তারা সকলেই আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি এবং রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা বলেন, আমরা রাসূলদের একজনকে অন্যজন থেকে পার্থক্য করি না। আর তারা বলেন, আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা গুনাহ মাফের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আমরা তোমারই দিকে ফিরে যাবো"। *(সূরা আল বাকারা: ২৮৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু অসংগতি খুঁজে পেতো। *(সূরা আন নিসা: ৮২)*

এ ছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব গুলোর মাধ্যমে কথা বলেছেন এবং তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলোই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর জন্য কথা বলার গুণ রয়েছে এবং তিনি উপরে সমুন্নত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

"প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। তাদের মধ্যে যখন মতভেদ সূচনা শুরু হলো তখন আল্লাহ নাবীদেরকে পাঠালেন। তারা ছিলেন সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠিয়েছেন, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার মীমাংসা করা যায়"। *(সূরা আল বাকারা: ২১৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

"এটি একটি মহা শক্তিশালী গ্রন্থ। বাতিল না পারে সামনে থেকে এর উপর চড়াও হতে না পারে পেছন থেকে। এটা মহাজ্ঞানী ও পরম প্রশংসিত সত্তার নাযিলকৃত জিনিস"। *(সূরা হামীম সাজদাহ: ৪১-৪২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

"হে নাবী! জ্ঞানবানরা ভালো করেই জানে, যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য এবং তা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়"। *(সূরা সাবা: ৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

"হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত"। *(সূরা ইউনূস: ৫৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾

"এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রোগ মুক্তি বটে"। *(সূরা হামীম সিজদাহ: ৪৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

"তাই ঈমান আনয়ন করো আল্লাহ, তার রাসূল এবং সেই নূরের বা আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত"। *(সূরা আত তাগাবুন: ৮)* এই রকম আয়াত কুরআনে অনেক রয়েছে।

(৬১) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ونُسمّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمينَ مؤمِنينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُعْتَرِفِينَ، ولهُ بِكُلِّ ما قالَ وأَخْبَرَ مُصَدِّقِين

আমাদের কিবলার যে সমস্ত লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই দীন নিয়ে এসেছেন তার স্বীকৃতি দেয় এবং তার সকল কথা ও খবরকে বিশ্বাস করে আমরা তাদেরকে মুসলিম মুমিন মনে করি।

.....

ব্যাখ্যা: রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছ্বলাত আদায় করে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ ফিরায় এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত ভক্ষণ করে, সেই মুসলিম। তার জন্য তাই রয়েছে, যা রয়েছে আমাদের জন্য এবং আমাদের উপর যেই হক রয়েছে, তা তার উপর রয়েছে"।[৪০]

ইবনে আবীল ইয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শাইখ এই বাক্যের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইসলাম এবং ঈমান একই বিষয়। আর গুনাহয় লিপ্ত হলেই কোন মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে গুনাহএর কাজে লিপ্ত হয়।

আমাদের কিবলার লোক দ্বারা শাইখের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা ইসলামের দাবী করে এবং কাবামুখী হয়ে ছ্বলাত আদায় করে, যদিও সে সামান্য বিদ'আত অথবা পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং যতক্ষণ না সে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের কোন কিছু প্রত্যাখ্যান করে। শাইখের বক্তব্য: আমরা আহলে কিবলার কাউকে গুনাহ এর কারণে কাফের বলিনা, যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং ইসলাম ও ঈমান একই, আর মুমিনগণ ঈমানের মধ্যে সমান, এর ব্যাখ্যা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

---

[৪০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৯১।

(৬২) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله

আমরা আল্লাহর ব্যাপারে অযথা তর্ক করি না এবং আল্লাহর দীন নিয়ে ঝগড়া করি না।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখ এখানে কালাম শাস্ত্রবিদদের বাতিল বিতর্ক হতে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং তাদের বিদ্যার দোষারোপ করেছেন। কেননা তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিনা ইলমে এবং বিনা দলীলে কথা বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾

"তারা শুধু ধারণা এবং তাদের মন যা চায় তারই অনুসরণ করে। আর তাদের নিকট তাদের প্রভুর পক্ষ হতে হিদায়াত আগমন করেছে। *(সূরা আন নাজম: ২৩)*

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর যাতে পাক সম্পর্কে কথা বলা কারো জন্য বৈধ নয়। বরং আল্লাহ নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেই গুণে তাকে গুণান্বিত করবে। কোন কোন আলেম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যাকে আমার নাম ও সিফাত সমূহের জ্ঞান দান করেছি, তাকে আদব শিক্ষা দিয়েছি। আর যার জন্য আমার হাকীকতের যাত উন্মুক্ত করেছি, তাকে অচল করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি আদব অথবা ধ্বংসের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারো। এই কথার সমর্থনে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যখন পাহাড়ের জন্য স্বীয় সত্তাকে উন্মুক্ত করলেন, তখন পাহাড় নত হয়ে গেল এবং প্রকম্পিত হয়ে উঠল। আল্লাহর যাতের বিশালতার সামনে টিকে থাকতে পারেনি। ইমাম শিবলী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কথা লম্বা করা বেআদবী।

আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে ঝগড়া করি না। এর অর্থ হচ্ছে হকপন্থীদের মধ্যে বিদ'আতীদের সন্দেহে ঢুকিয়ে তাদেরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার আশায় এবং তাদেরকেও বিতর্কে জড়ানোর উদ্দেশ্যে তাদের সাথে আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে ঝগড়া করি না। কেননা এটি বাতিলের দিকে আহবান করা, সত্যকে ঘোলাটে করা এবং দীন ইসলামকে ধ্বংস করার নামান্তর।

(৬৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين

আমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করি না। আমরা সাক্ষ্য দেই যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। রুহুল আমীন তা নিয়ে অবতরণ করেছেন এবং সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। মাখলুকের কোনো কালাম এর সমান হতে পারে না। আমরা বলি না যে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা মুসলিমদের জামা'আতের খেলাফ করি না।

.....

ব্যাখ্যা: আমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করি না, এ কথার দ্বারা সম্ভবত তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যে, আমরা কুরআনের ব্যাপারে সরল পথ হতে বিচ্যুতরা যেমন বলেছে, মতভেদ করেছে এবং সত্যকে মিটিয়ে ফেলার জন্য অন্যায় ঝগড়া করেছে, আমরা তাদের মত বলিনা। বরং বলি, কুরআন আল্লাহর কালাম। রুহুল আমীন তা নিয়ে অবতরণ করেছে।

শাইখের উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, কুরআনের যে সমস্ত কিরাআত বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক করি না। বরং প্রত্যেক সুসাব্যস্ত ও ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত কিরআত দ্বারাই কুরআন পাঠ করি। উপরোক্ত দু'টি অর্থই সত্য।

দ্বিতীয় অর্থটি সঠিক হওয়ার দলীল এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াতে এমনভাবে পড়তে শুনলাম, যা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্যভাবে পড়তে শুনেছি। আমি তার হাত ধরে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং তাকে বিষয়টি অবহিত করলাম। আমি এতে রাসূল রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর চেহারায় অপছন্দের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, তোমাদের উভয়ই সুন্দর ও ঠিকভাবেই পড়েছ। তোমরা মতভেদ করো না। কেননা তোমাদের পূর্বের লোকেরা মতভেদ করেই ধ্বংস হয়েছে"।[৪১]

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের মধ্যে ঐ ধরণের মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে মতভেদকারীদের প্রত্যেকেই তার বিরোধীর সাথে যে হক রয়েছে, তা অস্বীকার করে। কেননা উভয় কারীই তাদের কিরআত ঠিকভাবেই পাঠ করেছিল। এই

[৪১] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৪১০।

ধরণের মতভেদ হতে নিষেধের কারণ হলো অতীতের লোকেরা মতভেদ করেই হালাক হয়েছে। এই জন্যই হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেছিলেন, আপনি এই উম্মতের লাগাম টেনে ধরুন। তারা যেন তাদের পূর্বের জাতিসমূহের ন্যায় মতভেদ করতে না পারে।[৪২]

সুতরাং তিনি উম্মতকে মাত্র একটি কিরাআতের উপর (ইজমা) একত্রিত করে দিলেন। এটি ছিল একটি সঠিক ও বৈধ ইজমা। এই উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীর উপর একত্রিত হওয়া থেকে মাসুম রেখেছেন। এই ইজমাতে কোনো ওয়াজিব বিষয় বাদ পড়েনি এবং হারাম বিষয়ও হালালে পরিণত হয়নি। কেননা সাত কিরাআতে কুরআন পাঠ করা জায়েয ছিল; ওয়াজিব ছিল না। এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুমতি ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এখতিয়ার দিয়েছেন। তারা যে কোনো কিরআত এখতিয়ার করতে পারে। এমনি কুরআনের সূরাসমূহের তারতীব দেয়া (সাজানো) অহীর মাধ্যমে ওয়াজিব করা হয়নি। এ জন্যই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কপি উছমানী কপির তারতীব অনুযায়ী ছিল না। অন্যদের কপির ক্ষেত্রেও কথা একই। তবে আয়াতসমূহের তারতীব অহীর মাধ্যমেই হয়েছে। তাদের জন্য কোনো আয়াতকে আগেপিছে করা বৈধ ছিল না। সূরার বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছাহাবীগণ যখন দেখলেন, এক কিরাআতের উপর একত্রিত করা না হলে উম্মত দলে দলে বিভক্ত হচ্ছে, মতভেদ করছে এবং ঝগড়া করছে, তখন তারা মাত্র একটি কিরাআতের উপর সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে দিলেন। এটিই হচ্ছে সালাফদের অধিকাংশ আলেম ও কারীদের বক্তব্য। ইমাম ইবনে জারীর এবং অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

তাদের কেউ কেউ বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে সাত কিরাআতে কুরআন পাঠ করা বৈধ ছিল। কেননা তখন এক কিরাআত আয়ত্ত করা তাদের জন্য প্রথমত কঠিন ছিল। অতঃপর যখন তাদের জবান কুরআন পাঠের জন্য সম্পূর্ণ অবনত হল এবং একটি মাত্র কিরাআতে কুরআন পাঠ করা সকলের জন্য সহজ হয়ে গেল, -এটিই ছিল তাদের জন্য অধিক উপযোগী- তখন কুরআনকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সবশেষে যেই কিরাআতে পেশ করা হয়েছিল সেই কিরাআতটির উপরই তারা একমত হয়েছেন।

ফুকাহা এবং আহলে কালামদের একদলের মতে মুসহাফ সাত প্রকার কিরাআতকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। কেননা সাত কিরআতের কোনো একটির প্রতি অবহেলা করা বৈধ ছিলনা। তবে তারা উছমানী সংকলনকেই বর্ণনা করা এবং এ ছাড়া অন্যান্য কপি বর্জন করার উপর এক্যবদ্ধ হয়েছেন। পূর্বে এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। তা এই যে সাত কিরাআতে পাঠ করা জায়েয ছিল; ওয়াজিব নয়। অথবা এও বলা যায় যে,

[৪২]. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৮৮।

বাকী কিরাআতগুলো মানসুখ হয়ে গেছে।

ইবনে মাসউদের উদ্ধৃতি দিয়ে যে বলে, তিনি মূল শব্দ বাদ দিয়ে ভাবার্থ দিয়ে কুরআন পাঠ করা জায়েয মনে করতেন, সে তার উপর সম্পূর্ণ মিথ্যারোপ করেছে। বরং ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি তাদের কিরআতের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, তা পরস্পর কাছাকাছি। তা তোমাদের কারো এই কথার মতই, هلم, أقبل وتعال –এ সবগুলো শব্দের অর্থ আসলো। সুতরাং তোমরা যেভাবে জেনেছো সেভাবেই পাঠ করো। অথবা ইবনে মাসউদ অনুরূপ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আহলে কিতাবদের সাথে কেবল উত্তমভাবে বিতর্ক করি। তবে তাদের মধ্যে যারা যালেম, তাদের ব্যাপারটি আলাদা। আহলে কিতাবদের সাথে উত্তমভাবে বিতর্ক করা যদি আবশ্যক হয়, তাহলে আহলে কিবলার লোকদের সাথে কেন সেভাবে বিতর্ক করা হবে না? কেননা সামগ্রিকভাবে আহলে কিবলার লোকেরা আহলে কিতাবদের চেয়ে ভালো। সুতরাং আহলে কিবলার মধ্যে যারা যালেম নয়, তাদের সাথে উত্তম পন্থা বাদ দিয়ে অন্য কোনো পন্থায় বিতর্ক করা জায়েয নেই। তাদের কেউ ভুল করলে তার নিকট ঐ দলীল পেশ করার আগে তাকে কাফের বলা যাবে না, যা বর্জন করার কারণে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফুরীর হুকুম লাগিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই জন্যই সালাফগণ বিদ'আতীদেরকে দোষারোপ করেছেন, (কাফের বলেননি) এবং তারা বলেছেন, বিদ'আতীদেরকে বারণ করার জন্য তলোয়ার শুধু সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবেই ব্যবহার করতে হবে। সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ আসছে ইনশাআল্লাহ। সেখানে তিনি বলেছেন, আমরা জামা'আতকে হক ও সঠিক মনে করি এবং ফির্কাবন্দী করাকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি এবং আযাব মনে করি।

শাইখের উক্তি: আমরা সাক্ষ্য দেই যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এই কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে শাইখ বলেছেন, নিশ্চয় এই কুরআন আল্লাহর কালাম। আমাদের কাছে পরিচিত কোনো প্রকার ধরণ[৪৩] বর্ণনা করা ছাড়াই কথা আকারে তার নিকট থেকে এটি এসেছে।

রূহুল আমীন এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন। জিবরীলকে রূহুল আমীন বলা হয়েছে। তাকে রূহ বলার কারণ এই যে, তিনি রাসূলদের কাছে এমন অহী নিয়ে আসতেন, যাতে মানুষের অন্তরসমূহ জীবিত হয়। তিনি প্রকৃত পক্ষেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। তার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে দুরূদ বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা সূরা শুআরার ১৯৩-১৯৫ নং আয়াতে বলেন,

---

[৪৩] আল্লাহর সকল সিফাতের ক্ষেত্রেই এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অন্যসব সিফাতের মতই আমরা এর কোনো বিশেষ ধরণ বর্ণনা করবো না। কিংবা আল্লাহর সিফাতের ধরণ কেমন? এই প্রশ্নও করবো না। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। আমরা তা বিশ্বাস করি। তবে আমাদের পরিচিত কথা অর্থাৎ মানুষের কথার মতো আল্লাহর কথা নয়। আল্লাহর কথা কেমন? এই প্রশ্নও করা যাবে না।

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾

"জিবরীল এই কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছেন। অবতরন করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও যারা সতর্ককারী হয়, পরিষ্কার আরবী ভাষায়"। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকবীরের ১৯ থেকে ২০ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾

"এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সম্মানিত রাসূলের বাণী যিনি বড়ই শক্তিধর। আরশের মালিকের কাছে উন্নত মর্যাদার অধিকারী"। এখানে রাসূল বলতে জিবরীল উদ্দেশ্য। এখানে রাসূলের যে বৈশিষ্ট ও গুনাগুণ এসেছে, তা জিবরীলের সিফাত। সূরা আল-হাক্কার ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত সিফাত এর বিপরীত। কেননা সেখানে রাসূল দ্বারা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ﴾

"কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের বাণী। ইহা কোনো কবির কথা নয়"। *সূরা হাক্কাহ:৪০-৪১।* এখানে রাসূল বলতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য।

শাইখ বলেন, জিবরীল ফেরেশতা রাসূলদের সরদার মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন শিখিয়েছেন। এতে তিনি সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাকে কুরআন শিখিয়েছেন জিবরীল। এর মাধ্যমে শাইখ কারামেতা সম্প্রদায় এবং অন্যদের ধারণাকে খন্ডন করেছেন। তারা বলে থাকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলহামের মাধ্যমে স্বীয় নফসের মধ্যে কুরআন প্রাপ্ত হয়েছেন।

শাইখ বলেন, আমরা এ কথা বলি না যে, কুরআন আল্লাহর মাখলুক এবং আমরা এ ব্যাপারে মুসলিমদের জামা'আতের বিরোধীতাও করি না। এতে শাইখ সতর্ক করেছেন যে, যারা কুরআনকে মাখলুক বলে, তারা মুসলিমদের জামা'আতের খেলাফ করেছে। কেননা উম্মতের সালাফদের সকলেই একমত হয়েছেন যে, কুরআন প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহর কালাম। তা মাখলুক নয়। বরং আমরা মুসলিমদের জামা'আতের খেলাফ করি না- এ কথা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা কুরআন বা অন্য যেসব বিষয়ে মুসলিমগণ একমত পোষণ করেছেন সেগুলোতে তাদের খেলাফ করি না। কেননা খেলাফের মধ্যেই গোমরাহী, সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি এবং বিদ'আত ।

(৬৪) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

আহলে কিবলার কেউ কোন গুনাহ করলেই আমরা তাকে কাফের বলি না। যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে সেই গুনাহয় লিপ্ত হয়। আর এ কথাও বলি না যে, ঈমান আনয়নের পর কেউ গুনাহ করলে তাতে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না।

.....

ব্যাখ্যা: ইমাম ইবনে আবীল ইয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এখানে আহলে কিবলা বলতে তারা উদ্দেশ্য, যাদের বর্ণনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের কিবলার যে সমস্ত লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত দীনের স্বীকৃত দেয় এবং তিনি যা বলেছেন ও তিনি যেই সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করে আমরা তাদেরকে মুসলিম ও মুমিন মনে করি। এখানে শাইখ ঐ সমস্ত খারেজীদের প্রতিবাদ করেছেন, যারা প্রত্যেক গুনাহর কারণেই মানুষকে কাফের বলে থাকে।

হে পাঠক! আপনি জেনে রাখুন! আল্লাহ্ আপনাকে এবং আমাদেরকে রহম করুন। কাফের বলা বা না বলার মাসআলাটি নিয়ে বড় ধরণের ফিতনা হয়েছে। এতে অনেক ফির্কার সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে আলেমদের দলীলগুলো পরস্পর বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে যেই সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার বিরোধীতাকারী ভ্রান্ত আক্বীদাহ ও মতবাদের অনুসারীদেরকে কাফের বলার ব্যাপারে দু'টি দলের অবস্থান পরস্পর বিরোধী। তৃতীয় আরেকটি দল মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। তাদের এই মতভেদ কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে মতভেদের মতোই।

একদল বলে থাকে, আমরা আহলে কিবলার কাউকেই কাফের বলি না। তারা তাকফীরকে (কাফের বলাকে) সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এখানে জেনে রাখা দরকার যে, আহলে কিবলার মধ্যে রয়েছে অনেক মুনাফেক। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমাকে ইয়াহূদী-নাসারা-খ্রিস্টানদের চেয়েও অধিক কঠোরভাবে অস্বীকার করে। এদের কেউ যখন সুযোগ পায়, তখনই কুফুরী প্রকাশ করে। অথচ তারা মানুষকে দেখানো ও শুনানোর জন্য কালেমা পাঠ করে থাকে।

মুসলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, কোন ব্যক্তি যদি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত প্রকাশ্য ওয়াজিব ও হারাম এবং অনুরূপ বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে তাওবা করার আদেশ করা হবে। তাওবা না করলে তাকে কাফের ও মুরতাদ হিসাবে হত্যা করা হবে। বিদ'আত ও পাপ কাজ থেকেই নিফাকী ও দীন পরিত্যাগ করার

সূত্রপাত হয়। ইমাম খাল্লাল তার কিতাবুস সুন্নাহয় ইবনে সীরিন থেকে এই কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বিদ'আতীরাই দ্রুত মুরতাদ হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। ইমাম খাল্লাল মনে করতেন, বিদ'আতীদের ব্যাপারেই নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"যখন তুমি তাদেরকে দেখো, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও। যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর যালেমদের সাথে উপবেশন করবেনা"। *(সূরা আল আন'আম: ৬৮)*

এ জন্যই অনেক গুনাহএর কারণে আমরা কাউকে কাফের বলি না, এ কথাটি বলতে বিরত রয়েছেন। যেমন খারেজীরা বলে থাকে। প্রত্যেক কবীরা গুনাহ এর কারণেই কাফের হয়ে যাওয়া এবং কবীরা গুনাহ এর কারণে কাফের হয়ে যাওয়া- এই বাক্য দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কবীরা গুনাহ করলেই কোন মুসলিম কাফের হয়ে যায় না; তবে কোনো কোনো কবীরাহ গুনাহ কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটি ঐ সমস্ত খারেজীদের কথার বিপরীত যারা প্রত্যেক গুনাহ এর কারণেই মুসলিমকে কাফের বলে।

এ জন্যই শাইখ শর্ত লাগিয়েছেন যে, مالم يستحله অর্থাৎ গুনাহকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হলেই কেবল কাফের হবে। অন্যথায় কাফের হবে না। শাইখের এই কথাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আমলগত গুনাহসমূহ থেকে যে কোনো কবীরা গুনাহ করলেই কাফের হয়ে যাবে, তিনি এটিকে অস্বীকার করেছেন। তবে আক্বীদাহগত কোন বিষয়ে গুনাহ করলে কাফের হবে না- তিনি এ কথা বলেননি।[৪৪]

এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়। সেটি হচ্ছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমলগত গুনাহ এবং আক্বীদাগত গুনাহ এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। কেননা আমল

---

[৪৪] মোট কথা, تكفير بذنب (কবীরা গুনাহ এর কারণে কাফের বলা) এবং تكفير بكل بذنب (প্রত্যেক কবীরা গুনাহএর কারণেই কাফের বলা)- এই উভয় বাক্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ খারেজী ও মুতাযেলীরা বলে, প্রত্যেক কবীরা গুনাহর কারণেই মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। খারেজীদের মতে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যায়। মুতাযেলীদের মতে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফরীতে প্রবেশ করে না; বরং ঈমান ও কুফুরীর মাঝখানে ঝুলে থাকে। তবে উভয় দলের মতেই পরকালে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ হচ্ছে গুনাহ এর কারণে মুসলিম কাফের হয় ঠিকই; তবে প্রত্যেক গুনাহ এর কারণেই কাফের হয় না। বরং কোন কোন গুনাহ কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেমন শির্ক ও কুফরী গুনাহ। এগুলোর কোন একটিতে কোন মুসলিম লিপ্ত হলে কাফের হবে এবং তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে পরকালে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মধ্যেই সীমিত নয়; অন্তরের আমল তথা বিশ্বাসই হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মূলভিত্তি। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হচ্ছে অন্তরের আমলের অনুগামী। তাই مالم يستحله তথা গুনাহকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত না হলে কাফের হবে না, এর অর্থ হবে গুনাহকে হালাল বিশ্বাস করে লিপ্ত হলেই কাফের হবে। এই কথার অন্য কোন অর্থও থাকতে পারে।

অতঃপর শাইখ বলেন, ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله 'আমরা এ কথা বলি না যে, ঈমান ঠিক রেখে যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হবে পাপ কাজ তার ঈমানের কোন ক্ষতি করেনা'। এই কথার দ্বারা শাইখ মুরজীআদের প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলে, ঈমান ঠিক থাকলে পাপ করলেও ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন কুফর অবস্থায় সৎ আমল করলেও কোন লাভ হবে না। মুরজীআরা একদিকে। খারেজীরা তার বিপরীত দিকে। খারেজীরা বলে, যে কোন গুনাহ করলেই মুসলিম কাফেরে পরিণত হবে। আর মুরজিআরা বলে ঈমান ঠিক থাকলে যত গুনাহই করা হোক, গুনাহ এর কারণে কেউ ইসলাম থেকে বের হবে না।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের কথা খারেজীদের কথার মতই। কবীরা গুনাহ করলে ঈমান-আমল সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়। তার সাথে ঈমানের কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। তবে উভয় দলের কথার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। খারেজীরা বলে কবীরা গুনাহকারী ঈমান থেকে বের হয়ে গিয়ে কুফুরীতে প্রবেশ করে। আর মুতাযিলারা বলে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় ঠিকই; কিন্তু কুফরীতে প্রবেশ করে না। কবীরা গুনাহকারী ঈমান ও কুফর এই দুই অবস্থানের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। তবে উভয় দলই বলে যে মৃত্যুর পর সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

ফিকাহ, তর্কশাস্ত্র ও মুহাদ্দিছদের কতিপয় দল বলে থাকে, কেউ আমলগত গুনাহ করলে কাফের হবে না। অর্থাৎ আমল ত্যাগ করার কারণে কিংবা হারাম কাজে লিপ্ত হলেই কোন মুসলিম কাফের হয়ে যায়না। তবে বিদ'আতী আক্বীদাহ পোষণ করার কারণে কাফের হয়। যদিও উক্ত বিদ'আতী মুজতাহিদ হয় এবং সে তার ইজতিহাদে ভুল করে। তারা বলে থাকেন, যে ব্যক্তিই এ কথা (কুফুরী কথা) বলবে, সে কাফের হবে। এখানে মুজতাহিদ থেকে অন্যকে আলাদা করা হয়নি। অথবা তারা বলে থাকেন প্রত্যেক বিদ'আতীই কাফের।

এভাবে কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার মধ্যে বড় ধরণের সমস্যা রয়েছে। কেননা অনেক ছ্বহীহ হাদীছ প্রমাণ করে যে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে। সুতরাং যে সমস্ত হাদীছে শুধু ঈমান আনলেই অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করলেই জান্নাতের অধিকারী হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সে সমস্ত হাদীছগুলোকে মুরজীআরা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। এই হাদীছগুলো ঐ সমস্ত হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক, যেখানে বলা হয়েছে যে, কোনো একটি পাপ কাজ করলেই

জাহান্নামী হবে। এগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে খারেজী এবং মুতাযিলারা।[৪৫] পাপ কাজ করার কারণে যে সমস্ত হাদীছে জাহান্নামে প্রবেশের ভয় দেখানো হয়েছে, তার আলোচনা বিস্তারিতভাবে যথাস্থানে আসছে। "তাওহীদ পন্থী লোকেরা কবীরা গুনাহ করে মৃত্যু বরণ করলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না", শাইখের এ কথাটির বিশেষণ করার সময়ও এ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা একটু পরেই আসছে।

মোট কথা হচ্ছে বিদ'আত কবীরা গুনাহরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা মানুষ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থায় মুমিন হয়। কিন্তু কোন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করেছে, যাতে সে ভুল করেছে। ইজতেহাদ করে ভুল করেছে কিংবা গাফেলতী করে গুনাহএ লিপ্ত হয়েছে। তাই বলা হবে না যে, এর কারণে তার ঈমান ও আমল বাতিল হয়ে গেছে। তবে যদি ঈমান নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের কোন দলীল থাকে সে কথা ভিন্ন।

যদি বলি যে কোনো পাপ কাজ করলেই ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে, তাহলে এটি খারেজী ও মুতাযিলাদের কথার মতই হবে। আমরা এটিও বলবোনা যে, গুনাহ করলে কাফের হবে না। বরং ইনসাফের কথা হচ্ছে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। যেসব বাতিল, বিদ'আতী ও হারাম কথা এমন বস্তুকে নফী করে, যা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাবেত করেছেন অথবা এমন বিষয়কে ছাবেত করে, যা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফী করেছেন কিংবা যা নিষেধকে আদেশ বানিয়ে ফেলে অথবা আদেশকে নিষেধে পরিণত করে দেয়, তাতে হক বলা হবে। অর্থাৎ শরীয়তে সে ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে, তাই বলা হবে।[৪৬] যে কথা বা কাজকে দলীল যে বিষয়ের ভয় দেখিয়েছে, তার জন্য সেই ভয়ই

---

[৪৫] বিদ'আতীরা শরী'আতের দলীলগুলো শুধু এক চোখ দিয়ে দেখে থাকে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে শুধু এক পক্ষের দলীল পেশ করে হুকুম লাগায়। অন্য পক্ষের দলীলের দিকে তাকিয়েও দেখেনা। মুরজীআরা শুধু 'আহাদীছুর রাজা' তথা ঈমান আনলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলো দিয়ে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছে যে, ঈমান ঠিক থাকলে পাপ কাজ করলেও ঈমান নষ্ট হবে না এবং জান্নাতে যেতেও কোন অসুবিধা হবে না। অপর পক্ষে মুতাযিলা ও খারেজীরা আহাদীছুল ওয়াঈদ অর্থাৎ যে সমস্ত হাদীছে পাপ করলে জাহান্নামে যেতে হবে বলে ঘোষণা করেছে, শুধু সে হাদীছগুলোকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছে, কোন মুসলিম একটি পাপ কাজ করলেই জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে। এরা প্রথম পক্ষের হাদীছগুলোর প্রতি কোন প্রকার গুরুত্ব প্রদান করেনি। প্রথম ফির্কার লোকেরাও দ্বিতীয় ফির্কার লোকদের হাদীছগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। তবে কবীরা গুনাহকারীর উপর দুনিয়াতে কী হুকুম লাগানো হবে এ ব্যাপারে মুতাযিলা ও খারেজীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। খারেজীরা তাকে সুস্পষ্ট কাফের বলে থাকে। অন্যদিকে মুতাযিলারা বলে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে, কিন্তু কুফরীতে প্রবেশ করবেনা। বরং সে ঈমান ও কুফরীর মাঝামাঝি অবস্থানে ঝুলন্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের কথা উপরোক্ত দুই দলের মাঝখানে। তারা উভয় প্রকার দলীলকে একত্রিত করেন। এটিই হচ্ছে সঠিক পন্থা। তারা পাপের কারণে কোন মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না এবং তাকে পরিপূর্ণ মুমিনও বলেনা। তাকে ত্রুটিযুক্ত মুমিন বলা যেতে পারে। দুনিয়াতে তার উপর মুমিনের হুকুমই কার্যকর হবে। পরকালে তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন কিংবা শাস্তি দিবেন। আর শাস্তি দিলেও সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। তাওহীদ ও ঈমানের কারণে সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[৪৬] অর্থাৎ শরী'আতের দলীল যদি সেটিকে কুফরী বলে, তাহলে কুফরীই বলতে হবে এবং ফিসক বলা হলে তাকে ফিসকই বলা হবে। চাই তা আক্বীদাহগত গুনাহ হোক বা আমলগত। শরী'আত যা বলেছে সেটিই বলতে হবে।

দেখানো হবে। দলীল যেটিকে কুফুরী বলেছে, তাকে কুফুরীই বলতে হবে। বলা হবে, যে ব্যক্তি এই কথা বলবে সে কাফের।[৪৭] এ রকমই অন্যান্য ক্ষেত্রে।[৪৮] যেমন কারো নফসের ও মালের উপর যুলুম করার ক্ষেত্রে যে শাস্তির ধমক রয়েছে, তাই উল্লেখ করা হবে।

যারা বলে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি (আল্লাহর কালাম নয়), আখিরাতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় এবং পৃথিবীতে যা ঘটে, তা ঘটার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে জানেন না, তাদেরকে আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামা'আতের অনেক প্রসিদ্ধ ইমাম কাফের বলেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর সাথে খালকে কুরআন অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি না আল্লাহর কালাম? এ বিষয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক করেছি। পরিশেষ তার কথার সাথে আমি একমত পোষণ করেছি। আমরা এ সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছি, যে ব্যক্তি বলবে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, সে কাফের।

কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যখন বলা হবে, তোমরা কী সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, অমুক ব্যক্তির জন্য ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা রয়েছে এবং তোমরা কী সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, অমুক ব্যক্তি কাফের? তখন আমরা বলবো যে, তার ব্যাপারে আমরা এই সাক্ষ্য দিতে পারবো না। তবে যদি এমন দলীল পাওয়া যায়, যা তার কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট, তবে সে কথা ভিন্ন। কেননা সর্বাধিক বড় যুলুমের অন্যতম হচ্ছে, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, তার উপর রহম করবেন না এবং তাকে চিরকাল জাহান্নামে রাখবেন। নির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এই কথা বলা সবচেয়ে বড় যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। এটি হচ্ছে মৃত্যুর পর কাফেরের হুকুম।

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সুনানের "যুলুম থেকে নিষেধ" নামক অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«كَانَ رَجُلاَنِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ وَ لاَ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ

এটিই হচ্ছে হক। দলীল ছাড়া কোন বিষয়কে কুফরী বলা যাবে না। শরী'আত বিরোধী সমস্ত কথা, কাজ ও আক্বীদাহর ব্যাপারে শরী'আত যা বলছে আমরাও তাই বলি।

[৪৭] তবে সাধারণ হুকুম এবং খাস হুকুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই কাজ করবে সে কাফের- এ কথা বলা এবং নির্দিষ্ট করে কাউকে কাফের বলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কথা ও কাজের উপর হুকুম লাগানো এবং নাম নিয়ে কারও উপর কুফুরীর বা অন্য কিছুর হুকুম লাগানোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

[৪৮] অর্থাৎ যেটিকে ফিসক বলেছে, তাকে ফিস্ক, যাকে জাহেলীয়াত বলা হয়েছে, তাকে জাহেলীয়াত আর যা করলে বা বললে জাহান্নামে যেতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তাই বলতে হবে। কোনো ক্রমেই শরী'আতের সীমালংঘন করা যাবে না।

الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ»

"বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ভাই বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের একজন সবসময় পাপ কাজে লিপ্ত হতো আর অন্যজন সবসময় ইবাদত-বন্দেগীতে লেগে থাকতো। ইবাদত-বন্দেগীতে লেগে থাকা লোকটি তার ভাইকে সবসময় পাপ কাজে লিপ্ত হতে দেখতো আর বলতো, পাপ কাজ হতে বিরত থাকো! অতঃপর ইবাদত গোজার লোকটি একদিন তার ভাইকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে বলল, বিরত হও! এতে পাপ কাজে লিপ্ত লোকটি বলল, আমার প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি! আমাকে তুমি আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয়েছে? এতে ইবাদত গোজার লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে কখনই ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতেও স্থান দিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের রূহ কবয করে নিলেন। তারা উভয়েই আল্লাহর নিকট হাজির হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা এই ইবাদত গোজারকে বললেন, তুমি কি আমার সব কিছুই জানতে কিংবা যা কিছু আমার হাতে আছে, তার উপর কি তুমি সক্ষম ছিলে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গুনাহগারকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও এবং আমার রহমতের ফলে জান্নাতে প্রবেশ করো। আর অন্যজনের ব্যাপারে তিনি বললেন, একে জাহান্নামে নিয়ে যাও।[৪৯] আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর শপথ! ঐ ব্যক্তি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাই বরবাদ করে ফেলেছে। এই হাদীছটি হাসান।

কেননা যেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর হুকুম লাগানো হবে, সে মুজতাহিদ হতে পারে এবং,সে ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল করতে পারে। সে হিসাবে তার গুনাহ ক্ষমাযোগ্য অথবা এও হতে পারে যে, সে ব্যাপারে তার নিকট কোন দলীল পৌঁছেনি অথবা এমন হতে পারে যে, উক্ত গুনাহকারীর এত বড় ঈমান এবং এমন নেকী রয়েছে, যার কারণে তার জন্য আল্লাহর রহমত আবশ্যক হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে তার ছেলেদেরকে বলেছিলো আমি যখন মরবো তখন আমাকে জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে সাগরে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে এই জন্য ক্ষমা করে দিয়েছেন যে, তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আল্লাহর ভয় ছিল।[৫০]

এ লোকটি বিশ্বাস করত, পরকালে আল্লাহ তাকে ধরতে সক্ষম; তবে তার প্রবল ধারণা ছিল, এভাবে ছাই বানিয়ে সাগরের পানিতে ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা সম্ভবত তার

---

[৪৯] হাদীছটি হাসান, দেখুন: আবু দাউদ, হা/৪৯০১। শাওয়াহেদ থাকার কারণে তথা একাধিক উৎস থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদীছটি ছ্বহীহ । দেখুন তিরমিযী, হা/২৩১৯।

[৫০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৮১, মুসলিম হা/২৭৫৬।

ছাইকে জমা করে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করতে পারবেন না কিংবা সে এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। তবে আখিরাতে বিদ'আতীর অবস্থা কী হবে? এ ব্যাপারে চুপ থাকার অর্থ এই নয় যে, বিদ'আত থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হবে না এবং তাকে তাওবা করতে বলা হবে না। তাওবা করতে বলার পর যদি সে তাওবা করে, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে।[৫১] মূলত কথাটি যখন কুফুরী কথা হবে, তখন অবশ্যই বলা হবে যে এটি কুফুরী।[৫২] আর যে ব্যক্তি কথাটি বলবে, তাকে কাফের বলার শর্ত পাওয়া গেলে এবং কাফের বলার প্রতিবন্ধক না থাকলে তাকেও কাফের বলা হবে। তবে কোন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের হবে না, যতক্ষণ না সে মুনাফেক ও যিন্দিক[৫৩] (নাস্তিক) হবে। সুতরাং আহলে কিবলার মধ্য হতে যারা ইসলাম প্রকাশ করে, তাদের কাউকে কাফের বলা যাবে না। যতক্ষণ না সে মুনাফেক ও যিন্দীক হয়। আর আল্লাহর কিতাবই এ বিষয়ে চূড়ান্ত বর্ণনা ও ফায়ছালা করবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে সমস্ত মানুষকে মোট তিনভাবে বিভক্ত করেছেন।

(১) মুশরিক ও আহলে কিতাবদের কাফের সম্প্রদায়। এরা তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেনি।

(২) এক প্রকার লোক এমন, যারা প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে ঈমান আনয়ন করেছে।

(৩) আরেক প্রকার লোক এমন রয়েছে, যারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করলেও অন্তরে কুফুরী গোপন করেছে।

সূরা আল বাকারার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা এই তিন প্রকার লোকের আলোচনা করেছেন।[৫৪] যার ব্যাপারে জানা যাবে যে, সে তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে

---

[৫১] এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, শাস্তি স্বরূপ কোন মুসলিমকে হত্যা করা কিংবা শরী'আতের কোন বিধান লংঘন করার কারণে কারো উপর শরী'আতের নির্ধারিত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা ব্যক্তি বিশেষ বা কোন সংগঠনের কাজ নয়। এটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান বা তার প্রতিনিধির দায়িত্ব। সুতরাং যে দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম নেই, সেখানের কোন লোক যদি শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করে, তাহলে দীনের আলেম, দাঈ এবং দীন দরদী মুসলিমদের উচিত, তাকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করা এবং আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করা। কোনো অবস্থায় কারো উপর শরী'আতের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যাবেনা। কারণ এটি তার দায়িত্ব নয়।

[৫২] এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, কুফর দু'প্রকার। (১) এমন কুফর, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। (২) كفر دون كفر অর্থাৎ এমন (ছোট) কুফর, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে না। এটি অন্যান্য কবীরা গুনাহর মতই।

[৫৩] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর পরিভাষায় যিন্দিক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অন্তরে কুফুরী গোপন রেখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে।

[৫৪] এই শ্রেণী বিন্যাসটি উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার শুরুতে তার দীন কবুল করা বা না করার দিক থেকে সমস্ত মানুষকে তিনভাবে বিভক্ত করেছেন। এক নং আয়াত থেকে পাঁচ নং আয়াত পর্যন্ত তিনি খাঁটি মুমিনদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারা হচ্ছেন ঐ সমস্ত মানুষ যারা আল্লাহ, পরকাল এবং গায়েবের অন্যান্য বিষয়ে ঈমান আনয়ন করেছে এবং ছ্বলাত-যাকাত থেকে শুরু করে ইসলামের

অর্থাৎ এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সঠিক উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, কিন্তু একই সময় এও প্রমাণিত হবে যে, সে অন্তরে কুফুরী গোপন রেখেছে, সে যিন্দীক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আর যিন্দীকই হচ্ছে মুনাফেক।

এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল, যে ব্যক্তি প্রত্যেক বিদ'আতীকে কাফের বলবে, তার এই হুকুমের মাধ্যমে এমন লোকদেরকেও কাফের বলে ফেলবে, যারা মুনাফেক নয় অর্থাৎ তারা এমন লোক নয়, যারা অন্তরে কুফরী গোপন রেখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করেছে। বরং হতে পারে তাদের ভিতরের অবস্থা এমন যে, তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের প্রতি ঈমানও রাখে। যদিও তারা পাপের কাজে লিপ্ত হয়।

অন্যান্য বাহ্যিক আমলগুলো সম্পাদন করে। এর পরই মাত্র দু'টি আয়াতে অর্থাৎ ছয় ও সাত নং আয়াতে নিরেট কাফেরদের আলোচনা করেছেন। এরা হচ্ছে এমন লোক, যারা অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করেনি এবং আল্লাহর দীন ও নবী-রাসূলদের দীনকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। এতটুকু করেই তারা ক্ষ্যান্ত হয়নি; বরং তারা পৃথিবী থেকে আল্লাহর দীনকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে এবং করে যাচ্ছে। অতঃপর ৮ নং আয়াত থেকে শুরু করে ১৯ নং আয়াত পর্যন্ত মুনাফেকদের বৈশিষ্ট ও পরিচয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তারা হচ্ছে এমন লোক, যারা বিশেষ স্বার্থে মুখে মুখে ইমান প্রকাশ করে ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে পালন করে; কিন্তু তাদের অন্তর কুফুরীতে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তাদের আসল পরিচয় তুলে ধরেছেন। কারণ প্রকাশ্য কাফের থেকে এরা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য অধিক ক্ষতিকর। কাফের ও মুশরিকরা যেহেতু ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু এবং তারা যেহেতু মুসলিম সমাজ থেকে সাধারণত দূরেই বাস করে, তাই তাদের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে মুনাফেকরা যেহেতু ইসলামী সমাজে মুসলিমদের সাথেই বসবাস করে, ইসলামের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করে, তাই তাদেরকে চেনা কষ্টকর, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

এই বিষয়টি এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা প্রদানকারী এবং ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শনাবলী পালনকারী কোন মুসলিমকে কোন একটি পাপ কাজ করার কারণেই আপনি যদি তাকে কাফের বলেন, তাহলে যার উপর আপনি কুফরীর হুকুম লাগাচ্ছেন, তার অবস্থা ঠিক ঐ সমস্ত লোকদের মতই হতে হবে, যাদের আলোচনা করা হয়েছে সূরা বাকারার ৮ নং আয়াত থেকে ১৯ নং আয়াতের মধ্যে। কারণ আপনি ভালো করেই জানেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার লোকদের উপর আপনি কুফরীর হুকুম লাগাচ্ছেন না। আপনি কেবল কবীরা গুনাহ করার কারণে কিছু মুসলিমকে তৃতীয় প্রকার লোকদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছেন। সুতরাং আপনাকে ভাল করে ভাবতে হবে, যে মুসলিমকে তৃতীয় প্রকার মানুষের মধ্যে শামিল করতে চাচ্ছেন, তার মধ্যে ঐ সমস্ত লোকের বৈশিষ্ট পূর্ণরূপে আছে কি না- যার আলোচনা করেছেন আল্লাহ তা'আলা ৮ নং থেকে ১৯ নং আয়াতে। অর্থাৎ আপনি যদি মনে করেন, কোন মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার চেলাদের ন্যায় অন্তরে কুফুরী গোপন করে মুখে ইসলাম প্রকাশ করছে এবং সে আসলেই ইসলামের দুশমন, তাহলে আপনার হুকুম তার উপর প্রযোজ্য হতে পারে। অন্যথায় একজন মুসলিমকে পাপের কারণে কাফের বললে আপনি মারাত্মক অপরাধী হবেন। সুতরাং বিজ্ঞ আলেম এবং সমাজে বসবাসকারী মানুষের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য কোন মুসলিমের উপর কুফুরীর হুকুম লাগানো অনুচিত। বিশেষ করে যখন জানা গেল যে, পাপ কাজ করলেই কোন মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়না। (আল্লাহই ভাল জানেন)

ছ্বহীহ বুখারীতে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আযাদ কৃত গোলাম আসলাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ النَّبِيُّ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

“নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় এক লোকের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার উপাধি ছিল হিমার। সে রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কথার মাধ্যমে হাসাতো। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মদ পান করার কারণে শাস্তিও দিয়েছিলেন। তাকে একদিন পাকড়াও করে নিয়ে আসা হলো এবং তার উপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমে শাস্তি প্রয়োগ করা হলো। উপস্থিত এক লোক বলল, হে আল্লাহ্! তার উপর লা'নত বর্ষণ করো। কত বারই তাকে একই অপরাধে গ্রেফতার করা হলো! নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তার উপর অভিশাপ করো না। আল্লাহর কসম! আমি তাকে আল্লাহ্ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসে বলেই জানি”।[৫৫]

এটি এমন একটি বিষয় (বিদ'আত), যা ইলম ও ইবাদতে প্রসিদ্ধতা অর্জনকারী অনেক দল ও ইমামের মধ্যেই নিশ্চিতরূপে পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে জাহমীয়া অথবা মুরজীআ অথবা কাদারীয়া অথবা শিয়া কিংবা খারেজীদের কিছু কিছু কথা পাওয়া যায়। তবে ইলম ও আমলের ইমামগণের মধ্যে উক্ত বিদ'আতগুলো প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল না। বরং বিদআতের কিছু কিছু শাখা তাদের মধ্যে ছিল। এ জন্যই পরবর্তী কালের বিদ'আতীরা পূর্ব যামানার অনেক প্রসিদ্ধ আলেমের ভুল ধরেছেন। তবে বিদ'আতীদের দোষ হচ্ছে তাদের একদল অন্যদলকে কাফের বলে। অপর পক্ষে আহলে ইলম তথা জ্ঞানীদের গুণ হচ্ছে তারা কাউকে কাফের বলেন না; বরং বলে থাকেন, অমুক ব্যক্তি ভুল করেছেন।

[৫৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৮০।

আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করার হুকুমঃ

তবে এখানে শাইখের কথার উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অর্থাৎ শাইখ যে বলেছেন, কবীরা গুনাহ করার কারণে আমরা আহলে কিবলার কাউকে কাফির বলি না। এই কথার উপর একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ হাদীছে কতিপয় গুনাহকে কুফুরী হিসাবে নাম দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফের"। *(সূরা আল মায়েদা: ৪৪)* রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

"কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী তথা পাপাচারিতার অন্তর্ভুক্ত। আর তার সাথে যুদ্ধ করা কুফুরী"।[৫৬] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

"তোমরা আমার পরে এমন কাফের হয়ে যেয়ো না যে, তোমাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করবে"।[৫৭] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»

"যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে বলবে, হে কাফের! তখন তাদের একজন কাফের হয়ে যাবে"।[৫৮] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»

"এমন চারটি বৈশিষ্ট রয়েছে যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফেক হিসাবে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি বিদ্যমান থাকবে তা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মধ্যে নেফাকীর একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। (১) যখন তার কাছে কোনো

---

[৫৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৪।

[৫৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/১২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৫।

[৫৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬১০৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬০।

কিছু আমানত রাখা হয় তখন তার খেয়ানত করে। (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (৩) অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে। (৪) আর যখন ঝগড়া করে তখন গালমন্দ করে"।[৫৯]

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ»

"যিনাকারী যখন যিনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকেনা। একই অবস্থা মদ পানকারীর। সে মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। এর পরও তার জন্যে তাওবার দরজা উন্মুক্ত থাকে।[৬০] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

"بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ"

মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছ্বলাত পরিত্যাগ করা।[৬১] ছ্বহীহ মুসলিমে জাবির রা. হতে বর্ণিত।রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

«مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

"যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল, অতঃপর গণক যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল সে মূলত মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করলো"।[৬২]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফুরী করলো"।[৬৩] হাকিম এরূপ শব্দে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

---

[৫৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮।

[৬০] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৭৫, মুসলিম হা/৫৭। অন্য বর্ণনায় আছে, "যখন কোন হত্যাকারী কাউকে হত্যা করে, হত্যা করার সময় সে মুমিন থাকে না"। অন্য বর্ণনায় আছে, ছিনতাইকারী যখন কোন মূল্যবান জিনিস ছিনতাই করে, যার দিকে লোকেরা দৃষ্টি উঁচু করে দেখে তখন সে মুমিন থাকে না"।

[৬১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ৮২।

[৬২] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৬৩৯, ইমাম আলবানীও হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/৩৩৮৭, মিশকাত হা/৫৫১।

[৬৩] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১৫৩৫, হাকিম হা/৪৫

«اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»

"মানুষের মধ্যে দু'টি কুফুরী স্বভাব রয়েছে। বংশের বদনাম করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা"।[৬৪] এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে।

এর উত্তর হচ্ছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐকমত্যে কবীরা গুনাহকারীর উপর এমন কুফুরীর হুকুম লাগানো যাবে না, যা তাকে দীন থেকে বের করে দেয়। যেমন খারেজীরা বলে থাকে। কেননা যদি বলা হয় সে এমন কাফির হয়েছে, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিয়েছে, তাহলে সে মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। সে হিসাবে হত্যাকারীকে যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ক্ষমা করে দেয়, তাহলে সেই ক্ষমা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনি মদ, যিনা, চুরি এবং মদ পানের অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তিও প্রয়োগ করা যাবে না, কথাটি যে বাতিল এবং তা যে দীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা সকলেরই জানা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো একমত যে, কবীরা গুনাহকারী ঈমান ও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না এবং কুফুরীতেও প্রবেশ করবে না। মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে প্রবেশ করে কাফেরদের সাথে চিরকাল তথায় অবস্থানও করবে না। যেমন বলে থাকে মুতাযিলারা। মুতাযিলাদের এই কথাও বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তিকে মুমিনদের মধ্যেই গণ্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজকরণ এবং অনুগ্রহ বিশেষ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব"। *(সূরা আল-বাকারা: ১৭৮)*

সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে মুমিন বলেই সম্বোধন করেছেন এবং তাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছের ভাই হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দীনি ভাই।

[৬৪] ছহীহ মুসলিম হা/ ১২১।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"মুমিনদের দুই দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফ কারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও"।[৬৫] *(সূরা হুজরাত: ৯-১০)*

সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমা প্রমাণ করে যে, অবিবাহিত ব্যভিচারী, চোর এবং ব্যভিচারের অপবাদ দানকারীকে হত্যা করা হবে না। বরং তাদের প্রত্যেকের উপর নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা হবে। এটি প্রমাণ করে যে, অনুরূপ গুনাহ এ লিপ্ত কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় না।

ছ্বহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ثم ألقي في النار»

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন সেই দিন আসার আগে আজই তার কাছ থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায় (ক্ষমা চেয়ে নেয়), যেদিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। তার যদি নেকী থাকে তাহলে তা থেকে যুলুমের সমপরিমাণ কেটে নেয়া হবে। আর তার যদি নেকী না থাকে তাহলে তার সাথীর (মযলুমের) গুনাহসমূহ থেকে কিছু নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে"।[৬৬]

---

[৬৫] এখানেও আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের দু'টি বিবাদরত দলকে মুমিন এবং তারা পরস্পর ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, মুসলিমগণ পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলেও তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়নি।

[৬৬] বুখারী হা/২৪৪৯, মুসলিম হা/২৫৮১।

এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কিয়ামতের দিন যালেমেরও কিছু নেকী থাকবে, যা থেকে মাযলুম তার হক ছিনিয়ে নিবে। ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ دينار فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وله حسنات أمثال الجبال وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وأخذ مال هذا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ»

“তোমরা কি জানো দরিদ্র কে? তারা বললো, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার কোনো দিরহাম বা দীনার নেই। অতঃপর তিনি বললেন, দরিদ্র হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন পাহাড় সমান নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে। সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্তপাত করেছে, কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। অতঃপর একে তার নেকী থেকে বদলা প্রদান করা হবে, ওকে তার নেকী থেকে বদলা প্রদান করা হবে। সকলের পাওনা পরিশোধ করার আগেই যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে পাওনাদারদের গুনাহ নিয়ে এসে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৬৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ﴾

“আর দিনের দুই প্রান্তেই ছ্বলাত কায়েম করো এবং রাতের প্রান্তভাগেও; সৎ কাজ অবশ্যই পাপকাজগুলোকে দুর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক”। *(সূরা হুদ: ১১৪)*

এতে প্রমাণিত হলো যে, অন্যায় কাজ করা অবস্থাতেও মুমিন ব্যক্তি এমন সৎ কাজ করে, যা তার অন্যায় কাজের গুনাহসমূহকে মোচন করে দেয়। যথাস্থানে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা-আল্লাহ।

আখিরাতে কবীরা গুনাহকারী মুসলিমের হুকুমের ক্ষেত্রে মুতাযিলারা খারেজীদের সাথে একমত পোষণ করেছে। তারা এবং খারেজীরা বলে কবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তবে খারেজীরা বলে আমরা দুনিয়াতে তাকে কাফের নাম দিবো। আর মুতাযিলা বলে আমরা তাকে ফাসেক বলবো। তাদের মাঝে মূলত পার্থক্য শুধু বাহ্যিক।

আহলে সুন্নাতের লোকেরাও এ ব্যাপারে একমত যে, মুমিন ব্যক্তি যে কবীরা গুনাহ করেছে, তার জন্য সে শাস্তির হকদার। যেমন এ বিষয়ে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

---

[৬৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৫৮১।

তারা মুরজিআদের মত কথা বলে না। মুরজিআরা বলে, ঈমান ঠিক থাকলে পাপ কাজ ঈমানের কোন ক্ষতি করে না এবং কাফের অবস্থায় সৎকাজ করেও কোন লাভ হয় না। ওয়াদার যে সমস্ত হাদীছ দ্বারা মুরজিআরা দলীল পেশ করেছে এবং ভয়ের যে সমস্ত হাদীছ দ্বারা খারেজী ও মুতাযিলারা দলীল গ্রহণ করেছে, তা একত্রিত করলে উভয় দলের কথাই ভুল প্রমাণিত হয়। এই লোকদের কথাগুলো আলোচনা করে কোন লাভ নেই। তবে আপনি শুধু একদলের কথা দ্বারাই অন্যদলের মাযহাবকে ভুল প্রমাণিত করতে পারবেন।

কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তির হকদার, তবে সে কাফের হয়ে যায়নি- এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের লোকেরা একমত হওয়ার পর মতভেদ করেছেন যে কুফুরীর একাধিক স্তর আছে কি না? কুফুরীর মধ্যে كفر دون كفر অর্থাৎ কুফুরীর মধ্যে এমন কুফর আছে কি যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এমনি ঈমানেরও কি একাধিক স্তর আছে, যেমন إيمان دون إيمان অর্থাৎ এমন ঈমান যা পরিপূর্ণ নয়? এটি বাহ্যিক মতভেদ। এতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। ঈমানের সংজ্ঞা ও পরিচয়ের ব্যাপারে তাদের মতভেদ থেকেই এই মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের ইমামগণ মতভেদ করেছেন যে, ঈমান কী 'কাওল' ও 'আমল' অর্থাৎ কথা ও কাজের সমষ্টিগত নাম, যা বৃদ্ধি পায় এবং কমে? না কি এ রকম নয়? অর্থাৎ শুধু অন্তরের বিশ্বাসই কি ঈমান?

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে কাফির বলেছেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যাকে কাফির বলেছেন তাকে কাফিরই বলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যেখানে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালাকারীকে কাফির বলেছেন, আমরা তাকে কাফির বলবো এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে কাফির বলেছেন, আমরা তাকেও কাফির বলবো।

যারা বলেন ঈমান হচ্ছে কথা ও আমলের সমষ্টিগত নাম এবং ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তারা বলেন যে, আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিয়ে ফায়ছালাকারীর কাজটি কুফরে আমলী অর্থাৎ তার কাজটি কুফুরী কাজ। কুফুরী এতেকাদী অর্থাৎ অন্তরের কুফুরী নয়। সুতরাং তারা কুফুরীকে একাধিক স্তরে বিভক্ত করেছেন। অর্থাৎ كفر أكبر এবং كفر دون كفر এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। অনুরূপ ঈমানকেও তারা একাধিক স্তরে বিভক্ত করেছেন।

আর যারা বলেন যে, ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম এবং আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয় আর শুধু অস্বীকার করাকেই কুফরী বলা হয়, ঈমান ও কুফরীর হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তারা বলেন, আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যের বিধান দিয়ে ফায়ছালাকারীর কুফর হচ্ছে كفر مجازي অর্থাৎ তার কাজকে রূপকার্থে কুফুরী হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা কুফরে

হাকীকী তথা প্রকৃত কুফর হচ্ছে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এমনি কতিপয় আমলকেও রূপকার্থে ঈমান বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু"। *(সূরা আল বাকারা: ১৪৩)*

অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে আদায় করা তোমাদের ছ্বলাতকে নষ্ট করবেন না। এখানে ছ্বলাতকে রূপকার্থে ঈমান বলা হয়েছে।[৬৮] কেননা ঈমান ছাড়া আমল শুদ্ধ হয় না। অথবা ছ্বলাত যেহেতু ঈমানের প্রমাণ বহন করে, তাই ছ্বলাতকেই ঈমান বলা হয়েছে। কেননা ছ্বলাত আদায় করা ছ্বলাতীর মুমিন হওয়ার পরিচায়ক। এ জন্যই কাফের আমাদের মত ছ্বলাত পড়লেই তাকে মুসলমান বলা হবে।

কবীরা গুনাহকারীরা যে, শাস্তির হকদার হবে, মুসলিম মিল্লাতের ফিকাহ বিদদের নিকট এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই দীন নিয়ে এসেছেন, তাকে তারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে ওদের কথা হচ্ছে ভুল, যারা বলে কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তিরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যেমন বলে থাকে খারেজী ও মুতাযেলীরা।

তবে মতভেদের সময় কতিপয় লোকের গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি খুবই নিকৃষ্ট। তারা ভিন্ন মতের লোকের উপর এমন বিষয় চাপিয়ে দেয়, যা তার উপর চাপিয়ে দেয়া যথার্থ নয়। সেই সাথে ভিন্নমত পোষণকারীকে অতিরিক্ত দোষারোপ করে এবং গালিও দেয়। আমাদেরকে যেখানে কাফেরদের সাথে তর্ক করার সময় ইনসাফ করতে বলা হয়েছে এবং সর্বাধিক উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, সেখানে এ রকম একটি বিষয়ে আমাদের লোকেরা পরস্পর ইনসাফ করবে না কেন?[৬৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[৬৮] এটি ঠিক নয়। কেননা কুরআন হাদীছের শব্দকে তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং আমল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আলেমের মত।

[৬৯] যতদূর বুঝা যাচ্ছে শারেহ (ব্যাখ্যাকার) এখানে কবীরাহ গুনাহকারীর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোক এবং খারেজী-মুতাযিলাদের মধ্যকার মতভেদের দিকে ইঙ্গিত করেন নি। বরং তিনি আহলে সুন্নাতের লোকদের মধ্যে ঈমানের মাস'আলায় যে খেলাফ রয়েছে সেদিকে ইংগিত করেছেন। তাদের অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে, ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস, জবানের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের সমষ্টিগত নাম। সে হিসাবে সৎ আমলসমূহ ঈমানের মধ্যে শামিল এবং আমলের কারণে ঈমান বৃদ্ধি পায় গুনাহএর কারণে ঈমান কমে যায়।

অপর পক্ষে কতিপয় আলেমের মত হচ্ছে ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম। সৎ আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে সৎকাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। তাদের মতে ঈমান বাড়েও না কমেও না। ব্যাখ্যাকার বলতে চাচ্ছেন তাদের এই মতভেদ শুধু বাহ্যিক এবং খুবই হালকা। এ নিয়ে আহলে সুন্নাতের লোকদের পারস্পরিক মতভেদের সময় পরস্পর গালাগালি ও দোষাররোপ করা অন্যায়। (আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে অধিক জ্ঞাত"। *(সূরা আল-মায়িদা: ৮)*

এখানে একটি বিষয় ভালো করে বুঝা উচিত। সেটি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করা কখনো এমন কুফুরী হয়, যা বিচার-ফায়ছালাকারীকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আবার কখনো এটি কবীরা গুনাহ অথবা ছগীরা গুনাহ এর কাজ হয়। আবার কখনো এটি এমন কুফুরী হয়, যা রূপকার্থে কিংবা ছোট কুফর অর্থে ব্যবহৃত। মোট কথা উপরোক্ত দুই অর্থে কুফর শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। আর শাসকের অবস্থা অনুপাতেই তা হয়ে থাকে। সে যদি বিশ্বাস করে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করা তার ইচ্ছাধীন অথবা আল্লাহর নাযিল করা বিধান সম্পর্কে অবগত হয়েও সে যদি তার প্রতি অবজ্ঞা করে, তাহলে এটি হবে বড় কুফুরী। এটি করলে শাসক ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আর সে যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান দ্বারা বিচার-ফায়ছালা তার উপর ওয়াজিব, নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ে আল্লাহর ফায়ছালা কী, তাও সে অবগত আছে, কিন্তু এ কথা করে সে আল্লাহর বিধান থেকে সরে আসে যে, আল্লাহর বিধান বর্জন করার কারণে সে শাস্তির হকদার তাহলে সে গুনাহগার। রূপকার্থে তাকে কাফের বলা হবে অথবা বলা হবে তার কাজটি ছোট কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি নির্দিষ্ট কোন ঘটনায় বিচার করার সময় আল্লাহর হুকুম জানার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরও সে বিষয়ে আল্লাহর হুকুম জানতে না পারার কারণে ভুল ফায়ছালা করে, তাহলে সে ভুলকারী হিসাবেই গণ্য হবে। ইজতেহাদ করার কারণে সে ছাওয়াব পাবে এবং তার ভুল ক্ষমাযোগ্য।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله আমরা এ কথা বলি না যে, ঈমান ঠিক রেখে যে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হবে পাপ কাজ তার ঈমানের কোন ক্ষতি করে না। এই কথার দ্বারা শাইখ মুরজীয়াদের বিরোধীতা করেছেন। মুরজিয়ারা[৭০] ছাহাবীদের যুগের কতিপয় লোকের অনুরূপ সন্দেহে নিপতিত হয়েছে। তবে ছাহাবীগণ একমত হয়েছিলেন যে, তারা যদি তাওবা না করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। কুদামা বিন আব্দুল্লাহ এবং তার সাথে আরো কতিপয় লোক মদ হারাম হওয়ার পরও তা

[৭০] এখানে মুরজিআ বলতে জাহমীয়া সম্প্রদায়ের নিরেট মুরজিআ উদ্দেশ্য। তারা বলে আমলের কোন দরকার নেই। কিন্তু ফিকাহবিদদের মধ্যে যারা মুরজিয়া, তারা বলে থাকে, পাপ কাজ ঈমানে ক্ষতি করে।

পান করলো। তারা সূরা মায়েদার ৯৩ নং আয়াতের ভুল ব্যাখ্যায় লিপ্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই। বিশেষ করে যখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। অতঃপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ সৎকর্মীদেরকে ভালোবাসেন"।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে যখন তাদের বিষয়টি পেশ করা হলো, তখন তিনি, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং সমস্ত ছাহাবী একমত হলেন যে, মদ পানকারীরা যদি মদ হারাম হওয়ার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি তারা তা হালাল বলার উপর অটল থাকে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

কুদামা বিন আব্দুল্লাহ যখন কুরআনের উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করলো এবং বলল, আল্লাহকে ভয় করলে, ঈমান আনয়ন করলে ও সৎ আমল সম্পাদন করলে মদ পান করাতে কোন দোষ নেই, তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তুমি ভুল করেছো। তুমি বেঁচে গেলে। অর্থাৎ সে যেহেতু মদকে হালাল মনে করেনি; বরং কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করেছে, তাই তাকে হত্যা করা হয়নি। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, তুমি যদি আসলেই আল্লাহকে ভয় করতে, ঈমান আনয়ন করতে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করতে, তাহলে মদ পান করতে না। কেননা উক্ত আয়াতটি নাযিলের কারণ হলো, উহুদ যুদ্ধের সময় আল্লাহ তা'আলা যখন মদ হারাম করলেন, তখন কতিপয় ছাহাবী বললেন, মদ পান করে আমাদের যে সমস্ত সাথী মৃত্যু বরণ করেছেন, এখন তাদের অবস্থা কী হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।[৭১] এতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যেসব সৎকর্মপরায়ন মুমিন মুত্তাকী মদ হারাম হওয়ার পূর্বে তা পান করেছে, তাদের কোন দোষ নেই। কিবলা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে ছ্বলাত আদায়ের বিষয়টিও অনুরূপ। কিন্তু ঐ সমস্ত লোককে দোষারোপ করা হবে যারা আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে মদ পান করেছে এবং তাওবা থেকে মাহরূম হয়েছে। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুদামা বিন আব্দুল্লাহর কাছে চিঠি লিখলেন,

﴿حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾

[৭১] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩০৫০।

"হা-মীম, এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তারই দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে"। *(সূরা গাফের: ১-৩)*

অতঃপর তিনি লিখেছেন, আমি জানি না, তোমার কোন্ গুনাহটি অধিকতর ভয়াবহ? প্রথমত হারামকে হালাল মনে করা? না আল্লাহর রহমত থেকে মাহরুম হওয়া?

(৬৫) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم

"মুমিনদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদের জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কামনা করি এবং তার রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর আশা করি। তবে তাদেরকে সম্পূর্ণ শঙ্কামুক্ত মনে করি না এবং তাদের জন্য নিশ্চিতরূপে জান্নাতের সাক্ষ্যও প্রদান করি না। আর মুমিনদের মধ্যে যারা গুনাহগার, তাদের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাদের উপর আযাবের আশঙ্কা করি। তবে তাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করি না।

.....

ব্যাখ্যা: মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে, সে নিজের ব্যাপারে এবং অন্যের ব্যাপারে শাইখের মত আক্বীদাহ পোষণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

"যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য উসীলা তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্যশীল। তারা তার রহমতের আশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৫৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে আমাকেই ভয় করো"। *(সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾ "তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো"। *(সূরা আল-বাকারা: ৪১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ "তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো"। *(সূরা আল-বাকারা: ৪০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾ "তোমরা মানুষকে ভয় করো না। কেবল আমাকেই ভয় করো"। *(সূরা আল-মায়েদা: ৪৪)* যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী"। *(সূরা আল মুমিনুন: ৫৭-৬১)*

মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে তিরমিযীতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার বাণী: "এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে" এখানে যে ভয়ের কথা বলা হয়েছে, তা কী ঐ ব্যক্তির ভয়, যে যেনা করে, মদ পান করে এবং চুরি করে? জবাবে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, হে সিদ্দীকের কন্যা। এখানে সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে ছ্বিয়াম রাখে, ছ্বলাত পড়ে এবং দান-খয়রাতও করে। সেই সাথে আশঙ্কা করে যে, তার ইবাদত কবুল হলো কি না?[৭২]

হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর শপথ উক্ত আয়াতে ঐ সব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা আনুগত্য করে এবং তাতে খুব পরিশ্রম করে। তারপরও তাদের আমলগুলো কবুল না হওয়ার আশঙ্কাও করে। মুমিন ব্যক্তি সৎ আমল এবং ভয় উভয়টিই অর্জন করে। আর মুনাফেক খারাপ আমল করে এবং নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

[৭২] এই হাদীছটি হাসান, দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/৩৮২।

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করেছে, তারা আল্লাহ্‌র রহমত প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, করুণাময়"। *(সূরা আল-বাকারা: ২১৮)*

সুতরাং চিন্তা করুন! ঈমান আনয়ন ও সৎকর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে তারা কিভাবে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে। আল্লাহর রহমতের আশা কেবল ঐ সমস্ত আমলের মাধ্যমেই হতে পারে, যা হিকমতে ইলাহীর দাবী। আল্লাহর শরী'আত, তার কুদরত, তার ছাওয়াব এবং অনুগ্রহেরও দাবী।

কোন লোকের যদি এক খন্ড যমীন থাকে, সে যদি কামনা করে তার সেই যমীন থেকে এমন ফসল আসুক, যা তার উপকারে আসবে, কিন্তু সে যদি তার যমীন চাষ না করে ফেলে রাখে এবং তাতে বীজ বপন না করেই ঐ ব্যক্তির অনুরূপ ফসল কামনা করে যে, যমীন চাষ করে, বীজ বপন করে এবং যমীনের যত্ন করে তাহলে মানুষ তাকে সর্বাধিক বোকা মনে করবে। এমনি উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করেই সন্তান কামনা করে এবং আল্লাহর উপর ভাল ধারণা রাখে। এই উদাহরণ ঐ ব্যক্তির উপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে, ইলম অর্জনে পূর্ণ পরিশ্রম না করেই যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হতে চায়। এ রকম উদাহরণ আরো রয়েছে। এমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করল এবং জান্নাতের উচ্চ আসন এবং চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভের সুদৃঢ় প্রত্যাশা করল, কিন্তু আল্লাহর আনুগত্য করল না এবং তার আদেশসমূহ বাস্তবায়ন ও তার নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টাও করেনি, তার ক্ষেত্রেও মেছালটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার আশা করা যায় না। এখানে জানা উচিত যে, কোন ব্যক্তি যখন কিছু কামনা করবে, তার জন্য নিম্নের কাজগুলো করা আবশ্যক।

১) কাম্য বস্তুকে সে ভালোবাসবে। ২) কাম্য বস্তু ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করবে। ৩) কাম্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবে।

উপরোক্ত কাজসমূহের কোনোটিই যে করবে না, সে যদি কাম্য বস্তু পেতে চায়, তাহলে এটি হবে তার মনের কল্পনা মাত্র। কোন কিছু কামনা করা এক জিনিস আর মনে কল্পনা আরেক জিনিস। প্রত্যেক কামনাকারী আতঙ্কিত থাকে। কাম্য বস্তু পাওয়ার জন্য পথ চলার সময় পথিক যখন পথ চলে এবং বস্তুটি হাত ছাড়া হওয়ার আশঙ্কা করে, তখন সে চলার গতি বাড়ায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ তার সাথে শির্ক করা গুনাহ মাফ করবেন না। শির্ক ছাড়া অন্যান্য যেসব গুনাহ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন"। *(সূরা আন-নিসা: ৪৮)*

সুতরাং মুশরিকের জন্য ক্ষমার আশা নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ক্ষমার সুযোগ রাখেননি। এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে তিনি তা ক্ষমা করবেন। ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন।

মু'জামুত তাবারানীতে রয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তিনটি খাতা থাকবে। একটি ফাইল এমন হবে, যা থেকে কোন কিছুই ক্ষমা করবেন না। এটি হচ্ছে শির্কের ফাইল অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ তার সাথে শির্ক করা গুনাহ মাফ করবেন না। শির্ক ছাড়া অন্যান্য যেসব গুনাহ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন"। *(সূরা আন নিসা: ৪৮)* দ্বিতীয় ফাইলটি হচ্ছে এমন ফাইল, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা কিছুই ছাড়বেন না। এটি হচ্ছে বান্দাদের পারস্পরিক যুলুমের ফাইল। তৃতীয় ফাইলটি হচ্ছে এমন ফাইল, যাকে আল্লাহ তা'আলা ভর্তি করবেন না। অর্থাৎ তাতে কিছুই লিখবেন না। আর এটি হচ্ছে এমন যুলুমের ফাইল, যা বান্দা তার নিজের উপর করেছে এবং যেই যুলুমের সম্পর্ক শুধু আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সীমিত। অর্থাৎ আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এটি মাফ করে দিবেন।[৭৩]

কবীরা গুনাহ ও ছগীরা গুনাহ এর পরিচয় বর্ণনায় আলেমদের মতভেদ রয়েছে। উম্মতে মুহাম্মাদীর কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তিরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না শাইখের এই কথার ব্যাখ্যা করার সময় অচিরেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

একটি বিষয় ভাল করে বুঝা উচিত। তা হচ্ছে, কবীরা গুনাহ করার সময় যদি গুনাহকারীর অন্তরে লজ্জা, ভয় এবং গুনাহকে ভয়াবহ মনে করার প্রবণতা থাকে, তাহলে কবীরাও ছগীরায় পরিণত হয়। অপর পক্ষে নির্লজ্জ, বেপরোয়া, নির্ভয়ে এবং গুনাহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যখন ছগীরা গুনাহ করা হয়, তখন ছগীরাও কবীরায় পরিণত হয়। তবে এটি অন্তরের বিষয় এবং মূল কাজের সাথে এটি একটি অতিরিক্ত জিনিস। বুদ্ধিমান মানুষ তার নিজের মধ্যে এবং অন্যের মধ্যেও অনুভব করতে পারে।

আরেকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, বড় বড় নেকীর অধিকারীর এমন অপরাধও ক্ষমা করা হবে, যা অন্যদের বেলায় করা হবে না।

[৭৩] যঈফ: মুসনাদে আহমাদ হা/২৬০৭৩।

গুনাহকারী যেসব আমলের মাধ্যমে জাহান্নামের আযাব থেকে রেহাই পেতে পারেঃ

গুনাহ্গারের উপর থেকে দশটি আমল জাহান্নামের আযাবকে প্রতিহত করবে। কুরআন ও হাদীছ অনুসন্ধান করে এগুলো বের করা হয়েছে।

(১) গুনাহ্ থেকে তাওবা করাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾

"অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা ছ্বলাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তাওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না"। *(সূরা মারইয়াম: ৫৯-৬০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"আমি যেসব দলীল-প্রমাণ এবং হেদায়াতের কথা মানুষের জন্য, নাযিল করেছি যারা তা গোপন করে, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাত কারীগণেরও। তবে যারা তাওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে এবং মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তাওবা আমি কবুল করি এবং আমি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু"। *(সূরা আল বাকারা: ১৫৯-১৬০)* এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

তবে তাওবায়ে নাসুহা তথা খাঁটি তাওবা হতে হবে। তাওবা কোন একটি গুনাহর সাথে খাস নয়। সকল গুনাহ্ থেকেই তাওবা কবুলযোগ্য। তবে প্রশ্ন হচ্ছে তাওবা কবুলের জন্যই কি এই শর্ত রয়েছে যে, সকল গুনাহ থেকে একসাথে তাওবা করতে হবে? বিষয়টি কি আসলে এ রকম যে, এক গুনাহ থেকে তাওবা করে অন্য গুনাহ্য় লিপ্ত থাকলে তাওবা কবুল হবে না? এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে তাওবা কবুল হবে। আরো জানা আবশ্যক যে, ইসলাম কবুল করলেই কি পূর্বের শির্ক এবং বিনা তাওবায় অন্যান্য গুনাহ মাফ হয়ে যায়? না কি ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ থেকেও তাওবার দরকার আছে? এমনকি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কাফের যদি যেনা ও মদ পান করা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কুফরের হালতে সে যেই অপরাধ করেছে, তা থেকে আলাদাভাবে তাওবা না করলে কি তাকে পাকড়াও করা হবে? ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে কি ঐ মদ পান ও যেনা থেকে তাওবা করা আবশ্যক? না কি ইসলাম গ্রহণের সময় আমভাবে সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলেই চলবে? এ সব প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে,

শেষ কথাটিই সঠিক। ইসলাম কবুলের সাথে সাথে সকল পাপ থেকে একটি তাওবা করা আবশ্যক। এই তাওবাই সমস্ত গুনাহ্ এর কাফ্ফারা হবে এবং ইসলামের পূর্বে যেই গুনাহ হয়েছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এতে ইমামদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তাওবা ছাড়া সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"হে নাবী! বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজের উপর যুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। *(সূরা আয-যুমার: ৫৩)*

তাওবাকারীর জন্য এই সুযোগ। তাই আল্লাহ বলেছেন, لاتقنطوا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। এরপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমূখী হও এবং তার আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না"। (সূরা যুমার: ৫৪)

(২) আল্লাহর কাছে গুনাহ থেকে ইস্তেগফার করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

"অথচ আল্লাহ্ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তা ছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ্ কখনো তাদের উপর আযাব দেবেন না"। *সূরা আল-আনফাল: ৩৩।*

কখনো কখনো শুধু ইস্তেগফার উল্লেখ করা হয়। আবার কখনো তাওবা এবং ইস্তেগফার একসাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়। শুধু ইস্তেগফার উল্লেখ করা হলে তার সাথে তাতে তাওবাও শামিল হয়। এমনি যখন শুধু তাওবা উল্লেখ করা হয়, তখন ইস্তেগফারও তাওবার সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং তাওবা ইসস্তেগফারকে শামিল করে আবার ইস্তেগফারও তাওবার অন্তর্ভুক্ত। এ দু'টির একটিকে যখন অন্যটি থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয় তখন একটি অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করে। আর যখন দু'টিকে একসাথে উল্লেখ করা হয়, তখন ইস্তেগফার দ্বারা অতীতে হয়ে গেছে এমন ঘটনার অকল্যাণ থেকে বাঁচার প্রার্থনা করা হয় এবং তাওবা শব্দটি ভবিষ্যতে হতে পারে এমন পাপ কাজের অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য দু'আ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

একই রকম সম্পর্ক ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে। যখন এ দু'টির একটি উল্লেখ করা হয়, তখন অন্যটিও বুঝায়। আর যখন উভয়টি একসাথে উল্লেখ করা হয়, তখন প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুতভাবে করে থাকো। অতএব, এর কাফ্ফারা এই যে, দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা"। *(সূরা আল-মায়েদা: ৮৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা হলো একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দু'মাস ছিয়াম রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এ জন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব" *সূরা আল-মুজাদালাহ:৪।* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি দান গোপন করো এবং ফকীরদেরকে দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরো উত্তম। আল্লাহ্ তোমাদের কিছু গুনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৭১)*

কোনো মতভেদ নেই যে, এই আয়াতগুলোতে আলোচিত ফকীর ও মিসকীনের প্রত্যেকটিকে যখন আলাদা করে উল্লেখ করা হবে, তখন যার কিছু আছে এবং যার কিছুই নাই উভয় ব্যক্তির জন্যই ফকীর অথবা মিসকীন নামটি প্রযোজ্য হবে। আর যখন উভয়টিকে একসাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হবে, তখন ফকীর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, যার কিছুই নাই, আর মিসকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, যার কিছু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তার সংসার চলে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা আত-তাওবা: ৬০)*

الاثم (পাপ), العدوان (সীমালংঘন) এবং البر (সৎকাজ), التقوى (আল্লাহর ভয়) এর মধ্যকার সম্পর্কও অনুরূপ। এমনি الفسوق (আনুগত্য বর্জন করা), العصيان (নাফরমানী করা) এর মধ্যকার পার্থক্য। কুফর ও নিফাকের অর্থও এর কাছাকাছি। কুফর শব্দটি অধিকতর ব্যাপকার্থ বোধক। তাই যখন কুফর শব্দটি ব্যবহার করা হবে, তখন এটি নিফাককেও শামিল করবে। আর যদি দু'টিকে একসাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়, তাহলে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা অর্থ হবে। ঈমান ও ইসলামের মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ।

(৩) সৎ আমল: সৎ আমলের বিনিময় দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অসৎ আমলের বিনিময় কেবল অনুরূপই দেয়া হয়। সুতরাং যার একগুণ দশগুণের উপর জয়লাভ করে, তার জন্য দুর্ভোগ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾

"আর দিনের দুই প্রান্তেই ছ্বলাত ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগেও; সৎকাজ অবশ্যই গুনাহ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা উপদেশ"। (সূরা হুদ: ১১৪) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»

"আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তুমি যেখানেই থাকো না কেন এবং কোনো অন্যায় কাজ হয়ে গেলে পরক্ষণেই নেকীর কাজ করবে, যেন সে অন্যায়ের পাপ মোচন হয়ে যায়। আর মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করবে"।[৭৪]

(৪) দুনিয়ার বিপদাপদ: রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ، وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

[৭৪] হাসান: তিরমিযী, হা/১৯৮৭। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

“মুসলিম কোন ক্লান্তি, কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও বিষণ্নতার শিকার হলে, এমনকি কাঁটাবিদ্ধ হলেও এর বদলে আল্লাহ তা‘আলা তার গুনাহ মাফ করে দেন।[৭৫]

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে, যখন আল্লাহর এই বাণী অবতীর্ণ হলো,

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

“যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ্ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবেনা”। *(সূরা আন নিসা: ১২৩)* তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন আয়াত নাযিল হয়েছে, যা পিঠ ভেঙে দিবে। আমাদের কে আছে যে, যুলুম করেনি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তুমি কি কষ্টে নিপতিত হও না? তুমি কি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হও না? তুমি কি মুছীবতে পতিত হও না? এগুলোই হচ্ছে মুমিনের পাপ কাজের সাজা”।[৭৬]

সুতরাং মুছীবতগুলো হচ্ছে গুনাহ এর কাফ্ফারা। মুছীবতে পতিত হয়ে সবর করলে বান্দা ছাওয়াব প্রাপ্ত হয়। আর অধৈর্য হলে ও বিরক্তি প্রকাশ করলে গুনাহগার হয়। সবর করা এবং অধৈর্য হওয়া এক বিষয় এবং মুছবীত অন্য একটি বিষয়। মুছীবত আসে আল্লাহর পক্ষ হতে। এটি বান্দার কাজ নয়। মুছীবত হচ্ছে বান্দার পাপের কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে সাজা স্বরূপ। মুছীবতের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। বান্দা বিনিময় প্রাপ্ত হয় বা গুনাহগার হয়, তার আমলের কারণে। সবর করা বা অধৈর্য হওয়া বান্দার কাজ। যদিও অনেক সময় আমল ছাড়াই হাদীয়া স্বরূপ বান্দার জন্য বিনিময় অর্জিত হয় অথবা আল্লাহর পক্ষ হতে কোন কারণ ছাড়াই বান্দা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না; আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল বিনিময় দান করেন। *(সূরা আন-নিসা: ৪০)*

সুতরাং অসুখ-বিসুখই হচ্ছে গুনাহ এর শাস্তি। যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অনেক সময় বিনিময় গুনাহ মাফ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এই গুনাহ মাফ বিনিময়ের আসল অর্থ নয়; বরং মুছীবত দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং সবরের মাধ্যমে বিনিময় অর্জিত হয়।

(৫) কবরের আযাব: এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইনশাআল্লাহ।

(৬) মুমিনদের দু‘আ: চাই এই দু‘আ জীবিতকালে হোক কিংবা মৃত্যু বরণ করার পর হোক। এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য দু‘আ করলে এই দু‘আ গুনাহ মাফের এবং জাহান্নামের আযাব রহিত হওয়ার কারণ হতে পারে।

---

[৭৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫৬৪২, মুসলিম হা/২৫৭২।

[৭৬] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, আত তারগীব ওয়াত তারহীব।

(৭) মৃত্যুর পর ছাওয়াব হাদীয়া দেয়া: কোন মৃতের জন্য যদি সাদকাহ, কুরআন তেলাওয়াত অথবা হজ্জ ইত্যাদির ছাওয়াব হাদীয়া দেয়া হয়,[৭৭] তাহলে তার মাধ্যমেও মৃত ব্যক্তির কবরের আযাব রহিত হতে পারে। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

(৮) কিয়ামতের ভয়াবহতা: কিয়ামতের ভয়ভীতি এবং এর কঠিন অবস্থাও জাহান্নামের আগুন রহিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

(৯) হাশরের মাঠের পারস্পরিক বদলা: ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فيقتص لبعضهم من بعض فإِذَا هُذِّبُوا ونُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ»

"মুমিনগণ যখন পুলসিরাত পার হবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের উপর থামানো হবে। তখন দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।[৭৮]

(১০) শাফা'আতকারীদের শাফা'আত: শাফা'আত এবং তার প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনার সময় এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১১) সর্বাধিক দয়ালু আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা: আল্লাহ তা'আলা কারো শাফাআত ছাড়াই অনেক মানুষকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ তার সাথে শির্ক করার গুনাহ মাফ করবেন না। শির্ক ছাড়া অন্যান্য যেসব গুনাহ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন"। *(সূরা আন-নিসা: ৪৮)*

বড় কোনো গুনাহর কারণে আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে ক্ষমা না করেন, তাহলে সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যাতে তার ঈমানে পাপ-পঙ্কিলতার ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার হয়। যার অন্তরে সামান্যতম ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না। শুধু তাই নয়; যে ব্যক্তি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সেও জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না। যেমন ইতিপূর্বে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে অতিক্রান্ত হয়েছে। বিষয়টি যখন এ রকমই, তাই এই উম্মতের কারো ব্যাপারে জাহান্নামী বা জান্নাতী হওয়ার অকাট্য

[৭৭] একদল আলেমের মতে কুরআন তেলাওয়াতের ছাওয়াব অন্যকে হাদীয়া দেয়া জায়েয। ইহাকে ইসালে ছাওয়াব বলা হয়। তবে সালাফে সালেহীনদের কারো থেকে এটি প্রমাণিত নয়।

[৭৮] ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ৬৫৩৫।

ঘোষণা দেয়া যাবে না। তবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে জান্নাতী বলেছেন, তার কথা ভিন্ন। তবে আমরা সৎকর্মশীলদের জন্য ভাল কামনা করি এবং তাদের উপর আযাব আপতিত হওয়ার আশঙ্কাও করি।

(৬৬) ইমাম ত্বহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة

আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করা এবং তার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। মুসলিমদের জন্য উভয়ের মাঝখানে অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তার রহমতের আশা করার মধ্যেই সঠিক পথ।

.....

ব্যাখ্যা: বান্দা একদিকে যেমন আল্লাহর আযাবের ভয় করবে, অন্যদিকে তার রহমতের আশাও রাখবে। তবে সঠিক ও প্রশংসিত ভয় হচ্ছে, যা বান্দা এবং আল্লাহর হারাম কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।[৭৯] বান্দা যখন উপরোক্ত সীমা অতিক্রম করবে, তখন তার ব্যাপারে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশংসিত আশা হচ্ছে, ঐ ব্যক্তির আশা, যে আল্লাহর আলোয় আলোকিত হয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে। সে আল্লাহর ছাওয়াব কামনা করে। সেই সাথে ঐ ব্যক্তির আশাও প্রকৃতি এবং প্রশংসিত আশা, যে পাপ কাজ করার পর আল্লাহর নিকট তাওবা করে। সে আল্লাহর মাগফিরাতের আশা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র রহমত প্রত্যাশী। আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী ও দয়াকারী"। *(সূরা আল-বাকারা: ২১৮)*

কিন্তু কোন লোক যখন অলসতা ও পাপ কাজে সীমালংঘন করবে এবং বিনা আমলে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করবে, তাহলে এটিই হবে প্রতারণা, অবাস্তব আকাঙ্খা এবং মিথ্যা প্রত্যাশা। ইমাম আবু আলী রুযবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর আযাবের ভয় করা এবং তার রহমতের আশা রাখা একটি পাখির দু'টি ডানার ন্যায়। যখন পাখা দু'টি এক সমান থাকে তখন পাখি আকাশে স্থির থাকে এবং পাখিটি সোজাভাবে চলতে পারে। একটি পাখা ত্রুটিযুক্ত হলে পাখির চলার মধ্যে ত্রুটি চলে আসে। আর যখন উভয় পাখাই চলে

[৭৯] অর্থাৎ প্রকৃত ভয় তাই, যা বান্দাকে আমলের প্রতি উৎসাহিত করে।

যায়, তখন পাখিটি মারা যায়। যারা আল্লাহর আযাবের ভয় করে এবং তার রহমতের আশা রাখে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾

"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? (সূরা আয-যুমার: ৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

"তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। আযাবের ভয় ও রহমতের আশা নিয়ে তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে"। (সূরা সাজদাহ: ১৬)

সুতরাং আশা ভয়কে আবশ্যক করে। বান্দার অন্তরে যদি আযাবের ভয় না থাকে, তাহলে রহমতের আশা করার বদলে নিজেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করবে। এমনি আযাবের ভয় রহমতের প্রত্যাশা করাকে আবশ্যক করে। বান্দার অন্তরে যদি আল্লাহর রহমতের আশা না থাকে, তাহলে সে নিজেকে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত ও নিরাশ মনে করবে। পৃথিবীর যে কোন বস্তুকে যখন আপনি ভয় করবেন, তখন তা থেকে পলায়ন করবেন। কিন্তু যখন আল্লাহকে ভয় করবেন, তখন আপনি আল্লাহর কাছেই আশ্রয় নিবেন। সুতরাং আল্লাহর ভয়ে ভীত বান্দা আল্লাহর দিকেই পালায়।

'মানাযিলুস সায়িরীন' গ্রন্থকার বলেন, মুরীদের (ভক্তের) সর্বাধিক দুর্বল মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর রহমতের আশা করা। এই কথা ঠিক নয়। বরং উপরোক্ত পদ্ধতির ভয় ও আশা ভক্তের সর্বোত্তম মঞ্জিলের অন্তর্ভুক্ত। ছ্বহীহ বুখারীতে রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে বলেছেন,

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى فَلْيَظُنَّ بِى مَا شَاءَ»

"আমার প্রতি বান্দা যেমন ধারণা করে, আমি তার অনুরূপ। সুতরাং সে আমার প্রতি যেমন ইচ্ছা ধারণা করুক"।[৮০]

ছ্বহীহ মুসলিমে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি তার মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলেছেন,

«لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

[৮০] বুখারীতে হুবহু এই শব্দে নেই। এই শব্দে হাদীছটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/১৬৬৩।

"তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ না করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ না করে"।[৮১]

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। এই জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, বান্দা যখন অসুস্থ হয়, তখন যেন আল্লাহর আযাবের ভয়ের চেয়ে তার রহমত পাওয়ার আশাটাই অধিক হয়।[৮২] তার অবস্থা যেন সুস্থ থাকার সময়ের অবস্থার বিপরীত হয়। সুস্থ অবস্থায় আশার চেয়ে ভয় অধিক হওয়া উচিত।[৮৩]

কোন কোন আলেম বলেন, যে ব্যক্তি শুধু ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে যিন্দীক তথা নাস্তিকে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি শুধু ভয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সে হারুরী অর্থাৎ খারেজীতে পরিণত হবে। আরো বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর রহমতের আশা নিয়ে তার ইবাদত করবে, সে মুরজিআদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি ভালোবাসা, ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, সেই তাওহীদপন্থী মুমিন। কবি মাহমুদ আল ওয়ার্‌রাক খুব সুন্দর বলেছেন, তুমি যদি ছোট একটি ভাল কাজের ছাওয়াব দেখতে পেতে, তাহলে তার বিশালতা দেখে তুমি হতবাক হতে। অথবা যদি ছোট একটি পাপ কাজের সাজা দেখতে পেতে, তাহলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তা পরিত্যাগ করতে।

(৬৭) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه

বান্দাকে যে বিষয় ঈমানে দাখিল করেছে, তা অস্বীকার ব্যতীত সে ঈমান থেকে খারিজ হবে না।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখ এখানে মুতাযিলা ও খারেজীদের প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলে যে, কবীরা গুনাহ্‌য় লিপ্ত হওয়ার কারণে বান্দা ঈমান থেকে বের হয়ে যায়। এখানে শাইখ তার পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। একটু পূর্বে তিনি বলেছেন, আহলে কিবলার কেউ কোন গুনাহ করলেই আমরা তাকে কাফের বলি না, যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে সেই গুনাহ্‌য় লিপ্ত হয়।

---

[৮১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৭৭।

[৮২] কেননা তখন বান্দা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক আমল থেকে বঞ্চিত হয়। তাই অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহর রহমতের আশাটা প্রবল থাকা চাই।

[৮৩] এবং হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা এবং ওয়াজিব, ফরয ও সুন্নাতী আমলের প্রতি তৎপর হওয়া উচিত।

(৬৮) ইমাম ত্বহাবী বলেন,

والإيمان: هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى

জবানের স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের বিশ্বাসের নাম ঈমান। শরী'আতের যত বিষয় রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তার সবই সত্য। ঈমান মাত্র একটি জিনিসের (অন্তরের বিশ্বাসের) নাম। সকল ঈমানদার মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, কু-প্রবৃত্তি দমন এবং উত্তম আমলের মাধ্যমে মুমিনদের মর্যাদার পার্থক্য হয়।

.....

ব্যাখ্যা: ঈমানের সংজ্ঞা নিয়ে আলেমগণ অনেক মতভেদ করেছেন। ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বাল, আওযাঈ, ইসহাক বিন রাহওয়াই, সমস্ত আহলে হাদীছ, মদীনাবাসী, যাহেরী মতবাদের অনুসারী এবং কালাম শাস্ত্রবিদদের একটি জামা'আতের মতে ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস, জবানের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের নাম।

আর আমাদের সাথীদের (হানাফী মাযহাবের) অনেক আলেমের মত সেটিই, যা ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ঈমান শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের বিশ্বাসের নাম। তাদের কেউ কেউ আবার বলেন, মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের অতিরিক্ত একটি রুকন; মূল নয়। এটিই হচ্ছে ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী এর অভিমত। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) হতেও এটি বর্ণনা করা হয়।

কার্‌রামীয়া সম্প্রদায়ের মতে ঈমান শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম। এ অর্থে মুনাফেকরাও তাদের নিকট পূর্ণ ঈমানদার। তবে তারা বলে আমল না করলে তারা অবশ্যই আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবে। এ ব্যাপারে কাররামীয়াদের কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

জাহম বিন সাফওয়ান এবং কাদরীয়াদের অন্যতম নেতা আবুল হাসান সালেহীর মতে ঈমান শুধু অন্তর দিয়ে জানার নাম। এই কথাটি পূর্বোক্ত কাররামীয়াদের কথার চেয়েও অধিক ভ্রান্ত। কারণ এই কথার ফল এই দাঁড়ায় যে, ফেরাআউন ও তার সম্প্রদায়ও পূর্ণ ঈমানদার। কেননা তারাও মূসা ও হারুন আলাইহিস সালাম এর সত্যতা সম্পর্কে অবগত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু ঈমান আনেনি। তাই তো ফেরাআউনকে লক্ষ্য করে মূসা আলাইহিস সালাম যা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তা উল্লেখ করে বলেন,

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾

"তিনি বললেন, তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন! আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ১০২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾

"তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল"? *(সূরা আন-নামল: ১৪)*

আহলে কিতাবরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের সন্তানের মতই চিনতো। কিন্তু তারা তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল না; বরং তারা ছিল কাফের এবং তার শত্রু। জাহম বিন সাফয়ানের নিকট আবু তালেব ছিল মুমিন। কেননা আবু তালেব স্বীকার করেছিল,

ولقد علمت بأنَّ دين محمد ... من خير أديان البرية ديناً

لولا الملامةُ أو حِذارُ مَسَبَّةٍ ... لرأيتني سمحاً بذاك مبيناً

"আমি অবগত আছি যে, মুহাম্মাদের দীন হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ দীন, মানুষের দোষারোপ এবং তিরস্কারের ভয় না থাকলে তুমি দেখতে যে, আমি এই দীন কবুলের সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছি। শুধু তাই নয় জাহমের মতে ইবলীসও পূর্ণ ঈমানদার। কেননা সে তার রব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না। সে তার প্রভু সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

"ইবলীস বললো হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেবো। তাদের মধ্য হতে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত"। *(সূরা আল হিজর: ৩৬-৪০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص: ٨٢]

সে বলল, 'আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব।' সূরা ছ্বদ: ৮২

কুরআনের একাধিক বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, ইবলীসও আল্লাহ সম্পর্কে জানতো।

সুতরাং জাহম বিন সাফওয়ানের মতে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাই কুফুরী। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে জাহম থেকে অধিক অজ্ঞ আর কেউ নেই। কেননা সে সাধারণভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে, কিন্তু তার সমস্ত সিফাতকে বাতিল করে দিয়েছে। জাহমের চেয়ে বড় অজ্ঞ আর কেউ নেই। সে নিজের নফসের উপর সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমেই কাফেরে পরিণত হয়েছে।

ঈমানের সংজ্ঞা সম্পর্কে এই মাযহাবগুলো ছাড়াও আরো অনেক মাযহাব রয়েছে। তাতে অনেক ব্যাখ্যা ও শর্তাদিও রয়েছে। সংক্ষেপ করণার্থেই আমি তা উল্লেখ করিনি। আবুল মাঈন আন নাসাফী তার কিতাব তাবসিরাতুল আদিল্লাহ এবং অন্যান্য কিতাবে এই মাযহাবগুলো উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত সকল মাযহাবের সারাংশ এই যে, ঈমান কি অন্তর, জবান ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের নাম? যেমন তিন মাযহাবের অধিকাংশ সালাফ এবং অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন।[৮৪] আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন। না কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যতীত শুধু অন্তর ও জবানের কাজের নাম হবে? ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এটিই ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং তার অনুসারীদের মাযহাব। না কি শুধু জবানের স্বীকারোক্তির নাম? যেমন বলেছে কাররামীয়া সম্প্রদায়। না কি এটি শুধু অন্তরের কাজের নাম? অন্তরের আমল হলে এটি কি শুধু আল্লাহ সম্পর্কে অন্তর দিয়ে অবগত হওয়ার নাম? না কি অন্তর দিয়ে বিশ্বাসের নাম?

এ বিষয়ে জাহম বিন সাফয়ান ও কাররামীয়াদের কথা ভুল হওয়ার বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। আর ঈমানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামদের মধ্যকার মতভেদ শুধু শাব্দিক।[৮৫] কেননা অন্তরের বিশ্বাসের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল লাযেম অথবা তা ঈমানের অংশ। তবে তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। বরং সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। ঈমানের সংজ্ঞায় ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ আলেমদের মধ্যকার মতভেদ শুধু বাহ্যিক। এতে আক্বীদাহ নষ্ট হবে না।

আর কবীরা গুনাহকারীদের মধ্য হতে যারা ছ্বলাত পরিত্যাগকারীকে কাফের বলেছেন, তারা অন্য আরো দলীল যুক্ত করেছেন। আর যেখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেনাকারী, চোর, মদ্যপায়ী এবং ছিনতাইকারীর ঈমান থাকে না বলেছেন, তার অর্থ এই নয় যে, তাদের ঈমান সম্পূর্ণ চলে যায়। এ কথার উপর তারা একমত হয়েছেন। আহলে

[৮৪] এটিই সঠিক মাযহাব।

[৮৫] মূলত এ ক্ষেত্রে মতভেদ শুধু শাব্দিক নয়। এটি বড় ধরণের খেলাফ।

সুন্নাতের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছে দু'টি জিনিস চেয়েছেন। কাওল ও আমল (কথা ও কাজ)। কাওল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তি। যখন বলা হয় ঈমান হচ্ছে কাওল ও আমলের নাম, তখন তা দ্বারা উদ্দেশ্য এটিই। তবে বান্দাদের কাছে আল্লাহর এই চাওয়া তথা কাওল ও আমলকেই কি ঈমান বলা হয়? না কি কাওল ও আমল- এ দু'টি হতে একটির নাম ঈমান? আর সেটি হচ্ছে শুধু কথা। আর আমল হলো একটি ভিন্ন বিষয়, যাকে ঈমান তার নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে না। বিশেষ করে যখন ঈমানকে এককভাবে উল্লেখ করা হয়। আর যখন কাওল ও আমল উভয়কেই ঈমান বলা হবে, তখন কি ঈমান রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে? এ প্রশ্নটিই হচ্ছে খেলাফের কেন্দ্রবিন্দু।[৮৬]

আহলে সুন্নাতের সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, বান্দা যদি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল না করে, তাহলে সে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নাফরমানীকারী হিসাবে গণ্য হবে এবং সে শাস্তির হকদার। তবে যারা বলে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের কেউ বলে থাকে ঈমান যেহেতু একটি জিনিসেরই নাম, তাই আমার ঈমান আবু বকর সিদ্দীক ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) দের ঈমানের মতই! শুধু তাই নয়; আরো বলে আমার ঈমান নাবী-রাসূলদের ঈমানের মতই এবং জিবরীল ও মীকাঈল আলাইহিস সালাম এর মতই! তার এ কথার মধ্যে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন রয়েছে।

কেননা ঈমানের সাথে কুফর দৃষ্টিশক্তির সাথে অন্ধত্ব থাকার মতোই। কোনো সন্দেহ নেই যে, যাদের চক্ষু আছে, তাদের সকলের দৃষ্টি এক রকম নয়। কারো দৃষ্টি শক্তি খুবই প্রখর আবার কারো চোখের দৃষ্টি দুর্বল। তাদের কেউ শুধু রাতে চোখে দেখে আবার কেউ রাতকানা। কেউ শুধু মোটা মোটা লেখা পড়তে পারে, কিন্তু চশমা ছাড়া ছোট ও চিকন লেখা পড়তে পারে না। কেউ খুব কাছে থেকে কোন জিনিস চিনতে পারে আবার অন্যজন তার বিপরীত।

এ জন্যই ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মুমিনগণ মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সমান। অর্থাৎ সকল মুমিনের মূল ঈমান একই পর্যায়ে।[৮৭] এর মাধ্যমে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) ইঙ্গিত করেছেন যে, মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সকলেই সমান। তবে তার কথা থেকে এটি আবশ্যক হয় না যে, সকল দিক থেকেই সকল মুমিনের ঈমান এক স্তরে। বরং মুমিনদের ঈমান অনুপাতে তাদের অন্তরে কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর নূরের যে কত স্তরভেদ রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। মানুষের মধ্যে এমন লোক

---

[৮৬] আহলে সুন্নাতের মতে ঈমান ও আমল একই। আমল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত। একই বিষয়ের দু'টি নাম।

[৮৭] সম্ভবত শাইখ এ কথার মাধ্যমে হানাফী মাযহাবকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামদের নিকট সকল মুমিনের মূল ঈমান এক সমান নয়। তাদের ঈমানের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। উম্মতের সাধারণ একজন মুমিনের ঈমান আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঈমানের মত নয়; বরং উম্মতের বিভিন্ন মুমিনের ঈমান বিভিন্ন রকম, একই রকম নয়।

রয়েছে, যার অন্তরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর নূর সূর্যের মত আলোকময়, উজ্জ্বল। কারো নূর আকাশের উজ্জ্বল তারকার ন্যায়, কারো নূর বিশাল মশালের ন্যায়, কারো নূর উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় আবার কারো নূর দুর্বল প্রদীপের ন্যায়। এই পরিমাণেই কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে ও ডান পাশে অন্তরের ঈমান ও তাওহীদের ইলম ও আমল অনুপাতে তাদের নূরসমূহ চমকাতে থাকবে। এই কালেমার নূর যত মজবুত ও বড় হবে, বান্দার অন্তর থেকে ঠিক সেই পরিমাণ শুবুহাত ও শাহওয়াতকে জ্বালিয়ে দিবে। কখনো সেই নূরের অবস্থা এমন হতে পারে যে, বান্দার অন্তরে কুপ্রবিত্ত, দীনের কোন বিষয়ে সন্দেহ কিংবা কোন পাপ কাজের ইচ্ছা জাগ্রত হলেই তাকে সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। তাওহীদে যে বান্দা সত্যবাদী, তার অবস্থা ঠিক এ রকমই হয়ে থাকে। সুতরাং তার আকাশসম বিশাল ঈমানের পরিধিকে এমন অগ্নিপিন্ডসমূহ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা তার ঈমানের কোনো অংশকে চুরি করে নিতে আগত প্রত্যেক চোরকেই নিক্ষেপ করে বিতারিত করে। এ কথা যে বুঝতে সক্ষম হয়েছে, সে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ হাদীছ উপলব্ধি করতে পেরেছে, যেখানে তিনি বলেছেন,

«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

"আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন"।[৮৮] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[৮৯]

এ রকমের আরো যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, অনেক মানুষই তা বুঝতে পারে না। এমনকি অনেকেই মনে করেছে এই হাদীছগুলো রহিত হয়ে গেছে। আবার অনেকেই মনে করেছে, এগুলো শরী'আতের আদেশ-নিষেধ আসার আগের হাদীছ। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে, তারা আগুনে প্রবেশ করলেও কাফের-মুশরিকদের জন্য তৈরীকৃত আগুনে প্রবেশ করবে না। আবার কেউ বলেছেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারীগণ আগুনে প্রবেশ করলেও সেখানে চিরকাল থাকার জন্য প্রবেশ করবে না। অনুরূপ আরো অনেক ব্যাখ্যাই করা হয়েছে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু জবান দিয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করাকেই আগুন থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট বলে নির্ধারণ করেননি। এটি দীন ইসলামের একটি জানা কথা। কেননা মুনাফেকরা তাদের জবান দিয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে। তারপরও তারা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে এবং কাফেরদের নিচে অবস্থান করবে। বান্দার আমলসমূহ

[৮৮] মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ বুখারী, হা/৪২৫, মুসলিম হা/৩৩।

[৮৯] মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ বুখারী, হা/১২৮, মুসলিম হা/৩২।

বাহ্যিক আকৃতি ও সংখ্যা অনুপাতেই বড় ও বিশাল হয় না; বরং অন্তরের ঈমান ও ইখলাসের বিশালতা অনুপাতেই আমল বড় ও বিশাল হয়।[৯০]

হে পাঠক! যেই হাদীছে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের এক পাল্লায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ লিখিত একটি কার্ড রাখা হবে, তা নিয়ে চিন্তা করুন। সেখানে বলা হয়েছে, এক পাল্লায় রাখা হবে সেই কার্ডটি। অপর পাল্লায় রাখা হবে নিরানব্বইটি বিশাল বই। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, তত বিশাল হবে একেকটি বই। ওজনের সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহএর পাল্লা ভারী হবে এবং বিশাল বিশাল বই-এর পাল্লা হালকা হবে। অতএব, কার্ড ওয়ালাকে আযাব দেয়া হবে না।[৯১]

এটি জানা কথা যে, প্রত্যেক তাওহীদ পন্থীই অনুরূপ কার্ড পাবে। তাদের অনেকেই আবার আগুনেও প্রবেশ করবে। আপনি আরো চিন্তা করুন! দেখুন যেই লোক একশটি মানুষ হত্যা করেছিল, তার অন্তরে ঈমানের কত বড় হাকীকত বিদ্যমান ছিল। মৃত্যুর টান এসে গেছে। অথচ মৃত্যুর টান তাকে ভাল লোকদের গ্রামের দিকে চলা হতে থামিয়ে দেয়নি। ঈমানের তেজ ও গতি তাকে এই কঠিন সময়েও সামনের দিকে অগ্রসর করলো। মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণা করা অবস্থায় বুক টানা দিয়ে সে সামনে অগ্রসর হলো!!

আপনি আরো চিন্তা করুন! যেনাকারী মহিলাটির অন্তরে কেমন ঈমান ছিল! সে পায়ের মোজা খুলে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরকে পান করালো। এতে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

মানুষের আকল তথা বিবেক-বুদ্ধির বিষয়টিও অনুরূপ। বিভিন্ন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অথচ সকল জ্ঞানী মূল জ্ঞানে সমান।[৯২] সকল জ্ঞানীই এ বিষয়ে সমান যে তারা জ্ঞানী; পাগল নয়। তবে তাদের কেউ অন্য কারো চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। ওয়াজিব ও হারামের বিষয়টিও অনুরূপ। কোন ওয়াজিব অন্য ওয়াজিবের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়। আবার কোন হারাম অন্য হারামের চেয়ে হালকা হয়। এটিই সঠিক কথা। যদিও কেউ কেউ আকল ও ওয়াজিবের তারতম্য হওয়ার কথা বলেছেন; হারামের ক্ষেত্রে নয়।

---

[৯০] এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূল ঈমানেও তারতম্য রয়েছে।

[৯১] হাদীছটি ছ্বহীহ। দেখুন সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/১৩৫।

[৯২] এই কিয়াসটি সঠিক নয়। বিভিন্ন মানুষের মূল জ্ঞানও বিভিন্ন রকম হয়। যেমনটি হয়ে থাকে ঈমানের ক্ষেত্রে। ঈমানের পরিচয় ও বিশ্লেষণে আল্লামা ইবনে আবুল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) এর দীর্ঘ বক্তব্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় তিনি ইমাম তাহাবীর কথাকেই সাহায্য ও সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু যেভাবে তিনি আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ আলেমের মতের পক্ষের দলীলগুলো পেশ করেছেন, তাতে বুঝায় যে, তিনি উভয় মাযহাবকে কাছাকাছি করার পাশাপাশি অধিকাংশ আলেমদের কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তা সুস্পষ্ট করে বলেননি। সম্ভবতঃ তিনি এ ক্ষেত্রে বিশেষ হিকমত অবলম্বন করেছেন। (আল্লাহই অধিক জানেন)

ঈমানের বিষয়গুলোর প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিশ্বাসের দিকে থেকে ঈমান বৃদ্ধির বিষয়ে একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হওয়ার পর যা ওয়াজিব হয়েছে কুরআন নাযিলের শুরুর দিকে এবং ইসলামের প্রথম যুগে তার সবগুলো ওয়াজিব ছিল না। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের যেই বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তার সবগুলো বিশ্বাস করা ঐ ব্যক্তির উপর আবশ্যক নয়, যার নিকট শুধু রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করার খবর পৌঁছেছে। যেমন নাজ্জাশী এবং তার অনুরূপ ব্যক্তিদের উপর ঈমানের সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক ছিল না। আর অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের দাবী অনুযায়ী যেই ঈমান বৃদ্ধি পায়, তা ঐ বিশ্বাসের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ, যা আমল আবশ্যক করে না। এ রকমই যেই আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে, তার ইলম ঐ আলেমের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ, যে তার ইলম অনুযায়ী আমল করেনা। সুতরাং লাযেম অর্জিত না হওয়াই মাযলুমের দুর্বলতার প্রমাণ। অর্থাৎ আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল না করাই প্রমাণ করে যে, তার ইলম ও ঈমান দুর্বল।

এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ليس المخبر كالمعاين অর্থাৎ দূর থেকে কোনো ঘটনা সম্পর্কে শ্রবণকারী কাছে থেকে তা দর্শকের মত নয়। অর্থাৎ কারো কাছে কোন ঘটনা যত পরিষ্কার করেই বর্ণনা করা হোক, সেই ঘটনা সম্পর্কে তার জ্ঞান ঐ ব্যক্তির মত মজবুত ও পরিপক্ক হবে না, যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে ঘটনা দেখেছে। মূসা আলাইহিস সালাম কে যখন আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা বাছুর পূজা শুরু করেছে, তখনই তিনি তাওরাত কিতাব ফেলে দেননি; বরং তিনি যখন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন যে, আসলেই তারা বাছুর পূজা শুরু করেছে, তখনই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সংবাদে সন্দেহ করে প্রথমেই তাওরাত নিক্ষেপ করেননি- এমনটি নয়; বরং সংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি যদিও সংবাদকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কিন্তু সে শ্রুত খবরকে সেভাবে মূল্যায়ন করে না, যেভাবে মূল্যায়ন করে থাকে তা স্বচক্ষে দেখার পর। যেমন ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালাম বলেছেন,

﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনা? ইবরাহীম বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্য চাচ্ছি, যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরো। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলো (যবেহ করে) দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর ছিটিয়ে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার

নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৬০)*

উদাহরণ স্বরূপ আরো বলা যায়, যার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয হয়েছে, তার জন্য এটি বিশ্বাস করা জরুরী যে তাকে অবশ্যই হজ্জ ও যাকাতের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সে আরো বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর এমন কিছু বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ও তা জানা আবশ্যক করেছেন, যা অন্যদের উপর করেননি। তবে অন্যদের উপর সংক্ষিপ্ত ঈমান আনয়ন আবশ্যক করেছেন। কিন্তু তার উপর এ বিষয়ে ঈমানে মুফাস্সাল তথা বিস্তারিত ঈমান আনয়ন ওয়াজিব করেছেন।

যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে, তার প্রাথমিক অবস্থাও অনুরূপ। তার উপর শুধু সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি আবশ্যক। অতঃপর যখন ছ্বলাতের সময় হবে, তখন তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, ছ্বলাত আবশ্যক হওয়ার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তা সম্পাদন করবে। সুতরাং মানুষকে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়নের হুকুম করা হয়েছে, তাতে তারা বরাবর ও সমান নয়। যার অন্তরে এমন সুদৃঢ় ঈমান রয়েছে, যাতে কোন প্রকার সন্দেহ প্রবেশ করতে পারে না এবং কুপ্রবৃত্তি যার মুকাবেলায় টিকে থাকতে পারে না, তার দ্বারা কখনই পাপ কাজ সংঘটিত হবে না। বান্দার অন্তরে যদি শাহওয়াত ও শুবহাত কিংবা উভয়টির কোন একটি না থাকতো, তাহলে সে কখনই গুনাহ এ লিপ্ত হতো না; বরং যে সময় সে পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তর তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে করে তা থেকে পাপ কাজ হারাম হওয়ার সত্যায়ন লোপ পায়। ফলে সে পাপে লিপ্ত হয়। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেনাকারী যেনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। সুতরাং সে যখন যেনা করে, তখন তার অন্তরে মূল ঈমান অবশিষ্ট থাকলেও[৯৩] যেনা হারাম হওয়ার বিশ্বাস তার অন্তর থেকে উঠে যায়। অতঃপর যেনা করার পর সে যেনা হারাম হওয়ার বিশ্বাস ফিরে পায়।[৯৪] সুতরাং মুত্তাকীরা ঠিক ঐ রকমই, যেমন আল্লাহ তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

"যারা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয়, তখনই সতর্ক হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়"। *(সূরা আল-আরাফ: ২০১)*

---

[৯৩] মূল ঈমান টিকে থাকলেও তা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় থাকে।

[৯৪] সুতরাং যে মুমিন যেনা করে আর যে তা করে না, তাদের উভয়ের ঈমান এক সমান নয়। যেই মুমিনের ঈমান মুমিনকে যেনা থেকে বিরত রাখে তার ঈমান খুব মজবুত। আর যার ঈমান তাকে যেনা থেকে বিরত রাখে না, তার ঈমান খুবই দুর্বল। পাপ কাজ করা অবস্থায় মূল ঈমান বিদ্যমান থাকলেও তা খুব দুর্বল অবস্থায় থাকে। সুতরাং সর্বদা যে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, আর যে কখনো কখনো বা অধিকাংশ সময় তাতে লিপ্ত হয়, তাদের সকলের ঈমান এক সমান নয়।

ইমাম লাইছ মুজাহিদের সূত্রে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ঐ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যার অন্তরে পাপ কাজের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। কিন্তু সাথে সাথেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং পাপ কাজ বর্জন করে। কুপ্রবৃত্তি এবং রাগ সকল অন্যায়ের মূল। আর পাপ কাজের চিন্তা করার সময় যখন শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, তখনই বান্দা পাপ কাজের চিন্তা থেকে ফিরে আসে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এর পরের আয়াতে বলেন,

﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾

"পক্ষান্তরে শয়তানের ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না"। *(সূরা আল-আরাফ: ২০২)*

অর্থাৎ শয়তানের ভাইদেরকে শয়তান ও তার চেলারা গোমরাহীর দিকে সর্বদা টানতেই থাকে। এতে তারা কোন প্রকার ত্রুটি করে না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, মানুষ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে না এবং শয়তানরাও তাদেরকে বিপদগামী করতেই থাকে। এ সময় যদি মানুষ সচেতন না হয়, তাহলে অন্তর অন্ধকারের মধ্যে থেকে যায়। শয়তান তাকে গোমরাহীর মধ্যে আরো বেশী করে টানতে থাকে। যদিও তার অন্তরের বিশ্বাস একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অর্থাৎ ঈমানের আলো ও দৃষ্টি এবং ভয়-ভীতি তার অন্তর থেকে বের হয়ে যায়নি। এটি হচ্ছে ঠিক ঐ রকমই যেমন কোন মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে, ফলে সে কিছুই দেখতে পায়না। যদিও সে অন্ধ নয়। অন্তরের বিষয়টি এ রকমই। গুনাহ-এর মরিচিকা অন্তরকে ঢেকে রাখে। ফলে সে চোখ থাকতেও সত্যকে দেখতে পায় না। কাফেরের অন্ধত্ব ঠিক এ রকমই।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফু সূত্রে এই অর্থটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "إذا زنا العبد نزع منه الإيمان، فإذا تاب أعيد إليه" বান্দা যখন যেনা করে, তখন তার থেকে ঈমান উঠিয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর যখন সে তাওবা করে, তখন তার নিকট ঈমান ফিরিয়ে দেয়া হয়।[৯৫]

ঈমানের মাসআলায় যেহেতু আহলে সুন্নাতের লোকদের মধ্যে খেলাফ শুধু বাহ্যিক, তাই এই খেলাফে কোন অসুবিধা নেই। তবে অসুবিধা হচ্ছে, দু'দলের একদল শুধু অপর দলের উপর অন্যায় আক্রমণ করে এবং এর কারণে দলাদলি তৈরী হয়। শুধু তাই নয় এই মতভেদ মুরজিআ এবং তাদের অনুরূপ তর্কবিদদের নিকৃষ্ট বিদআতের কারণ হতে পারে।[৯৬] পরিণামে পাপাচার ও অশ্লীলতা প্রকাশ হতে পারে এবং কেউ এ কথা বলার

---

[৯৫] ইমাম আবু দাউদ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাকেম ও যাহাবী ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/৫০৯।

[৯৬] এতে ইমাম ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) ইঙ্গিত করেছেন যে, যারা বলে ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম এবং আমল ঈমানের মধ্যে শামিল নয়, তাদের এই মতভেদ কালাম শাস্ত্রের মুরজিআদের বিদআতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তারা বলে থাকে ঈমানের সাথে পাপ কাজ কোন ক্ষতি করে না। مرجئة

সাহস দেখাতে পারে যে, আমি পরিপূর্ণ মুমিন ও মুসলিম এবং আল্লাহর অলীদের একজন। এই কথা বলার পর সে যে কোন পাপকাজ করতে কোন প্রকার পরওয়া করবে না। এ জন্যই মুরজিআরা বলেছে, ঈমান আনার পর যে ব্যক্তি গুনাহ করে, তার গুনাহ ঈমানের কোন ক্ষতি করে না। এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল।

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) ভাষাগত দিক থেকে ঈমানের হাকীকতের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত থেকে অনেক দলীলের প্রতিও খেয়াল করেছেন। আর অন্য ইমামগণ শরী'আতের পরিভাষায় ঈমানের হাকীকতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের সাথে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ও শর্ত যোগ করেছেন।[৯৭]

যেমন ছ্বলাত, ছ্বিয়াম, হজ্জ এবং অন্যান্য ইবাদতের একাধিক শর্ত ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[৯৮]

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর অনুসারীগণ বলেন, আরবী ভাষায় শুধু অন্তরের تصديق তথা সত্যায়নের নাম হচ্ছে ঈমান। তাদের দলীল হচ্ছে,

(১) আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর ভাইদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন,

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾

(মুরজিআ) শব্দটি الإرجاء থেকে গঠন করা হয়েছে। 'ইরজা' অর্থ পিছিয়ে দেয়া। অর্থাৎ মুরজিআরা যেহেতু ঈমান থেকে আমলকে পিছিয়ে দেয় অর্থাৎ আমলের কোন প্রয়োজন মনে করে না, তাই তাদেরকে মুরজিআ বলা হয়। মুরজিআ মূলত দুই প্রকার। (১) মুরজিআতুল ফুকাহা ও (২) মুরজিআতুল জাহমীয়া। প্রথম শ্রেনীর মুরজিআগণ আমলে বিশ্বাসী এবং তারা আমলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু কালাম শাস্ত্রের মুরজিআরা বলে শুধু ঈমান থাকলে চলবে। ঈমানের সাথে পাপ কাজ কোন ক্ষতি করতে পারে না। শাইখ ইবনে আবীল ইয আশশ্কা ব্যক্ত করেছেন যে, মুরজিআতুল ফুকাহাগণ যদি গোঁড়ামি করেন এবং তারা যদি জোর দিয়ে এটিই সাব্যস্ত করেন যে, সকল মুমিনের ঈমান তথা পাপী ও সৎকর্মশীলদের ঈমান একই সমান, ঈমান আমলের অন্তর্ভুক্ত নন, তাহলে তাদের এই খেলাফ দ্বিতীয় শ্রেণীর মুরজিআদের বিদআতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। (আল্লাহই অধিক জানেন)

[৯৭] এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম ইবনে আবীল ইয্ ঈমানের মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্য ইমামদের মধ্যকার খেলাফকে হালকা করতে চেয়েছেন এবং উভয় মাযহাবের লোকদেরকে কাছাকাছি রাখতে চাচ্ছেন।

[৯৮] বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। ভাষাগত দিক থেকে শুধু বিশ্বাসের নাম হলেও শরী'আতের পরিভাষায় কেবল বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়। ছ্বলাতের একটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। শরী'আতের পরিভাষায় ছ্বলাতের রয়েছে আরেকটি অর্থ। এমনি ছ্বিয়ামেরও ভাষাগত ও শরী'আতের পরিভাষায় ভিন্ন দু'টি অর্থ রয়েছে। ঈমানে ক্ষেত্রেও তাই। এ সব বিষয়ে শরী'আতের পরিভাষাটিই মূল ধর্তব্য বিষয়। ভাষাগত দিক থেকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম হলেও শরী'আতের পরিভাষায় তার সাথে আরো অনেক বিষয় যুক্ত হবে। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের আভিধানিক অর্থের সাথে আরো অনেক বিষয় যুক্ত করেছেন। এখানে এই পারিভাষিক অর্থটিই প্রাধান্য পাবে।

"আমরা সত্যবাদী হলেও আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না"। *(সূরা ইউসুফ: ১৭)* এখানে مؤمن শব্দটি مصدق (সত্যায়নকারী) অর্থেই এসেছে। ভাষাগত দিক থেকে ঈমান শুধু সত্যায়ন অর্থেই ব্যবহৃত হয়- এই কথার উপর কেউ কেউ ভাষাবিদদের ইজমা বর্ণনা করেছেন। ঈমানের ভাষাগত অর্থ হচ্ছে অন্তর দিয়ে শুধু সত্যায়ন করা। আল্লাহর হক হিসাবে বান্দার উপর এটিই ওয়াজিব। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তা সে সত্যায়ন করবে। সুতরাং রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তা যে সত্যায়ন করেছে, আল্লাহ তা'আলা ও তার মধ্যকার হকসমূহের প্রতি বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে। জবান দিয়ে সেগুলো উচ্চারণ করা দুনিয়াতে তার উপর ইসলামের হুকুম জারি করার জন্য শর্ত স্বরূপ। ঈমানের সংজ্ঞা বর্ণনায় দু'টি মতের এটি একটি মত। যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

ঈমান শুধু অন্তরের সত্যায়নের নাম- এটি এ জন্য যে, তা কুফুরীর বিপরীত। আর কুফর অর্থ অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা। এ দু'টি অন্তর দিয়ে হয়। এ রকমই এ দু'টির বিপরীত বিষয়ও (ঈমানও) অন্তর দিয়েই হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফুরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি"। *(সূরা আন নাহল: ১০৬)* এতে বুঝা যাচ্ছে ঈমানের স্থান হচ্ছে অন্তর, জবান নয়। তা যদি জবানের কথা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাহলে তার এক অংশ চলে গেলে পুরোটাই চলে যাবে।[৯৯] আরেকটি কথা এই যে, আমলকে ঈমানের উপর আত্ফ করা হয়েছে। আর আতফের মাধ্যমে দু'টি শব্দকে একসাথে যুক্ত করা হলে শব্দ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, ছ্বলাত প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে, তাদের জন্যে পুরস্কার। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৭৭)* এ রকম অনেক আয়াত কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে।

---

[৯৯] এটি আবশ্যক নয়। ঈমানের এক অংশ চলে গেলেই যে সম্পূর্ণ ঈমান চলে যাবে, শরী'আতের দলীল দ্বারা এ কথা সমর্থিত নয়। বরং দলীল তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ হানাফীদের দলীলের উপর আপত্তি করে বলেন যে, ভাষাগত দিক থেকেও ঈমান শুধু সত্যায়নের নাম নয়। কারণ تصديق (সত্যায়ন) এবং إيمان (বিশ্বাস) এই শব্দ দু'টি সমার্থ বোধক শব্দ নয়। ভাষাগত দিক থেকে কোন স্থানে এটি সমার্থবোধক হলেই সকল স্থানে শব্দ দু'টি সমার্থ বোধক হওয়া আবশ্যক নয়।

এমনি যারা দাবী করে ইসলাম ও ঈমান শব্দটি সমার্থবোধক, তাদের কথার উপর আপত্তি রয়েছে। ঈমান ও তাসদীক এই দু'টি শব্দ ভাষাগত দিক থেকে সমার্থবোধক নয়। তার প্রমাণ এই যে, যাকে খবর দেয়া হয়, সে যখন প্রদত্ত খবরকে সত্যায়ন করে, তখন বলা হয় صدقه। এটি বলা হয় না যে, آمنه। এমনি এটিও বলা হয় না যে, آمن به। বরং বলা হয়, آمن له। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"অতঃপর ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লুত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা আল আনকাবুত: ২৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾

"অতঃপর ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশঙ্কায় মূসার প্রতি তার কওমের কতিপয় বালক ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলো না। প্রকৃত ব্যাপার হলো ফেরাউন ছিল ভূপৃষ্ঠে অহংকারকারী এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত"। (সূরা ইউনুস: ৮৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ "তিনি আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখেন এবং ঈমানদারদেরকেও বিশ্বাস করেন"। (সূরা তাওবা: ৬১) এই আয়াতগুলোতে ঈমানকে با এবং لام হরফে জার দ্বারা মুতাআদ্দী করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। مخبر به অর্থাৎ যে বিষয়ের সংবাদ দেয়া হয়, তা বুঝানোর জন্য إيمان শব্দটিকে 'বা' দ্বারা মুতাআদ্দী করা হয়। আর সংবাদ দাতার জন্য ব্যবহৃত হলে মুতাআদ্দী করা হয় لام দ্বারা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,وما أنت بمصدق لنا। এখানে لام হরফে জার ছাড়া বলা হলে অর্থাৎ مصدقنا বলা হলেও জায়েয হত। কেননা এখানে আমেলকে শক্তিশালী করার জন্য লাম প্রবেশ করেছে। এমনি আমেলের পূর্বে যখন মামুল উল্লেখ করা হয় কিংবা আমেল যখন ইসমে ফায়েল

কিংবা মাসদার হয়, তখনো আমেল দুর্বল হওয়ার কারণে শক্তিশালী করার জন্য আমেলের সাথে লাম যুক্ত করা হয়। যেমন নাহু শাস্ত্রে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

সার কথা এই যে, খবর দাতার খবরকে সত্যায়ন করার সময় آمنته এবং صدقت له বলা জায়েয নেই। তবে آمنت له বলা জায়েয হবে। এমনি **أقررت له** (আমি তাকে সত্য বলে স্বীকার করলাম) বলাও জায়েয আছে। তাই **آمنت له** এর তাফসীর **أقررت له** এর দ্বারা করা হলে **صدقت** দ্বারা করার চেয়ে মূল অর্থের অধিক নিকটবর্তী হবে। তারপরও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থেকেই যাবে। কেননা উভয়ের অর্থের মধ্যে পার্থক্য সুসাব্যস্ত। কেননা প্রত্যেক চোখের দেখা খবর অথবা গায়েব (অদৃশ্য) বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দাতাকে সত্যায়ন করার সময় বলা হয় صدقت (আপনি সত্য বলেছেন)। আর তাকে মিথ্যা হিসাবে সাব্যস্ত করার সময় বলা হয় كذبت (আপনি মিথ্যা বলেছেন)। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে, السماء فوقنا (আকাশ আমাদের উপরে), তাকে বলা হবে, صدقت (আপনি ঠিকই বলেছেন)। কিন্তু ঈমান শব্দটিকে শুধু গায়েবী বিষয়কে সত্য বলে স্বীকার করার সময়ই ব্যবহার করা হয়। তাই যে ব্যক্তি বলবে طلعت الشمس (সূর্য উদীত হয়েছে), আমরা বলবো, صدقناه (আমরা তার কথা সত্যায়ন করলাম। এটি বলবো না যে, آمنا له। কেননা ঈমানের মূলে রয়েছে أمن (বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী) এর অর্থ। আর গায়েব সম্পর্কে খবর দেয়ার ক্ষেত্রেই কেবল আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার বিষয়টি লক্ষ্যণীয় হয়। সুতরাং গায়েবের বিষয়ের খবর দাতাকেই বিশ্বস্ত মনে করা হয়। তাই কুরআন বা অন্যান্য আসমানী কিতাবে গায়েবের খবর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে آمن له ব্যতীত অন্য কোন শব্দ আসেনি। সেই সাথে কোথাও কখনো إيمان শব্দের বিপরীতে تكذيب (মিথ্যারোপ) শব্দটি আসেনি। যেমন تكذيب শব্দটি تصديق এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমানের বিপরীতে কেবল কুফরই ব্যবহৃত হয়। আর কুফর শুধু মিথ্যারোপ করার সাথেই খাস নয়। বরং কেউ যদি বলে, আমি জানি তুমি সত্যবাদী, কিন্তু আমি তোমার অনুসরণ করবো না; বরং তোমাকে শত্রু মনে করি, তোমাকে ঘৃণা করি এবং আমি তোমার ঘোর বিরোধী, তাহলে এটি হবে বিরাট কুফুরী। সুতরাং জানা গেল, ঈমান শুধু তাসদীকের নাম নয় এবং কুফুরীও শুধু তাকযীব তথা মিথ্যারোপ করার মধ্যেই সীমিত নয়। তাই কুফর যেহেতু কখনো মিথ্যারোপ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখনো আবার শরী'আত বিরোধী কাজ করা অর্থে আবার কখনো মিথ্যারোপ ছাড়াই মুমিনদের বিরুদ্ধে দুশমনী করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ঈমানও অনুরূপ। কখনো তা সত্যায়ন অর্থে, শরী'আতের বিধান মেনে নেওয়া অর্থে, কখনো মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা অর্থে এবং

কখনো শরী'আতের বিধানের সামনে অবনত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। শুধু সত্যায়ন যথেষ্ট নয়। সুতরাং যে সমস্ত বিষয়ের নাম ঈমান ইসলামও তার অংশ।[১০০]

আর যদি মেনেও নেওয়া হয়, إيمان ও تصديق পরস্পর সমার্থবোধক, তথাপিও তাসদীক কখনো আমলের মাধ্যমেও হয়। যেমন ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«الْعَيْنَانِ تزنيان زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُن تزني زِنَاهُا السمع وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَالفرْج يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

"দুই চোখ যেনা করে। চোখের যেনা হচ্ছে তাকিয়ে দেখা। কান যেনা করে। কানের যেনা হচ্ছে শ্রবণ করা। জবান যেনা করে। জবানের যেনা হচ্ছে কথা বলা। হাতের যেনা হচ্ছে স্পর্শ করা। পায়ের যেনা হচ্ছে যেনার উদ্দেশ্যে পথ চলা। অন্তর ইচ্ছা ও কামনা করে। অঙ্গ তা বাস্তবে পরিণত করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে।[১০১]

হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ঈমান শুধু বাহ্যিক আচরণ ও আশা-আকাঙ্খার নাম নয়; বরং ঈমান হচ্ছে অন্তরের এমন মজবুত ও দৃঢ় বিশ্বাস, আমল যাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে। আর ঈমান শুধু তাসদীকের নাম হলেও তা এক বিশেষ সত্যায়ন। যেমন ছ্বলাতের ব্যাপারে বলা হয়। আভিধানিক দিক থেকে তা দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হলেও তা দ্বারা এক বিশেষ দু'আ উদ্দেশ্য, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। এমনি ঈমান আভিধানিক দিক থেকে তাসদীক (সত্যায়ন) অর্থে ব্যবহৃত হলেও তার দ্বারা অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সত্যায়ন উদ্দেশ্য। অন্যান্য শরঈ আলফায তথা শরী'আতের পরিভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা। যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এতে শব্দের আসল অর্থ পরিহার করে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয় না এবং পরিবর্তনও করা হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুধু সাধারণভাবে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করার আদেশ দেন নি; বরং এমন এক বিশেষ ঈমান আনয়ন করতে বলেছেন, যার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যেই সত্যায়নকে ঈমান বলা হয়েছে, তার সর্বনিম্ন অবস্থা হচ্ছে তা সাধারণ তাসদীকের একটি প্রকার মাত্র। তাসদীক ঈমানের আম ও খাস বিষয়ের অনুরূপ নয়। সুতরাং জবানের উচ্চারণ এবং অন্তরের আমল ছাড়া ঈমান হয় না।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ভাষায় সাধারণ ও বিশেষ কর্মের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ একটি জিনিসকে ঈমান বলা হয়েছে। যেমন মানুষের পরিচয় হচ্ছে সে বাক শক্তি সম্পন্ন একটি প্রাণী। অন্তরের পূর্ণ সত্যায়ন অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমল আবশ্যক করে।

---

[১০০] এতে শাইখ ইঙ্গিত করেছেন যে, ঈমান শুধু অন্তরের তাসদীকের নাম নয়।

[১০১] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৭। তবে মুসলিমের শব্দগুলো হুবহু এ রকম নয়। এখানে আমলকেও তাসদীক বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল শুধু ঈমানকেই তাসদীক বলা হয় না। বুখারী হা/৬২৪৩।

কেননা পূর্ণ ঈমানের দাবী হচ্ছে ঈমানকে আমলে রূপদান করা। আর আমল না থাকাই ঈমান না থাকার প্রমাণ।

আমরা বলি, ঈমান কখনো আমলের অন্তর্ভুক্ত হয় আবার কখনো তার অন্তর্ভুক্ত হয় না। এও বলা যেতে পারে যে, ঈমান আভিধানিক অর্থেই বহাল রয়েছে, কিন্তু শরী'আতের প্রবর্তক তাতে আরো কিছু আহকাম ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অথবা তিনি ঈমানকে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ রূপক অর্থই শরী'আতের পরিভাষায় ঈমানের আসল অর্থ। যদিও তা ভাষাগত দিক থেকে রূপক। অথবা এইও হতে পারে যে, শরী'আত প্রবর্তক ঈমানকে তার প্রকৃত অর্থ থেকে স্থানান্তর করেছেন।

যারা ঈমানের পথে চলেছেন, ঈমান সম্পর্কে তাদের কতিপয় উক্তি:

তারা বলেছেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ঈমানের পরিচয় জানিয়েছেন। ঈমানের মূল উদ্দেশ্য কী, তা আমাদেরকে খুব ভালভাবেই বুঝিয়েছেন। তা এই যে, কোন লোক যদি তাওহীদ ও রেসালাতের সত্যায়ন করে, কিন্তু জবান দ্বারা উচ্চারণ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দিয়ে ঈমানের স্বীকৃতি না দেয়, ছ্বলাত কায়েম না করে, ছ্বিয়াম পালন না করে, আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালো না বাসে, আল্লাহকে ভয় না করে; বরং রাসূলের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, তার প্রতি দুশমনী করে এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে মুমিন নয়। আমরা জেনেছি যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইখলাসের সাথে তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্যদান করা এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল কারীর জন্যই কল্যাণ ও সাফল্য লাভের ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

«الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَعلاهَا قول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدناهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ»

"ঈমানের সত্তর অথবা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সবচেয়ে ছোট শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। লজ্জাবোধ ঈমানের অন্যতম একটি শাখা"।[১০২]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "মুমিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির ঈমান পূর্ণতম, যার চরিত্র সর্বোত্তম"।[১০৩] তিনি আরো বলেন, "বিনয়ী হওয়া ঈমানের অন্তর্ভুক্ত"।[১০৪]

---

[১০২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৯ ও মুসলিম হা/৩৫। তবে হাদীছের শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

[১০৩] ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৬৮২, ইবনে হিব্বান, হাকেম এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বর্ণনা করেছেন।

[১০৪] ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪১৬১, সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/৩৪১।

সুতরাং ঈমান যেহেতু এমন একটি মৌলিক বিষয়, যার অনেক শাখা রয়েছে এবং এর প্রত্যেক শাখাকেই ঈমান বলা হয়, তাই ছ্বলাত ঈমানের অংশ, যাকাত, ছ্বিয়াম এবং হজ্জও ঈমানের অংশ। এমনি বাতেনী আমলগুলো যেমন লজ্জা, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করাও ঈমানের অংশ। ঈমানের শাখাসমূহ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে। কেননা এটিও ঈমানের শাখা। এই শাখাগুলোর মধ্যে এমন কিছু শাখা রয়েছে, যা চলে গেলে আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে ঈমান চলে যাবে। যেমন তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্যদান সম্পর্কিত শাখাটি। সেরকমই ঈমানের এমন কিছু শাখা রয়েছে, যা বাদ পড়লে আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে ঈমান চলে যায় না। যেমন রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস না সরানো। ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন শাখার মাঝখানে আরো এমন অনেক শাখা রয়েছে যেগুলোর মধ্যেও বিরাট স্তরভেদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে এমন শাখাও রয়েছে, যা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আবার এগুলোর মধ্যে এমন শাখাও রয়েছে, যা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার নিকটবর্তী।

সুতরাং ঈমানের শাখাও যেমন ঈমান, তেমনি কুফুরীর শাখাও কুফরী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করা ঈমানের শাখার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান দ্বারা বিচার-ফায়ছালা করা কুফুরী। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন গর্হিত বিষয় দেখে, তবে সে যেন তা স্বীয় হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি তা করতে সক্ষম না হয় তবে তার জবান দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটা হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান"।[১০৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "এর পরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকে না"। ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

«مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্যই দান করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিয়েছে"।[১০৬]

এ হাদীছের অর্থ হচ্ছে, ভালোবাসা ও ঘৃণা করা অন্তরকে সর্বপ্রথম নাড়া দেয়। আর মাল খরচ করা বা না করা অন্তরকে পূর্ণ করে। ধন-সম্পদ হচ্ছে নফসের কাছে সর্বাধিক ও সর্বশেষ প্রিয় বস্তু। মানুষের শরীর হচ্ছে অন্তর ও ধন-সম্পদের মধ্যবর্তী। সুতরাং যার প্রথম

[১০৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৬।

[১০৬] দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/৩৮০।

এবং শেষ সবই আল্লাহর জন্য হবে, অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা দিয়ে শুরু হবে এবং আল্লাহর জন্য ভালোবাস দিয়ে শেষ হবে, সকল কাজে আল্লাহই হবে তার মাবুদ। তার মধ্যে শির্কের কিছুই থাকবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির নিয়্যাত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কামনা করার নাম হচ্ছে শির্ক। যার অবস্থা এ রকম হবে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে কিছুই কামনা করবে না, সে পরিপূর্ণ মুমিন হিসাবে গণ্য হবে। এ ছাড়া আরো অনেক হাদীছ রয়েছে, যা আমল অনুসারে ঈমান শক্তিশালী কিংবা দুর্বল হওয়ার প্রমাণ করে।

ছাহাবীদের মর্যাদার ব্যাপারে শাইখ বলেছেন, ছাহাবীদেরকে ভালোবাসা হচ্ছে দীন, ঈমান ও ইহসান এবং তাদেরকে ঘৃণা করা কুফুরী, নিফাকী এবং যুলুম। শাইখের এই বাণী সামনে আসছে। সুতরাং ঈমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) ছাহাবীদের ভালোবাসাকে ঈমান হিসাবে নাম দিয়েছে এবং তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করাকে কুফুরী হিসাবে নামকরণ করেছেন।

আহলে সুন্নাতের আলেমগণ ঈমানের শাখা-প্রশাখা বর্ণনায় উপরোক্ত যে হাদীছটি দিয়ে দলীল পেশ করেছেন, তার জবাবে আবুল মুঈন নাসাফী এবং অন্যরা যা বলেছেন, তা খুবই তাজ্জবের বিষয়! আবুল মুঈন বলেন, হাদীছের বর্ণনাকারী এখানে সন্দেহ করে বলেছেন,بضع وستون أو بضع وسبعون ঈমানের ষাট অথবা সত্তরের চেয়েও অধিক শাখা রয়েছে। এখানে বর্ণনাকারী নিজেই সন্দেহ করেছেন। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দেহ করেছেন, এটি ধারণাতীত। আর এই হাদীছটি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত।

আবুল মুঈন এখানে রাবীর অসতর্কতার কারণে এবং তার ধারণায় হাদীছটি কুরআনের বিপরীত হওয়ার কারণে হাদীছের উপর আক্রমণ করেছেন।

হে পাঠক! আপনি লক্ষ্য করুন! এটি কত আশ্চর্য্যজনক আক্রমণ! ষাট না সত্তর? এ বিষয়ে রাবীর সন্দেহ করা হাদীছটির ব্যাপারে তার দৃঢ়তা না থাকা আবশ্যক করে না। বিশেষ করে যেখানে ইমাম বুখারী সন্দেহ বোধক শব্দ বাদ দিয়ে দৃঢ়তার সাথে ষাটের কথা বর্ণনা করেছেন। আর আবুল মুঈনের কথা: হাদীছে কুরআনের বিপরীত বর্ণনা রয়েছে, তার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, কোথায় কুরআনের বিপরীত? কুরআনের কোথায় এমন বিষয় রয়েছে, যা এই হাদীছের বিপরীত? বরং কুরআনে এমন বিষয় রয়েছে, যা এই হাদীছকে সমর্থন করে। তাকলীদ এবং গোঁড়ামির কারণেই তিনি হাদীছের উপর এই আঘাত করেছেন। আলেমগণ আরো বলেন, এখানে আরেকটি মূলনীতি রয়েছে। কথা দুই প্রকার। (১) অন্তরের কথা। এটি হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস। (২) জবানের কথা। এটি হচ্ছে জবান দিয়ে ইসলামের তথা কালেমায়ে তায়্যিবা পাঠ করা।

আমলও দুই প্রকার। (১) অন্তরের আমল। এটি হচ্ছে নিয়্যাত ও ইখলাস। (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। এই চারটি একসাথে চলে গেলে ঈমান সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। আর অন্তরের বিশ্বাস চলে গেলে বাকী কাজগুলো করেও লাভ নেই। সুতরাং অন্তরের সত্যায়ন

বাকী কাজগুলোর মূল্যায়ন ও উপকারী হওয়ার জন্য শর্ত। আর যেখানে অন্তরের সত্যায়ন বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বাকী আমলগুলো থাকে না, সেখানেই মতভেদ।

কোন সন্দেহ নেই যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুগত না হওয়াই প্রমাণ করে যে, অন্তর অনুগত নয়। কেননা অন্তর যদি অনুগত ও বাধ্য হত, তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ্যই আনুগত্য করত ও বাধ্য হত। আর বান্দার অন্তর অনুগত ও বাধ্য না হওয়াই প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে এমন বিশ্বাস নেই, যা তার কাছে সৎকাজ করার দাবী করে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لها سائرالْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لها سائرالْجَسَدُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ»

“প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, তা সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে সারা শরীর বরবাদ হয়ে যায়। আর তা হলো অন্তর”।[১০৭]

সুতরাং যার অন্তর সংশোধন হবে, তার দেহ অবশ্যই সংশোধন হবে। বিপরীত পক্ষে অন্তর নষ্ট হলে দেহ কখনো সংশোধন হবে না।

আর যারা বলেছে, ঈমানের এক অংশ চলে গেলে, পুরো ঈমানই চলে যায়, তাদের কথার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, এক অংশ চলে যাওয়ার পর ঈমান পূর্বে যেরকম সমষ্টিগত অবস্থায় ছিল, সেরকম সমষ্টিগত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে না, তাহলে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ঈমানের কিছু অংশ চলে গেলে সমস্ত অংশই চলে যাওয়া আবশ্যক হয় না। তাই কোন অংশ চলে গেলে শুধু ঈমানের কামালীয়াত চলে যাবে, মূল ঈমান নয়।

ঈমান কি বাড়ে ও কমে?

সৎ কাজের কারণে ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং পাপ কাজ করলে ঈমান কমে যায়। আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং সালাফদের উক্তিতে এর পক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আনফালের ২ নং আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

“যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে”। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

[১০৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫২, মুসলিম হা/১৫৯৯।

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾

"যারা হেদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ্ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে ছাওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ"। *(সূরা মারইয়াম: ৭৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾

"যারা মুমিন, তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়"। *(সূরা মুদ্দাছ্ছির: ৩১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূ-মন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা ফাতাহ: ৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

"যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম। সুতরাং তাদের ভয় করো। তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদনকারী"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৭১)*

সুতরাং ঈমান বৃদ্ধির প্রমাণে এতগুলো আয়াত থাকার পরও কিভাবে বলা হবে যে, ঈমান বৃদ্ধির দ্বারা যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা হয়, তা (শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান) বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। মানুষেরা যখন বলেছিল, লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রচুর সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করেছে। *(সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)*

সুতরাং তাদেরকে ভয় করো, এখানে কি শরী'আতের হুকুম-আহকাম বৃদ্ধি উদ্দেশ্য? মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রশান্তি নাযিল করার মাধ্যমে কি শরী'আতের বিধান বৃদ্ধি করা হয়েছে? মোট কথা আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ময়দান হতে ফিরে আসার সময় মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন। যাতে তাদের ইয়াকীন প্রশান্তি আরো বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে উক্ত কথার সমর্থন মিলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾

"এ মুনাফিকদের যখন বলা হলো, এসো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা নিজের শহর প্রতিরক্ষা করো, তারা বলতে লাগলো, যদি আমরা জানতাম আজ যুদ্ধ হবে, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম যখন তারা একথা বলছিল তখন তারা ঈমানের তুলনায় কুফুরীর অনেক বেশী কাছে অবস্থান করছিল। তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে, যা তাদের মনের মধ্যে নেই এবং যা কিছু তারা মনের মধ্যে গোপন করে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন"। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

"যখন কোনো নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে এর ফলে তোমাদের কার ঈমান বেড়ে গেছে? যারা ঈমান এনেছে প্রত্যেকটি অবতীর্ণ সূরাই তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা এর ফলে আনন্দিত। তবে যাদের অন্তরে রোগ বাসা বেঁধেছে তাদের পূর্ব কলুষতার উপর আরো একটি কলুষতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফুরীতে লিপ্ত রয়েছে"। *(সূরা আত-তাওবা: ১২৪-১২৫)*

আর এ আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী (রাহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে যেই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা হলো, ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী বাড়ে কিংবা কমে? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, "لَا الْإِيمَانُ مُكَمَّلٌ فِي الْقَلْبِ، زيادته كفر، ونقصانه شرك" না, ঈমান অন্তরে পরিপূর্ণ থাকে। ঈমান বৃদ্ধি হওয়া কুফুরী এবং হ্রাস পাওয়া শির্ক।[১০৮]

ইমাম ইবনে কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) কে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন, আবুল লাইছ থেকে শুরু করে আবু মুতী পর্যন্ত এই হাদীছের সনদের সকল বর্ণনাকারীই অপরিচিত। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কোন কিতাবে তাদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এই হাদীছের অন্যতম রাবী আবু মুতীর পরিচয় হচ্ছে, তিনি হলেন হাকাম বিন আব্দুল্লাহ বিন মাসলামাহ আল-বালখী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আমর বিন আলী আলফাল্লাস, ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, ইমাম নাসাঈ, আবু হাতিম রাযী, আবু

[১০৮] বানোয়াট, জাল হাদীছ।

হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান আল-বুসতী, আল-উকাইলী, ইবনে আদী, দারকুতনী এবং অন্যান্য ইমামগণ তাকে যঈফ বলেছেন। আর আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনাকারী আবুল মুহায্যামের নাম লিখতে লেখকগণ ভুল করেছেন। তার আসল নাম হচ্ছে ইয়াযীদ বিন সুফিয়ান। তাকেও একাধিক মুহাদ্দিছ যঈফ বলেছেন। শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহিমাহুল্লাহ) তাকে মাতরুক বলেছেন। অর্থাৎ তার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য। ইমাম শু'বা তাকে জাল হাদীছ রচনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। শু'বা বলেন, তাকে যদি লোকেরা দু'টি পয়সা দেয়, তাহলে সে তাদেরকে ৭০টি হাদীছ বানিয়ে শুনাবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে দীন ও জ্ঞানে অপূর্ণাঙ্গ বলেছেন। তিনি আরো বলেন,

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

"তোমাদের কেউ ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় হই"।[১০৯] এখানে ঈমানদার হতে পারবে না-এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। এই ধরণের হাদীছ আরো অনেক রয়েছে। ঈমানের শাখা-প্রশাখা-এর হাদীছ, শাফাআতের হাদীছ, যে হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে সেই হাদীছ এবং এ রকম আরো অনেক হাদীছ। এর পরে কিভাবে বলা হবে যে, আসমানের অধিবাসীদের ঈমান এবং যমীনের অধিবাসীদের ঈমান এক সমান? কিভাবেই বলা হবে যে, ঈমান ব্যতীত অন্য একটি বিষয়ের কারণে মুমিনদের পারস্পরিক মর্যাদা কমবেশী হয়। এই অর্থে সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনেক উক্তি রয়েছে। আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কোন বান্দার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে সে তার ঈমানের খবর নিবে এবং দেখবে, তা থেকে কোন কিছু কমে গেল কি না? সেই সাথে কোন বান্দার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে, সে দেখবে, তার ঈমান কি কমে যাচ্ছে? না বৃদ্ধি পাচ্ছে? উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার সাথীদেরকে বলতেন, আসো! আমরা ঈমান বৃদ্ধি করি। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার দু'আর মধ্যে বলতেন, اللَهُمّ زِدْنا إِيمانا ويَقينا وفِقْها। "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমান, ইয়াকীন এবং দীনের জ্ঞান বৃদ্ধি করো"।

মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তিকে বলতেন, "আমাদের সাথে বসো। আমরা এক ঘন্টা ঈমান বৃদ্ধি করবো"।[১১০] আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আম্মার বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছ্বহীহসূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, তিনটি বৈশিষ্ট যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানকে পূর্ণ করে নিয়েছে। স্বীয় নফ্স থেকে

[১০৯] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৫, মুসলিম হা/৪৪।

[১১০] ছ্বহীহ: বুখারী কিতাবুল ঈমান।

ইনসাফ করা, অভাবের সময়ও খরচ করা এবং পৃথিবীর মানুষের জন্য সালাম প্রচার করা। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ঈমান বৃদ্ধি হওয়া ও কমে যাওয়ার ব্যাপারে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে, ততটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

ঈমান ও আমলকে একসাথে উল্লেখ করার সময় প্রথমে ঈমান ও পরে আমলের উল্লেখ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা:

যারা বলে ঈমানের উপর যেহেতু আমলকে আত্ফ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথমে ঈমান তারপর আমল উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বুঝা যায় যে, ঈমান ও আমল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। সুতরাং আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর জবাবে আমরা বলবো, কোন সন্দেহ নেই যে, কখনো শুধু ঈমান উল্লেখ করা হয়। তার সাথে আমল বা ইসলাম কোনটাই উল্লেখ করা হয় না। আবার কখনো ঈমানকে আমলের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়। আবার কখনো ইসলামের সাথে ঈমানকে মিলিয়ে উল্লেখ করা হয়। যেখানে শুধু ঈমান উল্লেখ করা হয়, সেখানে ঈমান আমলকেও আবশ্যক করে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আনফালের ২ নং আয়াতে শুধু ঈমানের কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে"। আল্লাহ তা'আলা সূরা হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

"প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ ও তার রসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

"যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, নাবী এবং নাবীর উপর যা নাযিল হয়েছিল তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতো তাহলে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো

না। [১১১] কিন্তু তাদের অনেক লোক ফাসেক"। *(সূরা আল মায়িদা: ৮১)* রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»

"যিনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না"।[১১২]

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا" তোমরা পরস্পরকে ভালো না বাসলে ঈমানদার হতে পারবে না।[১১৩] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দিল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[১১৪] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র ধারণ করল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[১১৫] যারা বলে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: فليس منا-এর অর্থ হচ্ছে, فليس مثلنا অর্থাৎ "আমাদের মত নয়"- তার এই কথা মূল সত্য হতে বহু দূরে। আফসোস! যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে না সে যদি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবীদের মত হতো!

আর যখন ঈমানের উপর আমলকে আত্ফ করা হয়, তখন মনে রাখবে যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর আত্ফ করা হলে معطوف (যাকে আত্ফ করা হয়েছে বা পরে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং معطوف عليه (যার উপর আত্ফ করা হয়েছে বা যাকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এই দু'টির জন্য যেই হুকুম উল্লেখ করা হয়, তা ঠিক থাকে এবং সেই সাথে মা'তুফ এবং মা'তুফ আলাইহির মধ্যে مغايرة পরস্পর ভিন্নতার দাবী করে। মুগায়ারাহ-এর কয়েকটি স্তর রয়েছে।

(১) সর্বোচ্চ মুগায়ারাহ হচ্ছে মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বস্তু হওয়া। এ দু'টির একটি হুবহু অন্যটি নয়, অন্যটির অংশও নয় এবং উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার তালাযুম বা একটি অন্যটির জন্য আবশ্যক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[১১১] অর্থাৎ তাদের ঈমান যদি সঠিক হতো এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী যদি আমল করতো, তাহলে তারা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু মনে করতো না।

[১১২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৪৭৫ অন্য বর্ণনায় আছে, "যখন কোন হত্যাকারী কাউকে হত্যা করে, হত্যা করার সময় সে মুমিন থাকে না"। অন্য বর্ণনায় আছে, ছিনতাইকারী যখন কোন মূল্যবান জিনিস ছিনতাই করে নেয়, যার দিকে লোকেরা দৃষ্টি উঁচু করে দেখে তখন সে মুমিন থাকে না"। মুসলিম হা/৫৭।

[১১৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৪।

[১১৪] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/ ১০১।

[১১৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৬৮৭৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৮।

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন। তবুও সত্যের দাওয়াত অস্বীকারকারীরা অন্যদেরকে তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে"। (সূরা আল আনআম: ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾

"তিনি তোমার ওপর এই কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছেন এবং আগের কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে। এর আগে তিনি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছিলেন"। (সূরা আলে ইমরান: ৩) অধিকাংশ সময় এমনই হয়ে থাকে।

(২) এর পরের স্তরটি হচ্ছে মা'তুফ এবং মা'তুফ আলাইহি এর মধ্যে তালাযুম থাকা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করো না"। *(সূরা আল বাকারা: ৪২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো"। *(সূরা আল মায়িদা: ৯২)* এখানে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য রাসূলের আনুগত্য করা আবশ্যক।

(৩) কোন জিনিসের অংশ বিশেষকে পূর্ণ জিনিসের উপর আত্ফ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

"তোমাদের ছ্বলাতগুলো সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে মধ্যম ছ্বলাতের প্রতি। আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও"। *(সূরা আল বাকারা: ২৩৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তার ফেরেশতা, তার রাসূলগণ, জিবরীল ও মীকাইলের শত্রু হবে স্বয়ং আল্লাহ সেই কাফেরদের শত্রু"। *(সূরা আল-বাকারা: ৯৮)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

হে নাবী! স্মরণ করো সেই অঙ্গীকারের কথা যা আমি নিয়েছি সকল নাবীর কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারিয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও। সবার কাছ থেকে আমি নিয়েছি পাকাপোক্ত অলংঘনীয় অঙ্গীকার। *(সূরা আল আহযাব: ৭)*

এই ধরণের বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। (১) সম্ভাবনা আছে যে, মা'তুফ তথা পরে উল্লেখিত বস্তুটি পূর্বে উল্লেখিত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সে হিসাবে একই বিষয় দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। (২) এখানে আতফের দাবী হচ্ছে পরে উল্লেখিত বিষয়টি (জিবরীল) পূর্বে উল্লেখিত বিষয় তথা ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদিও এককভাবে তা পূর্বের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ফকীর ও মিসকীন এবং অনুরূপ শব্দের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপারে অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। এগুলোকে একসাথে উল্লেখ করলে একরকম অর্থ হয় এবং আলাদাভাবে উল্লেখ করলে অন্যরকম অর্থ হয়।

(৪) অনেক সময় দু'টি বস্তুর সিফাত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণেও তাদের একটিকে অন্যটির উপর আত্ফ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ** "গুনাহ মাফকারী এবং তাওবা কবুলকারী"। (সূরা মুমিন: ৩) শুধু শব্দ ভিন্ন হওয়ার কারণেই কবিতার মধ্যে আত্ফ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কবি বলেন, فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا "তার কথাকে সে মিথ্যা হিসাবে পেয়েছে"। এখানে كذب এবং مين একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের একটিকে অন্যটির উপর আত্ফ করা হয়েছে। লোকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন কুরআনেও এর উদাহরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরী'আত ও একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছি"। *(সূরা আল-মায়িদা: ৪৮)* এ বিষয়ে স্বস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আরবী ভাষায় আত্ফ যখন এই ভাবেই ব্যবহৃত হয়, তাই আমরা ইসলামী শরী'আতের প্রবর্তক মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর দিকে দৃষ্টি দিবো। দেখবো, কিভাবে ঈমান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, যখন শুধু ঈমান শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেখানে এটি কল্যাণ, তাকওয়া, দীন, দীন ইসলাম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আসবাবুন নুকুলের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, লোকেরা ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এই আয়াত নাযিল হয়,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

"তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাবার মধ্যে কোন পুণ্য নেই বরং সৎকাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও নাবীদেরকে মনে প্রাণে মেনে নেবে এবং আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর ছ্বলাত কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে। আর যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে সবর করবে তারাই সৎ ও সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী"। *(সূরা আল-বাকারা: ১৭৭)*

মুহাম্মাদ বিন নসর বলেন, আমাদের কাছে ইসহাক বিন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আলমুকরী এবং আলমায়ী হাদীছ বর্ণনা করেছে। তারা উভয়েই বলেন, আমাদের কাছে কাসেম থেকে মাসউদী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট আগমন করে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। আবু যার তখন উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। লোকটি তখন বললো আমি আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি না। আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এক ব্যক্তি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে তুমি যে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, সে সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছিল। জবাবে তিনি তাই পাঠ করেছেন, যা আমি তোমাকে পাঠ করে শুনালাম। সেও তাই বলেছিল, যা তুমি আমাকে বলছ। লোকটি যখন তা মেনে নিতে অস্বীকার করল, তখন আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي إِذَا عَمِلَ الْحَسَنَةَ سَرَّتْهُ وَرَجَا ثَوَابَهَا، وَإِذَا عَمِلَ السَّيِّئَةَ سَاءَتْهُ وَخَافَ عِقَابَهَا"

মুমিন ব্যক্তি যখন নেকীর কাজ করে, তখন সেই নেকীর কাজ তাকে খুশী করে এবং সেই নেকীর কাজের ছাওয়াব কামনা করে। আর যখন পাপের কাজ করে, পাপের কাজ তাকে কষ্ট দেয় এবং তার আযাবের ভয় করে।[১১৬] সালাফদের এক জামা'আতও একই জবাব প্রদান করেছেন।

ছ্বহীহ হাদীছে রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান ঈমান কি জিনিস? তা হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নেই। ছ্বলাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং গণীমতের মালের পাঁচ ভাগের একভাগ প্রদান করা।[১১৭]

---

[১১৬] এ প্রসঙ্গ ও সনদ যঈফ।

[১১৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৩৬৮।

এটি জানা কথা যে, আল্লাহর প্রতি অন্তরের ঈমান ব্যতীত এই আমলগুলো কখনো ঈমান হতে পারে না। কেননা একাধিক স্থানে বলা হয়েছে যে, অন্তরের ঈমান আবশ্যক। সুতরাং জানা গেল অন্তরের ঈমানের সাথে সাথে উপরোক্ত কাজগুলোও ঈমান। আমল যে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, এ কথা প্রমাণের জন্য উপরোক্ত দলীলের চেয়ে আরো কোন বড় দলীল আছে কি? কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানকে আমলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। তাসদীক তথা সত্যায়নের কথা বলেননি। এটি জানা আবশ্যক যে, কুফুরী বা অস্বীকার করার পর এই আমলগুলো কোন কাজে আসবে না।

মুসনাদে আহমাদে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইসলাম হচ্ছে প্রকাশ্য বিষয় আর ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিষয়।[১১৮] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, ঈমান ও ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন দু'টি জিনিস। জিবরীল আলাইহিস সালাম এর প্রশ্নের হাদীছের মধ্যে ইসলাম ও ঈমানের ব্যাখ্যা রয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে বলেছেন, এই তো জিবরীল। তিনি এসেছিলেন, তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য।[১১৯]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) ইসলাম, (২) ঈমান এবং (৩) ইহসান। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমাদের দীন এই তিনটি বিষয়ের সমষ্টি। এ দীনের অনুসারীদেরও তিনটি স্তর রয়েছে। (১) মুসলিম, (২) মুমিন এবং (৩) মুহসিন। ইসলামের সাথে যখন ঈমানকে উল্লেখ করা হবে, তখন ঈমান দ্বারা ওটাই উদ্দেশ্য হবে, যা তার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসলাম দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হবে, যা তার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান ও ইসলামের সাথে যেখানে ইহসানকে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে ইহসান দ্বারা ওটাই উদ্দেশ্য, যা তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। ঈমান ব্যতীত ইহসান অর্জিত হবে- এটি কল্পনাও করা যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾

"তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি যাদেরকে আমি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্য থেকে কেউ নিজের প্রতি যুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর হুকুমে সৎকাজে অগ্রবর্তী, এটিই অনেক বড় অনুগ্রহ"। (সূরা ফাতির: ৩২)

---

[১১৮] যঈফ: মুসনাদে আহমাদ, যঈফ জামি।

[১১৯] ছ্বহীহ: মুত্তাফাকুন আলাইহি।

মধ্যপন্থী এবং সৎকর্মে অগ্রসর ব্যক্তি অবশ্যই বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু নফসের প্রতি যুলুমকারীর কথা ভিন্ন। কেননা তার শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ইহসান হচ্ছে শব্দগত দিক থেকে অধিকতর ব্যাপকার্থ বোধক।[১২০] আর যার মধ্যে ইহসান পাওয়া যাবে তার দিক থেকে ইহসান এক বিশেষ অর্থ প্রদানকারী।[১২১]

ঈমানও শব্দের দিক থেকে সাধারণ বা ব্যাপক অর্থবোধক, কিন্তু ঈমানের অধিকারীর দিক থেকে ইসলামের তুলনায় এটি অধিক বিশেষ অর্থবোধক শব্দ। সুতরাং ইহসানের মধ্যে ঈমান পাওয়া যায়। আবার ঈমানের মধ্যে ইহসানের অর্থও বিদ্যমান। মুহসিনগণ মুমিনদের থেকে অধিক খাস। মুমিনগণ মুসলিমদের থেকে অধিক খাস। রিসালাত ও নবুওয়াতের মধ্যকার সম্পর্কও অনুরূপ। রিসালাতের মধ্যে নবুওয়াতও শামিল। রিসালাত শব্দের দিক থেকে অধিক অর্থবোধক। আর রেসালাতের বাহকের দিক থেকে বিশেষ অর্থবোধক। সুতরাং প্রত্যেক রাসূলই নাবী। কিন্তু প্রত্যেক নাবীই রসূল নন।

ইসলামের সংজ্ঞায় লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে। (১) একদলের মতে ইসলাম শুধু মুখের কথার নাম। অর্থাৎ শুধু জবান দিয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার নাম। (২) আরেক দল ইসলামের সংজ্ঞায় তাই বলেছেন, যা বলেছেন স্বয়ং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বিশেষ করে যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাকে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। সেখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্য আমলের দ্বারা ইসলামের ব্যাখ্যা করেছেন। আর ঈমানের ব্যাখ্যা করেছেন পাঁচটি মূলনীতির মাধ্যমে।

আরেক দল বলেছে, ইসলাম ঈমানের সমার্থবোধক। তারা বলে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, ছ্বলাত কায়েম করা.....হাদীছের শেষ পর্যন্ত।[১২২]

এগুলো হচ্ছে ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন। এ ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে কোন কিছু অপ্রকাশ্য না থাকা। তারা আরো বলে, ঈমান শুধু অন্তরের সত্যায়নের নাম। অতঃপর তারা বলে থাকে, ইসলাম এবং ঈমান একই জিনিস। সুতরাং তাদের মতে ইসলামও সত্যায়নের নাম! এটি এমন একটি কথা, যা কোনো ভাষাবিদই বলেননি। ইসলামের অর্থ হচ্ছে নত হওয়া এবং আনুগত্য করা।

---

[১২০] সাধারণভাবে এটি অনুগ্রহ করা, উত্তমভাবে কর্ম সম্পাদন করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[১২১] নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহসানের সংজ্ঞায় বলেন

[১২২] ছ্বহীহ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পন করেছি। তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি"।[১২৩] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্য আমল সমূহের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং যখন আমরা উভয়টিকে একত্রিত করবো, তখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জবাব প্রদান করেছেন, তা ব্যতীত আমাদের হাতে আর কোন জবাব নেই।

আর যখন ঈমানকে এককভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন তাতে ইসলামও শামিল হবে। আর যখন শুধু ইসলামকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন নিঃসন্দেহে ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার সাথে সাথে মুমিনও হবে। এমন হওয়াই আবশ্যক। কোন ব্যক্তি মুসলিম হবে, একই সময় তাকে মুমিনও বলা হবে কি হবে না? এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এমনি ইসলাম কি ঈমানকে আবশ্যক করে? এতেও উপরোক্ত মতভেদ রয়েছে। ঈমান আনয়নের বদলে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে জান্নাত লাভ ও জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাতের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

শোনো, আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই। তাদের চিন্তারও কোন কারণ নেই। তারাই যারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে। *(সূরা ইউনূস: ৬২-৬৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

"দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের মত। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল"। *(সূরা আল-হাদীদ: ২১)*

শুধু ইসলামের বিনিময়ে কুরআনের কোথাও জান্নাতের ওয়াদা করা হয়নি। কিন্তু তিনি ইসলাম কবুল করাকে মানুষের উপর ফরয করেছেন। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, ইসলাম হচ্ছে এমন দীন, যা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের থেকে অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। এ দিয়েই তিনি সমস্ত নাবীকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

[১২৩] ছ্বহীহ: বুখারী হা/১১২০, মুসলিম হা/৭৬৯

"ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন দীন অবলম্বন করবে তার কাছ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৮৫)*

সার কথা হলো ইসলামকে ঈমানের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করার অবস্থা উভয়টিকে আলাদা করে উল্লেখ করার চেয়ে ভিন্ন। সুতরাং ইসলাম ও ঈমানের উদাহরণ হলো তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দেয়ার মতই। তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া এবং রেসালাতের সাক্ষ্য দেয়া এই দু'টি ভিন্ন জিনিস। এই দু'টি জিনিস পরস্পর ভিন্ন হলেও একটি অন্যটির সাথে অর্থ ও হুকুম উভয় দিক থেকেই সম্পৃক্ত। মূলত দু'টি একই জিনিসের মতই। ঈমান ও ইসলামের বিষয়টি এমনই।

যার ঈমান নেই, তার ইসলামও নেই। যার ইসলাম নেই, তার ঈমানও নেই। কেননা যেই ইসলামের দ্বারা ঈমান বাস্তবে রূপ নেয়, তা হতে কোন মুমিনই মুক্ত হতে পারে না। আর যেই ঈমানের মাধ্যমে ইসলাম বিশুদ্ধ হয়, তা হতে কোন মুসলিমই খালী হতে পারে না।

এই বিষয়গুলোর উদাহরণ আল্লাহর কালামে এবং রাসূলের সুন্নাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অর্থাৎ এগুলো একসাথে মিলিয়ে কিংবা আলাদাভাবে উল্লেখ করার উদাহরণ। যেমন কুফর ও নিফাক শব্দ দু'টি। শুধু কুফরীর কারণে যেখানে আখিরাতে শাস্তির ধমকি দেয়া হয়েছে, সেখানে মুনাফেকরাও শামিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎ আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত" *(সূরা আল-মায়িদা: ৫)*

এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আর যদি কুফুরী এবং নিফাকী এক সাথে উল্লেখ করা হয়, তখন কুফুরী দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ঐ ব্যক্তির কুফুরী, যে প্রকাশ্যে কুফুরী করল। আর মুনাফেক দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ঐ ব্যক্তি যে জবান দ্বারা ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তর দিয়ে ঈমান আনেনি।

এমনি البر (নেকী) ও তাকওয়া, الإثم (পাপকাজ) ও العدوان (সীমালংঘন), তাওবা এবং ইস্তেগফার এবং ফকীর ও মিসকীন ইত্যাদি পরিভাষার ক্ষেত্রে একই কথা।

আল্লাহর এই বাণী ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্যের প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"এ বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, তাদের বলে দাও তোমরা ঈমান আন নাই। বরং বল, আমরা মুসলিম হয়েছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের পথ অনুসরণ করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর বিনিময় দানে কোন কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। *(সূরা আল-হুজুরাত: ১৪)*

এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত। এই কথার উপর আপত্তি করে বলা হয় যে, আয়াতে "আমরা মুসলিম হয়েছি"-এর অর্থ হচ্ছে, আমরা প্রকাশ্যভাবে অনুগত হয়েছি। প্রকৃত পক্ষে তারা মুনাফিক। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরীনদের দু'টি কথার এটিও একটি কথা।

অন্য একটি কথার মাধ্যমেও জবাব দেয়া হয়েছে এবং সেটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত কথা। আর সেটি এই যে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার নয়, মুনাফেকও নয়। যেমন হত্যাকারী, যেনাকারী, চোর এবং খিয়ানতকারী হতে ঈমানকে নফী করা হয়েছে।

আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার ধরণ এই কথাকেই সমর্থন করে। কেননা সূরা আল হুজুরাতের শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত পাপকাজ হতে নিষেধের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে এবং কতিপয় গুনাহগার এবং অনুরূপ লোকের আলোচনা হয়েছে। তাতে মুনাফেকদের কোন আলোচনা হয়নি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ ও তার আনুগত্যের পথ অনুসরণ করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর বিনিময় দানে কোন কার্পণ্য করবেন না"। *(সূরা আল হুজুরাত: ১৪)* তারা যদি প্রকৃত অর্থেই মুনাফেক হতো, তাহলে আনুগত্যের কাজ তাদের কোন উপকারে আসতো না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

"প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী"। *(সূরা আল-হুজুরাত: ১৫)* অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈমানদার হচ্ছেন এরাই। তোমরা নও; বরং তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমান অনুপস্থিত।

এ মতের সমর্থনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন যে, আমরা মুসলিম হয়েছি। আর মুনাফেকদেরকে তা বলার অনুমতি দেয়া হয়নি। তারা যদি মুনাফেক হতো, তাহলে তাদের জন্য ইসলাম শব্দটি ব্যবহার করা হতো না। যেমন তাদের থেকে ঈমানকে নফী করা হয়েছে। তারা মুসলিম হয়েছে এই খোঁটা দিতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা তাদেরকে মুসলিম বলা হয়েছে। এর দ্বারা

রাসূলকে খোঁটা দিতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ইসলাম যদি ছ্বহীহ না হতো, তাহলে তাদেরকে বলা হতো, তোমরা মুসলিম হওনি। বরং তোমরা মিথ্যুক। যেমন আল্লাহ তাদেরকে সূরা মুনাফিকুনের ১নং আয়াতে মিথ্যুক বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

"হে নাবী! এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, তুমি অবশ্যই তার রাসূল। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী"। *(সূরা আল-মুনাফিকুন: ১)* এ বিষয়ে আল্লাহই অধিক জানেন।

উপরোক্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় পরস্পর সমার্থবোধক নয়। সেই সাথে ঐ ব্যক্তিকেও দোষারোপ করা বাতিল হয়ে গেল, যে বলে ইসলাম যদি শুধু প্রকাশ্য বিষয়ের নাম হতো, তাহলে শুধু প্রকাশ্য আমলকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। একনিষ্ঠ মুমিনের কোনো মূল্যায়নই হতো না। আর এটি একটি বাতিল কথা। শাহাদাতাইন (তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান) এবং অন্যান্য বিষয় দ্বারা ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈমান ও ইসলামকে একসাথে উল্লেখ করার অবস্থা শব্দ দু'টিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার অবস্থার চেয়ে ভিন্ন। আপনি কালেমায়ে শাহাদাতের দিকে লক্ষ্য করুন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ»

"আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে সে আমার হাত থেকে তার জান-মাল নিরাপদ করে নিল"।[১২৪]

তারা যদি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে এবং রিসালাতকে অস্বীকার করে, তাহলে তারা জান-মালের নিরাপত্তা পাবে না। বরং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর হক আদায় করে তা পাঠ করতে হবে। যে ব্যক্তি রিসালাতকে সত্যায়ন না করবে, সে কখনই যথাযথভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর হক আদায়কারী হিসাবে গণ্য হবে না। এমনি যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিল যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সাক্ষ্য প্রদানের যথাযথ হক আদায়কারী বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সে ঐ সমস্ত বিষয়কে সত্যায়ন করবে, যা নিয়ে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। সুতরাং তা তাওহীদকেও শামিল করবে।

সুতরাং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর সাক্ষ্য দেয়ার সাথে যখন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এই সাক্ষ্য দেয়া মিলিত হবে তখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর

[১২৪] মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৯২, মুসলিম হা/২০, ইবনে মাজাহ হা/৩৯২৭।

সাক্ষ্য দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তাওহীদ সাব্যস্ত করা আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে রিসালাত সাব্যস্ত করা। ঈমান ও ইসলামের বিষয়টিও অনুরূপ। বিশেষ করে যখন ঈমান ও ইসলামকে একসাথে মিলিয়ে উল্লেখ করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ----- أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের.....জন্য আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন"। *(সূরা আল-আহযাব: ৩৫)*

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ» "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পন করেছি। তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি"।[১২৫]

এখানে ইসলাম দ্বারা যা উদ্দেশ্য ঈমান দ্বারা তা উদ্দেশ্য নয়। যেমন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

"الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ، وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ"

ইসলাম হচ্ছে প্রকাশ্য আর ঈমান হচ্ছে অন্তরে।[১২৬]

যখন এ দু'টির একটি অন্যটি থেকে আলাদা হয়ে ব্যবহৃত হবে, তখন প্রত্যেকটিই অন্যটির অর্থ ও হুকুম বহন করবে। ফকীর, মিসকীন এবং এরূপ অন্যান্য শব্দের বিষয়টিও অনুরূপ। কেননা ফকীর ও মিসকীন শব্দদ্বয় যখন একত্রিত অবস্থায় থাকবে, তখন উভয়ের অর্থ হবে ভিন্ন। আর যখন আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন উভয়ের একই অর্থ হবে।

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ অর্থাৎ কসমের কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা। *সূরা আল-মায়িদা :৮৯*

সুতরাং যার কিছুই নেই (ফকীর) তাকে বাদ দিয়ে অভাবীকে (যার কিছু আছে তাকে) অর্থাৎ মিসকীনকে দেয়া হবে, এ কথা কিভাবে বলা যেতে পারে? অথবা কিভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, মিসকীনকে বাদ দিয়ে শুধু ফকীরকেই দেয়া হবে? এমনি আল্লাহর বাণী:

﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

---

[১২৫] মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী, হা/১১২০, মুসলিম হা/৭৬৯, ইবনে মাজাহ হা/১৩৫৫।

[১২৬] যঈফ: মুসনাদে আহমাদ।

"তবে যদি গোপনে ফকীরদেরকে দাও, তাহলে তোমাদের জন্য এটিই বেশী ভালো"। *সূরা আল-বাকারা :২৭১।* এখানেই বা কিভাবে বলা হবে যে, মিসকীনদেরকে বাদ দিয়ে শুধু ফকীরদেরকেই দেয়া হবে?

আর ঐ ব্যক্তিকেও দোষারোপ করা চলবে না, যে বললো যে ব্যক্তি ঈমান আনল ঠিকই, কিন্তু মুসলিম হয়নি, তার হুকুম কী? অথবা ইসলামে প্রবেশ করল ঠিকই, কিন্তু ঈমান আনয়ন করেনি, তার হুকুম কী? দুনিয়া ও আখিরাতে তার হুকুম কী? সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিনের জন্য এক হুকুম সাব্যস্ত করবে কিন্তু মুসলিমের জন্য আরেক হুকুম সাব্যস্ত করবে, তার কথা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারীকে দোষারোপ করবে, তাকে বলা হবে, তুমি মুসলিম ও মুমিনকে এক বানাতে চাচ্ছ? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ"। *সূরা আল-আহযাব: ৩৫।*

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও মুসলিমকে ভিন্ন ভিন্ন বলেছেন। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদা বলা হলো, আপনি অমুক ব্যক্তিকে দান করা হতে বিরত থাকলেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মুমিন মনে করি। তিনি তখন বললেন, তুমি তাকে মুসলিম বলতে পারো। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি তিনবার বললেন।[১২৭]

সুতরাং তিনি তার জন্য ইসলাম সাব্যস্ত করলেন এবং ঈমান সাব্যস্ত করা হতে বিরত থাকলেন। সুতরাং যারা বলবে ঈমান ও ইসলাম একই বিষয় তারা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার বিরোধীতা করল। আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে মতভেদের বিষয়গুলো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের দিকে সোপর্দ করা। কখনো কখনো কিছু কিছু দলীলের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্য দেখা গেলেও আল্লাহর মেহেরবাণীতে শরী'আতের দলীলসমূহের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন পারস্পরিক বিরোধীতা নেই। কেননা এগুলোর বাহ্যিক বৈপরিত্য নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মূলত সেটিই মূল ধর্তব্য বিষয়। আল্লাহই তাওফীক দানকারী। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী:

﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"অতঃপর ঐ জনপদে যারা মুমিন ছিলো তাদের সবাইকে বের করে নিলাম। আমি সেখানে একটি মুসলিম পরিবার ছাড়া আর কোন পরিবার পাইনি"। *(সূরা আয-যারিয়াত: ৩৫-৩৬)*

[১২৭] ছ্বহীহ: বুখারী হা/২৭, মুসলিম হা/১৫০।

এ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে যারা বলে ইসলাম ও ঈমান শব্দ দু'টি পরস্পর সমার্থবোধক, তাদের কথা ঠিক নয়। আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে তাদের কথার পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা যেই জনপদ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছিল, তার অধিবাসীগণ ঈমান ও ইসলাম এই উভয় গুণে গুণান্বিত ছিল। সুতরাং এই উভয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়া দ্বারা উভয়ের পারস্পরিক সমার্থবোধক হওয়া আবশ্যক করে না।

পরিষ্কার কথা হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের মাসআলায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর বিরোধীতা করার বিষয়টি ছ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। মতভেদটি এসেছে, তার ছাত্রদের থেকে। এর অধিকাংশ বিষয়ের কোন ভিত্তি নেই। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এতে অবশ্যই রাজী হতেন না। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) হাম্মাদ বিন যায়েদের সাথে ইমাম আবু হানীফার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ বিন যায়েদ যখন ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর জন্য এই হাদীছ বর্ণনা করলেন, أي الإسلام أفضل ইসলামের কোন্ আমলটি উত্তম? হাদীছটির শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করে হাম্মাদ ইমামকে বললেন, আপনি দেখছেন না যে ছাহাবী জিজ্ঞেস করছেন, ইসলামের কোন জিনিসটি উত্তম? জবাবে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমান। অতঃপর হিজরত ও জিহাদকে ঈমানের মধ্যে গণ্য করেছেন। এতে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) চুপ থাকলেন। এতে তার কোন কোন ছাত্র বললেন, আপনি কি হাম্মাদের কথার জবাব দিবেন না? ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) তখন বললেন, কিসের মাধ্যমে জবাব দিবো? সে তো রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাকে হাদীছ শুনাচ্ছে।

ঈমান ও ইসলামের মাসআলার মধ্যে মতভেদের ফলাফল হচ্ছে ঈমানের মধ্যে إستثناء অর্থাৎ এই কথা বলা জায়েয হবে কি না যে, أنا مؤمن إن شاء الله (ইনশাআল্লাহ্ আমি মুমিন)।

আলেমগণ এই মাসআলায় তিনভাগে বিভক্ত হয়েছেন। দু'টি দল পরস্পর বিপরীতমুখী। অপর দলটি মধ্যপন্থী। এক দলের মতে ঈমানের মধ্যে ইস্তেছনা করা অর্থাৎ ইনশা-আল্লাহ বলা ওয়াজিব। আরেক দলের মধ্যে ইনশা-আল্লাহ বলা হারাম। মধ্যপন্থী দল এক দৃষ্টিকোন থেকে ইনশাআল্লাহ জায়েয বলেছেন এবং অন্য দৃষ্টিকোন থেকে নিষেধ বলেছেন। এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ কথা।

যারা ঈমানের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বলাকে আবশ্যক মনে করেন, তারা তাদের কথার পক্ষে দু'টি দলীল পেশ করেন।

মূলত ঈমান হচ্ছে ঐ বিষয়, যার উপর মানুষ মৃত্যু বরণ করে। মানুষ আল্লাহর নিকট মুমিন অথবা কাফের হয় কেবল মৃত্যুর অবস্থা অনুসারে। অর্থাৎ মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর নিকট মুমিন হয় আর কুফুরীর উপর মৃত্যুবরণ করলে কাফের হয়।

আল্লাহর ইলমে সে যে অবস্থায় আছে, তাই মূল্যায়নযোগ্য। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় মানুষ যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, তাই ধর্তব্য; এর পূর্বের অবস্থার কোন মূল্যায়ন নেই।

তারা আরো বলেন, যেই ঈমানের পর কুফুরী চলে আসে অতঃপর সে কুফুরীর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তা মূলত ঈমানই নয়। তার ঈমান সেই ব্যক্তির ছ্বলাতের ন্যায়, যে তার ছ্বলাতকে পূর্ণ করার পূর্বেই নষ্ট করে দিয়েছে এবং তার ঈমান ঐ ছ্বিয়াম পালনকারী ছ্বিয়ামের মতই যে বেলা ডুবার পূর্বেই ইফতার করে ফেলেছে। কুল্লাবীয়া সম্প্রদায়ের অনেক লোক এবং অন্যান্যদের অনেকেই এই যুক্তি পেশ করে থাকেন। তাদের মতে আল্লাহ তা'আলা আযলে (আদিতে) কাফেরকেও ভালোবাসেন, যখন তিনি জানতে পারেন যে, সে মুমিন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। এই অর্থে ছাহাবীগণ ইসলামে প্রবেশ করার পূর্বেই আল্লাহর কাছে প্রিয় ছিলেন। ইবলীস এবং যারা দীন ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, তারা আল্লাহর নিকট ঘৃণীত ছিল, যদিও তাদের থেকে তখনো কুফুরী প্রকাশ পায়নি।

তবে এই কথা সালাফদের নয়। সালাফদের মধ্যে যারা ঈমানের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাদের কেউ এই যুক্তি পেশ করেননি। এটি একটি ভুল কথা। কেননা আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" *(সূরা আলে ইমরান: ৩১)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি মুমিনদেরকে ভালোবাসেন, যদি তারা রাসূলের অনুসরণ করে। সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার শর্ত হচ্ছে রাসূলের অনুসরণ করা। শর্ত বাস্তবায়ন করার পরই কেবল ফলাফল অর্জিত হয়। এ ছাড়াও আরো অনেক দলীল রয়েছে।

এই কথার সাথে একমত পোষণ করে আরেকটি দল খুব বাড়াবাড়ি করেছে। তাদের কেউ সৎ আমল সম্পাদন করার পরও বলে যে, صليت إن شاء الله (ইনশা-আল্লাহ আমি ছ্বলাত পড়েছি)। অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছ্বলাত কবুল হওয়া। অনুরূপ আরো অনেক ক্ষেত্রেই তারা অযথা ইনশা-আল্লাহ বলে থাকে। অতঃপর অনেক লোকই প্রত্যেক বিষয়েই ইনশা-আল্লাহ বলে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলে থাকে, هذا ثوب إن شاء الله (ইনশা-আল্লাহ এটি হচ্ছে কাপড়), ইনশা-আল্লাহ এটি হচ্ছে রশি। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটি কাপড় বা রশি হওয়াতে তো কোন সন্দেহ নেই, তখন তারা বলে, হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, তবে আল্লাহ চাইলে এটিকে অন্য বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

তাদের অন্য দলীলটি হচ্ছে, পরিপূর্ণ ঈমানের দাবী হলো আল্লাহ তার বান্দাকে যত আদেশ করেছেন, তার সবগুলো বাস্তবায়ন করা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, তার সবগুলো থেকে বিরত থাকা। এই দৃষ্টিকোন থেকে কোন ব্যক্তি যখন বলবে, أنا مؤمن (আমি ঈমানদার), তখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে নিজের জন্য এই সাক্ষ্য দিল যে, সে নেককার মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত, সকল আদেশ বাস্তবায়নকারী এবং সকল নিষেধ বর্জনকারী। এর ফলে সে আল্লাহর নৈকট্যশীল অলীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এটি নিজেই নিজেকে পবিত্র বলে সাক্ষ্য দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এই সাক্ষ্য দেয়া যদি সঠিক হয়, তাহলে তার উচিত নিজের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেয়া, যদি সে এই অবস্থার উপর মৃত্যু বরণ করে। যেসব সালাফ ঈমানের মধ্যে ইনশা-আল্লাহ বলা জায়েয বলেছেন, তাদের সকলেরই এই একই দলীল। তবে তারা অন্য অর্থে ইনশা-আল্লাহ বলা বর্জন করাও জায়েয মনে করেন। যেমন অচিরেই আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করবো। ইনশা-আল্লাহ। যেসব বিষয়ে সন্দেহ নেই, সেসব ক্ষেত্রে যারা ইনশা-আল্লাহ বলা জায়েয হওয়ার পক্ষে তাদের দলীল হচ্ছে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তার রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন- যা ছিল সরাসরি হক। ইনশাআল্লাহ তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানতে না তিনি তা জানতেন। তাই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার পূর্বে তিনি তোমাদেরকে এ আসন্ন বিজয় দান করেছেন"। *(সূরা ফাতাহ: ২৭)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ইনশা-আল্লাহ, আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।[১২৮] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ আল্লাহর শপথ! আমার বিশ্বাস হচ্ছে, আমিই আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করি।[১২৯] এ রকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আর যারা ঈমানের মধ্যে ইনশা-আল্লাহ বলাকে হারাম বলেছেন, তাদের মতে ঈমান মাত্র একটি বিষয়ের নাম। তাদের কেউ বলে থাকে, আমি নিজেকে মুমিন বলেই জানি। যেমন আমি অবগত আছি যে, আমি তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছি। সুতরাং

[১২৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৯

[১২৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১১০

আমার এই কথা: 'আমি মুমিন' এবং আমার কথা: 'আমি মুসলিম' এই উভয় বাক্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি ঈমানের মধ্যে ইনশা-আল্লাহ বলবে, সে ঈমানের মধ্যে সন্দেহ পোষণকারী বলে গণ্য হবে। যারা ঈমানের মধ্যে ইনশা-আল্লাহ বলে, তাদেরকে شكاكة (সন্দেহকারী) বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: "ইনশা-আল্লাহ তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের কোন ভয় থাকবে না"। এর জবাবে তারা বলেন যে, ইনশা-আল্লাহ বলা হয়েছে, ভয় ও নিরাপত্তার বিষয়ে; মক্কায় প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত বলে তাতে ইনশা-আল্লাহ বলা হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, এখানে ইনশা-আল্লাহ বলার অর্থ এই যে, তোমাদের সকলেই অথবা তোমাদের কতক লোক মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, এরই মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করবে।

তাদের উভয় জবাবের মধ্যেই আপত্তি রয়েছে। তারা যা থেকে পলায়ন করেছিল, তারা তাতেই প্রবেশ করেছে। কেননা নিরাপত্তা ও ভয়ের বিষয়ের ব্যাপারেও চূড়ান্ত ফায়ছালা করে বলা হয়েছে যে, মুসলিমগণ নিরাপদেই মক্কায় প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা এটি ভাল করেই জানেন। সুতরাং তারা প্রবেশ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই, নিরাপদে প্রবেশ করবে, এতেও কোন সন্দেহ নেই এবং সকল মুসলিম কিংবা কতক মুসলিম প্রবেশ করবে- এটিও নিশ্চিত। আল্লাহ তা'আলা জানেন, কারা প্রবেশ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং এখানে নিশ্চিত প্রবেশের জন্যই ইনশা-আল্লাহ বলা হয়েছে। যেমন কোন বিষয়ে সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করার পরও লোকেরা বলে থাকে, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এটি করবো। ইনশা-আল্লাহ। স্বীয় ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করে এটি বলে না। তবে এই ধরণের কসমের মধ্যে উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকার কারণে শপথ ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে না।

আয়াতে বর্ণিত ইনশা-আল্লাহর ব্যাপারে আরেকটি জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে আমাদেরকে ভবিষ্যতের বিষয়াদিতে কিভাবে ইনশা-আল্লাহ বলবো- তা শিক্ষা দিয়েছেন। এ জবাবে কোনো অসুবিধা না হলেও আয়াত থেকে এই উদ্দেশ্য নেওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আয়াতে এই অর্থের দিকে ইঙ্গিত থাকতে পারে; তবে তা সুস্পষ্ট নয়।

ইমাম জামাখশারী অন্য দু'টি বাতিল জবাব দিয়েছেন। এই কথাটি সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এবং এটিকে কুরআন হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন অথবা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি বলেছেন। এই জামাখশারীর মতে কুরআনে আল্লাহর কালাম ব্যতীত অন্যের কালামও রয়েছে। এর ফলে সে ঐ ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত ধমকির আওতায় পড়তে পারে, যে বলেছিল, **{إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر: ٢٥]** "এ কুরআন মানুষের

কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়"। *(সূরা আল-মুদ্দাছছির: ২৫)* আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি।

আর বিশেষ কোন দিক বিবেচনায় যারা, ঈমানের মধ্যে ইনশা-আল্লাহ বলা জায়েয বলেছেন, উপরোক্ত দুই দলের চেয়ে তারাই দলীলের অধিক নিকটবর্তী। সকল কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। ঈমানের মধ্যে যে ব্যক্তি ইনশা-আল্লাহ বলে, সে যদি মূল ঈমানে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে তাতে ইনশা-আল্লাহ বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। এতে কোন মতভেদ নেই। আর যদি এই উদ্দেশ্যে ইনশা-আল্লাহ বলে যে, সে ঐ সমস্ত মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের এই আয়াতসমূহে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

"প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে। তারা ছ্বলাত কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, ভুল-ত্রুটির ক্ষমা ও উত্তম রিযিক"। *(সূরা আল-আনফাল: ২-৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

"প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে অতঃপর এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী"। *(সূরা আল-হুজুরাত: ১৫)*

সুতরাং এই গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত মুমিনদের কাতারে শামিল করার ক্ষেত্রে ইনশা-আল্লাহ বলা জায়েয।[১৩০] অনুরূপ যে ব্যক্তি শেষ পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে ইনশা-আল্লাহ বলল, তার জন্যও ইনশা-আল্লাহ বলা জায়েয। এমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ইনশা-আল্লাহ বলল; ঈমানে সন্দেহ করে নয়, তার জন্যও ইনশা-আল্লাহ বলা জায়েয। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এই কথা যথেষ্ট শক্তিশালী।

---

[১৩০] নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্র না করে এবং প্রথম শ্রেণীর মুমিন দাবী না করে যদি ইনশা-আল্লাহ বলে, তাহলে জায়েয।

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শরী'আতের যেসমস্ত বিষয় ও বর্ণনা ছ্বহীহসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য।

এখানে শাইখ জাহমীয়া, মুআত্তেলা (আল্লাহর সিফাতে অবিশ্বাসকারী সম্প্রদায়), মুতাযিলা এবং রাফেযীদের প্রতিবাদ করেছেন। এ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে খবর দুই প্রকার। ক) খবরে মুতাওয়াতের ও খ) খবরে আহাদ। খবরে মুতাওয়াতের এর সনদ যদিও অকাট্যভাবে প্রমাণিত, কিন্তু তার দালালত অকাট্য নয়। কেননা শব্দের দালালত ইলমে ইয়াকীনের ফায়দা দেয় না। এই বাতিল কথার মাধ্যমেই আল্লাহর সিফাতসমূহের উপর কুরআনের দালালতকে তারা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারা বলে থাকে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয় না।[১৩১] এর সনদ ও মতন দ্বারা দলীলও গ্রহণ করা যায় না। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, তার নাম ও গুণাবলী এবং কর্মসমূহ সম্পর্কে যে খবর দিয়েছেন, এর মাধ্যমে তারা সেগুলো জানার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ থেকে তারা মানুষকে ফিরিয়ে এমন কিছু ধারণা ও কাল্পনিক কথার দিকে নিয়ে গেছে, যাকে তারা অকাট্য জ্ঞান বলে নামকরণ করেছে। মূলত তাদের কথাসমূহের প্রকৃত অবস্থা হলো যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾

"তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরুপ্রান্তরের মরীচিকা। তৃষ্ণাতুর পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে ওখানে পৌঁছালো তখন কিছুই পেলো না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসাব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসাব নিতে দেরী হয় না অথবা তার উপমা যেমন একটি গভীর সাগরের বুকে অন্ধকার। উপরে ছেয়ে আছে একটি তরঙ্গ, তার উপরে আরেকটি তরঙ্গ আর তার উপরে মেঘমালা। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও দেখতে পায় না। যাকে আল্লাহ আলো দেন না তার জন্য আর কোন আলো নেই"। *(সূরা আন-নূর: ৩৯-৪০)*

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তারা তাদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধিকে অহীর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তারা শরী'আতের দলীলসমূহকে সরিয়ে রাখে। সুস্পষ্ট দলীলসমূহ দ্বারা হিদায়াত গ্রহণ করা বাদ দিয়ে তারা তাদের অন্তরসমূহকে হিদায়াত থেকে খালী করে রেখেছে। সুস্থ ফিতরাত (সৃষ্টিগত স্বভাব) ও নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ দ্বারা সমর্থিত সঠিক বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উপকৃত হতে

[১৩১] তবে তারা বলে ইলম অর্জিত না হলেও তা দ্বারা আমল আবশ্যক হয়।

পারেনি। তারা যদি কুরআন ও হাদীছের দলীলসমূহকে ফায়ছালাকারী হিসাবে মেনে নিত, তাহলে তারা সুস্থ ফিতরাত দ্বারা সমর্থিত পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারতো।

প্রত্যেক বিদ'আতী দল কুরআন ও সুন্নাহ্ এর দলীলকে তাদের বিদ'আত ও কল্পিত যুক্তি দ্বারা যাচাই-বাছাই করে থাকে। যেই দলীল তাদের যুক্তি ও বিদআতের মুতাবেক হয়, তাকে তারা মুহকাম (পরিপক্ক) বলে, তা গ্রহণ করে এবং তা দ্বারা দলীল পেশ করে। আর যা তাদের বিদ'আত ও যুক্তির বিরোধী হয়, সেটিকে তারা মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট) বলে এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানকে তারা তাফবীয হিসাবে নাম দেয়। অর্থাৎ তারা বলে এর অর্থ কেবল আল্লাহই অবগত আছেন। কিংবা তারা তাহরীফ (পরিবর্তন) করে। আর তাহরীফকে তারা তা'বীল (ব্যাখ্যা) হিসাবেও নাম দিয়ে থাকে। এ জন্যই আহলে সুন্নাতের আলেমগণ কঠোর ভাষায় তাদের প্রতিবাদ করেছেন।

আহলে সুন্নাতের মাযহাব হচ্ছে, তারা বিশুদ্ধ দলীল বর্জন করেন না এবং বিবেক দ্বারা কিংবা কারো কথা দ্বারা এর বিরোধীতাও করেন না। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি হুমাইদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা একদা ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) এর নিকট ছিলাম। তখন এক লোক এসে তাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। ইমাম শাফেঈ তখন বললেন, এই মাসআলায় রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এই ফায়ছালা করেছেন। সে বললো আপনি কী বলেন? ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তুমি কি মনে করছো আমি খ্রিস্টানদের গীর্জায় আছি? তুমি কি মনে করছো যে, ইয়াহূদীদের ইবাদতখানায়? আমি কী খ্রিস্টানদের যান্নার (খ্রিস্টানদের এক প্রকার পোশাক!) পরিহিত? আমি বলছি, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছো, আপনি কী বলেন?[১৩২] সালাফদের কথার মধ্যে এ রকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

"যখন আল্লাহ্ ও তার রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিয়ে দেন, তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। যে আল্লাহ্ ও তার রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়"। *(সূরা আল-আহযাব: ৩৬)*

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অনুযায়ী আমল করার জন্য এবং তার কথাকে সত্যায়নের জন্য এই উম্মত যেহেতু খবরে ওয়াহেদকে কবুল করে নিয়েছে, তাই অধিকাংশ আলেমের মতে ইহা দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান সাব্যস্ত হবে। গৃহীত হওয়ার দিক থেকে

[১৩২] এ কথা দ্বারা ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) সম্ভবত বুঝাতে চাচ্ছেন, ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের আলিমরা যেমন তাদের নাবীদের দীন পরিবর্তন করেছে, আমি তাদের মত নই। আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা পরিবর্তন করে সেই স্থানে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করার মত সাহসিকতা দেখাবো না।

খবরে ওয়াহেদ খবরে মুতাওয়াতেরের মতই। এটি গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনদের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ ছিল না।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত ছ্বহীহ বুখারীর প্রথম হাদীছটিই খবরে ওয়াহেদ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» "প্রতিটি নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল"।[১৩৩] আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نَهَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ»

" নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদ বিক্রি করা ও তা দান করা হতে নিষেধ করেছেন।[১৩৪] আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا»

"কোন মহিলা ও তার ফুফুকে এক সাথে বিবাহ করা যাবে না। এমনি কোন মহিলা ও তার খালাকে একসাথে বিবাহ করা যাবে না"।[১৩৫] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

"বংশগত সম্পর্ক যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করে দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণেও সেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম"।[১৩৬] এমনি আরো অনেক খবরে ওয়াহেদ রয়েছে, যেগুলোকে মুসলিম জাতি কবুল করে নিয়েছে। এই হাদীছগুলো ঐ ব্যক্তির খবরের মতই, যে কুবা মাসজিদে এসে খবর দিয়েছিল যে, কিবলা কাবার দিকে পরিবর্তন হয়ে গেছে। মুসলিমগণ এই খবর শুনেই ছ্বলাতরত অবস্থাতেই কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।[১৩৭]

এমনি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন অঞ্চলে দূতগণকে একাকী প্রেরণ করতেন এবং মাত্র একজন লোকের সাথে চিঠি পাঠিয়ে দিতেন। যাদের কাছে পাঠাতেন, তারা বলতেন না যে, আমরা এই খবর গ্রহণ করবো না। কারণ এটি মাত্র একজনের খবর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[১৩৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/১।

[১৩৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ২৫৩৫, মুসলিম হা/১৫০৬।

[১৩৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/ ৫১০৯, মুসলিম হা/১৪০৮।

[১৩৬] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৬৪৫, মুসলিম হা/১৪৪৪।

[১৩৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪০৩, মুসলিম হা/৫২৬।

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

"আল্লাহই তার রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি একে সকল প্রকার দীনের উপর বিজয়ী করেন, মুশরিকরা একে যতই অপছন্দ করুক না কেন"। *(সূরা আত-তাওবা: ৩৩)* আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার সৃষ্টির জন্য দীনের দলীল-প্রমাণকে হেফাজত করবেন। যাতে করে তা বিলীন হয়ে না যায়।

এ জন্যই রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর যারা তার নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অপদস্ত করেছেন এবং মানুষের জন্য তাদের মুখোশ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছ বর্ণনায় কোন মিথ্যুকের বিষয়ই আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখেন নি। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, কোন লোক যদি সাগরে অবস্থান করেও মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করতে চায়, লোকেরা তার ব্যাপারে বলবে, অমুক ব্যক্তি মিথ্যুক।

খবরে ওয়াহেদ যদিও সত্য ও মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে; কিন্তু তা থেকে ছ্বহীহ ও যঈফের মধ্যে পার্থক্য করার পরই বলতে হবে কোন্‌টি ছ্বহীহ আর কোন্‌টি যঈফ। হাদীছ চর্চা করতে গিয়ে রাবীদের জীবনী অনুসন্ধানে যে আলেম তার অধিকাংশ সময় ব্যয় করে সে ব্যতীত অন্য কেউ এটি বলার ক্ষমতা রাখে না। যাতে করে তিনি তাদের অবস্থা, কথা-বার্তা এবং হাদীছ বর্ণনায় ভুল ও সীমা লংঘন করা হতে তাদের সতর্কতা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। মুহাদ্দিছগণ হাদীছের খেদমতে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন যে, প্রাণ গেলেও তারা কাউকে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে কোন মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করার সুযোগ দিতেন না এবং নিজেরাও তা করতেন না। তারা আমাদের নিকট এই দীন সেভাবেই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, যেভাবে তাদের কাছে পৌঁছেছে। তারা ইসলামের প্রথম কাতারের সৈনিক এবং ঈমানের শক্তি। তারা খবরের যাচাই-বাছাইকারী এবং হাদীছকে পরিশুদ্ধকারী। সুতরাং কোন আলেম যখন হাদীছ বর্ণনাকারীদের অবস্থা এবং তাদের দীনদারী ও আমানতদারী সম্পর্কে জানতে পারবেন, তখন তিনি যা বর্ণনা করবেন, তা সম্পর্কে অবশ্যই অবগত হতে পারবেন।

জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকদের নিকট এটি পরিষ্কার যে, মুহাদ্দিছগণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা, তার জীবনী এবং তার হাদীছ সম্পর্কে এমন জ্ঞান রাখেন, যা সম্পর্কে অন্যদের জ্ঞান থাকা তো দূরের কথা; এ সম্পর্কে তাদের কোন অনুভূতিই নেই। সীবওয়াই ও খলীলের অবস্থা ও খবরাদি সম্পর্কে নাহুবিদগণ যেমন জ্ঞান রাখেন, অন্যরা তেমন রাখেন না। এমনি ডাক্তারগণ বিকরাত ও জালিনুস সম্পর্কে যে জ্ঞান রাখেন, অন্যরা তা রাখেন না। এমনি প্রত্যেক পেশাদার তার পেশা সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশী জানে। মুদির দোকানে গিয়ে আপনি যদি আতরের গুণাগুণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন অথবা বস্ত্র ব্যবসায়ীকে যদি আপনি আতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে এটি বড় ধরণের বোকামীর পরিচয় হবে।

যারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে, তারা আল্লাহর বাণী: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ 'তার সদৃশ আর কিছুই নেই। *সূরা আশ-শূরা:১১।* এটিকে অনেক ছ্বহীহ হাদীছ প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কাছে যখনই এমন কোন ছ্বহীহ হাদীছ আসে, যা তাদের মূলনীতি ও মতামতের বিরোধী হয় এবং যা তাদের কল্পনা ও চিন্তা পরিপন্থী হয়, তখন উক্ত বাণী দ্বারা সেটিকে প্রত্যাখ্যান করে। যাদের অন্তর তাদের চেয়েও অধিক অন্ধ তারা কেবল তাদেরকেই ধোঁকা দিতে পারে এবং কুরআনের আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করতে পারে।

তারা আল্লাহর সিফাতসমূহের হাদীছগুলো থেকে এমন কিছু বুঝেছে, যা আল্লাহ এবং তার রাসূল উদ্দেশ্য করেননি। তারা যা বুঝেছে, ইসলামের কোন ইমাম তা বুঝেননি। তারা মনে করে আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করলে মাখলুকের সিফাতের সাথে আল্লাহর তাশবীহ (তুলনা) হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহর সিফাতকে বাতিল করার জন্য لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 'তার সদৃশ আর কিছুই নেই, এই কথা দ্বারা দলীল প্রদান করেছে।[১৩৮] এর মাধ্যমে তারা কুরআন ও হাদীছের দলীল পরিবর্তন করেছে। তারা এ বিষয়ে কিতাবাদিও লিখেছে এবং বলেছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যেই দীন এসেছে এবং যা মেনে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, এটি হচ্ছে সেই দীন ইসলামের মূলনীতি। তারা কুরআনের অনেক আয়াত পড়ে এবং রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যে অর্থ বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এই অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন, তাতে চিন্তা-গবেষণা না করেই তা আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দেয়।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের কারণে অর্থাৎ আসমানী কিতাবের অর্থ পরিবর্তন করার কারণে, সুস্পষ্ট অর্থকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দেয়ার কারণে এবং চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই কিতাব পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের দোষারোপ করেছেন। আমরা যাতে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং তাদের কর্ম থেকে দূরে থাকি, সেই জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে তাদের খবর ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

---

[১৩৮] لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 'তার সদৃশ আর কিছুই নেই,- তারা শুধু সূরা শুরার ১১ নং আয়াত থেকে এই অংশকে গ্রহণ করে আল্লাহর সিফাতকে বাতিল করতে চায়। অথচ এই আয়াতই আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার জন্য আহলে সুন্নাতের অন্যতম একটি দলীল ও মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ "তার সদৃশ আর কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। *(সূরা আশ-শূরা: ১১)* এখানে প্রথমে আল্লাহর মত কোন মাখলুকের হওয়াকে নফী করা হয়েছে অতঃপর তার জন্য শ্রবণ করা ও দেখা- এই দু'টি গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কোন সিফাত (গুণ) মাখলুকের কোন সিফাতের মত নয়।

عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨)

"তোমরা কি তাদের থেকে আশা করো যে, তারা তোমাদের দাওয়াতের উপর ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দলের চিরাচরিত রীতি এই চলে আসছে যে, আল্লাহর কালাম শোনার পর খুব ভালো করে জেনে-বুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে তাহরীফ (বিকৃতি) করেছে। যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে সাক্ষাত হলে তারা বলে, আমরাও ঈমান আনয়ন করেছি। আবার যখন পরস্পরের সাথে নিরিবিলিতে কথা হয় তখন বলে, তোমরা কি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেলে? এদেরকে তোমরা এমন সব কথা বলে দিচ্ছো যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন, ফলে এরা তোমাদের রবের কাছে তোমাদের মোকাবিলায় তোমাদের এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে? এরা কি জানে না, যা কিছু এরা গোপন করছে এবং যা কিছু প্রকাশ করছে সমস্তই আল্লাহ জানেন? এদের মধ্যে একটি দল হচ্ছে নিরক্ষরদের। তাদের কিতাবের জ্ঞান নেই, নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্খাগুলো নিয়ে বসে আছে এবং নিছক অনুমান ও ধারণার ওপর নির্ভর করে চলছে"। *(সূরা আল-বাকারা: ৭৫-৭৮)* আয়াতে الأماني তথা ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্খা বলতে অর্থ না বুঝে শুধু বাহ্যিক তেলাওয়াত উদ্দেশ্য। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾

"কাজেই তাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত যারা স্বহস্তে কিতাব লেখে তারপর লোকদের বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এভাবে তারা এর বিনিময়ে সামান্য স্বার্থ লাভ করে। তাদের হাতের এই লিখন তাদের ধ্বংসের কারণ এবং তাদের এই উপার্জনও তাদের ধ্বংসের উপকরণ"। *(সূরা আল-বাকারা: ৭৯)*

তারা নিজ হাতে যা লিখে আল্লাহর দিকে নিসবত করেছে এবং এর মাধ্যমে তারা যা কামাই করেছে, সে কারণে আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন। এই উভয় বৈশিষ্টই নিকৃষ্ট। তারা আল্লাহর দিকে এমন জিনিস নিসবত করছে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে নয়। এর বিনিময়ে তারা যেই সম্পদ বা নেতৃত্ব হাসিল করছে, তাও নিকৃষ্ট। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উসীলায় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে কথায় ও কাজে বিভ্রান্তি হতে রক্ষা করেন।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তার কথা: الشرع والبيان দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে, তা দুই প্রকার। একটি হচ্ছে মূল শরী'আত। আর অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাবে আল্লাহ তা'আলা যে বিধান নির্ধারণ করেছেন, তার বিশদ ব্যাখ্যা। এর সবগুলোই সত্য এবং অনুসরণ করা আবশ্যক।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, ঈমানের অধিকারীগণ মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সকলেই এক সমান। আল্লাহর ভয়, নফসের প্রবৃত্তি বর্জন করা এবং উত্তম কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমেই তাদের পারস্পরিক ফযীলত নির্ধারিত হয়। এখানে শাইখ প্রথম কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করছেন যে, সকল মুমিনই মূল সত্যায়নে সমান অংশীদার। তবে কতকের সত্যায়ন অন্যদের সত্যায়নের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও মজবুত হয়। যেমন কারো দৃষ্টিশক্তি অন্য কারো চেয়ে অধিক শক্তিশালী বা দুর্বল হয়ে থাকে। পরের বাক্য দ্বারা শাইখ বুঝাতে চাচ্ছেন যে, অন্তরের কাজের মাধ্যমে মুমিনগনের পারস্পরিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মূল সত্যায়নে কোন স্তরভেদ বা পার্থক্য নেই। তবে মূল সত্যায়ন ও বিশ্বাসেও পার্থক্য হয়। এই মতই অধিক শক্তিশালী। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন।

(৬৯) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن

সকল মুমিনই আল্লাহর অলী।

.....

ব্যাখ্যঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

"আল্লাহর অলীদের কোনো ভয় নেই। তাদের চিন্তারও কোন কারণ নেই। তারাই আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে"। *(সূরা ইউনূসঃ ৬২-৬৩)*

الولي (বন্ধু) শব্দটি الولاية (বন্ধুত্ব) শব্দ হতে নিসৃত। এর واو বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে। এটি العدواة (শত্রুতা) শব্দের বিপরীত। আল্লাহর বাণীঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজের জান-মালের ঝুকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরতকারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসলে তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই, কিন্তু হিজরত করেনি তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্বের কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে

সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন"। *(সূরা আল-আনফাল: ৭২)*

এখানে ইমাম হামযাহ ولاية শব্দের واو এর উপর যের দিয়ে পড়েছেন। অন্যরা পড়েছেন যবর দিয়ে। যের ও যবর উভয় কিরাআতেই পড়া যায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে সাহায্য করা। আর যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে রাজত্ব।

ইমাম যাজ্জায যের দিয়ে পড়া জায়েয বলেছেন। কেননা একই গোত্রের লোকেরা যখন পরস্পরকে বন্ধু বানিয়ে নেয়, তখন তাদের কাজ যেন এক শ্রেণীর কাজের মতই হয়ে যায়। যে শব্দের অবস্থা ঠিক এ রকম, তা যের দিয়েই পড়া হয়। যেমন الخِيَاطَةِ (সেলাই করা) ইত্যাদি।

সুতরাং মুমিনগণ আল্লাহর অলী। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বন্ধু। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফুরী করে তাদের বন্ধু হচ্ছে তাগুত। তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে"। *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾

"এর কারণ, আল্লাহ নিজে ঈমান গ্রহণকারীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী। কিন্তু কাফেরদের সহযোগী ও সাহায্যকারী কেউ নেই"। *(সূরা মুহাম্মাদ: ১১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু। এরা ভালো কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, ছ্বলাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে"। *(সূরা আত-তাওবা: ৭১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজের জান-মালের ঝুকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরতকারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসলে তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু হিজরত করেনি তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্বের কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন। যারা কুফুরী করেছে তারা পরস্পরের বন্ধ। যদি তোমরা এটা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি হবে ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা করেছে তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্যে রয়েছে ভুলের ক্ষমা ও সর্বোত্তম রিযিক। আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং অবশ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত রয়েছেন"। *(সূরা আল-আনফাল: ৭২-৭৪)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾

"আসলে তোমাদের বন্ধু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ, তার রাসূল এবং সেই ঈমানদাররা যারা ছ্বলাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে বিনীত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তার রসূলকে ও মুমিনদেরকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তার জেনে রাখা দরকার, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে"। *(সূরা আল-মায়িদা: ৫৫-৫৬)*

উপরের সবগুলো আয়াত প্রমাণ করে যে, মুমিনগণ পরস্পরের বন্ধু। সেই সাথে তারা আল্লাহ্ তা'আলারও অলী। আল্লাহ তা'আলাও তাদের বন্ধু ও অভিভাবক। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদের অভিভাবকত্ব করেন এবং তাদেরকে ভালোবাসেন। তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে

প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ বেলায়াত (বন্ধুত্ব) আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। একজন মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে যেমন অন্য একজন মানুষকে বন্ধু বানায়, আল্লাহর বেলায়াত সেরকম নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾

"আর বলো, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোনো পুত্র গ্রহণ করেননি। তার বাদশাহীতে কেউ শরীকও হয়নি এবং তিনি এমন অক্ষমও নন যে, কেউ তার সাহায্যকারী হবে। আর তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ১১১)*

দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে আল্লাহ তা'আলা কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করেননি। বরং আল্লাহর জন্যই সকল ক্ষমতা ও সম্মান। তিনি দুনিয়ার বাদশাহ এবং অন্যান্যদের মত নন। দুনিয়ার রাজা-বাদশারা নিজেদের প্রয়োজনে অন্যদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী বানায়।

বেলায়াত ঈমানের মতই। সে হিসাবে শাইখের কথার উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, বেলায়াতের অধিকারীগণ মূল বেলায়াতে সকলেই একসমান। অর্থাৎ সকল মুমিনই আল্লাহর বন্ধুত্ব প্রাপ্তির দিক থেকে সমান। তবে এটি কারো জন্য পূর্ণ আবার কারো জন্য অপূর্ণ হতে পারে। পূর্ণ বেলায়াত শুধু মুত্তাকী মুমিনদের জন্যই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই। তাদের চিন্তারও কোন কারণ নেই। তারাই আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য"। *(সূরা ইউনূস: ৬২-৬৪)*

এখানে الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ এই বাক্যটি أولياء الله-এর সিফাত অথবা বদল হিসাবে মানসুব হয়েছে। অথবা পূর্বে أمدح (আমি তাদের প্রশংসা করছি)-এই ফেলটি উহ্য থাকার কারণে الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ বাক্যটি মানসুব হয়েছে। অথবা তার পূর্বে هم যমীর উহ্য থাকার কারণে বাক্যটি মারফুর স্থানে রয়েছে। অথবা বাক্যটি إن এর দ্বিতীয় খবর। عليهم এর যমীর হতে বদল হিসাবে মাজরুর হওয়াও জায়েয আছে।

উপরোক্ত সকল অবস্থাতেই আল্লাহর বেলায়াত ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপরোক্ত তিনটি আয়াতে যেই ওয়াদা রয়েছে,

তারা তা পাওয়ার হকদার। প্রশংসিত বন্ধুর সাথে তার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বস্তুতে একমত পোষণ করার নাম বেলায়াত। অর্থাৎ আল্লাহ যা ভালোবাসেন তাকে ভালোবাসা এবং তিনি যা অপছন্দ করেন, তা অপছন্দ করার মাধ্যমেই বেলায়াত অর্জিত হয়। প্রচুর পরিমাণ ছিয়াম পালন করা, ছ্বলাত কায়েম করা, সুন্দর ব্যবহার করা এবং কঠিন পরিশ্রম করে এটি অর্জন করা যায় না।

কেউ কেউ বলেছেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ বাক্যটি মুবতাদা। আর لهم البشرى হচ্ছে তার খবর। এই কথা সত্য হতে অনেক দূরে। এতে পূর্বের বাক্য হতে পরের বাক্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং আয়াতের শব্দমালার গ্রন্থনা এলোমেলো হওয়া আবশ্যক হয়।

একই মুমিনের মধ্যে একই সাথে একদিক থেকে বেলায়াত এবং অন্যদিক থেকে বেলায়াতের বিপরীত বস্তুও একত্রিত হতে পারে। যেমন একই মুমিনের মধ্যে ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শির্ক, তাকওয়া ও পাপাচার এবং নিফাকী ও ঈমান একত্রিত হতে পারে। যদিও আহলে সুন্নাতের লোকদের মধ্যে এই মূলনীতির ক্ষেত্রে বাহ্যিক মতভেদ রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে এবং বিদ'আতীদের মধ্যে রয়েছে বিরাট মতভেদ। যেমন ইতিপূর্বে ঈমানের মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বিষয়টি বিস্তারিতভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু শব্দ ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে শরী'আত প্রবর্তকের অনুসরণ করা শুধু অর্থের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার চেয়ে উত্তম। একই ব্যক্তির মধ্যে যে, তাওহীদ ও শির্ক এবং ঈমান ও তার বিপরীত বিষয় একত্রিত হতে পারে, তার অনেক দলীল রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ "অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করে, কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে"। *(সূরা ইউসুফ: ১০৬)*[১৩৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"গ্রাম্য লোকেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, তাদের বলে দাও তোমরা ঈমান আন নাই। বরং বল, আমরা মুসলিম হয়েছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তার আনুগত্য করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর বিনিময় দানে কোন কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। *(সূরা আল-হুজুরাত: ১৪)*

[১৩৯] উক্ত আয়াতে ঈমান বলতে তাওহীদে রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন উদ্দেশ্য। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানে, কিন্তু ইবাদতে অন্য বস্তুকেও আল্লাহর সাথে শরীক করে। মক্কার মুশরিকদেরও এ অবস্থা ছিল।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দীর্ঘ কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত আলেমদের দু'টি মতের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এই লোকেরা মুনাফেক ছিলনা। বরং তাদের মধ্যে ঈমান ছিল এবং ঈমানের বিপরীত বিষয়ও ছিল। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذا وعد أخلف وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» (بخارى: ٣٤)

"এমন চারটি বৈশিষ্ট রয়েছে যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফেক হিসাবে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে উক্ত বৈশিষ্টসমূহের একটি বিদ্যমান থাকবে তা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মধ্যে নেফাকীর একটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে। (১) যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে। (২) কারো সাথে চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে। (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। (৪) যখন ঝগড়া করে তখন গালমন্দ করে"।[১৪০] অন্য বর্ণনায় وإذا وعد أخلف এর স্থলে إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، বাক্যটি রয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ঈমানের শাখা-প্রশাখা বর্ণনার হাদীছটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ"

যার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে।[১৪১]

এতে জানা গেল, যার অন্তরে খুব সামান্য ঈমান থাকবে, সেও চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যদিও তার সাথে অনেক নিফাকী থাকে। তার সাথে যে পরিমাণ নিফাকী রয়েছে সেই পরিমাণ জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। পরিশেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে।

সুতরাং সৎ আমল ঈমানের শাখা। পাপকাজ কুফুরীর শাখার অন্তর্ভুক্ত। যদিও অস্বীকার করাই হচ্ছে কুফুরীর শাখাসমূহের মূল এবং ঈমানের শাখাসমূহের মূল হচ্ছে সত্যায়ন করা।

আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীছে বলেন যখনই মানুষের কোন একটি জামা'আত এক স্থানে একত্রিত হয়, তখন তাদের মাঝে আল্লাহর একজন অলী থাকে। সেই অলী সম্পর্কে লোকদের কাছে কোন খবর থাকে না এমনকি অলী নিজেও নিজের সম্পর্কে জানে না। এটি একটি বাতিল হাদীছ। এর কোন ভিত্তি নেই। এটি বানোয়াট কথা। কেননা অনেক সময় কাফেরদের কোন জামা'আত একসাথে মিলিত হয়। আবার কখনো ফাসেকদের জামা'আতও একস্থানে সমবেত হয় এবং তারা ফাসেক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে।

---

[১৪০] মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৪৫৯, মুসলিম হা/৫৮।

[১৪১] মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭৪৩৯, মুসলিম হা/২৯৪০, তিরমিযী হা/১৯৯৯।

মূলত আল্লাহর অলী তারাই যাদের আলোচনা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই করেছেন। আল্লাহর কামেল অলীদের গুণাগুণ বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই। তাদের চিন্তারও কোন কারণ নেই। তারাই যারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য"। *(সূরা ইউনূস: ৬২-৬৪)*

আর তাকওয়া ও মুত্তাকীর পরিচয় আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

"তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করার মধ্যে কোন পূণ্য নেই; বরং পূণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণপ্রিয় ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থী ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে। আর ছ্বলাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করবে এবং বিপদে-অনটনে ও হুকুম বাতিলের সংগ্রামে সবর করবে তারাই সৎ ও সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই মুত্তাকী"। *(সূরা আল-বাকারা: ১৭৭)*

মুত্তাকীগণ দু'প্রকার। (১) মধ্যপন্থী নৈকট্যশীল মুত্তাকী ও (২) সৎকর্মে অগ্রগামী নৈকট্যশীল মুত্তাকী। মধ্যপন্থী মুত্তাকী তারাই, যারা অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহ থেকে শুধু ফরযগুলো আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে। আর সৎ কর্মে প্রতিযোগীতাকারী ও অগ্রগামী মুত্তাকী হচ্ছে তারা, ফরযগুলো আদায়ের পর নফলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করে।

ছ্বহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ» (بخارى: ٦٥٠٢)

“যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা যেসব ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে, তার মধ্যে ফরয ইবাদতই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যার কারণে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি মুমিন ব্যক্তির জান বের করতে যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি, অন্য কোন কাজ করতে গিয়ে ততটা দ্বিধা-সংকোচ করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে (দীর্ঘ হায়াত দিয়ে অতি বৃদ্ধ করে) কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি”।[১৪২]

الولي বন্ধু শত্রুর বিপরীত। অলী শব্দটি الولاء থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য হাসিল করা। সুতরাং অলী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজগুলো করে তাকে বন্ধু বানায় এবং সন্তুষজনক আমল করে তার নৈকট্য হাসিল করে। আল্লাহর অলীগণ ঠিক সেরকমই যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

“আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করেন”। *(সূরা আত-তালাক: ২-৩)*

[১৪২] ছুহীহ বুখারী হা/ ৬৫০২। যদি প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দার কান, চোখ ইত্যাদি হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তর হচ্ছে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তার ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায় এবং ইবাদত করতে করতে তার ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়, তখন তার শরীরের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরী'আতের অনুগামী হয়ে যায়। তখন কান দিয়ে শুধু আল্লাহর আনুগত্যের কথাই শুনে এবং তা দিয়ে কোন হারাম নিষিদ্ধ আওয়াজ শুনার চিন্তাও করে না। চোখ দিয়ে শুধু আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসই দেখে। হাত দিয়ে শুধু ভাল জিনিসই স্পর্শ করে এবং পা দিয়ে শুধু আনুগত্যের পথেই চলে। এক কথায় আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সন্তুষ্টজনক কাজ করার তাওফীক দিয়ে থাকেন।

আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু যার! লোকেরা যদি শুধু এই আয়াত অনুযায়ী আমল করতো, তাতেই তাদের যথেষ্ট হতো।[১৪৩]

সুতরাং মানুষের কাছে যা কঠিন, আল্লাহ তা'আলা তা মুত্তাকীদের জন্য সহজ করে দেন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন স্থান থেকে রিযিক দান করেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করেন এবং তাদেরকে কল্যাণকর বস্তু প্রদান করেন। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন কিছু দান করেন, যা ব্যাখ্যা করে শেষ করা যাবে না। তাদের জন্য এমন ইলম এবং অন্যান্য বিষয়ের দরজা খুলে দেন, যা অন্যদের জন্য উন্মুক্ত করেন না।

(৭০) ইমাম ত্বহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن

মুমিনদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত হচ্ছে ঐ মুমিন, যে সর্বাধিক অনুগত এবং কুরআনের অনুসরণে সর্বাধিক অগ্রগামী।

.....

ব্যাখ্যা: মুমিনদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান হচ্ছেন ঐ মুমিন, যে আল্লাহর সর্বাধিক অনুগত এবং কুরআনের সর্বাধিক অনুসারী। সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু মুমিনই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ "তোমাদের মধ্যে যে অধিক তাকওয়াবান সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী" *(সূরা আল হুজুরাত: ১৩)* সুনানের কিতাবসমূহে রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ"

কোনো অনারবের উপর আরবীর কোন ফযীলত নেই। এমনি কোন আরবীর উপর আজমীর কোন ফযীলত নেই। কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনো ফযীলত নেই। এমনি কালো লোকের উপর সাদা লোকের কোন ফযীলত নেই। তাকওয়ার মাধ্যমে কেবল একজনের

[১৪৩] হাদীছটি যঈফ: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং হাকেম এমন সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, যাতে ইনকিতা রয়েছে। ইবনে মাজাহ হা/৪২২০, মিশকাত হা/৫৩০৬।

উপর অন্যজনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরী।[১৪৪]

এই দলীলের মাধ্যমেই ঐ সমস্ত লোকদের মতভেদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়, যারা ধৈর্যশীল ফকীর এবং কৃতজ্ঞ ধনীর ব্যাপারে মতভেদ করেছেন এবং উভয়ের একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এই ক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো ফকীর উত্তম না ধনী উত্তম? এটি ধনী বা ফকীরের ব্যক্তিসত্তার আলোকে মূল্যায়িত হবে না। উভয়ের আমল ও প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করেই কে উত্তম তা নির্ধারিত হবে। আসলে এই মাসআলাটি মতভেদ করাই অর্থহীন।

কেননা তাকওয়া ও ঈমানের হাকীকত অনুযায়ীই আল্লাহর নিকট বান্দার মর্যাদা নির্ধারিত হয়। ধনাঢ্য ও দারিদ্র অনুপাতে নয়। এ জন্যই উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, মূলত দারিদ্র ও ধনাঢ্য দু'টি বাহন মাত্র। আমি এ দু'টির কোন একটিতে আরোহন করতেই পরোয়া করি না। দারিদ্র ও ধনাঢ্যতা বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা স্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধন-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে তা না দিয়ে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾

"আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন" *(সূরা আল ফাজর: ১৫)*

ধৈর্যশীল ফকীর ও কৃতজ্ঞ ধনী যদি তাকওয়ার ক্ষেত্রে সমান হয়, তাহলে তারা মর্যাদায় পরস্পর সমান হবে। তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাদের একজন অন্যজনের চেয়ে বেশী অগ্রগামী হলে অগ্রগামী ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট বেশী মর্যাদাবান। দরিদ্র ও ধনাঢ্যতা ওজন করা হবে না। বরং ওজন করা হবে ধৈর্যশীলতা ও কৃতজ্ঞতা।

আরেকদল অন্যভাবে মাসআলাটি আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, ঈমান হচ্ছে সবরের অর্ধেক এবং শোকরের অর্ধেক। সুতরাং ফকীরের উচিত সবর করা এবং ধনীর উচিত ধন-সম্পদের শুকরিয়া প্রকাশ করা। লোকেরা সবর থেকে একটি শাখা নিয়েছে ও শোকর থেকে নিয়েছে আরেকটি এবং তা নিয়ে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া শুরু করেছে। তারা খরচকারী ধনীকে ধন-সম্পদের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারী হিসাবে নির্ধারণ করেছে। আর, যেখানে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত ফকীরকে দরিদ্রতা সত্ত্বেও ধৈর্যসহকারে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার কারণে ধৈর্যশীল হিসাবে নাম দিয়েছে, সেখানে বলা হবে, তাদের উভয়ের মধ্যে যে আল্লাহর অধিক অনুগত এবং কুরআনের অনুসরণে অধিক অগ্রগামী সেই অধিক পরিপূর্ণ। আর যদি আল্লাহর আনুগত্যে ও কুরআনের

[১৪৪] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদে। সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/২৭০০। ত্বারানী মু'জামুল আওসাত্ব হা/ ৪৭৪৯।

অনুসরণে উভয়েই সমান হয়, তাহলে মর্যাদায় তারা উভয়েই সমান বলে গণ্য হবে। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন।

আর যদি উভয়ের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া ছ্বহীহ হয়, তাহলে দেখতে হবে কে উত্তম? সুস্বাস্থের অধিকারী হয়ে শোকর আদায়কারী? না অসুস্থ অবস্থায় সবরকারী? সম্মান-মর্যাদা পেয়ে আল্লাহর শোকর আদায়কারী? না অপদস্থ হয়ে ধৈর্যধারণকারী? নিরাপত্তা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী? না ভয়ে ভীত-আতঙ্কিত হয়ে সবরকারী? ইত্যাদি।

(৭১) অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللهِ تعالى

ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তার রসূলদের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দ ও মিষ্টতা-তিক্ততার প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

.....

ব্যাখ্যা: পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এই বিষয়গুলো ঈমানের রুকন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমেই জিবরীলের প্রসিদ্ধ হাদীছে ঈমান সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। জিবরীল ফেরেশতা যখন একজন গ্রাম্য লোকের আকৃতি ধারণ করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বলেছেন, ইসলাম হচ্ছে তুমি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ছ্বলাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রামাযানের ছ্বিয়াম রাখবে এবং সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করবে। আর যখন ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বলেছেন, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি, আল্লাহর রসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং আরো বিশ্বাস করবে তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি। আর জিবরীল যখন ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বলেছেন,

«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

"ইহসান হল, এমনভাবে তুমি আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে যেন তাকে তুমি দেখতে পাচ্ছো। যদি তাকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস করবে যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন"।[১৪৫]

ছ্বহীহ বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ফজরের সুন্নাত ছ্বলাতের প্রথম রাকআতে সূরাতুল কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সুরাতুল ইখলাস পাঠ করতেন।[১৪৬] এই দু'টি সূরাকেই সূরাতুল ইখলাস বলা হয়। আবার কখনো তিনি ঈমান ও ইসলামের দু'টি আয়াত পাঠ করতেন। ঈমানের আয়াতটি হচ্ছে সূরা বাকারায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

"হে মুসলিমগণ! তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যে কিতাব আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানদের প্রতি। আমরা আরো বিশ্বাস করেছি মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নাবীদেরকে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিষয়ের প্রতি। তাদের কারোর মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। আমরা সবাই তার অনুগত মুসলিম"। *(সূরা আল-বাকারা: ১৩৬)*

আর ইসলামের আয়াতটি রয়েছে সূরা আল-ইমরানে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

"বলো, হে আহলে কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা হচ্ছেঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করবো না। তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবোনা। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসেবে গ্রহন করবেনা। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাওঃ তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যই মুসলিম"। *(সূরা আলে ইমরান: ৬৪)*[১৪৭]

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের ব্যাখ্যায় তাদের জন্য বলেছেন, আমি তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান, একমাত্র

---

[১৪৫] মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ বুখারী হা/৫০, মুসলিম হা/৮।

[১৪৬] ছ্বহীহঃ মুসলিম হা/৭২৬।

[১৪৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭২৭।

আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তা হচ্ছে তুমি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নেই। ছ্বলাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং গণীমতের মালের পাঁচ ভাগের এক অংশ প্রদান করা।[১৪৮]

ইহা জানা কথা যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি বুঝাতে চান নি যে, অন্তরের বিশ্বাস ব্যতীত এই কাজগুলো ঈমান হিসাবে গণ্য হবে। কেননা তিনি একাধিক স্থানে সংবাদ দিয়েছেন যে, সৎ আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অন্তরের ঈমান জরুরী। সুতরাং জানা গেল, উপরোক্ত বিষয়গুলো কেবল তখনই ঈমান বলে গণ্য হবে, যখন তার সাথে অন্তরের বিশ্বাস যুক্ত হবে। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অনেক দলীল প্রমাণ করে যে, অন্তরের সত্যায়নের সাথে সাথে আমল না করলে কোন ব্যক্তির জন্য ঈমান সাব্যস্ত হবে না। এই সত্যায়ন ছ্বলাত ও যাকাতের বাহ্যিক অর্থের চেয়ে একটি অতিরিক্ত বিষয়। সুন্নাত ছ্বলাত ও যাকাতকেও ঈমান বলেছে। আর কুরআন ও সুন্নাহ ঈমানের অর্থকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। ঈমানের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা সূরা আনফালের ২ নং আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"প্রকৃত ঈমানদার, তারাই যাদের সামনে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হলে তাদের অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

মুমিন কেবল তারাই যারা আলাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আলাহর পথে জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ। *সূরা আল-হুজুরাত:১৫।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সেসব লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে"। *(সূরা আন-নিসা: ৬৫)*

[১৪৮] ছ্বহীহ: বুখারী হা/১৩৯৮, মুসলিম হা/১৭।

সুতরাং রাসূলের মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মন থেকে সকল প্রকার সংকীর্ণতা পরিহার না করা পর্যন্ত এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল না করা পর্যন্ত, তাদের থেকে ঈমানকে নাকোচ করা হয়েছে। সুতরাং এই দু'টি বস্তু অর্জন করা মানুষের উপর ফরয। যারা এই দু'টি জিনিস বর্জন করবে, তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা সেই পূর্ণ ঈমান আনয়নকারী বলে গণ্য হবে না, যার অধিকারীদেরকে বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করার ওয়াদা করা হয়েছে।

এ কথা বলা ঠিক নয় যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলের হাদীছে ঈমানের যেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধির হাদীছে ঈমানের যেই ব্যাখ্যা করেছেন, তা পরস্পর সাংঘর্ষিক। কেননা জিবরীলের হাদীছে ইসলামের ব্যাখ্যা করার পর ঈমানের ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং সেখানে ঈমানের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। সেই সাথে ঐ আমলগুলোও তার অন্তর্ভুক্ত হবে, যা ইসলামের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীছে জিবরীলে উল্লেখিত ইহসান তার পূর্বে উল্লেখিত ঈমানকেও নিজের মধ্যে শামিল করে নিবে। তবে আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধির হাদীছ এর বিপরীত। কেননা সেখানে প্রথমেই ঈমানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার আগে ইসলামের ব্যাখ্যা করা হয়নি।

তবে ঈমানের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) যা উল্লেখ করেছেন, তার সাথে এই জবাব সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। তাই আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীছটি শাইখের কাছে সুস্পষ্ট নয়। আরো প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আল্লাহ যেহেতু জিবরীলের হাদীছে বর্ণিত পাঁচটি কাজের চেয়েও অধিক বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, তাই কেন বলা হলো যে, ইসলামের কাজ হচ্ছে এই পাঁচটি?

এর জবাবে কেউ কেউ বলেছেন, এগুলো হচ্ছে দীনের সর্বাধিক বড় ও সর্বাধিক প্রকাশ্য নিদর্শন। বান্দা যখন এগুলো বাস্তবায়ন করবে, কেবল তখনই তার আনুগত্য ঠিক হবে। এগুলো ছেড়ে দিলে তার আনুগত্যের রশি খুলে যাবে।

মোট কথা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিনা শর্তে বান্দা তার প্রভুর কাছে আত্মসমর্পন করবে এটিই হচ্ছে দীন। আল্লাহর জন্য সকল বান্দার উপর শুধু এই ইবাদত করাই আবশ্যক। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে সক্ষম প্রত্যেক বান্দার উপর আবশ্যক হচ্ছে দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করে কেবল তারই ইবাদত করবে। এই পাঁচটি এবং এ ছাড়া অন্যান্য যা আছে, তার সবগুলোই কারো উপর বিশেষ কারণে এবং বিশেষ স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য ওয়াজিব হয়। সকল মানুষের উপর ইসলামের সকল বৈশিষ্ট ও কাজ একসাথে আবশ্যক হয় না। এগুলো থেকে কিছু বিষয় কারো উপর ফরযে কেফায়া হয়। যেমন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, সৎ কাজের আদেশ

দেয়া, অসৎ কাজের নিষেধ করা, রাজ্য পরিচালনা করা, বিচার-ফায়ছালা করা, ফতোয়া দেয়া, কুরআন পড়ানো এবং হাদীছ বর্ণনা করা ইত্যাদি।

আর বনী আদমের হকসমূহের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, যার জন্য এবং যার উপর যেই হক রয়েছে, তার সাথে সেই ব্যক্তিই খাস। তবে কাজীর ফায়ছালার মাধ্যমে কখনো সেই হক রহিত বা বাতিল হয়ে যায়। যেমন ঋণ পরিশোধ করা, আমানত ফেরত দেয়া, জবর দখলকৃত সম্পদ তার হকদারের নিকট ফেরত দেয়া, রক্তপাত, সম্পদ ও মানহানির ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এমনি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, সন্তানের অধিকার, আত্মীয়তার হক এবং এমনি আরো অনেক বিষয় ব্যক্তির সাথে খাস। কেননা এগুলো থেকে একজনের উপর যা আবশ্যক, অন্যজনের উপর তা আবশ্যক নয়।

তবে রমাদ্বানের ছিয়াম রাখা, কাবা ঘরের হাজ্জ করা, পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করার কথা ভিন্ন। এগুলো আল্লাহর হক। যাকাত মালের হক হলেও তা মূলত আল্লাহর জন্যই বের করতে হবে। আর আট প্রকার লোক হচ্ছে যাকাত ব্যয়ের খাত। এই জন্যই যাকাত যেহেতু আল্লাহর হক, তাই তা আদায় করার সময় নিয়্যাত করা জরুরী। কারো পক্ষ হতে অন্য কেউ যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায়কারীর অনুমতি ব্যতীত জায়েয হবে না। কাফেরদের কাছে যাকাত প্রদানের দাবীও করা হবে না। বান্দার হকসমূহ পরিশোধ করার সময় নিয়্যাত জরুরী নয়। একজনের পক্ষ হতে অন্যজন বান্দার হকসমূহের মধ্য হতে কোনো হক তার বিনা অনুমতিতে আদায় করলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আমরা বান্দার পারস্পরিক হকসমূহ কাফেরদের থেকেও তলব করবো। আর আল্লাহ তা'আলার হক হিসাবে বান্দার উপর যেই হক সাব্যস্ত হয় যেমন কাফ্ফারাসমূহ, তার কারণ মূলত বান্দা। এতে শাস্তির অর্থও বিদ্যমান। যাকাতের মধ্যে যেহেতু নিয়্যাত করা জরুরী এবং তা আল্লাহর হক, তাই এতে তাকলীফ বা বালেগ হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। তাই আবু হানীফা এবং তার অনুসারীদের মতে শিশু ও পাগলের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যথাস্থানে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তাকদীরের ভাল-মন্দ ও মিষ্ট-তিক্ততার প্রতি ঈমান

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাকদীরের ভাল-মন্দ ও মিষ্ট-তিক্ততা সবই আল্লাহর পক্ষ হতে, এটি বিশ্বাস করাও ঈমানের রুকনের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছে জিবরীলের বাক্য, **وتؤمن بالقدر خيره وشره** "তুমি তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনয়ন করবে"- এই কথার উপর আলোচনা করার সময় তাকদীরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

"তাদের বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমাদের হয় না। আল্লাহই আমাদের অভিভাবক এবং ঈমানদারদের তার উপরই ভরসা করা উচিত"। *(সূরা আত-তাওবা: ৫১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

"যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর কোনো ক্ষতি হলে বলে, এটা হয়েছে তোমার বদৌলতে। বলে দাও, সবকিছুই হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। লোকদের কী হয়েছে, কোনো কথাই তারা বুঝতে চেষ্টা করে না"। *(সূরা আন-নিসা: ৭৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

"হে মুহাম্মাদ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো না কেন, তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয় তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে। হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। এর উপর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট"। *(সূরা আন-নিসা: ৭৯)*

এখন প্রশ্ন হলো, সূরা নিসার উপরোক্ত ৭৮ নং আয়াতে বলা হলো (ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ) সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। আর অত্র সূরার ৭৯ আয়াতে আবার বলা হয়েছে, যে বিপদ তোমার উপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের পক্ষ হতে (তোমার উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে)"। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কিভাবে?

জবাবে বলা হয়েছে যে, **كل من عند الله** এর অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, উর্বরতা-অনুর্বরতা এবং জয়-পরাজয় ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। আর যে বিপদ তোমার

উপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে- এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার উপর যেই অকল্যাণ আগমন করে, তা তোমার পাপের কারণেই শাস্তি স্বরূপ আগমন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾

"তোমাদের উপর যে মুছিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন"। *(সূরা আশ-শূরা: ৩০)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীছ এই অর্থকে সমর্থন করে। তিনি সূরা নিসার ৭৯ নং আয়াতকে এভাবে পাঠ করেছেন, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وأنا كتبتها عليك "আর যে বিপদ তোমার উপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে। আর আমি তা তোমার উপর লিখে দিয়েছি"। আলেমদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে এখানে حسنة দ্বারা নিয়ামত উদ্দেশ্য। আর سيئة দ্বারা বালা- মুছীবত উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে حسنة দ্বারা নিয়ামত উদ্দেশ্য। আর سيئة দ্বারা পাপকাজ উদ্দেশ্য। কেউ বলেছেন, হাসানাহ দ্বারা বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা উদ্দেশ্য। আর سيئة দ্বারা উহুদ যুদ্ধের পরাজয় উদ্দেশ্য। প্রথম কথাটি এই তৃতীয় কথাকেও শামিল করে। অকাট্যভাবেই প্রথম মতটি ব্যতীত দ্বিতীয় কথা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মন্দ আমল ও মন্দ বিনিময়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সবকিছুই নির্ধারিত। দ্বিতীয় মন্দ প্রথম মন্দের শাস্তি। খারাপ বিনিময় খারাপ আমলের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় হাসানাহ অর্থাৎ উত্তম আমলের পুরস্কার প্রথম হাসানাহ তথা সৎ আমলের ছাওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহ এ কথারই প্রমাণ করে।

"যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয় তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে"- এই কথা দ্বারা কাদারীয়া সম্প্রদায় তথা তাকদীরে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের লোকদের কোন দলীল নেই। তারা বলে, ভাল বা মন্দ যাই হোক- বান্দার সকল কাজ বান্দার পক্ষ হতেই। আল্লাহর পক্ষ হতে নয়! কুরআন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছে। কিন্তু তারা পার্থক্য করে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, كل من عند الله সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। সুতরাং ভাল ও কল্যাণকর বস্তুগুলো আল্লাহর পক্ষ হতেই হয় এমনি অকল্যাণকর বিষয়গুলোও আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। কিন্তু কাদরীয়ারা বান্দার আমলের ক্ষেত্রে তা বলে না। বরং পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে তা বলে থাকে। مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ 'যে কল্যাণ তুমি লাভ করে থাকো, وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ এবং যে বিপদ তোমার উপর এসে পড়ে', আল্লাহ তা'আলার এই বাণীদ্বয় وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ 'তাদের কোন কল্যাণ

হলে এবং وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ তাদের কোনো অকল্যাণ হলে, এর মতোই। যেই হাসানাত নিয়ামত অর্থে ব্যবহৃত এবং যেই সায়্যেআত মুছীবত অর্থে ব্যবহৃত, তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পার্থক্য করেছেন। সুতরাং নিয়ামত অর্থে ব্যবহৃত হাসানাত আল্লাহর পক্ষ হতে আসে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং শাস্তি ও মুছীবত অর্থে ব্যবহৃত সায়্যেআতকে মানুষের কর্মের ফল হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কল্যাণ কেবল আল্লাহর দিকেই সম্বোধিত হয়। কেননা আল্লাহই সকল প্রকার কল্যাণ প্রদানের মাধ্যমে বান্দার উপর অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং কল্যাণের সকল প্রকারই আল্লাহর দিকে সম্বোধিত হওয়ার দাবী রাখে। আর অকল্যাণের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ উদ্দেশ্যে তা সৃষ্টি করেন। সুতরাং সেদিক থেকে তাও আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ স্বরূপ। কেননা আল্লাহ তা'আলা শুধু অকল্যাণের জন্য কোন কিছুই করেন না। আল্লাহর সকল কাজই ভাল ও কল্যাণকর।[১৪৯] এই জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাতের শুরুতে দু'আ পাঠ করার সময় বলতেন,

والخيرُ كُلُّهُ بيدَيكَ والشَّرُّ لَيسَ إليكَ

সব কল্যাণই তোমার উভয় হাতে এবং অকল্যাণ তোমার দিকে সম্বোধিত হয় না।[১৫০]

অর্থাৎ তুমি কেবল অকল্যাণের উদ্দেশ্যেই অকল্যাণ সৃষ্টি করো না। বরং আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে হিকমত রয়েছে। সেই হিকমত অনুসারে তাও কল্যাণকর। তবে তাতে কখনো কোন কোন মানুষের জন্য অকল্যাণ থাকে। এই অকল্যাণ সীমিত ও আপেক্ষিক। মাখলুকের ব্যাপক অকল্যাণ সাধন করা হতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তাই ব্যাপক অকল্যাণের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হয় না। তাই কখনো এককভাবে অকলাণের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা হয় না। বরং কখনো বলা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টিই আল্লাহর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ "প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ"। *(সূরা আর-রাদ: ১৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, كل من عند الله সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। *(সূরা আন-নিসা: ৭৮)* আবার কখনো অকল্যাণকে কোন সৃষ্টির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

[১৪৯] বাংলা ভাষায় একটি কথা আছে, আল্লাহ তা'আলা যা করেন, তা ভালোর জন্যই করেন। অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার উপর মুসীবত ও শাস্তি নাযিলের মাধ্যমে তাকে পবিত্র করতে চান অথবা সম্পদ হানি করে বা গরীব বানিয়ে তাকে সীমা লংঘনকারী হওয়া থেকে বাঁচান। সুতরাং আল্লাহর কোন কাজই হিকমত থেকে খালী নয়।

[১৫০] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৭৭১।

"হে নাবী! বলো, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার। (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। (৪) গ্রন্থিতে ফুঁ দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। (৫) আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে"। সূরা ফালাক্ব: ১-৫।

আবার কখনো অকল্যাণকে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তার فاعل বা কর্তাকে উহ্য রাখা হয়। যেমন জিনদের কথা নকল করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেন,

﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾

"আর আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না যে, পৃথিবীবাসীদের সাথে কোন খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান?[১৫১] *(সূরা জিন: ১০)*

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন এমন জিনিস সৃষ্টি করেন, যাতে কতক মাখলুক কষ্ট পায়, তাতে কোন হিকমত নেই, এটি বলা যাবে না। বরং তাতে এমন রহমত ও হিকমত থাকে, যার সঠিক পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। সুতরাং যখন নির্দিষ্ট কোন মাখলুকের অকল্যাণ হয়, তার অর্থ এ নয় যে, তা সকল মাখলুকের জন্য ক্ষতিকর। বরং অন্যসব মাখলুকের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহর বান্দাদের জন্য উপকারী হয়। যেমন ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষণ করা এবং সকল বনী আদমের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করা ইত্যাদি।

এর দাবী হচ্ছে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদেরকে সেই সব মুজেযা দ্বারা শক্তিশালী না করা, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সত্য নাবীদেরকে শক্তিশালী করেছেন। এটি ব্যাপক জন-মানবের জন্য ক্ষতিকর। তাকে মুজেযার মাধ্যমে শক্তিশালী করা হলে সে সকল মানুষকে গোমরাহ করে ফেলবে এবং তাদের দীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিবে। ভন্ড নাবীর বিষয়টি যালেম শাসকের মত নয়। কেননা যালেম শাসকের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এমন অকল্যাণ দমন করেন, যার পরিমাণ তার যুলুমের চেয়ে অনেক বেশী।

বলা হয়ে থাকে যে, যালেম শাসক দ্বারা ষাট বছর শাসিত রাজ্য শাসক বিহীন একরাত হতে উত্তম। যালেম শাসকের যুলুম অধিক হলেও তা দীনের জন্য ভাল। যালেম শাসক ঐ মুছীবতের মতই, যা মুমিন ব্যক্তিদের গুনাহ এর কাফ্ফারা স্বরূপ। যালেম শাসকের যুলুমের উপর সবর করলে মুমিনগণ ছাওয়াবের অধিকারী হবে, তারা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং তার নিকট তাওবা করবে। এমনি মুমিনদের উপর বাইরের শত্রু চাপিয়ে দেয়ার বিষয়টি। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা অনেক যালেম শাসককে নির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত শক্তিশালী রাখেন।

---

[১৫১] সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হলেও আল্লাহর সাথে আদব রক্ষার্থে এখানে তার দিকে অকল্যাণের সম্বন্ধ করা হয়নি।

কিন্তু মিথ্যুক নবীদেরকে দীর্ঘদিন শক্তিশালী রাখেন না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দ্রুত ধ্বংস করেন। কেননা দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষেত্রে তাদের ফাসাদ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾

"যদি এ নবী নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম"। *(সূরা হাক্কাহ: ৪৪-৪৬)*

আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ তোমার উপর যেই বিপদ আসে, তা তোমার কারণেই- এ কথা বলার উপকারিতা:

বান্দা যখন বিশ্বাস করবে, যে বিপদ তার উপর এসে পড়ে তা তার নিজের উপার্জন ও কাজের কারণেই আসে, তখন সে নিজের নফসের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হবে না এবং নফসকে নিয়েই স্থির হবে না। কেননা নফসের মধ্যে অকল্যাণ লুকায়িত রয়েছে। নফস্ থেকেই অকল্যাণ আসে। নফসকে দোষারোপ করার ফায়দা হচ্ছে, লোকেরা যখন কোন মানুষকে কষ্ট দিবে, তখন মানুষকে দোষারোপ করার পরিবর্তে সে নিজেকেই দোষারোপ করবে। কেননা হতে পারে এটি ঐ মুছীবতের অন্তর্ভুক্ত, যা তার উপর এসে পড়েছে। পাপ কাজের কারণেই তার উপর তা পতিত হয়েছে। এর ফলে সে তাওবা করবে এবং স্বীয় নফসের অকল্যাণ ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। সেই সাথে সৎকাজে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা চাইবে। এর মাধ্যমেই বান্দার জন্য সকল কল্যাণ অর্জিত হবে এবং সকল অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বস্তু দূরিভূত হবে।

এ জন্যই সর্বাধিক উপকারী, সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে মজবুত দু'আ হচ্ছে সূরা ফাতিহার দু'আ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন:

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

"তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও। তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো। যাদের উপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি"। *(সূরা আল ফাতিহা: ৫-৭)*

আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোনো বান্দাকে এই পথ দেখান, তখন তাকে আনুগত্যের কাজে সহযোগিতা করেন এবং পাপকাজ বর্জনে সাহায্য করেন। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোন অকল্যাণ হয় না। তবে মানুষের নফসের দ্বারা পাপ কাজ সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য। তাই সবসময় মানুষের নফস হিদায়াতের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক মানুষ হিদায়াতের প্রতি পানাহারের চেয়েও অধিক মুখাপেক্ষী।

কতক মুফাস্সির বলে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু হিদায়াত করেছেন, তাই নতুন করে আবার হিদায়াত চাওয়া হবে কেন? সুতরাং এখানে হিদায়াত চাওয়ার অর্থ হচ্ছে

হিদায়াতের উপর অটুট রাখা অথবা অতিরিক্ত হিদায়াত তলব করা। তাদের এই কথা পুরোপুরি ঠিক নয়; বরং বান্দা তার সকল ইবাদত কিভাবে করবে এবং কোন কাজগুলো বর্জন করবে, সে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যেক দিনই শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সাথে আমল করার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার প্রতি ইলহামেরও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা আল্লাহ যদি ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য বান্দাকে ধাবিত না করেন, তাহলে শুধু ইলম যথেষ্ট নয়। তখন ইলম তার বিপক্ষে হুজ্জতে পরিণত হবে এবং বান্দা হিদায়াত প্রাপ্ত বলে গণ্যও হবে না। এমনি বান্দা আরো মুখাপেক্ষী যে, তাকে তার সৎ নিয়্যাত অনুযায়ী আমল করার উপর সক্ষম করা হবে। কেননা আমরা সত্য বিষয়সমূহ থেকে যা জানি না, তা আমাদের জানা বিষয়গুলোর চেয়ে অনেকগুণ বেশী। আমরা অলসতা ও গাফিলতি করে যা করতে চাইনা, তা সম্ভবত ঐ সমস্ত বিষয়ের অনুরূপ বা তার চেয়ে বেশী অথবা একটু কম, যা আমরা করতে চাই। এমনি যা করতে আমরা সক্ষম নই, তা হতে পারে ঐ সব বিষয়ের মতই যা করতে আমরা সক্ষম কিংবা যা আমরা করার ইচ্ছা করি। যেসব বিষয় আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে জানি, সম্ভবত তার অধিকাংশ বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে জানি না। এসব বিষয় গণনা করার উর্ধ্বে।

সুতরাং পূর্ণ হেদায়াতের প্রতি আমরা খুবই মুখাপেক্ষী। যার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো পূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছে, সে হেদায়াতের উপর অটুট রাখার প্রার্থনা করবে। এটি হচ্ছে হিদায়াতের সর্বশেষ স্তর। এর পরে যেই হিদায়াত রয়েছে, তা হচ্ছে অন্য একটি হিদায়াত। আর তা হচ্ছে আখিরাতে জান্নাতের রাস্তা দেখিয়ে দেয়া।

এ জন্যই মুমিনদেরকে প্রত্যেক ছ্বলাতের মধ্যে এই দু'আ করতে বলা হয়েছে। কেননা এর প্রতি তাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুতরাং এই দু'আর প্রতিই তাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে কল্যাণ অর্জনের জন্য এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার জন্য এই দু'আকে সর্ব বৃহৎ মাধ্যম হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। কুরআন বর্ণনা করেছে যে, পাপকাজ ও অকল্যাণ বান্দার নফস থেকেই হয়ে থাকে। যদিও তা আল্লাহ সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। আরো জানা দরকার যে, সকল প্রকার কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ হতেই। ব্যাপারটি যেহেতু এ রকমই, তাই আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। বান্দার উচিত সে তার গুনাসমূহ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করবে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ কল্যাণ আনয়ন করতে সক্ষম নন। এই বিশ্বাসই আল্লাহর তাওহীদকে আবশ্যক করে, তার উপর ভরসা করাকে সাব্যস্ত করে, একমাত্র তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহবান জানায় এবং গুনাহ থেকে তার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করার দাবী করে।

এসব বিষয়ই নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাতের মধ্যে একত্রিত করে আদায় করতেন। ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন,

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْد وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ»

"হে আল্লাহ! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা। আমি তোমার অনেক পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা করছি। আকাশ-পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতোদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য। হে আল্লাহ! তুমি প্রশংসা, বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী! তোমার প্রশংসায় বান্দা যা বলে, তুমি তার চেয়েও অধিক প্রশংসার হকদার। আমরা সকলেই তোমার বান্দা। অতঃপর তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন,

«أللهم لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

"হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তুমি যা বারণ কর তা দেয়ার কেউ নেই। আর তোমার পাকড়াও হতে কোন বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না"।[১৫২]

এই দু'আতে আল্লাহর তাওহীদের মধ্য হতে সৃষ্টি, নির্ধারণ, শুরু ও পরিণামের দিক থেকে তাওহীদুর রুবুবীয়াতের বাস্তবায়ন হয়েছে। তিনিই দানকারী ও রহিতকারী। তিনি যা দান করেন, তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তিনি যা প্রতিরোধ করেন, কেউ তা দান করতে পারে না। এখানে তাওহীদুর উলুহীয়াতের মধ্য হতে আল্লাহর শরী'আত, আদেশ ও নিষেধেরও বাস্তবায়ন হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদেরকে তাদের পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বাহ্যিক রাজত্ব, সম্মান ও নের্তৃত্ব দান করেন। সেই সাথে কাশফ ও কারামতের অধিকারীদেরকে বাতেনী রাজ্যও দান করেন।[১৫৩]

হে আল্লাহ! কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা তোমার শাস্তির মোকাবেলায় কোন উপকারে আসে না। অর্থাৎ মর্যাদাবানের মর্যাদা ও বিত্তশালীর বিত্ত আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্ত এবং উদ্ধার করতে পারবে না। এ জন্যই নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, لاينفعه منك "তোমার শাস্তি হতে মুক্ত হতে কোন মর্যাদাবানকে মর্যাদা উপকার করবে না"। এটি বলেননি لاينفعه عندك "তোমার নিকট তাকে উপকার করবে না"। কেননা এরূপ বলা হলে

[১৫২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯৯, মুসলিম মুসলিম হা/ ৪৭৭।

[১৫৩] এখানে কাশফ ও কারামত বলতে সুফীদের কাল্পনিক কাশফ ও বানোয়াট কারামত উদ্দেশ্য নয়। যতদূর জানা যায়, এখানে আল্লামা ইবনু আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) সুফীদের ঐ কাশফ উদ্দেশ্য করেননি, যার মাধ্যমে সুফীরা তাদের ধারণা অনুযায়ী লাউহে মাহফুয এবং আল্লাহর আরশ-কুরসী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইলম, আমল ও তাকওয়ার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তার কতিপয় বান্দার জন্য তার পরিচিতির এমন কিছু উন্মুক্ত করেন, যা অন্যদের জন্য করেন না। (আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন)

এই ধারণা হতো যে, মর্যাদাবানের মর্যাদা আল্লাহর নৈকট্য দান না করলেও কোন ক্ষতি করবে না। সুতরাং রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথার মধ্যে তাওহীদের বাস্তবায়ন রয়েছে। একই সাথে তাতে আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ -এর মর্মার্থেরও বাস্তবায়ন হয়েছে। *(সূরা আল ফাতিহা: ৫)*

যদিও ধরে নেওয়া হয় যে, নির্দিষ্ট কোন একটি জিনিস স্বতন্ত্রভাবেই অর্জিত হয় এবং সেটি কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তার সহজ করণের ফলেই হয়ে থাকে, তখন সেটি কেবল আল্লাহর কাছেই কামনা করা হবে, সে ব্যাপারে কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে তা চাওয়া হবে না। সে ব্যাপারে কেবল তার নিকটেই ফরিয়াদ করা হবে এবং তার কাছেই সাহায্য চাওয়া হবে। সুতরাং আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এবং আল্লাহর কাছেই সকল অভিযোগ। আমরা তার কাছেই সাহায্য চাই এবং তার কাছেই ফরিয়াদ করি। তার সাহায্য ব্যতীত অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা যায় না এবং তার তাওফীক ছাড়া সৎকাজ করা যায় না। কিভাবে এটি হতে পারে? কোন জিনিসই বিনা মাধ্যমে অর্জিত হয় না। মূলত কোন জিনিস অর্জিত হওয়ার জন্য অন্যান্য আসবাব বা মাধ্যম ও উপকরণ দরকার। সেই সাথে তা অর্জিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক ও প্রতিকূল পরিবেশ রয়েছে তা দূরিভূত হওয়াও জরুরী। প্রত্যেক কাজ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে মাধ্যম বা উপকরণ এবং তার সহযোগী। রয়েছে তার প্রতিবন্ধক। সহযোগী যদি কর্ম বাস্তবায়নে সহযোগিতা না করে এবং প্রতিবন্ধকও যদি দূর না হয়, তাহলে ফলাফল অর্জিত ও বাস্তবায়িত হয় না।

বৃষ্টি একাই ফসল ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে না। বৃষ্টির সাথে আলো-বাতাস, উর্বর ভূমি ইত্যাদি থাকা জরুরী। তারপরও ফসলের জন্য ক্ষতিকর বস্তু ও আপদ-বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত ফসল ও ফল পূর্ণ হয় না। শুধু পানাহার শরীরকে পুষ্ট করে না। শরীরে খাদ্যকে হজমকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি স্থাপন করা হয়েছে। তার মাধ্যমেই কেবল খাবার হজম হয় এবং শরীর পুষ্ট করে। এসবগুলো মিলেও কোন উপকার করে না, যতক্ষণ না খাদ্যকে বিনষ্টকারী বস্তু রোগ-ব্যাধি শরীর থেকে দূর করা না হয়।

যেই মাখলুক আপনাকে কিছু দেয় অথবা যে আপনাকে সাহায্য করে, তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা, শক্তি ও কাজ করার প্রবণতা স্থাপন করা সত্ত্বেও অনেকগুলো উপকরণ ছাড়া তার কাজ পূর্ণ হয় না। এই উপকরণগুলো তার মূল শক্তি থেকে ভিন্ন। এই উপকরণগুলো উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। যদিও সে প্রভাবশালী ও সম্মানিত বাদশাহ হয়। কর্ম সম্পাদনের সহায়ক উপকরণ থেকে তার বিরোধী শক্তিও দূরিভূত হওয়া জরুরী। সুতরাং উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য সহায়ক শক্তি জরুরী এবং প্রতিবন্ধক না থাকাও জরুরী। সুতরাং প্রত্যেক সহায়ক উপকরণ প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণের শক্তির অংশ বিশেষ। পৃথিবীতে কোন বস্তুই এককভাবে কোন দাবী ও চাহিদাকে পূর্ণ করে না। যদিও সেটাকে

দাবী পুরণকারী হিসাবে নামকরণ করা হয়ে থাকে এবং তার সকল সহায়ক শক্তিকে শর্ত হিসাবে নামকরণ করা হয়। এটি একটি বাহ্যিক মতভেদ।

সুতরাং কোনো মাখলুক নিজস্ব পূর্ণ ক্ষমতা বলে এবং অন্যের সাহায্য ব্যতীত কর্ম সম্পাদন করে বলে ধারণা করা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা মাখলুক একাই নিজের কল্যাণ সাধন করতে কিংবা নিজের উপর থেকে অকল্যাণ দমন করতে সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি এটি ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে, তার জন্য আল্লাহর তাওহীদ বুঝার দরজা উন্মুক্ত হবে। সে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত পাওয়ার হকদার হওয়া তো দূরের কথা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে কোন কিছু চাওয়াও বৈধ নয়। সেই সাথে আরো বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা করা কিংবা অন্যের কাছে কামনা করাও ঠিক নয়।

(৭২) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ على مَا جَاءُوا به

আমরা ঈমানের সকল বিষয়ের প্রতিই বিশ্বাস করি। রসূলদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করি না। তারা যা নিয়ে এসেছেন, তাতে তাদের সকলকেই বিশ্বাস করি।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে পূর্বে উল্লেখিত ঈমানের মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশেষ করে যেসব বিষয়ের প্রতি বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। শাইখ বলেন, আমরা কোন রাসূলের মধ্যেই পার্থক্য করি না। অর্থাৎ আমরা তাদের মাঝে এরূপ পার্থক্য করি না যে, তাদের কারো প্রতি ঈমান আনয়ন করি এবং কারো প্রতি কুফুরী করি। বরং আমরা তাদের সকলের প্রতিই ঈমান আনয়ন করি এবং তাদের সকলকেই সত্যায়ন করি। কেননা যে ব্যক্তি কতক রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করল এবং কতকের প্রতি কুফুরী করল, সে মূলত সকল রাসূলের প্রতিই কুফুরী করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলদের সাথে কুফুরী করে, আল্লাহ ও তার রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে আমরা কারো প্রতি ঈমান আনয়ন করবো ও কারো প্রতি ঈমান আনয়ন করবো না। আর তারা কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কাফের। আর এহেন কাফেরদের জন্য আমি অবমাননাকর শাস্তি তৈরী করে রেখেছি"। *(সূরা আন-নিসা: ১৫০-১৫১)*

এ ধরণের লোক কাফের হওয়ার কারণ এই যে, তারা যে কারণে কতক রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং অন্য যেসব রাসূলের প্রতি তারা ঈমান আনে নাই, তাদের মধ্যেও সেই কারণ বিদ্যমান। যেই রাসূলের প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে, তিনি তো বাকী রাসূলদেরকেও সত্যায়ন করেছেন। সুতরাং যখন কেউ কোনো একজন রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না, তখন সে কাফের হিসাবে গণ্য হবে। যদিও সে নিজেকে মুমিন বলে মনে করে। কেননা যেই রাসূলের প্রতি সে ঈমান এনেছে, তিনি সকল রাসূলের সত্যায়ন সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। এতে সে পাক্কা কাফের বলেই গণ্য হবে। অথচ সে ধারণা করে যে, সে একজন মুমিন। সে ঐ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। ওরা তারাই, যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক করে যাচ্ছে।

(৭৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وَسَلَّمَ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ وَهُمْ فِي مَشِيئَتِه وَحُكْمِه إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِه كَمَا ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِه ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِه وَشَفَاعَة الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِه ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلى جَنَّتِه وَذَلِكَ بِأَنَّ الله تعالى مَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِه وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نَكَرَتِه الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِه وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وِلَايَتِه اللَّهُمَّ يَا وَلِيَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِه ثَبِّتْنَا على الْإِسْلَامِ حتى نَلْقَاكَ به

উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্য হতে তাওহীদে বিশ্বাসী যেসব লোক কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত হবে, তারা মৃত্যুর পর চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যদিও তারা তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করে। বিশেষ করে যখন তারা আল্লাহর মারেফতসহ তার সাথে সাক্ষাত করবে। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমের আওতায়। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের গুনাসমূহ ঢেকে রাখবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেন, "আল্লাহ অবশ্যই শির্ক করাকে মাফ করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য যত গুনাহ হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করেছে সে তো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গুনাহের কাজ করেছে"। *(সূরা আন নিসা: ৪৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আল্লাহ কেবল শির্ক করার গুনাহ মাফ করবেন না। এ ছাড়া আর যাবতীয় গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, সে গোমরাহীর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে"। *(সূরা আন নিসা: ১১৬)* আর তিনি যদি চান, স্বীয় ইনসাফে জাহান্নামের আগুনে

নিক্ষেপ করে তাকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমতে এবং তার অনুগত বান্দাদের শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করবেন ও জান্নাতে পাঠাবেন। এটি এই জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তার মারেফতের অধিকারীদের অভিভাবক হয়েছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে ঐসব লোকের মত করেননি, যারা তাকে চিনতে (তার মারেফত হাসিল করতে) না পেরে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর বেলায়াত অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। হে আল্লাহ! হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক! তোমার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত আমাদেরকে ইসলামের উপর ছাবেত রাখো।

.....

ব্যাখ্যা: উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্য হতে তাওহীদে বিশ্বাসী যেসব লোক কবীরা গুনাহ্য় লিপ্ত হবে, তারা মৃত্যুর পর চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না- এই বাক্যের মাধ্যমে শাইখ খারেজী ও মুতাযিলাদের প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলেঃ কবীরা গুনাহকারীরা মৃত্যুর পর চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। খারেজীরা কবীরা গুনাহকারীদেরকে কাফের বলে। আর মুতাযিলারা বলেঃ তারা ঈমান থেকে বের হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু কুফুরীতে প্রবেশ করবেনা। বরং তাদের রয়েছে **منزلة بين منزلتين** অর্থাৎ ঈমান ও কুফুরীর মধ্যবর্তী একটি স্তর।

শাইখের উক্তি: আহলে কিবলার কেউ কোন গুনাহ করলেই আমরা তাকে কাফের বলি না। যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে সেই গুনাহয় লিপ্ত হয়'- এর ব্যাখ্যা করার সময় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকেরা কবীরা গুনাহ করে মৃত্যু বরণ করলে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। উম্মতে মুহাম্মাদীকে খাস করার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মাদী ব্যতীত অন্যান্য উম্মতের কবীরা গুনাহকারী লোকদের হুকুম অন্য রকম হবে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত উম্মতদের শরী'আত রহিত হওয়ার পূর্বে যদি তাদের কেউ কবীরা গুনাহয় লিপ্ত থেকে মৃত্যু বরণ করে থাকে। তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। কেননা নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, ঐ ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের হবে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে। এখানে তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীকে খাস করেন নি। বরং শুধু ঈমান উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বিষয়টি ভালভাবে বুঝা উচিত। কেননা আক্বীদায়ে ত্বহাবীয়ার কোন কোন কপিতে উম্মতে মুহাম্মাদী কথাটি নেই। في النار বাক্যটি لايخلدون এর মা'মুল। ছন্দ ঠিক রাখার জন্য এখানে মা'মুলকে আমেলের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। في النار বাক্যটি أهل الكبائر এর খবর নয়। যেমনটি বুঝেছেন আক্বীদায়ে ত্বহাবীয়ার কোনো কোনো ভাষ্যকার।

কবীরা গুনাহ এর সংজ্ঞা

কবীরা গুনাহ এর সংজ্ঞা ও সংখ্যা নির্ধারণে আলেমগণ অনেক মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, কবীরা গুনাহ সাতটি। কেউ বলেছেন, সতেরটি। কেউ বলেছেন, সকল শরী'আত যা হারাম হওয়ার উপর একমত হয়েছে, তাই কবীরা গুনাহ। কেউ কেউ বলেছেন, যা আল্লাহর মারেফতের দরজাকে বন্ধ করে দেয়, তাই কবীরা গুনাহ। কতিপয় আলেম বলেছেন, যা শরীর ও সম্পদ ধ্বংস করে, তাই কবীরা গুনাহ। কেউ বলেছেন, অন্যান্য গুনাহর তুলনায় যাকে বড় বলা হয়েছে, তাই কবীরা গুনাহ। কেউ বলেছেন, আসলে জানা নেই যে, কোনগুলো কবীরা গুনাহ। আরো বলা হয়েছে যে, লাইলাতুল কদরের ন্যায় এগুলো গোপন রাখা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এগুলোর সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি। কেউ বলেছেন, যেসব গুনাহর জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে অথবা যার জন্য জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে কিংবা যার কারণে লা'নত করা হয়েছে অথবা যাতে লিপ্ত ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোই কবীরা গুনাহ। সর্বশেষ মতটিই সর্বোত্তম।

ছ্বগীরা গুনাহ এর সংজ্ঞাতেও আলেমগণ মতভেদ করেছেন। আলেমদের কেউ কেউ বলেছেন, যেই গুনাহ এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়নি, তাই ছ্বগীরা গুনাহ। কোন কোন সালাফ বলেছেন, প্রত্যেক এমন গুনাহকে ছ্বগীরা বলা হয়, যার জন্য লা'নত, কিংবা আল্লাহর ক্রোধ অথবা জাহান্নামের শাস্তির ঘোষণা করা হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যেই গুনাহ এর জন্য দুনিয়াতে কোনো নির্ধারিত শাস্তি এবং আখিরাতের وعيد (ধমক) আসেনি। অঈদ দ্বারা জাহান্নামের আযাবের ধমক কিংবা আল্লাহর লা'নতের অথবা আল্লাহর গযবের ধমক উদ্দেশ্য। আখিরাতের অঈদ তথা জাহান্নামের শাস্তির ধমক দুনিয়ার শাস্তির মতই। অর্থাৎ যে সমস্ত অপরাধের কারণে দুনিয়াতে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, এখানে তা উদ্দেশ্য। দুনিয়াতে অপরাধীর উপর যেই তাযীর (অনির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করা হয়, তা আখিরাতে আগুন বা লা'নত কিংবা আল্লাহর ক্রোধ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ভয় দেখানোর মতই।

কবীরা গুনাহ এর পরিচয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখিত সর্বশেষ সংজ্ঞাটি এ বিষয়ে অন্যান্য সংজ্ঞার উপর কৃত আপত্তি হতে মুক্ত। কেননা এতে কেবল ঐ সমস্ত গুনাহ্ই কবীরা হিসাবে গণ্য হবে, যা দলীলের মাধ্যমে কবীরা হিসাবে প্রমাণিত। যেমন শির্ক করা, হত্যা করা, যেনা করা, যাদু করা, সতী সাধবী মুমিন নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ইত্যাদি আরো অনেক গুনাহ।

এই মত অর্থাৎ কবীরাহ গুনাহএর সংজ্ঞার ব্যাপারে সর্বশেষ মতটিকে অন্যান্য মতের উপর প্রাধান্য দেয়ার একাধিক কারণ রয়েছে।

(১) এই মতটি সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস, ইবনে উয়াইনা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহি. এবং অন্যান্য ইমাম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾

"তোমরা যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকো, যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাটো খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেবো এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো"। *(সূরা আন নিসা: ৩১)*

সুতরাং যাদেরকে আল্লাহর ক্রোধের মাধ্যমে কিংবা লা'নতের মাধ্যমে অথবা আল্লাহর আগুনের মাধ্যমে ধমক দেয়া হয়েছে, তারা এই সম্মানজনক ওয়াদা প্রাপ্ত হবে না। এমনি যে হদ্দ তথা শরী'আতের নির্ধারিত দণ্ডবিধি কায়েমযোগ্য অপরাধ করেছে তার ছগীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ক্ষমা হবে না।

(৩) আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহর রাসূল যেসব গুনাহ এর কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই কবীরা গুনাহ এর এই সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং এটি এমন একটি সংজ্ঞা শরী'আত প্রবর্তকের বক্তব্য থেকেই নেয়া হয়েছে।

(৪) এই সংজ্ঞার মাধ্যমে কবীরা ও ছগীরা গুনাহ এর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য মতামতের মাধ্যমে তা করা সম্ভব নয়। আর যারা বলে কবীরা গুনাহ মাত্র সাতটি, সতেরটি কিংবা সত্তরের কাছাকাছি, তাদের কথা নিছক দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ তা দলীল বিহীন কথা। আর যারা বলেন, সকল নবীর শরী'আত যা হারাম হওয়ার উপর একমত হয়েছে, তাই কবীরা গুনাহ। যেসব গুনাহ হারাম হওয়া বা হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ ছিল, তা নয়। তাদের কথার অনিবার্য দাবী হচ্ছে, মদ পান করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, কতক মাহরামকে বিবাহ করা, দুগ্ধসম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যাকে বিবাহ করা হারাম, তাকে বিবাহ করা এবং অনুরূপ গুনাহ কবীরার অন্তর্ভুক্ত নয়! অন্যদিকে ইয়াতীমের মাল থেকে এক দানা পরিমাণ চুরি করা, হালকা একটি মিথ্যা বলাও কবীরার অন্তর্ভুক্ত! এটি একটি বাতিল কথা।

যারা বলেন, আল্লাহর পরিচয় জানার ব্যাপারে যা বাধা হয়ে দাঁড়ায় অথবা যা শরীর ও মাল ধ্বংস করে দেয়, তাই কবীরা গুনাহ। এই কথার দাবী হচ্ছে মদ পান করা, শুকরের গোশত খাওয়া, মৃত জীব-জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা, রক্ত পান করা, সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া কবীরা নয়। এটি একটি বাতিল কথা।

যারা বলেন কবীরা গুনাহগুলোকে ছোট গুনাহএর তুলনায় কবীরা বলা হয়েছে অথবা আল্লাহ তা'আলা যা করতে নিষেধ করেছেন, তাই কবীরা, তাদের কথার দাবী হচ্ছে,

গুনাহ মূলত কবীরা ও ছগীরা এই দুইভাগে বিভক্ত নয়। এটিও বাতিল কথা। কেননা এই কথা গুনাহকে কবীরা ও ছগীরা এই দুইভাগে বিভক্তকারী দলীলসমূহের পরিপন্থী।

যারা বলেন, কবীরা গুনাহ কোন্‌গুলো? তা জানা নেই অথবা তা অস্পষ্ট, তার কথার জবাবে বলা যায় যে, তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা সেগুলো জানেন না। এতে এটি প্রমাণিত হয় না যে, অন্যরা তা জানেন না। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদিও তারা তাওবা করা ব্যতীত মৃত্যু বরণ করে। কেননা তাওবা হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা সকল গুনাহ মুছে ফেলে। এতে কোন মতভেদ নেই। খেলাফ শুধু ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তাওবা ছাড়াই মারা গেল।

শাইখ আরো বলেন, যদি তারা আল্লাহর মারেফত সহকারে মৃত্যু বরণ করে। শাইখ যদি عارفين (আল্লাহকে চেনা অবস্থায়) এর বদলে مؤمنين (মুমিন অবস্থায়) বলতেন, তাহলে ভালো হতো। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারল, কিন্তু ঈমান আনয়ন করেনি সে কাফের। জাহাম বিন সাফওয়ানই কেবল শুধু মারেফতকে ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করেছে। তার কথা প্রত্যাখ্যাত এবং বাতিল। যেমন ইতিপূর্বে তার কথা আলোচিত হয়েছে। ইবলীস তার প্রভু সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো। আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

"ইবলীস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করবো এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তাদের মধ্য হতে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত"। *(সূরা আল হিজর: ৩৬-৪০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

"সে বললো, তোমার ইজ্জতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই, তবে একমাত্র যাদেরকে তুমি একনিষ্ঠ করে নিয়েছো তাদেরকে ছাড়া"। (সূরা ছ্বদ: ৮২-৮৩)

এমনি ফেরাউন এবং অধিকাংশ কাফেরই আল্লাহকে চিনতো। কিন্তু এই চেনা তাদেরকে মুমিনে পরিণত করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক জানে না"। *(সূরা লুকমান: ২৫)* আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (٨٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾

"তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা জানো তাহলে বলো, এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা বসবাস করেছে তারা কার? তারা নিশ্চয়ই বলবে, সবই আল্লাহ্র। বলো, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, সাত আসমান ও মহান আরশের অধিপতি কে? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ্। বলো, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জেনে থাকো তাহলে বলো, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব? আর কে তিনি যিনি আশ্রয় দেন এবং তার মুকাবেলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না? তারা নিশ্চয়ই বলবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত। বলো, তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?" *(সূরা মুমিনূন: ৮৪-৮৯)*

এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, কাফেররাও জানতো যে, আল্লাহ আছেন, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সম্ভবত শাইখ মারেফত দ্বারা আল্লাহর এমন পরিপূর্ণ মারেফত উদ্দেশ্য করেছেন, যা হিদায়াত আবশ্যক করে। মনে হয় শাইখ এখানে তরীকতের অনুসারীদের (সুফীদের) প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তারা কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হওয়ার অনেক উর্ধ্বে। শুধু তাই নয়; তারা হচ্ছেন মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং তাদের অভিভাবক ও নেতা।[১৫৪]

অতঃপর শাইখ বলেন, তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমের অধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের গুনাহসমূহ ঢেকে রাখবেন আর ইচ্ছা করলে স্বীয় ফযল ও করমে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা শির্ক এবং অন্যান্য গুনাহ এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

---

[১৫৪] শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রাহিমাহুল্লাহ) এর এই কথার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। তিনি এর দ্বারা কোন্ শ্রেণীর সুফীদেরকে বুঝিয়েছেন, তা পরিষ্কার নয়। তার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, এখানে ঐ শ্রেণীর তরীকাপন্থী লোক উদ্দেশ্য, যারা শুধু ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকেন, দুনিয়ার মোহ ও লোভ-লালসা থেকে দূরে থাকেন এবং সকল বস্তুর উপর আল্লাহর ভালোবাসা ও মর্জিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত আর কিছু রেখে যান নি। তরীকাপন্থী নামে ছাহাবীদের মধ্যে কোন দলের অস্থিত্ব ছিল না। তারা সকলেই কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী মুসলিম ছিলেন। আমাদেরকেও তাই হতে হবে। আর যদি শাইখের কথা দ্বারা ঐ সব সুফী-সাধক উদ্দেশ্য হয়, যাদের মধ্যে রয়েছে শির্ক- বিদ'আতসহ শরী'আতের সুস্পষ্ট বিরোধীতা ও পাপাচারিতা, তাহলে শাইখের কথা অগ্রহণযোগ্য। কেননা তারা উম্মতের খাস লোক হওয়া তো দূরের কথা; তাদের কার্যকলাপ একজন সাধারণ মুসলিমের আচরণের ধারে কাছেও নয়।

কেননা শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। যেমন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি শির্কের গুনাহকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহকে স্বীয় ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যা ক্ষমা করা জায়েয, তাকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। আর যা ক্ষমা করা হবে না, তাকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না। শির্ক এবং অন্যান্য গুনাহ যদি একই রকম হতো, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো অর্থই হতো না। কেননা তিনি শির্ক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করাকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর তাওবার মাধ্যমে কবীরা ও ছ্বগীরা গুনাহ ক্ষমা করার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এটি আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে ঝুলন্ত রাখেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"হে নবী! বলো, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। *(সূরা আয-যুমার: ৫৩)*

সুতরাং তাওবা ছাড়াই যেই গুনাহ ক্ষমা করাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে, তা হচ্ছে শির্ক ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গুনাহ। অতঃপর শাইখ বলেন, উম্মতের কবীরা গুনাহকারী লোকেরা তাওবা ছাড়া মারা যাওয়ার পর জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমাও করতে পারেন। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তার মারেফত পন্থীদের বন্ধু। শাইখের এই কথার মধ্যে সামান্য আপত্তি রয়েছে। যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর শাইখ বলেছেন, اللَّهُمَّ يَا وَلِيَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِه مَسِّكْنَا بِالإِسْلَامِ "হে আল্লাহ! হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক! আমাদেরকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় রাখো"।

আক্বীদায়ে ত্বহাবীয়ার অন্য কপিতে مَسِّكْنَا بِالإِسْلَامِ এর স্থলে ثَبِّتْنَا على الْإِسْلَامِ حتى نلقاك به 'মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে ইসলামের উপর ছাবেত রাখুন'- এই বাক্যটি রয়েছে। শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় কিতাব 'আল ফারুক' এ নিজস্ব সনদে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আয় বলতেন,

اللَّهُمَّ يَا وَلِيَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِه مَسِّكْنَا بِالإِسْلَامِ حتى أَلْقَاكَ عليه

"হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক! তোমার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত আমাদেরকে ইসলামের উপর ছাবেত রাখো"।[১৫৫]

[১৫৫] সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/১৮২৩।

এই দু'আ র মাধ্যমে উপরোক্ত বক্তব্য সমাপ্ত করার কারণ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ নিয়ে মৃত্যু বরণ করলে যেহেতু আল্লাহর আযাবের ভয় রয়েছে, তাই শাইখ এই সম্পর্কে আলোচনা খতম করার সময় আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন যে, তিনি যেন ইসলামের উপর অটুট রাখেন এবং এর উপরই মৃত্যু দান করেন। আমীন।

আল্লাহর সত্যবাদী নাবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম অনুরূপ দু'আ করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾

"হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছো। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখিরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। ইসলামের উপর আমাকে মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত করো"। *(সূরা ইউসুফ: ১০১)*

এমন দু'আ ঐ সমস্ত যাদুকরগণও করেছিলেন, যারা মূসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি ঈমান আনয়ন কারীদের প্রথম সারির লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তারা বলেছিলেন,

﴿وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾

"তুমি যে ব্যাপারে আমাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছো, তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমাদের রবের নিদর্শসমূহ যখন আমাদের সামনে এসেছে তখন আমরা তা মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমাদের সবর দান করো এবং মুসলিম থাকা অবস্থায় আমাদেরকে মৃত্যু দান করো। *(সূরা আল আরাফ: ১২৬)*

যারা এই দু'টি আয়াত দ্বারা মৃত্যু কামনা করা জায়েয হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্য এখানে কোন দলীল নেই। কেননা এখানে শুধু মৃত্যু কামনা করা হয়নি; বরং ইসলামের উপর মৃত্যু কামনা করা হয়েছে। তা ছাড়া উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু কামনা করা হয়নি। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

(৭৪) অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنَرَى الصلاة خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَة وعلى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

আমরা আহলে কিবলার প্রত্যেক নেককার ও বদকারের পিছনে ছ্বলাত আদায় করা জায়েয মনে করি এবং তাদের মৃতদের উপর জানাযা ছ্বলাত পড়া ও তাদের জন্য দু'আ করাকেও বৈধ জানি।

.....

ব্যাখ্যা: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ» "তোমরা প্রত্যেক ভালো ও পাপী মুসলিমের পিছনে ছ্বলাত পড়ো"।[১৫৬]

মাকহুল আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারকুতনী এটি বর্ণনা করার পর বলেন, মাকহুল আবু হুরায়রার সাথে সাক্ষাত করেননি। হাদীছের সনদে রয়েছে সমালোচিত রাবী মুআবীয়া বিন সালেহ। তবে ইমাম মুসলিম তার রচিত ছ্বহীহ মুসলিম শরীফে তার হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ইমাম দারকুতনী এবং আবু দাউদও মাকহুলের সনদে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের ইমামতিতেই তোমাদের উপর ছ্বলাত আদায় করা ওয়াজিব। চাই সে নেককার হোক কিংবা বদকার হোক। প্রত্যেক আমীরের সাথেই তোমাদের উপর জিহাদ করা আবশ্যক। চাই সে নেককার হোক অথবা পাপাচারী হোক। যদিও সে কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হোক।

ছ্বহীহ বুখারীতে রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে জামা'আতে ছ্বলাত আদায় করতেন।[১৫৭] আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও তাই করতেন। আর হাজ্জাজ ছিল যালিম ও ফাসিক।

ছ্বহীহ বুখারীতে আরো আছে যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা (যালেম শাসকরা) ছ্বলাতে তোমাদের ইমামতি করবে। যদি তারা ঠিকমত ছ্বলাত আদায় করে, তাহলে তারা ছাওয়াব পাবে। তোমরাও ছাওয়াব পাবে। আর যদি বেঠিক করে, তাহলেও তোমাদের ছ্বলাত হয়ে যাবে এবং ছাওয়াবও পাবে। আর তাদের ছ্বলাত তাদের বিপক্ষে যাবে।[১৫৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহু ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তার পিছনে

---

[১৫৬] যঈফ: দারাকুৎনী হা/১০ কিতাবুল ঈদাঈন, যঈফ জামি হা/৩৪৭৮।

[১৫৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৬৬০।

[১৫৮] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৯৪।

ছ্বলাত পড়ো। আর যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে মৃত্যু বরণ করে, তোমরা তার জানাযা ছ্বলাত পড়ো। ইমাম দারকুতনী একাধিক সনদে হাদীছটি বর্ণনা করার পর যঈফ বলেছেন।

হে মুসলিম ভাই! আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর এবং আমাদের উপর রহম করুন। জেনে রাখুন, এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, মুসলিমদের জন্য ঐ ব্যক্তির পিছনে ছ্বলাতের ইকতেদা করা জায়েয, যার নিকট থেকে বিদ'আত বা ফাসেকীর কোনটিই প্রকাশিত হয়নি। মুক্তাদীর জন্য ইমামের আক্বীদাহ সম্পর্কে জানা জরুরী নয়। ইমামের আক্বীদাহ পরীক্ষা ও যাচাই করাও আবশ্যক নয়। তাকে এই কথা জিজ্ঞেস করাও ঠিক নয় যে, আপনার আক্বীদাহ-বিশ্বাস কী বা কেমন? বরং যার অবস্থা অজ্ঞাত, তার পিছনে ছ্বলাত পড়ে নিবে। যদিও এমন বিদ'আতীর পিছনে ছ্বলাত পড়া হয়, যে বিদআতের দিকে মানুষকে আহবান করে এবং এমন ফাসেক হয়, যার ফাসেকী প্রকাশ্য তাতেও কোন অসুবিধা নেই। বিশেষ করে যখন সে বেতনভুক্ত কিংবা সরকারের পক্ষ হতে নিয়োগপ্রাপ্ত ইমাম হয় এবং তার পিছনে ছ্বলাত পড়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকে। যেমন জুমু'আর ছ্বলাতের ইমাম, দুই ঈদের ছ্বলাতের ইমাম, হজ্জের সময় আরাফার ছ্বলাতের ইমাম ইত্যাদি। মুসলিমগণ তাদের পিছনে ছ্বলাত পড়বে। এটিই সকল সালাফ ও খালাফ তথা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল আলেমের অভিমত।

যে ব্যক্তি ফাসেক ইমামের পিছনে জুমু'আ ও জামাতে শরীক হওয়া বর্জন করবে, অধিকাংশ আলেমের নিকট সে বিদ'আতী হিসাবে গণ্য হবে। সঠিক কথা হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি ফাসেক ইমামের পিছনে ছ্বলাত পড়বে এবং সেই ছ্বলাত দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না। কেননা ছাহাবীগণ পাপিষ্ঠ ইমামদের পিছনে জুমু'আ ও জামা'আতে শরীক হতেন। তারা পুনরায় সেই ছ্বলাত আদায় করতেন না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হাজ্জাজের পিছনে ছ্বলাত পড়তেন। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহুও তাই করতেন। যেমন একটু পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য ছাহাবীগণও অলীদ বিন উকবা বিন আবী মুঈতের পিছনে ছ্বলাত পড়তেন। অলীদ ছিল মদপানকারী।

বলা হয় যে, সে একবার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ফজরের ছ্বলাত চার রাকাআত আদায় করার পর বলেছিল, তোমাদের জন্য ছ্বলাত আরো বাড়াবো কি? ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আজ তো তোমার সাথে আমরা বেশী পড়েই ফেলেছি!! আসলে বেশী তো হয়েই গেছে। আরো বেশী পড়াতে চাও?

ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, উছমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যখন ঘেরাও করা হলো, তখন এক লোক মুসলিমদেরকে নিয়ে ছ্বলাত পড়লো। ঐ সময় জনৈক লোক উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করল। আপনি মুসলিমদের সকলের ইমাম। আর এই যে লোকটি মানুষের ছ্বলাতের ইমামতি করছে, সে কি ফিতনার ইমাম নয়? উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, হে ভাতিজা! মানুষ যেসব ভালো আমল করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ছ্বলাত। তারা যখন সুন্দর করে ছ্বলাত পড়বে, তখন তুমিও তাদের সাথে সুন্দর করে

ছ্বলাত পড়ো। আর যখন তারা অসুন্দরভাবে ছ্বলাত পড়বে, তখন তুমি তাদের সেই অসুন্দরকে পরিত্যাগ করবে”।[১৫৯]

ফাসেক এবং বিদ‘আতীর ছ্বলাত মূলত ছ্বহীহ । তাই তার পিছনে যদি অন্য কেউ ছ্বলাত পড়ে তার ছ্বলাতও বাতিল হবে না। তবে যারা তার পিছনে ছ্বলাত পড়াকে মাকরূহ মনে করেছেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে এর মাধ্যমে তারা আমর বিল মারুফ ওয়ান্ নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কারণ এটি হচ্ছে ওয়াজিব। এ বিষয়টিও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের অন্তর্ভুক্ত যে, কোনো লোক যদি বিদ‘আত কিংবা পাপাচার প্রকাশ করে, তাকে মুসলিমদের ইমাম নিযুক্ত করা হবে না। কেননা তাকে শাস্তি দেয়া আবশ্যক। যাতে সে তাওবা করে পাপাচার থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সুতরাং তাকে পরিত্যাগ করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে তাই উত্তম।

আর যদি কিছু লোক তার পিছনে ছ্বলাত পড়া বাদ দিয়ে অন্যের পিছনে ছ্বলাত পড়ে, তাতেও অন্যায় কাজের প্রতিবাদ হবে এবং আশা করা যায় যে, সে তাওবা করবে। অথবা তাকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার পদ থেকে নামানো হবে। এতে করে লোকেরা তার মতো পাপকাজ করা হতে বিরত থাকবে। সুতরাং তার মত লোকের পিছনে ছ্বলাত পড়া বর্জন করা হলে দীনি বিশেষ স্বার্থ হাসিল হবে। তবে শর্ত থাকে যে, মুসলিমদের জুমআ এবং জামা‘আত যেন বাতিল না হয়।

আর যদি মুসলিমদের জুমআ ও জামা‘আত বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে ফাসেকের পিছনে ছ্বলাত পড়া বাদ দেয়া যাবে না। তবে ইমাম যদি জঘণ্য বিদ‘আতী হয় এবং ছাহাবীদের পথের বিরোধী হয়, তাহলে তার পিছনে ছ্বলাত পড়া যাবে না।

এমনি শাসকগণ যদি ইমাম নিযুক্ত করেন, তাহলে তার পিছনে ছ্বলাত না পড়ার মধ্যে দীনি কোনো স্বার্থ থাকে না। তাই এ ক্ষেত্রে শাসকের নিয়োগকৃত ইমামের পিছনে ছ্বলাত আদায় বর্জন করা হবে না। বরং তার পিছনে ছ্বলাত পড়াই উত্তম।

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ করে, তাকে যদি ইমামতিতে না দিয়ে পারা যায়, তাহলে মানুষের উপর তাকে ইমামতিতে না দেয়াই ওয়াজিব। কিন্তু অন্য কেউ (সরকার) যদি ইমাম নিয়োগ করে দেয় এবং তাকে সরানো অসম্ভব হয় অথবা তাকে সরাতে গেলে সে যে পরিমাণ প্রকাশ্য অন্যায়ে লিপ্ত তার চেয়েও বড় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মূলনীতি হচ্ছে বেশী বা বড় ফাসাদের মাধ্যমে কম বা ছোট ফাসাদ দমন করা নাজায়েয। কোন অকল্যাণ ও ক্ষতিকর কাজ দমন করতে গেলে যদি তার চেয়েও বড় অকল্যাণ ও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই অকল্যাণ দমন করা নাজায়েয। কেননা মানুষের কল্যাণ সাধন ও পূর্ণ করার জন্য এবং যথা সম্ভব তাদের উপর হতে ক্ষতি ও অকল্যাণকর বস্তু দূর করার জন্যই আসমানী শরী‘আত আগমন করেছে।

---

[১৫৯] ছ্বহীহ বুখারী, হাদীছ নং- ৬৬৩।

সুতরাং জুমআ ও জামা'আত বাতিল করার ক্ষতি পাপাচারী ইমামের পিছনে ইক্তেদা করার ক্ষতির চেয়ে অধিক ভয়াবহ। বিশেষ করে যখন তার পিছনে ছ্বলাত না পড়লে তার পাপাচার দূর না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এহেন অবস্থায় শরঈ মাসলাহাত বা দীনি স্বার্থ তো অর্জিত হলই না, সেই সাথে সেই ফাসাদ (অন্যায়) রয়েই গেল।

তবে ভালো লোকের পিছনে যদি জুমু'আ ও জামা'আত কায়েম করা সম্ভব হয়, তাহলে ফাসেকের পিছনে ছ্বলাত পড়ার চেয়ে ভালো লোকের পিছনে ছ্বলাত পড়াই উত্তম। ভাল ইমাম থাকতে বিনা উযরে কেউ যদি ফাসেক ইমামের পিছনে ছ্বলাত পড়ে, তাহলে এই বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তাকে পুনরায় ছ্বলাত পড়তে হবে। আবার কেউ বলেছেন, ছ্বলাত হয়ে যাবে। সুতরাং পুনরায় সে ছ্বলাত পড়তে হবে না। ফিকহ এর কিতাবসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আর ইমাম যদি ছ্বলাতে ভুল করে এবং মুক্তাদী তার অবস্থা জানতে না পারে, তাহলে মুক্তাদীর উপর ছ্বলাত পুনঃরায় পড়া আবশ্যক নয়। পূর্বে এ বিষয়ে হাদীছ অতিক্রান্ত হয়েছে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার ভুলবশত নাপাক অবস্থায় লোকদের ইমামতি করলেন। অতঃপর তিনি সেই ছ্বলাত পুনঃরায় পড়লেন। কিন্তু লোকদেরকে তা পুনঃরায় পড়তে বলেননি। তবে মুক্তাদী ছ্বলাতের পর যদি জানতে পারে যে, তার ইমাম নাপাক অবস্থায় ছিল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর মতে ছ্বলাত পুনরায় পড়তে হবে। তবে ইমাম মালেক, শাফেঈ এবং ইমাম আহামদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) এর প্রসিদ্ধ মতে তা পুনঃরায় পড়বে না।

এমনি ইমাম যদি ছ্বলাতে এমন কাজ করে, যা মুক্তাদীর নিকট নাজায়েয, তাহলে এ বিষয়ে বিরাট মতভেদ রয়েছে। ফিকহ এর কিতাবগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এমনি মুক্তাদী যদি জানতে পারে, তার ইমাম বিনা অযুতে ছ্বলাত পড়াচ্ছে, তাহলে সেই ইমামের পিছনে ছ্বলাত পড়া বৈধ নয়। কেননা এই ইমাম মূলত ছ্বলাত পড়ছে না; বরং সে লোকদেরকে নিয়ে খেল-তামাশা করছে।

শাসকদের আনুগত্য করা আবশ্যক

কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ এবং মুসলিমদের সালাফগণের ইজমা প্রমাণ করে যে, ইজতেহাদী বিষয়সমূহে মুসলিমদের শাসক, ছ্বলাতের ইমাম, বিচারক, যুদ্ধের আমীর এবং যাকাত উসুলকারীদের আনুগত্য করতে হবে। শাসকের উপর ইজতেহাদী বিষয়াদিতে জনগণের কথা মানা আবশ্যক নয়। বরং জনগণের উপর আবশ্যক হচ্ছে শাসকের আনুগত্য করা এবং শাসকের মতের পক্ষেই থাকা এবং শাসকের কথা মেনে নিয়ে নিজেদের রায় বর্জন করা। কেননা জামা'আত ও ঐক্যের স্বার্থ রক্ষিত হওয়া দলাদলি ও মতভেদ করার ক্ষতি ছোট-খাটো মাসআলাসমূহের চেয়ে অনেক বড়। এই জন্য বিচারকদের জন্য বৈধ নয় যে, তাদের কেউ অন্য কারো ফায়ছালার বিরুদ্ধে ফায়ছালা দিবে।

সুতরাং অকাট্য সত্য হচ্ছে যালেম শাসক ও ফাসেক ইমামদের কতকের পিছনে কতকের ছ্বলাত বিশুদ্ধ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি একবার খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে হজ্জ করলেন। খলীফা তখন শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) খলীফাকে ফতোয়া দিলেন যে, তাকে অযু করতে হবে না। তাই খলীফা বিনা অযুতে ছ্বলাতে মুসলিমদের ইমামতি করলেন।

ইমাম আবু ইউসুফকে তখন বলা হলো আপনি কি তার পিছনে ছ্বলাত পড়েছেন? তিনি তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমীরুল মুমিনীন! অর্থাৎ মুসলিমদের আমীরের পিছনে আমি ছ্বলাত পড়বো না? ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ) এ কথার মাধ্যমে উদ্দেশ্য করেছেন যে, শাসকদের পিছনে ছ্বলাত পরিত্যাগ করা বিদ'আতীদের কাজ। এ বিষয়ে ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে বলেছেন,

«يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»

"তারা (যালেম শাসকরা) ছ্বলাতে তোমাদের ইমামতি করবে। তারা যদি ঠিকমত ছ্বলাত আদায় করে, তাহলে তারা ছাওয়াব পাবে। তোমরাও পাবে। আর যদি বেঠিক করে, তাহলে তোমাদের ছ্বলাত হয়ে যাবে এবং ছাওয়াবও পাবে। আর তাদের ছ্বলাত তাদের বিপক্ষে যাবে"।[১৬০] এ ছ্বহীহ সুস্পষ্ট দলীলটি প্রমাণ করে যে, ইমাম যদি ছ্বলাতে ভুল করে, তাহলে সেই ভুলের খেসারত ইমামের উপর বর্তাবে; মুক্তাদীর উপর নয়। মুজতাহিদের উপর যতদূর বর্তায় তা হচ্ছে তিনি একটি ওয়াজিব বিষয় ছেড়ে দিয়ে ভুল করতে পারেন। তিনি তা এই বিশ্বাসে ছেড়ে দেন যে, কাজটি তার উপর ওয়াজিব ছিল না অথবা তিনি এই বিশ্বাসে একটি হারাম কাজ করতে পারেন যে, তা হারাম নয়।

---

[১৬০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ৬৯৪।

সুতরাং যেই মুসলিম আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার জন্য এই ছ্বহীহ সুস্পষ্ট হাদীছটির বিরোধীতা করা বৈধ নয়। বিশেষ করে যখন তার কাছে এটি পৌঁছে যাবে। এটি ঐ সমস্ত হানাফী, শাফেঈ এবং হাম্বলীদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল, যারা বলে ইমাম যদি ছ্বলাতের মধ্যে এমন বিষয় ছেড়ে দেয়, যা মুক্তাদীর বিশ্বাস অনুযায়ী পালন করা ওয়াজিব, তাহলে সেই ইমামের পিছনে ইক্তেদা করা বৈধ নয়!! কেননা ঐক্য ও সংহতি ঠিক রাখা ওয়াজিব এবং যা দলাদলি ফিতনা ও ফাসাদের দিকে নিয়ে যায়, তা পরিহার করা আবশ্যক।

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলে কিবলার ভাল-মন্দ যে কোনো লোক মারা গেলে আমরা তার জানাযা পড়া এবং তার জন্য দু'আ করা বৈধ মনে করি। তবে বিদ্রোহী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং ডাকাতদের বিষয়টি ভিন্ন। এমনি আত্মহত্যাকারীর বিষয়টিও ব্যতিক্রম। ইমাম আবু ইউসুফ (রহিমাহুল্লাহ)এর মতে এদের উপরও জানাযা পড়া হবে। শহীদের উপরও জানাযা পড়া বর্জন করা হবে না। তবে ইমাম মালেক ও শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) এর মতে শহীদের উপর জানাযা ছ্বলাত পড়া হবে না।[১৬১] ফিকহএর কিতাবসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা পাপাচারী এবং বিদ'আতীর জানাযা ছ্বলাত পরিত্যাগ করবো না, এই বিষয়টিই শাইখ এখানে বর্ণনা করেছেন। যারাই জবান দিয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করবে, তাদের সকলের উপরই জানাযা পড়তে হবে- শাইখের উদ্দেশ্য তা নয়। কেননা যারা ইসলাম প্রকাশ করে, তারা দু'শ্রেণীর।

তারা হয় খাঁটি মুমিন আর না হয় মুনাফেক। যার নিফাকীর বিষয়টি পরিষ্কার হবে, তার জানাযা ছ্বলাত পড়া জায়েয হবে না এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাও বৈধ হবে না। আর যার নিফাকীর বিষয়টি জানা যাবে না, তার জানাযা ছ্বলাত পড়া বৈধ। কেউ যখন কোন লোকের নিফাকী সম্পর্কে জানতে পারবে তখন সে ঐ লোকের জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি বিষয়টি জানতে পারবে না, সে ছ্বলাত ঠিকই পড়বে। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যার জানাযা পড়তেন না, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তার জানাযা পড়তেন না। কেননা হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাবুক যুদ্ধে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুনাফেকদের নাম জানতে পেরেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে মুনাফেকদের জানাযা ছ্বলাত পড়তে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এর কারণ হিসাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে।

সুতরাং যে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, তার জানাযা ছ্বলাত পড়া হতে নিষেধ করা হবে না। যদিও তার আক্বীদায় বিদ'আত সম্পর্কিত

[১৬১] অধিকাংশ আলেমের কথাও তাই। তাদের মতে শহীদের উপর জানাযা ছ্বলাত নেই।

গুনাহ কিংবা আমলগত পাপাচারিতা থাকে। বরং আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে মুমিনদের জন্য ইস্তেগফার করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

"অতঃএব জেনে নাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আর ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মুমিন নারী-পুরুষদের জন্য"। *(সূরা মুহাম্মাদ: ১৯)*

আল্লাহ তা'আলা এখানে তার নবীকে তাওহীদ বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছেন এবং নবীর নিজের জন্য এবং মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আদেশও দিয়েছেন। তাওহীদ হচ্ছে দীনের মূল বিষয়। আর তার জন্য এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা দীনকে পরিপূর্ণকারী আমলের অন্তর্ভুক্ত। মুমিনদের জন্য মাগফেরাত, রহমত এবং অন্যসব কল্যাণের দু'আ করা কখনো ওয়াজিব হয় আবার কখনো মুস্তাহাব। দু'আ দুই প্রকার। একটি হচ্ছে আম তথা জীবিত-মৃত সকল মুমিনের জন্য দু'আ করা। আরেকটি হচ্ছে খাস দু'আ । এটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া। সুতরাং যে মুমিন মারা যাবে, তার জানাযা পড়ার জন্য মুমিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে। সেই সাথে জানাযার ছ্বলাতে তার জন্য দু'আ করারও আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা ছ্বলাত পড়বে, তখন তার জন্য ইখলাসের সাথে দু'আ করো"।[১৬২]

[১৬২] হাসান: আবূ দাউদ হা/ ৩১৯৯, ইরওয়াউর গারিল হা/৭৩২, আহকামুল জানায়েয, হা/১২৩।

(৭৫) অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا

আমরা কোন মানুষের জন্য অকাট্যভাবে জান্নাতের কিংবা জাহান্নামের ফায়ছালা প্রদান করি না।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে শাইখ বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আমরা নির্দিষ্ট করে আহলে কিবলার কারো ব্যাপারে এ কথা বলবো না যে, সে জান্নাতের অধিবাসী অথবা অমুক ব্যক্তি জাহান্নামের অধিবাসী। কিন্তু নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে জান্নাতী বলে সংবাদ দিয়েছেন, তার কথা ভিন্ন। যেমন দশজন ছাহাবীকে তিনি জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন।[১৬৩] তবে আমরা বলি, কবীরা গুনাহকারীদের মধ্য হতে আল্লাহ যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করবেন, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর শাফাআতকারীদের শাফাআতের মাধ্যমে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকবো। বিনা ইলমে আমরা তাকে জান্নাতীও বলবো না এবং জাহান্নামীও বলবো না। কেননা মূল সত্য এখানে গোপন। সে কিসের উপর (ঈমান না কুফুরীর উপর) মারা গেছে? তা আমরা অবগত নই। কিন্তু সৎকর্মশীলদের জন্য আমরা আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং পাপাচারীদের উপর আল্লাহর আযাবের আশঙ্কা করি।

কারো জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে সালাফদের থেকে তিনটি মত পাওয়া যায়। (১) নবীগণ ছাড়া আর কাউকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেয়া যাবে না। ইমাম আওযাঈ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়া (রহিমাহুল্লাহ) থেকে এই মত বর্ণনা করা হয়। (২) যার জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে, তাকেই কেবল জান্নাতী বলা হবে। এটিই অধিকংশ আলেম ও মুহাদ্দিছের অভিমত। (এটিই সঠিক মত) (৩) দলীল যাদেরকে জান্নাতী বলেছে এবং মুমিনগণ যাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দিবে, তারাই জান্নাতী। ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে একদা একটি জানাযা অতিক্রম করল। লোকেরা তখন সেই লাশের খুব ভাল প্রশংসা করল। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, এর জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে। অতঃপর অন্য একটি জানাযা অতিক্রম করল। লোকেরা সেই লাশের খুব বদনাম করল। এবারও তিনি বললেন, আবশ্যক হয়ে গেছে। অন্য বর্ণনা এসেছে, কথাটি তিনবার বলেছেন।

---

[১৬৩] ১) আবু বকর ছিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ২) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৩) উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৪) আলী বিন আবু তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৫) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৬) তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৭) সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৮) আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৯) আবু উবায়দাহ বিন যাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ১০) সাঈদ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী আবশ্যক হয়ে গেছে? রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, প্রথম জানাযার জন্য তোমরা খুব ভাল প্রশংসা করেছো। তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর তোমরা দ্বিতীয় লাশের খুব বদনাম করেছো। তাই তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে গেছে। তোমরা হলে যমীনে আল্লাহর সাক্ষী।[১৬৪]

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, তোমরা অচিরেই জাহান্নামের অধিবাসী থেকে জান্নাতীদেরকে আলাদা করতে পারবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে? তিনি বললেন, মানুষের প্রশংসা এবং মানুষের বদনামের মাধ্যমে। এখানে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই ধরণের সাক্ষ্যের মাধ্যমেই জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে জানা সম্ভব।[১৬৫]

(৭৬) ইমাম ত্বহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إلى الله تعالى

আর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলিম থেকে কুফুরী, শির্ক কিংবা নিফাকী প্রকাশিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে কাফের, মুশরিক এবং মুনাফেক বলি না। আর মুসলিমদের অন্তরের গোপন বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার কাছেই সোপর্দ করি।

.....

ব্যাখ্যা: কেননা আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন মানুষের বাহ্যিক অবস্থা দেখে হুকুম লাগাই। আমাদেরকে মানুষের প্রতি ধারণা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যে বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে লাগতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} [الحجرات: ١١]

---

[১৬৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৬৭।

[১৬৫] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪২২১, ছ্বহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/৩৪০০। এখানে ছাহাবীদের সাক্ষ্যকে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমর্থন করেছেন। তাই এটি নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবীদের সাথে খাস। ছাহাবীদের পর অন্য কোন ব্যক্তির ব্যাপারে মানুষ ভাল সাক্ষ্য দিলেই এটি বলা যাবে না যে, সে জান্নাতী। তবে যার ব্যাপারে মানুষ ভাল প্রশংসা করবে, তার ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা এবং খুশী হওয়া যেতে পারে। দলীলের মাধ্যমে যাদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়া কিংবা জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি জানা গেছে, তাদেরকে ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জান্নাত বা জাহান্নামের ফায়ছালা দেয়া যাবে না।

"হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। *(সূরা আল হুজুরাত: ১১)*আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الْحُجُرَاتِ: ١٢]

হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহ। *(সূরা আল হুজুরাত: ১২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিয়ই চোখ, কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৩৬)*

(৭৭) ইমাম ত্বহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ

যার উপর তলোয়ার উঠানো আবশ্যক হয়েছে, সে ব্যতীত উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্য কোন লোকের উপর আমরা তলোয়ার উত্তোলন করা বৈধ মনে করি না।

.....

ব্যাখ্যা: ছ্বহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِله إِلا الله وَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল" এ কথার সাক্ষ্য প্রদানকারী কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়। তবে তিনটি কারণের যে কোন একটি কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ। যে বিবাহিত মুসলিম ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাকে হত্যা করা হবে। যে অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করবে, তাকেও হত্যা করা হবে। যে মুসলিম তার দীন পরিত্যাগ করবে এবং মুসলিমদের জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তাকেও হত্যা করা হবে।[১৬৬]

---

[১৬৬] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৬১০, মুসলিম হা/১৬৭৬। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, ব্যক্তি বিশেষের জন্য শরী'আতের নির্ধারিত দণ্ডবিধি কার্যকর করা বৈধ নয়। শাসক বা তার প্রতিনিধিই কেবল এ দায়িত্ব পালন করবেন।

(৭৮) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ على أَئِمَّتِنَا وَوُلَاة أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَة الله عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَة مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَة وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاة

আমরা আমাদের ইমাম ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও অস্ত্র ধারণ করা বৈধ মনে করি না। যদিও তারা যুলুম করে। তাদের উপর বদদু'আও করি না। তাদের থেকে আমরা আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেই না। তাদের আনুগত্য করাকে আমরা আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত ও ফরয মনে করি। যতক্ষণ না তারা পাপ কাজের আদেশ করে। আমরা তাদের সংশোধন ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম"। *(সূরা আন নিসা: ৫৯)*

ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য হল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল সে আমার নাফরমানী করল"।[১৬৭]

---

[১৬৭] মুত্তাফাকুন আলাইহি: বুখারী হা/২৯৫৭, মুসলিম হা/১৮৩৫।

আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আমীরের কথা শুনি এবং তার আনুগত্য করি। যদিও সেই আমীর হাবশী নাক-কান কাটা গোলাম হয়।[১৬৮]

ছ্বহীহ বুখারীতে এসেছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ»

"তোমরা আমীরের কথা শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো। যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মাথা বিশিষ্ট একজন হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর নিযুক্ত করা হয়"।[১৬৯]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ»

"মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে, পাপ কাজের আদেশ না দেয়া হলে পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে আমীরের আনুগত্য করা। তবে যদি আমীর তাকে অন্যায় কাজের আদেশ দেয়, তাহলে তার কথা শ্রবণ করা যাবে না এবং তা মানাও যাবে না"।[১৭০]

হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো। আর আমি তাকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। এই আশঙ্কায় যে, আমাকেই তা পেয়ে বসে কি না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো জাহেলিয়াত এবং অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে এই কল্যাণ দান করলেন। এই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তা হবে ভেজালযুক্ত। আমি বললাম, সেই ভেজালটি কি? তিনি বললেন, একদল লোক আমার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদেরকে চালিত করবে। তাদের কোন কোন কাজ তুমি সমর্থন করবে আর কিছু কিছু আমল তুমি অপছন্দ করবে। আমি বললাম, সেই কল্যাণের পরও কি কোন অকল্যাণ আসবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আসবে। জাহান্নামের দরজার দিকে আহবানকারী একদল লোক বের হবে। যে ব্যক্তি এই ডাকে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের কাছে তাদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা হবে আমাদেরই সমগোত্রীয় এবং

---

[১৬৮] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৬৪৮।

[১৬৯] মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ বুখারী হা/৬৯৬, মুসলিম হা/৬৪৭।

[১৭০] মুত্তাফাকুন আলাইহিঃ বুখারী হা/৭১৪৪, মুসলিম হা/১৮৩৯।

আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, তাদের যুগ পেয়ে গেলে আপনি আমাকে কী করার আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলিমদের জামা'আত ও তাদের ইমামের অনুসরণ করবে। হুযায়ফা বলেন, আমি বললাম, তখন যদি মুসলিমদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে তোমাকে যদি দাঁত দিয়ে গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরেও থাকতে হয়, তবুও তুমি এ সকল ফির্কা পরিত্যাগ করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তুমি এ অবস্থায় থাকবে।[১৭১] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ رأى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئا يكرهه فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فارق الجماعة شِبْرًا فمَاتَ فميتته جَاهِلِيَّةً»

"কোন ব্যক্তি যদি তার আমীরের পক্ষ হতে অপছন্দনীয় কিছু দেখে তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বের হয়ে যাবে, অতঃপর সেই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু বরণ করার ন্যায়"।

অন্য বর্ণনা রয়েছে, সে নিজের গর্দান হতে ইসলামের রশি খুলে ফেলল। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন দুইজন খলীফার জন্য বায়আত করা হয়, তখন তাদের মধ্য হতে যার নিকট পরে বায়আত করা হয়েছে, তাকে হত্যা করো"।[১৭২]

আওফ বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ عند ذلك؟ فَقَالَ «لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ أَلَا مَنْ وَلِي عليه وَالٍ فَرَآه يأتي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله ، فَلْيَكْرَه مَا يأتي مِنْ مَعْصِيَة الله وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة»

"তোমাদের সর্বোত্তম শাসক হচ্ছেন তারাই, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দু'আ করে থাকো। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসক হচ্ছেন তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদের উপর অভিশাপ করো, তারাও তোমাদের উপর অভিশাপ করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তখন তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে তাদেরকে সরিয়ে দিবো না? তিনি বললেন, না। যতোক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছ্বলাত কায়েম রাখবে, ততোক্ষণ তাদের

[১৭১] মুত্তাফাকুন আলাইহি: বুখারী হা/৩৬০৬, মুসলিম হা/১৮৪৭।

[১৭২] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৩।

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। জেনে রেখো! যার উপর কোন শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি দেখে, শাসক আল্লাহর কোন নাফরমানীতে লিপ্ত হচ্ছে, তাহলে সে যেন আল্লাহর নাফরমানীকে অপছন্দ করে। কিন্তু সে যেন শাসকের আনুগত্য বর্জন না করে"।[১৭৩]

শাসকগণ যে পর্যন্ত অন্যায় কাজের আদেশ না করবে, কুরআন ও সুন্নাহ এর দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। হে সম্মানিত পাঠক! আপনি আল্লাহর বাণী:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

"তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক তাদেরও আনুগত্য করো"। *সূরা আন-নিসা: ৫৯।* এ নিয়ে চিন্তা করুন।

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেছেন, وأطيعوا الرسول "এবং রাসূলের আনুগত্য করো"। এটি বলেন নি যে, وأطيعوا أولي الأمر منكم। অর্থাৎ উলুল আম্রের আগে أطيعوا (আনুগত্য করো) শব্দটি উল্লেখ করেননি। যেমন করেছেন الرسول শব্দের পূর্বে। কেননা স্বতন্ত্রভাবে শাসকদের আনুগত্য করা যাবে না। বরং যেখানে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য আছে, কেবল সেখানেই শাসকদের আনুগত্য করতে হবে। الرسول- এর সাথে أطيعوا ফেল (ক্রিয়া) পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ ছাড়া অন্য কোন আদেশ করেন না। তিনি এতে মাসুম।

আর শাসকগণের বিষয়টি ভিন্ন। তারা আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে অন্য বিষয়েও আদেশ করেন। সুতরাং শুধু সে ক্ষেত্রেই তাদের আনুগত্য করতে হবে, যেখানে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য রয়েছে।[১৭৪] তারা যুলুম করলেও তাদের আনুগত্য করার কারণ হলো, তখন আনুগত্য বর্জন করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাদের যুলুমের চেয়ে অনেক বেশি ফাসাদ হতে পারে। এ সময় বিদ্রোহ না করে তাদের যুলুমের উপর সবর করার মধ্যেই গুনাহ মাফ করা এবং প্রচুর ছাওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। কেননা আমাদের কুকর্ম ও পাপের কারণেই কেবল আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যালেম শাসক

---

[১৭৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫।

[১৭৪] সুতরাং শাসক আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ করলে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। আমাদের জন্য ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাকে যখন শাসক কুরআন আল্লাহর মাখলুক- এ কথা বলার আদেশ করল তখন তিনি শাসকের আদেশ মান্য করেননি; বরং শাসকের যুলুমের উপর সবর করেছেন। এ রকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। যুগে যুগে আলেমগণ শাসকদের যুলুমের উপর সবর করেছেন। আর যদি শাসক জনগণের পার্থীব হক নষ্ট করে, জনগণের ধন-সম্পদ বল প্রয়োগ করে নিয়ে নেয় তখন সে ক্ষেত্রেও শাসকদের আনুগত্য করতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

চাপিয়ে দেন। যেমন কর্ম তেমন ফল। সুতরাং যালেম শাসক চেপে বসলে আমাদের করণীয় হচ্ছে তাওবা ও ইস্তেগফার করা এবং আমাদের আমল সংশোধন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾

"তোমাদের উপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন"। *(সূরা আশ-শূরা: ৩০)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"তোমাদের উপর যখন বিপদ এসে পড়লো তখন তোমরা বলতে লাগলে, এ আবার কোথা থেকে এলো? তোমাদের এ অবস্থা কেন? অথচ এর দ্বিগুণ বিপদ তোমাদের মাধ্যমে তোমাদের বিরোধী পক্ষের উপর পড়েছিল। হে নবী! ওদের বলে দাও, তোমরা নিজেরাই এ বিপদ এনেছো। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৬৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

"হে মানুষ! যে কল্যাণই তুমি লাভ করে থাকো তা আল্লাহর দান এবং যে বিপদ তোমার উপর এসে পড়ে তা তোমার নিজের উপার্জন ও কাজের বদৌলতেই আসে। হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। এর উপর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট"। *(সূরা আন নিসা: ৭৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"এভাবেই আমি কতক যালেমকে অন্যসব যালেমের উপর শক্তিশালী করে দেই। তাদের কৃতকর্মের কারণে"। *(সূরা আল আনআম: ১২৯)*[১৭৫]

[১৭৫] সৃষ্টিতে আল্লাহর অন্যতম সুন্নাত হচ্ছে মানুষ যখন অতিরিক্ত যুলুম করে, তখন তিনি তাদের উপর অন্য একজন যালেমকে শক্তিশালী করে দেন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা এক যালেমের মাধ্যমে অন্য যালেমকে ধ্বংস করেন। আয়াতের অন্য একটি অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে কাফের ও যালেমদেরকে পরস্পরের বন্ধু বানিয়ে দেন। ফলে তারা দুনিয়াতে একে অপরের সহযোগী হয়। আখিরাতেও তাদেরকে একসাথে একই জাহান্নামে রাখবেন।

সুতরাং প্রজাগণ যদি শাসকের যুলুম হতে বাঁচতে চায়, তাহলে আগে যেন তারা নিজেরা যুলুম পরিত্যাগ করে।[১৭৬]

মালেক বিন দীনার হতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর কোনো কোনো আসমানী কিতাবে এসেছে, তিনি বলেন, আমি রাজাধিরাজ। রাজা-বাদশাহদের অন্তর আমার হাতে। সুতরাং যারা আমার আনুগত্য করে, আমি তাদের জন্য আমার রহমত স্বরূপ (ভাল) রাজা-বাদশাহদেরকে পাঠাই। আর যারা আমার নাফরমানী করে, তাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ (খারাপ) রাজা-বাদশাহদেরকে পাঠাই। সুতরাং তোমরা রাজা-বাদশাহদেরকে গালি দেয়ার মধ্যে নিজেদেরকে মশগুলে রেখো না। বরং তোমরা তাওবা করো এবং অন্যায় কাজ বর্জন করো। তাহলেই আমি তাদেরকে তোমাদের উপর দয়াশীল করে দিবো।[১৭৭]

(৭৯) অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنَتَّبِعُ السنة وَالْجَمَاعَة وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَة

আমরা সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসরণ করি। জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, দলাদলি করা ও ফির্কাবন্দী হওয়া থেকে দূরে থাকি।

.....

ব্যাখ্যাঃ সুন্নাত হচ্ছে রসূলের তরীকা। জামা'আত বলতে মুসলিমদের জামা'আত উদ্দেশ্য। তারা হচ্ছেন ছাহাবী এবং ঐ সমস্ত লোক, যারা কিয়ামত পর্যন্ত উত্তমভাবে ছাহাবীদের অনুসরণ করবে।[১৭৮] তাদের অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে হিদায়াত এবং তাদের খেলাফ করার মধ্যেই রয়েছে গোমরাহী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[১৭৬] মূলত শাসকগণ হচ্ছেন জনগণের ফটোকপি ও আয়না স্বরূপ। কোন দেশের জনগণের আচরণ ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে ঐ দেশের শাসকদের চরিত্র ও আচরণের প্রতি দৃষ্টি দিলেই জনগণের অবস্থা জানা যাবে। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নীতি হচ্ছে, তিনি জাতির চারিত্রিক অবস্থা অনুপাতেই শাসক দিয়ে থাকেন। জনগণ যদি যালেম ও পাপাচারী হয়, তাহলে তাদের জন্য অনুরূপ শাসকই পাঠিয়ে থাকেন। অপর পক্ষে জনগণ ভাল হলে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত স্বরূপ ভাল শাসক আগমন করেন। আমরা যদি খোলাফায়ে রাশেদা থেকে শুরু করে ইসলামের স্বর্ণ যুগের প্রতি দৃষ্টি দেই, তাহলে এর বাস্তব উদাহরণ খুঁজে পাবো। সুতরাং মুসলিম জাতির উপর যখন যালেম শাসক চেপে বসবে, তখন জনগণের উচিত, তাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করা ও আল্লাহর কাছে তাওবা করা।

[১৭৭] এটি ইসরাঈলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত, যার সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন। দেখুনঃ শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ শারহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ৩৮২।

[১৭৮] অনেক আলেমের মতে জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হক। এখানে জামা'আত দ্বারা ছাহাবীদের জামা'আত উদ্দেশ্য। উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা ছাহাবীগণ সুস্পষ্ট হকের উপরই ছিলেন এবং তারাই উম্মতের প্রথম জামা'আত।

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু।" *(সূরা আলে ইমরান: ৩১)* আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে কেউ রসূলের বিরোধীতা করবে এবং ঈমানদারদের পথের বিরুদ্ধে চলবে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাবো যে দিকে সে যেতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।" *(সূরা আন-নিসা: ১১৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"বলো, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো, রাসূলের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য রাসূল দায়ী এবং তোমাদের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তার আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই সৎ পথ পেয়ে যাবে। অন্যথায় পরিষ্কারভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই"। *(সূরা আন-নূর: ৫৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও"। *(সূরা আল-আনআম: ১৫৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াত পাওয়ার পরও দলাদলি ও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি"। *(সূরা আলে ইমরান: ১০৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ রয়েছে"। *(সূরা আল-আনআম: ১৫৯)*

সুনানের কিতাবসমূহে ইরবায বিন সারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একবার রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে একটি প্রভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের চক্ষুসমূহ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো এবং অন্তরসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হচ্ছে এটি বিদায়ী উপদেশ!! সুতরাং আপনি আমাদেরকে কিসের উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি তখন বললেন,

«أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ المهديين من بعدي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্কে ভয় করা, শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত । আর প্রত্যেক বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।[১৭৯] ইমাম তিরমিযী এই হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً – يَعْنِي الأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»

"ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা তাদের দীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এর দ্বারা তিনি বিদ'আতী দল উদ্দেশ্য করেছেন। মাত্র একটি দল ব্যতীত বাকী সব দলই জাহান্নামে যাবে। আর সেটি জামা'আত। অর্থাৎ ছাহাবীগণ যেই হকের উপর ছিলেন যারা সেই হকের অনুসরণ করবে, তারাই হবে সে জান্নাতী জামা'আত"।[১৮০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সেটি

[১৭৯] ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৬০৭।

[১৮০] হাসান: মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন।

কোন্ জামা'আত? তিনি তখন বললেন, «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» "আমি যে হকের উপর আছি এবং আমার ছাহাবীগণ যেই হকের উপর রয়েছে, যারা সেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারাই হবে সে নাজাত প্রাপ্ত জামা'আত।[১৮১]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহূদী-খ্রিস্টান এবং উম্মতে মুহাম্মাদী, এ উভয় পক্ষের মতভেদকারীরাই ধ্বংস হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই কেবল নাজাত পাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে কতই না সুন্দর কথা বলেছেন!! তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো সুন্নাত গ্রহণ করতে চায়, সে যেন মৃতদের (ছাহাবীদের) সুন্নাতকে গ্রহণ করেন। কেননা জীবিত ব্যক্তিগণ (ছাহাবীদের পরের লোকগণ) ফিতনা হতে নিরাপদ নয়। ছাহাবীগণ ছিলেন এ উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। তাদের অন্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ, তাদের জ্ঞান ছিল গভীর এবং তারা ছিলেন লোক দেখানো আমল হতে অনেক দূরে। তারা ছিলেন এমন একটি জামা'আত, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার নবীর সাথী হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তার দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাছাই করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের ফযীলতের স্বীকৃতি প্রদান করো, তাদের পথ অনুসরণ করো এবং যথাসাধ্য তাদের দীন ও আখলাক-চরিত্রকে আঁকড়িয়ে ধরো। কেননা তারা ছিলেন সঠিক পথের অনুসারী।

শাইখের উক্তি: 'আমরা জামা'আতবদ্ধ থাকাকে হক ও সঠিক মনে করি এবং ফির্কাবন্দী হওয়াকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি ও আযাব মনে করি' এই কথার ব্যাখ্যা করার সময় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

(৮০) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ

আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী ও আমানতদারগণকে ভালোবাসি এবং যালিম ও খিয়ানতকারীদেরকে ঘৃণা করি।

.....

ব্যাখ্যা: এ বিষয়টি পরিপূর্ণ ঈমান ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ ভালোবাসা ব্যতীত বান্দার ইবাদত পূর্ণ হয় না। সেই সাথে ইবাদতের মধ্যে পূর্ণরূপে আল্লাহর সামনে নত হওয়াও জরুরী। সুতরাং আল্লাহর নবী-রাসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে

[১৮১] হাসান: তিরমিযী, হা/২৬৪১।

ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। তবে যেই ভালোবাসা কেবল আল্লাহর প্রতিই পোষণ করা আবশ্যক, তাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর বান্দাকে ভালোবাসতে হবে; কিন্তু আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালোবাসা যাবে না।

এখানে মুহাব্বত তথা ভালোবাসার ক্ষেত্রে যা স্মরণ রাখা আবশ্যক তা এই যে, বন্ধু সবসময় তার মাহবুবের পছন্দনীয় বস্তুকেই ভালোবাসে, সে যা ঘৃণা করে, তাকেই ঘৃণা করে, মাহবুবের বন্ধুকে সেও বন্ধু বানায়, তার শত্রুকে শত্রু মনে করে, মাহবুবের সন্তুষ্টিতে সে সন্তুষ্ট হয়, তার ক্রোধে ক্রোধান্বিত হয়, মাহবুব যা পছন্দ করে, সে তাই পছন্দ করে এবং মাহবুব যা থেকে নিষেধ করে, সে তা থেকেও নিষেধ করে। মোটকথা, হাবীব সকল অবস্থায় মাহবুবের মর্জিতেই চলে।

আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল, মুত্তাকী, তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ভালোবাসেন আমরাও তাদেরকে ভালোবাসি। আল্লাহ তা'আলা খেয়ানতকারী, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং অহংকারীদেরকে ভালোবাসেন না। আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি মুতাবেক আমরাও তাদেরকে ভালোবাসি না; বরং তাদেরকে ঘৃণা করি। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: من كان اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمن كان يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ، ومن كان يَكْرَهَ أَنْ يَرجع فِي الْكُفْرِ بعد أن أنقذه الله منه كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلقى فِي النَّارِ»

"তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পাবে। (১) যার মধ্যে আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসা অন্যান্য সকল বস্তু হতে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। (২) যে ব্যক্তি কোন মানুষকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালোবাসে। (৩) যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে তেমনই অপছন্দ করে, যেমন অপছন্দ করে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।[১৮২]

সুতরাং পরিপূর্ণ ভালোবাসার দাবী হচ্ছে হাবীব তার মাহবুবের পছন্দনীয় বস্তুকে পছন্দ করবে ও তার অপছন্দনীয় বিষয়কে অপছন্দ করবে এবং কাউকে বন্ধু গ্রহণ বা কাউকে শত্রু মনে করার ব্যাপারেও মাহবুবের সাথে সম্মতি পোষণ করবে।

এটি জানা কথা যে, কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভালোবাসবে তখন সে অবশ্যই আল্লাহর শত্রুদেরকে ঘৃণা করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা যেহেতু আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তাই সে তার রাস্তায় জিহাদও করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾

[১৮২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৬, মুসলিম হা/৪৩।

"আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালোবাসেন যারা তার পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত প্রাচীর স্বরূপ"। *(সূরা সাফ্ফ: ৪)*

সুতরাং আল্লাহর বান্দাগণ যখন কাউকে ভালোবাসবে কিংবা কাউকে ঘৃণা করবে, তখন তার মধ্যে যে পরিমাণ ভালো গুণ অথবা মন্দ স্বভাব রয়েছে, সে অনুপাতেই ভালোবাসা পোষণ করবে অথবা শত্রুতা রাখবে। তাই আল্লাহর কোন বান্দা অন্য কোন বান্দার কাছে একদিকে প্রিয় হয় আবার অন্যদিক থেকে অপ্রিয় হয়। তবে যে দিকটি বেশী হবে, সেদিক মূল্যায়ন করেই হুকুম হবে। আল্লাহর কাছে বান্দার হুকুম এ রকমই। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুকে একদিক থেকে ভালোবাসেন এবং অন্যদিক থেকে সেটাকে অপছন্দ করেন। যেমন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قبض نَفْسِ عبدي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ولا بد له منه»

"যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমার বান্দা যে সব ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোন ইবাদত নেই, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার এতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যার কারণে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি আমার মুমিন বান্দার জান বের করতে যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি, অন্য কোন কাজ করতে গিয়ে ততটা দ্বিধা-সংকোচ করিনা। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে দীর্ঘ হায়াত দিয়ে অতি বৃদ্ধ করে কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি।[১৮৩]

[১৮৩] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৫০২। যদি প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দার কান, চোখ ইত্যাদি হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তর হচ্ছে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তার ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায় এবং ইবাদত করতে করতে তার ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়, তখন তার শরীরের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরী'আতের অনুগামী হয়ে যায়। তখন কান দিয়ে শুধু আল্লাহর আনুগত্যের কথাই শুনে এবং তা দিয়ে কোন হারাম

এতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি দ্বিধা-সংকোচ করেন। দু'টি ইচ্ছা পরস্পর বিরোধী হওয়াকে تردد দ্বিধা বলা হয়। মুমিন বান্দা যা ভালোবাসে, আল্লাহ তা'আলা তা ভালোবাসেন এবং সে যা অপছন্দ করে আল্লাহ তা'আলাও তা অপছন্দ করেন। মুমিন বান্দা যেহেতু মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তাই আল্লাহ তা'আলাও মুমিনের জান কবয করাকে অপছন্দ করেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমি তাকে কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছেন, তাই তিনি চান মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাতে। এই কাজটিকেই تردد দ্বিধা নাম দেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। কেননা মৃত্যুর মাধ্যমেই বান্দা দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আরো অধিক সুখময় জীবনের দিকে স্থানান্তরিত হবে।

(৮১) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنَقُولُ اللهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَه عَلَيْنَا عِلْمُه

যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট, সে বিষয়ে আমরা বলি, আল্লাহই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত।

.....

ব্যাখ্যা: ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) ইতিপূর্বে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের সামনে দীনের বিষয়াদি সোপর্দ না করবে এবং যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই অথবা যে ব্যাপারে তার জ্ঞান অস্পষ্ট সে বিষয়টি যদি আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে তার দীনের ব্যাপারে ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে সেই ব্যক্তি নিরাপদ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বিনা ইলমে কথা বলে, সে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ কারী বলে গণ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

নিষিদ্ধ আওয়াজ শুনার চিন্তাও করে না। চোখ দিয়ে শুধু আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসই দেখে। হাত দিয়ে শুধু ভাল জিনিসই স্পর্শ করে এবং পা দিয়ে শুধু আনুগত্যের পথেই চলে। এক কথায় আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সন্তুষজনক কাজ করার তাওফীক দিয়ে থাকেন।

যারা এ হাদীছ থেকে স্রষ্টা সৃষ্টিতে বিলীন হওয়ার কথা সাব্যস্ত করতে চান তারা অপব্যাখ্যার পাশাপাশি স্রষ্টার অস্তিত্বকে গুড়েবালি করে ফেলেন। যার ফলে তারা নিজেরাই স্রষ্টাকে খুঁজে পান না; বরং এক পর্যায়ে সৃষ্টিরই পূজা শুরু করেন, যা গুরুবাদের নামান্তর। তাদের ধারণা আত্মা ও পরমাত্মার মিশ্রণে সব একাকার হয়ে গেছে। তাই তো তারা বলে বেড়ায় "আল্লাহর নাইরে ছায়া, কায়া স্বরূপ ধইরাছে মায়া, মানুষ হইয়া খোদা খুঁজো এ মন্ত্রণা কে শিখাইয়াছে? (নাউযুবিল্লাহ)

এখন যদি তারা তোমার এ দাবী পূর্ণ না করে, তাহলে জেনে রেখো, তারা আসলে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত ছাড়াই নিছক নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে? আল্লাহ এ ধরনের জালেমদেরকে কখনো হিদায়াত দান করেন না। *(সূরা কাসাস: ৫০)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾

"কতক লোক এমন আছে যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে। অথচ তার ব্যাপারে তো এটা নির্ধারিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধু বানাবে তাকে সে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের আযাবের পথ দেখিয়ে দেবে"। (সূরা হজ্জ: ৩-৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} [غَافِرٍ: ٣٥]

যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন। *সূরা মুমিন/গাফির:৩৫ /*আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾

"বলো, আমার প্রতিপালক কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ্, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না"। *(সূরা আল আরাফ: ৩৩)*

আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে আদেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই তিনি যেন সে বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফের ২৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾

"তুমি বলো, আল্লাহ তাদের অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে বেশী জানেন। আকাশ ও

পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় তিনিই জানেন, তিনি কতই না চমৎকার দ্রষ্টা এবং তিনি কতই না সুন্দর শ্রোতা! পৃথিবী ও আকাশের সকল সৃষ্টির তত্ত্বাবধানকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই এবং নিজের শাসন কর্তৃত্ব তিনি কাউকে শরীক করেন না। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফের ২২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا﴾

"কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থজন ছিল তাদের কুকুরটি। আবার অন্য কিছু লোক বলবে, তারা পাঁচজন ছিল এবং তাদের কুকুরটি ছিল ষষ্ঠ, এরা সব আন্দাজে কথা বলে। অন্যকিছু লোক বলে, তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টমটি তাদের কুকুর। বলো, আমার রবই ভালো জানেন তারা কয়জন ছিল, অল্প লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। কাজেই তুমি সাধারণ কথা ছাড়া সংখ্যা নিয়ে লোকদের সাথে বিতর্ক করোনা এবং তাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করো না"।

নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বলেছেন, «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» "আল্লাহই অধিক জানেন বড় হয়ে তারা কী আমল করতো"।[১৮৪]

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে নিজস্ব রায় বর্জন করো। তোমরা যদি আবু জান্দালের ঘটনার দিন আমাকে দেখতে পেতে! (তাহলে আমাকে খুব অপছন্দনীয় অবস্থায় দেখতে পেতে) আমি সেদিন নিজের রায়ের মাধ্যমে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ প্রত্যাখ্যান করছিলাম। আমি ইজতেহাদ করে কথা বলছিলাম। এতে আমি কোন প্রকার ত্রুটি করছিলাম না। আর সেটি ছিল আবু জান্দালের (হুদায়বিয়ার) ঘটনার দিনের কথা। তখন হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত লিখা হচ্ছিল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করছিলেন, সন্ধিপত্র লিখার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখো। আর কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমর তখন বলছিল, না; বরং লিখার শুরুতে باسمك أللهم লিখতে হবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তখন তার কথা মেনে নিলেন এবং তাই লিখা হলো। আমি এটিকে লাঞ্ছনাকর মনে করে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেই যাচ্ছিলাম। এমনকি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলতে বাধ্য হলেন যে, তুমি দেখছো আমি মেনে নিয়েছি। তথাপিও তুমি তা মেনে নিতে অস্বীকার করছো!!

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সুন্নাত হচ্ছে তাই, যা আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

[১৮৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৮৩, মুসলিম হা/২৬৫৮।

সুতরাং তোমরা তোমাদের ভুল মতামতগুলোকে উম্মতের জন্য সুন্নাত হিসাবে নির্ধারণ করো না।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি যদি নিজের রায় দ্বারা অথবা বিনা ইলমে আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা করি, তাহলে কোন্ যমীন আমাকে আশ্রয় দিবে এবং কোনো আকাশ আমাকে ছায়া দিবে? হাসান বিন আলী আলহুলওয়ানী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের কাছে আরেম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে সাঈদ বিন আবু সাদাকাহ হতে হাম্মাদ বিন যায়েদ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আর সাঈদ বর্ণনা করেছেন ইবনে সিরীন হতে, ইবনে সিরীন বলেন, অজানা বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর চেয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারী অন্য কেউ ছিলেন না। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরে অজানা বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর চেয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারী অন্য কেউ ছিলেন না।

একদা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি মাসআলার (সমস্যার) সম্মুখীন হলেন। আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূলের সুন্নাতে সে বিষয়ে কোন দলীল (সমাধান) পেলেন না। তাই তিনি নিজের রায় দ্বারা ইজতেহাদ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আমার নিজস্ব রায়। তা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর যদি তা ভুল হয়ে থাকে, তা আমার পক্ষ হতেই। আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(৮২) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنَرَى الْمَسْحَ على الْخُفَّيْنِ في السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ في الْأَثَرِ

হাদীছের বর্ণনা মুতাবেক আমরা সফরে গৃহে অবস্থানকালে মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ মনে করি।[১৮৫]

.....

ব্যাখ্যা: অযু করার সময় উভয় পা ধৌত করা এবং পায়ে মোজা থাকলে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করার ব্যাপারে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতের সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাফেযীরা মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত এই সুন্নাতের বিরোধীতা করে।

---

[১৮৫] মোজার উপর মাসেহ করার মাসআলাটি সকল আক্বীদাহর কিতাবে আক্বীদাহ এর বিষয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এটি হচ্ছে দীনের শাখা মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত ফিকহের কিতাবসমূহে এ জাতিয় মাসআলা আলোচনা করা হয়। আক্বীদাহ এর যেসব কিতাবে এই মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে, তার লেখকগণের যুক্তি হচ্ছে দীনের কোন শাখা মাসআলা অথবা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে সুসাব্যস্ত কোন সুন্নাতকে যখন বিদ'আতীরা অস্বীকার করে, তখন সেই সুন্নাতী আমল বা দীনের শাখা মাস'আলাটিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকগণ দীনের উসুল তথা আক্বীদাহ হিসাবে গণ্য করেন।

তারা মোজার উপর মাসেহ করাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং একই সাথে তারা বলে মোজা বিহীন অবস্থায় তথা উভয় পা খোলা অবস্থায় শুধু আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে শুরু করে টাখনু পর্যন্ত উপরের অংশ মাসেহ করতে হবে। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

"হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা ছ্বলাতের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, মাথার উপর হাত বুলাও এবং পা দুটি গোড়ালীসহ ধুয়ে ফেলো"। *(সূরা আল-মায়েদা: ৬)*

তারা বলে أرجلكم শব্দটিকে برءوسكم এর উপর আতফ (যুক্ত) করা হয়েছে। সেই হিসাবে মাথা যেহেতু মাসেহ করা ফরয, তাই পা-এর জন্য একই হুকুম। কেননা মা'তুফ এবং মা'তুফ আলাহির একই হুকুম।

তাদের কথার জবাব এই যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছাহাবীগণ অযুর ব্যাপারে কাওলী ও ফেলী হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তারা কেবল তার থেকেই অযু শিখেছেন ও তার সামনে অযু করেছেন, তিনি তাদের অযু দেখতেন এবং সমর্থন করতেন। তারা অযুর সেই পদ্ধতি পরবর্তীতে আগমনকারী মুসলিমদের জন্য বর্ণনা করেছেন। যারা নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযুর বর্ণনা করেছেন, তাদের সংখ্যা অযুর আয়াত বর্ণনাকারীর সংখ্যার চেয়ে অধিক। কেননা নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সকল মুসলিমই অযু করতেন। তারা তার নিকট থেকেই অযুর নিয়ম শিখেছেন। কেননা জাহেলী যামানায় অযুর এই নিয়মটি তাদের নিকট পরিচিত ছিল না। যে সমস্ত ছাহাবী নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযু করতে দেখেছেন, তাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অযুতে উভয় পা ধৌত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছায় ছাহাবীগণ নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ছ্বহীহ হাদীছের কিতাবসমূহে এবং অন্যান্য কিতাবগুলোতে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পায়ের গোড়ালিসমূহ ও তলাসমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।[১৮৬] এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, পা ধৌত করা আবশ্যক। পায়ে যখন মোজা থাকবে না, তখন পা ধৌত না করে মাসেহ করলে ফরয আদায় হবে না।

শুধু পায়ের উপরের অংশ মাসেহ করাই যদি ফরয হতো, তাহলে সকলের জন্য পা ধৌত করা কষ্টকর বলে মানুষের স্বভাব তা করতে প্রস্তুত হতো না। যেমন সম্পদ ও নেতৃত্ব

[১৮৬] ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/৪১।

অর্জনের প্রতি মানুষ স্বভাবগত দ্রুত ধাবিত হয়। সুতরাং অযুর ধরণ বর্ণনায় মুতাওয়াতের হাদীছগুলোর সমালোচনা করা যদি বৈধ হতো, তাহলে অযুর আয়াতে বর্ণিত শব্দগুলোর বর্ণনাকে দোষারোপ করা আরো অধিক যুক্তি সংগত হতো। কারণ অযুর আয়াত বর্ণনাকারীর সংখ্যা অযুর হাদীছ বর্ণনাকারীর সংখ্যার চেয়ে কম।

তারা যদি বলে অযুর আয়াতের শব্দগুলো এমন মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যাতে মিথ্যা বা ভুল হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তাদের কথার জবাবে বলা হবে যে, অযুর পদ্ধতি বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীছের শব্দগুলো অযুর আয়াতের শব্দগুলোর চেয়ে আরো অধিক উত্তম ও পূর্ণরূপে মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর আয়াতের শব্দগুলো মুতাওয়াতের সুন্নাতের বিরোধীও নয়। কেননা মাসেহ শব্দটি কখনো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তা দ্বারা ভিজা হাতে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য হয়। আবার কখনো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হলেও তা দ্বারা পানি প্রবাহিত করে হালকাভাবে ধৌত করাও উদ্দেশ্য হয়। যেমন আরবরা বলে থাকে, تمسحت للصلاة অর্থাৎ ছ্বলাতের জন্য অযু করেছি। অযুর আয়াতের মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা অযুতে উভয় পা মাসেহ করার কথা বললেও এখানে ঐ মাসেহ (শুধু পায়ের উপর দিয়ে ভেজা হাত চালানো) উদ্দেশ্য নয়, যা ধৌত করার অংশ বা পায়ে মোজা থাকলে ধৌত করার বিকল্প হিসাবে করা হয়। বরং তিনি এমন মাসেহ উদ্দেশ্য করেছেন, যার অন্যতম প্রকার হচ্ছে ধৌত করা (হালকাভাবে ধৌত করা)। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وأرجلكم إلى الكعبين তোমরা পা ধৌত করো পায়ের উভয় গিঁঠ পর্যন্ত। এটি বলেন নি যে, إلى الكعاب (গোড়ালি পর্যন্ত)। অর্থাৎ এখানে كعب শব্দের দ্বি-বচন كعبين ব্যবহার করেছেন। বহুবচন كعاب ব্যবহার করেন নি। যেমন বহুবচন ব্যবহার করেছেন إلى المرافق এর মধ্যে। অর্থাৎ হাতের ব্যাপারে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক হাতের কনুই যেমন একটি তেমনি প্রত্যেক পায়ের গোড়ালি একটি নয়। বরং প্রত্যেক পা-এর মধ্যে রয়েছে দু'টি গোড়ালি। (একটি গোড়ালি ভিতরের দিকে অন্যটি বাহিরের দিকে) সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক 'পা'এর উপরের অংশের উপর এবং 'পা' ও নলার মিলনস্থলে বর্ধিত দু'টি হাড় পর্যন্ত মাসেহ করার আদেশ দিয়েছেন। আর এই মাসেহ দ্বারা ধৌত করা উদ্দেশ্য। যারা মাসেহ দ্বারা খাস মাসেহ তথা পা-এর উপর ভেজা হাত বুলিয়ে নেওয়া বুঝে থাকে, তারা মাসেহকে শুধু পা-এর উপরের অংশের জন্য নির্দিষ্ট করে। আয়াতের মধ্যে উভয় পায়ের উভয় গিঁঠকে ধৌত করার শেষ সীমা নির্ধারণ করাই তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং রাফেযীদের দাবী হলো, ফরয হচ্ছে উভয় পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত উপরিভাগ মাসেহ করা, -যা জুতার ফিতা বাধার স্থানে নলা এবং পায়ের মিলনস্থলে অবস্থিত, তা কুরআন ও ছ্বহীহ সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত।

অযুর আয়াতে وأرجلكم إلى الكعبين এর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ দু'টি কিরাআত রয়েছে। أرجل

শব্দের লাম বর্ণে যবর দ্বারা এবং যের দ্বারা পড়া- এই উভয় কিরাআতই এখানে জায়েয। উভয় কিরাআতের ব্যাখ্যা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যবর দিয়ে পড়া হলে উভয় পা ধৌত করা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। কেননা তখন ধৌত করার অঙ্গ 'হাত'এর উপর 'পা'কে আতফ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উভয় পা ধৌত করা হবে। যের দিয়ে পড়া কেউ কেউ জায়েয বললেও তা এ জন্য সঠিক নয় যে, কোনো বিষয়কে অন্য বিষয়ের মহলের (স্থানের) উপর আতফ করা তখনই সঠিক হয়, যখন উভয়ের অর্থ ও হুকুম অভিন্ন হয়। কবি বলেন, فلسنا بالجبال ولا الحديد অর্থাৎ আমরা পাহাড় ও লোহা নই। এখানে الحديد কে الجبال এর মহলের উপর আতফ করে তাকে নাসব দেয়া হয়েছে। কেননা الجبال শব্দটি নসবের স্থানে এসেছে। মূল বাক্যটি আসলে এরূপ, فلسنا الجبال والحديد।

আর مسحت برأسي ورجلي- এই বাক্যের অর্থ مسحت رأسي ورجلي বাক্যের অর্থের অনরূপ নয়। رأس (মাথা) শব্দের পূর্বে হরফে জার با উল্লেখ করার মাধ্যমে মাসেহ শব্দটি অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে। তা হচ্ছে মাথার সাথে সামান্য পানি (ভিজা হাত) মিলিয়ে দেয়া। সুতরাং أرجلكم এর আতফ أيديكم এর উপর হওয়া নির্দিষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ ধৌত করার অঙ্গ 'হাত'এর উপর অন্য ধৌত করার অঙ্গ 'পা'কে আতফ করা হয়েছে।

কতিপয় লোক অযুর আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হতে যা বুঝেছে, অর্থাৎ উভয় পা ধৌত না করে মাসেহ করার যে অর্থ বুঝেছে, তা মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হাদীছগুলো বাতিল সাব্যস্ত করে। কেননা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের জন্য কুরআনের শব্দ এবং অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন আবু আব্দুর রাহমান আস্ সুলামী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, উছমান বিন আফফান, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদসহ অন্যান্য যারা আমাদেরকে শিখাতেন, তারা বলতেন যে, তারা যখন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দশটি আয়াত শিখতেন তখন এই দশটি আয়াতের অর্থ না বুঝে নতুন কোন আয়াত শিখতেন না।

আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, أرجلكم কে برءوسكم এর উপর আতফ করা হয়েছে, তাহলে এখানে উভয় পা মাসেহ করার দ্বারা তা ধৌত করার সময় পানি কম খরচ করার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। কেননা পা ধৌত করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষ পানি অপচয় করে অভ্যস্ত। এই কথাটি সকলের কাছেই পরিচিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ফিক্হের কিতাবসমূহে।

(৮৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا

ভালো-মন্দ সকল মুসলিম শাসকের অধীনে হজ্জ করা ও জিহাদ করা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কোন কিছুই এ দু'টি কাজকে বাতিল বা রহিত করতে পারবে না।

.....

ব্যখ্যা: শাইখ এখানে শিয়া-রাফেযীদের প্রতিবাদ করেছেন। রাফেযীরা বলে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর হতে ইমাম রেযা বের না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় কোন জিহাদ হবে না। তাদের ধারণায় তিনি বের হলে আকাশ থেকে একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করবে, হে লোক সকল! তোমরা তার অনুসরণ করো। এটি একটি সুস্পষ্ট বাতিল কথা। এটি কোন দলীল দিয়ে সমর্থনযোগ্য কথা নয়। রাফেযীরা জিহাদ, হজ্জ বা অন্যান্য বিষয়ে ইমামের জন্য মা'সুম তথা নিষ্পাপ হওয়ার শর্তারোপ করে থাকে। এটি এমন একটি শর্ত, যার পক্ষে কোনো দলীল নেই।

ছ্বহীহ মুসলিমে আওফ বিন মালেক আল আশজাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ عند ذلك؟ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ أَلَا مَنْ وَلِيَ عليه وَالٍ فَرَآه يأتي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ الله فَلْيَكْرَه مَا يأتي مِنْ مَعْصِيَةِ الله وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

"তোমাদের সর্বোত্তম শাসক হচ্ছেন তারাই, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দু'আ করে থাকো। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসক হচ্ছেন তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদের উপর অভিশাপ করো, তারাও তোমাদের উপর অভিশাপ করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তখন তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে তাদেরকে সরিয়ে দিবো না? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছ্বলাত কায়েম রাখবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। জেনে রেখো! যার উপর কোন শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে

যদি দেখে, শাসক আল্লাহর কোন নাফরমানীতে লিপ্ত হচ্ছে, তাহলে সে যেন আল্লাহর নাফরমানীকে অপছন্দ করে। কিন্তু সে যেন শাসকের আনুগত্য বর্জন না করে”।[১৮৭]

শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে অনুরূপ একাধিক হাদীছ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ইমাম নিষ্পাপ হতে হবে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন কথা বলেননি। রাফেযীরা এই মাসআলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা অস্তিত্বহীন ইমামকে তারা নিষ্পাপ ইমাম বানিয়ে নিয়েছে। এই ইমাম তাদের দীন ও দুনিয়ার কোন বিষয়েই উপকার দিবেনা। তাদের দাবী হচ্ছে, তারা এই ইমামের অপেক্ষা করছে। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল আসকারী। রাফেযীরা বলে, তাদের এই ইমাম ২৬০ হিজরী সালে ইরাকের সামেরা শহরের সিরদাবে (গর্তে) অথবা এর নিকট অন্য কোন স্থানে আত্মগোপন করেছেন। তারা সেখানে কখনো কখনো খচ্চর কিংবা ঘোড়া দাঁড় করিয়ে রাখে। যাতে করে তাদের কল্পিত ইমাম বের হয়ে এর উপর আরোহন করেন। আবার কখনো কখনো তারা সেখানে ইমামকে বের হয়ে আসতে ডাকার জন্য লোকও নিয়োগ করে থাকে। সেই লোক এই বলে ডাকতে থাকে, يا مولانا اخرج হে আমাদের অভিভাবক (ইমাম)! বের হয়ে আসুন। তারা সেখানে যুদ্ধাস্ত্র নিয়েও অবস্থান করে। অথচ তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেখানে কোন শত্রু নেই। এমনি আরো অনেক হাস্যকর কান্ড তারা সেখানে করে থাকে।

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ভাল-মন্দ সকল মুসলিম শাসকের অধীনে হজ্জ করা ও জিহাদ করা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কোন কিছুই এ দু'টি ফরযকে বাতিল বা রহিত করতে পারবে না। কেননা হজ্জ ও জিহাদ এমন দু'টি ফরয ইবাদত, যাতে সফর করা আবশ্যক। আর সফরে আমীর থাকার প্রয়োজন রয়েছে। যিনি তার সঙ্গী-সাথীদের কাজ-কর্মের দিক নির্দেশনা দিবেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। এই উদ্দেশ্য নেককার শাসক দ্বারা যেমন হাসিল হয় তেমনি ফাসেক শাসকের দ্বারাও হাসিল হয়।

[১৮৭]. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫।

(৮৪) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ

আমরা কিরামুন কাতিবীন ফেরেশতাদের উপর ঈমান রাখি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের উপর পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করছেন।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"আর নিশ্চয়ই তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে। এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানে"। (সূরা ইনফিতার: ১০-১২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না, যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন রক্ষক সদা প্রস্তুত থাকে না"। (সূরা কাফ: ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾

" মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক পাহারাদার লেগে রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার হেফাযত করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের স্বভাব-চরিত্র বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়ছালা করেন তখন তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই"। (সূরা রাদ: ১১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾

"এরা কি মনে করেছে, আমি এদের গোপন এবং এদের চুপিসারে বলা কথা শুনতে পাই না! আমি সব কিছু শুনছি এবং আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করছে"। (সূরা যুখরুফ: ৮০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

“এটা আমাদের তৈরী করানো আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যাই করতে আমি তাই লিপিবদ্ধ করাতাম”। (সূরা জাসিয়াঃ ২৯) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾

“নিশ্চয়ই আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও চালাকী লিখে রাখছে”। (সূরা ইউনূসঃ ২১)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»

“তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমন করে থাকে। তারা ফজর ও আসরের ছ্বলাতের সময় একসাথে একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল, তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? তারা বলেন, আমরা তাদেরকে ছ্বলাত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তারা ছ্বলাতেই ছিল”।[১৮৮]

“অন্য হাদীছে এসেছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে এমন ফেরেশতাগণ রয়েছেন, যারা পায়খানা করার সময় এবং স্ত্রী সহবাসের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো”।[১৮৯]

সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ সম্পর্কে তাফসীরে এসেছে, দুইজন ফেরেশতা বান্দার ডানে ও বামে থাকেন। তারা বান্দার আমলসমূহ লিখে রাখেন। ডান পাশের ফেরেশতা বান্দার সৎ আমলগুলো লেখেন এবং বাম পাশের ফেরেশতা বান্দার খারাপ আমলসমূহ লিখেন। আর অন্য দুইজন ফেরেশতা তাকে পাহারা দেয় এবং হেফাজত করেন। একজন থাকে পিছনে আরেকজন থাকে সামনে। সুতরাং বান্দা দিনে চারজন ফেরেশতার মাঝে অবস্থান করে। রাতেও তাদের বদলে অপর চারজন ফেরেশতা দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। দুইজন লেখক আর দুইজন প্রহরী। ইমাম ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করে يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফেরেশতাগণ তাকে সামনে ও

[১৮৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৫, মুসলিম হা/৬৩২।

[১৮৯] যঈফঃ তিরমিযী, হা/২৭০০। সিলসিলায়ে যঈফা: হা/২৩০০।

পেছনের দিক থেকে আপদ-বিপদ ও দুর্ঘটনার কবলে পড়া থেকে হেফাজত করেন। অতঃপর যখন আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীর চলে আসে তখন তারা তাকে ছেড়ে চলে যান।

ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ اللهُ بِهِ قَرِيْنَهُ مِنَ الْجِنّ. قَالُوْا وقرينه من الملائكة: وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ وَإِيَّايَ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَأْمُرَنِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»

“আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একজন করে জিন (শয়তান) সাথী এবং একজন করে ফেরেশতা সাথী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ছাহাবীগণ আরজ করলেন, আপনার সাথেও কি শয়তান সাথী নিযুক্ত আছে হে আল্লার রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আল্লাহ্ আমাকে তার উপর বিজয়ী করেছেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং সে আমাকে কল্যাণকর বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর পরামর্শ দেয় না”।[১৯০]

فأسلم শব্দের মীম বর্ণে যবর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। যারা মীম বর্ণে পেশ দিয়ে فَأَسْلَمُ (আমি এখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকি) পড়েছেন, তারা শব্দকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন। যবর দিয়ে পড়ার সময় অর্থ হবে, সেই শয়তান কাফের হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে আত্মসমর্পন করেছে এবং আমার অনুগত হয়েছে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নিযুক্ত জিন শয়তানের ব্যাপারে আলেমদের দু’টি কথার মধ্যে এটিই অধিক বিশুদ্ধ কথা। এ জন্যই তিনি বলেছেন, এখন সে আমাকে কল্যাণকর বিষয় ছাড়া অন্য কোন পরামর্শ দেয় না। আর যারা বলে সেই শয়তান মুসলিম হয়ে গিয়েছিল, তারা অর্থকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। কেননা শয়তান কখনো মুসলিম হয়নি।[১৯১]

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর আদেশেই তারা বান্দাকে হেফাযত করেন। আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতাদেরকে বান্দার হেফাযতের আদেশ

---

[১৯০] ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিয়ামত এবং জান্নাত, অনুচ্ছেদ: শয়তানের একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কানো এবং তার বাহিনী প্রেরণ। হা/২৭১৪।

[১৯১] অন্যান্য আলেমগণ হাদীছের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন: মূলত সে জিন শয়তান ছিল। সে ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল। আর জিনদের মধ্যে কাফের ও মুসলিম উভয়ই রয়েছে। সুতরাং ভাষ্যকার অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই মনে হচ্ছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, ফেরেশতাগণ কিভাবে বান্দার নিয়্যাত জানতে পারেন? উত্তরে তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনা এবং অন্যান্য সালাফ থেকে নকল করে বলেছেন, বান্দা যখন খারাপ কাজের নিয়্যাত করে, তখন তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। আর যখন ভালো কাজের নিয়্যাত করে তখন, তার শরীর থেকে সুগন্ধ পায়। এর মাধ্যমেই তারা বান্দার নিয়্যাত ও মনের গোপন খবর জেনে নেন। তবে এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জানাতে সক্ষম। ফেরেশতাগণ কিভাবে বান্দার মনের গোপন নিয়্যাত জানতে পারেন, সে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাতে কিছুই বর্ণিত হয়নি।

দিয়েছেন। যারা يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ পড়ে থাকেন, তাদের কিরাআত এই অর্থকে সমর্থন করে।

উপরোক্ত সুসাব্যস্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ফেরেশতাগণ বনী আদমের কথা ও কাজ উভয়ই লিখেন। এমনকি বান্দার নিয়্যাতও লিখেন। কেননা নিয়্যাত হচ্ছে অন্তরের কাজ। সুতরাং আল্লাহর বাণী: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ "তারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানে"-এর মধ্যে অন্তরের কাজও শামিল। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছে কুদসীও এই অর্থকে সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা তার ফেরেশতাদেরকে বলেন,

«إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ»

"আমার বান্দা যখন কোন পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তা না করা পর্যন্ত তার কোন গুনাহ্ লিখো না। তবে সে যদি উক্ত গুনাহ্এর কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ্ লিখো। আর যদি বান্দা আমার ভয়ে উক্ত পাপ কাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা তার জন্য একটি নেকী লিখে দাও। আর বান্দা যখন কোনো ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু তা করেনি, তাহলেও তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করে দাও। আর যদি তা করে ফেলে তাহলে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত নেকি লিপিবদ্ধ করো"।[১৯২] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ»

"আল্লাহর ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রভু! তোমার অমুক বান্দা পাপ কাজের ইচ্ছা করছে। অথচ আল্লাহই তার সম্পর্কে অধিক অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলা তখন ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা তার প্রতি খেয়াল রাখো। সে যদি পাপ কাজ করেই ফেলে, তাহলে তোমরা পাপকাজটির বিনিময়ে অনুরূপ একটি গুনাহ লিখে ফেল। আর যদি তা বর্জন করে, তাহলে তার বদলে একটি নেকী লিখে নাও। কেননা সে আমার ভয়েই পাপকাজটি বর্জন করেছে"।[১৯৩]

---

[১৯২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭৫০১, মুসলিম হা/১২৮।

[১৯৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১২৯।

(৮৫) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ

"আমরা সৃষ্টিকুলের রূহসমূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত মালাকুল মাউতের উপরও ঈমান রাখি।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

"এদেরকে বলে দাও, মৃত্যুর যেই ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কবযায় নিয়ে নিবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে"। *(সূরা আস সাজদাহ: ১১)*

এখানে মালাকুল মাওত জান কবয করে থাকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই আয়াত আল্লাহ তা'আলার এই বাণীগুলোর বিরোধী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾

"তিনি নিজের বান্দাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তার প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা সামান্যতম শৈথিল্যও দেখায় না"। (সূরা আল আন'আম: ৬১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবয করেন আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবয করেন। অতঃপর যার মৃত্যুর ফায়ছালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের রূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে"। *(সূরা আয-যুমার: ৪২)*

প্রথম আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে, মালাকুল মাওত জান কবয করে, তার অর্থ হচ্ছে মালাকুল মাওতের দায়িত্ব হচ্ছে রূহ কবয করা এবং প্রাণীর দেহ থেকে তা বের করা। অতঃপর তার কাছ থেকে রহমতের ফেরেশতাগণ কিংবা আযাবের ফেরেশতাগণ রূহ নিয়ে নেন। তারপর তারাই এর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সব কিছুই আল্লাহর অনুমতি, ফায়ছালা, কুদরত, হুকুম ও আদেশে হয়ে থাকে। সুতরাং রূহ কবয করার সম্বন্ধ উপরোক্ত

প্রত্যেকের দিকে করাই সঠিক। একেক জনের দিকে একেক দিক থেকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

নাফ্সের হাকীকত কী?

নাফ্সের হাকীকত বা প্রকৃত অবস্থা কী? এ সম্পর্কে আলেমগণ অনেক মতভেদ করেছেন। এটি কী দেহের কোন অংশ বিশেষ? না কি শরীরের অবস্থা সমূহের কোন একটি অবস্থা? 'নাফ্স' কি দেহের সাথে বসবাসকারী অন্য একটি দেহ, যাকে শরীরের মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে? না কি এটি শুধু একটি জাওহার বা স্বনির্ভর একটি জিনিস? সেই সাথে আরো মতভেদ করা হয়েছে নাফ্স এবং রূহ কী একই জিনিস? না রূহ এবং নাফ্স আলাদা দু'টি বস্তু? নাফ্সে আম্মারা, নাফ্সে লাওয়ামাহ এবং নাফ্সে মুতমাইন্নাহ এই তিনটি একই নাফ্সের নাম? না নাফ্স মূলতই তিনটি? রূহ কী মারা যায়? না কি শুধু দেহের মরণ হয়? এই মাসআলাটি বিস্তারিত লিখলে বিশাল একটি কিতাবে পরিণত হবে। তবে আমি এখানে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এই মাসআলায় কথা বলবো। ইনশা-আল্লাহ।

কারো কারো মতে রূহ হচ্ছে কাদীম বা অসৃষ্ট এবং চিরজীবন্ত একটি জিনিস।[১৯৪] তবে সমস্ত নবী-রাসূল একমত হয়েছেন যে, 'রূহ' আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি সৃষ্টি, প্রস্তুতকৃত ও প্রতিপালিত সৃষ্টি। নবী-রাসূলদের দীন থেকে এটি একটি জ্ঞাত বিষয় যে, সমস্ত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংস হবে। এই বিশ্বাসের উপরই ছিলেন ছাহাবী ও তাবেঈগণ। ছাহাবী ও তাবেঈদের পরে এমন কিছু লোকের আগমন ঘটেছে, যাদের জ্ঞান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত বুঝার ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তারা মনে করল যে, রূহ অসৃষ্ট ও চিরজীবন্ত একটি জিনিস।

তাদের দলীল হচ্ছে রূহ আল্লাহর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর আদেশ সৃষ্ট বস্তু নয়। বরং তা আল্লাহর সিফাতের মধ্যে শামিল। তারা আরো বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন তার ইলমকে, তার কুদরতকে, শ্রবণকে, দৃষ্টিকে এবং তার হাতকে নিজের দিকে সম্বোধিত করেছেন, তেমনি রূহকেও তার নিজের দিকে সম্বোধিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলো, রূহ আমার রবের আদেশ মাত্র। কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৮৫)*

---

[১৯৪] দার্শনিকরা অসৃষ্ট বস্তু বা স্রষ্টাকে ব্যাখ্যা করে থাকে কাদীম শব্দ দ্বারা এবং এর বিপরীতে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করে হাদিছ শব্দ দ্বারা।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾

"যখন আমি তাকে পূর্ণ অবয়ব দান করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদাবনত হয়ে যেও"। *(সূরা ছ্বদ: ৭২, সূরা আল হিজর, ২৯)* অন্যরা এ ব্যাপারে কোন প্রকার মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলেন, রূহ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। এই কথার উপর যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইজমা ব্যক্ত করেছেন, তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন নাসর আল-মারওয়াযী এবং ইবনে কুতাইবা অন্যতম। রূহ যে আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

"আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক"। *(সূরা আয-যুমার: ৬২)*

এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। কোন কিছুই আল্লাহর সৃষ্টির বাইরে নয়। তবে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতসমূহ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে শামিল নয়। আল্লাহর সিফাতসমূহ তার পবিত্র সত্তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র ইলাহ। তিনি সিফাতে কামালীয়ার দ্বারা গুণান্বিত। তার ইলম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা) হায়াত (জীবন), শ্রবণ, দৃষ্টি এবং অন্যান্য সকল সিফাত তার নামের সত্তার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র সত্তা ও সিফাতে কামালীয়ার মাধ্যমে সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি এবং তার সিফাতসমূহ ছাড়া বাকী সবই তার সৃষ্টি।

এ কথা অকাট্যভাবে জ্ঞাত যে, সমস্ত মাখলুকের রূহসমূহ আল্লাহর পবিত্র সত্তার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আল্লাহর সিফাতসমূহেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾

"মানুষের উপর অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না"। *(সূরা দাহার: ১)* আল্লাহ তা'আলা যাকারীয়া আলাইহিস সালাম কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

﴿كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾

"এভাবেই হবে। তোমার রব বলেন, এ তো আমার জন্য সামান্য ব্যাপার মাত্র। এর আগে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। তখন তুমি কিছুই ছিলে না"। *(সূরা মারইয়াম: ৯)*

দেহ এবং রূহকে একসাথে মিলিয়ে ইনসান তথা মানুষ বলা হয়। এখানে যাকারীয়া আলাইহিস সালাম এর রূহ ও দেহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তিনি কিছুই ছিলেন না, অতঃপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রূহের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, রূহ কবয করা হয়, রূহ এর মৃত্যু হয়, তাকে আটকিয়ে রাখা হয় এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এ কথাগুলো সাধারণত ধ্বংসশীল সৃষ্টির বেলায় প্রযোজ্য হয়।

আর যারা বলে রূহ মাখলুক (সৃষ্টি) নয়, তারা আল্লাহর এই বাণী: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي 'বলো, এ রূহ আমার রবের আদেশ মাত্র'-এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে। তাদের এই দলীল গ্রহণ ঠিক নয়। কেননা এখানে أمر (আদেশ) দ্বারা আল্লাহর হুকুম উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে রূহ একটি আদিষ্ট বা আল্লাহর আদেশপ্রাপ্ত সৃষ্টি। আরবী ভাষায় কখনো মাসদার (ক্রিয়ামূল) উল্লেখ করে ইসমে মাফউল (কর্মকারক) উদ্দেশ্য করা হয়। এ বিষয়টি আরবদের কাছে একটি জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধ বিষয়।

আর তারা বলে থাকে, এখানে রূহকে আল্লাহর দিকে সম্বোধিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي "এবং যখন আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো"। সুতরাং রূহকে যেহেতু আল্লাহর দিকে সম্বোধিত করা হয়েছে, তাই তা সৃষ্টি নয়।

তাদের যুক্তির জবাব হলো, এখানে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর দিকে যা সম্বন্ধ করা হয়, তা দুই প্রকার। (১) আল্লাহর দিকে এমন সিফাতের সম্বন্ধ করা হয়, যা স্বনির্ভর নয়। অর্থাৎ অন্যের সাথে মিলিত না হলে এগুলো অস্তিত্বশীল হয় না। যেমন ইলম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা), কালাম (বাণী), শ্রবণ দৃষ্টি ইত্যাদি। অর্থাৎ আলেম ছাড়া ইলম, ক্ষমতাবান ছাড়া ক্ষমতা, বক্তা ছাড়া বক্তৃতা, শ্রবণকারী ছাড়া শ্রবণ এবং দ্রষ্টা ছাড়া দৃষ্টির কল্পনা করা যায় না। এমনি আল্লাহ তা'আলার হাত ও চেহারার ক্ষেত্রেও কথা একই।

(২) আল্লাহর দিকে এমন সৃষ্ট বস্তুরও সম্বন্ধ করা হয়, যা আল্লাহর যাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন বলা হয় بيت الله আল্লাহর ঘর, ناقة الله আল্লাহর উটনী, عبد الله আল্লাহর বান্দা, رسول الله আল্লাহর রাসূল, روح الله আল্লাহর রূহ ইত্যাদি। এই মাখলুকগুলো খালেকের দিকে ইযাফত বা সম্বোধিত করা হয়েছে। এই ধরণের সম্বন্ধ দ্বারা মাখলুকের সম্মান বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য। যেসব বস্তুকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, সেগুলো অন্যান্য মাখলুক থেকে আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী হয়ে থাকে।

রূহ এর হাকীকত:

রূহের ব্যাপারে আরো মতভেদ করা হয়েছে যে, রূহ আগে সৃষ্টি করা হয়? না শরীর আগে সৃষ্টি হয়? আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রূহ কী? এ ব্যাপারে অনেক মতভেদ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, রূহ একটি স্বতন্ত্র দেহ। কেউ কেউ বলেছেন, রূহ দেহ নয়; বরং দেহের বিশেষ এক অবস্থা মাত্র।

কেউ কেউ বলেছেন, রূহ কি স্বনির্ভর কোনো দেহের নাম? নাকি দেহের অবস্থা বিশেষ? তা আমরা জানি না।

কেউ কেউ বলেছেন, যেই চারটি উপাদানের সংমিশ্রনে মানুষের শরীর গঠিত তার ভারসাম্য ঠিক থাকার নামই হচ্ছে রূহ। প্রাচীন দার্শনিকদের মতে সেই উপাদান চারটি হচ্ছে আগুন, মাটি, হাওয়া ও পানি।

কেউ কেউ বলেছেন, রূহ হচ্ছে দেহের ঐ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রক্তের নাম, যা ময়লা-আবর্জনা ও পচন থেকে মুক্ত থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, রূহ হচ্ছে শরীরের স্বভাবজাত উত্তাপ। এটিকে জীবনী শক্তিও বলা হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, রূহ হচ্ছে এমন একটি সুক্ষ্ম সত্তা, যাকে সৃষ্টিজগতের সকল প্রাণীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রাণীর মধ্যে রূহ সঞ্চার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণীকে কাজের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং কাজে লাগানো। এই রূহের কারণেই প্রাণী সচল থাকে এবং নড়াচড়া করে ও তার প্রয়োজন মোতাবেক সকল কাজ সম্পন্ন করে। এই রূহকে সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার পরও তার সত্তা ও গঠন বিভিন্ন নয়। অর্থাৎ সকল সৃষ্টিজগতের রূহ মূলত একটিই; একাধিক নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যেই বাতাস দেহে প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে বের হয়, তাই রূহ। রূহ এর ব্যাপারে এমনি আরো অনেক কথাই বলা হয়েছে।

ইনসান বা মানুষের হাকীকত:

الإنسان (মানুষ) কাকে বলে এ ব্যাপারেও মতভেদ আছে। মানুষ কী শুধু রূহের নাম? নাকি শুধু শরীরের নাম? নাকি দেহ ও রূহের সমষ্টিগত নাম? নাকি উভয়ের প্রত্যেকটির নাম? আলেমগণ কালামের ব্যাপারেও এই চারটি কথা বলেছেন। কালাম কি শুধু শব্দের নাম? নাকি শুধু অর্থের নাম? নাকি উভয়ের সমষ্টিগত নাম? নাকি শব্দ ও অর্থ এ দু'টির প্রত্যেকটির নাম? সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষ ও তার কথার ব্যাপারে লোকেরা একই রকম

মতভেদ করেছে। সঠিক কথা হচ্ছে রূহ এবং দেহের সম্মিলিত রূপের নাম হচ্ছে মানুষ। তবে যদি কোন আলামত পাওয়া যায়, তাহলে রূহ এবং দেহের যে কোনো একটিকে মানুষ নাম দেয়া যেতে পারে। এমনি কালামের ক্ষেত্রেও একই কথা।

আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, ছাহাবীদের ইজমা এবং সুস্থ বিবেক প্রমাণ করে যে, নাফ্স বা রূহ আমাদের এই পরিচিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত দেহ থেকে আলাদা একটি সত্তা। সেটি হচ্ছে উর্ধ্ব জগতে চলাচলকারী এক চিরজীবন্ত হালকা নূরানী সত্তা। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে তা চলাচল করে। গোলাপের মধ্যে পানি যেমন চলাচল করে, যয়তুনের মধ্যে তেল যেমন তার প্রত্যেক কণার মধ্যেই বিদ্যমান ও সতেজ থাকে এবং কয়লার মধ্যে আগুন যেভাবে চলাচল করে, প্রাণীর দেহে রূহ ঠিক সেভাবেই চলাচল করে। দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতক্ষণ এই সুক্ষ্ম 'রূহ'এর প্রভাব কবুল করার উপযোগী থাকে, ততক্ষণ দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এই রূহ চলাচল করতেই থাকে এবং শরীরের মধ্যে 'রূহ'এর প্রভাব অনুভব হয় এবং কাজ করার ইচ্ছা তৈরী করে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে রূহ চলাচলের এই রাস্তা যখন রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায়, তখন দেহ থেকে 'রূহ' বিচ্ছিন্ন হয় এবং সে রূহের জগতে চলে যায়। 'রূহ' এর ব্যাপারে এ সর্বশেষ মতটিই সঠিক। নিম্নে এই মতের পক্ষে কতিপয় দলীল উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবয করেন আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার রূহ কবয করেন। অতপর যার মৃত্যুর ফায়ছালা কার্যকরী হয় তাকে রেখে দেন এবং অন্যদের 'রূহ' একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে"। *(সূরা আয-যুমার: ৪২)*

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'রূহ' কবয করা হয়, তাকে আটকিয়ে রাখা হয় আবার ছেড়েও দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

"আপনি যদি যালিমদেরকে ঐ সময়ে দেখতে পেতেন যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের রূহ বের করে আনো। তোদের আমলের কারণে আজ তোদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছিলে এবং তোমরা তার আয়াতের বিরুদ্ধে অহংকার করেছিলে"। *(সূরা আল-আনআম: ৯৩)*

এখানে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ মানুষের 'রূহ' বের করার জন্য হাত প্রসারিত করেন। 'রূ'হ এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাকে মানুষের শরীর থেকে বের করা হয় এবং তা বের হয়ে আসে। আরো সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাকে কিয়ামতের দিন আযাব দেয়া হবে এবং সে তার প্রভুর নিকট হাযির হবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়-কাল পূর্ণ হয়। পরিশেষে তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে"। *(সূরা আল-আন'আম: ৬০)*

এখানেও বলা হয়েছে যে, রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে 'রূহ'কে কবয করা হয় এবং দীনের বেলায় দেহের ভিতর ছেড়ে দেয়া হয়। আর মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ 'রূহ'কে মানুষের শরীর থেকে কবয করে নেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِيوَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

"হে প্রশান্ত আত্মা! চলো তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে তুমি সন্তুষ্ট এবং তোমরা রবের প্রিয়পাত্র। শামিল হয়ে যাও আমার নেক বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে"। *(সূরা ফাজর: ২৭-৩০)*

এখানে রূহের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তা ফিরে যায়, প্রবেশ করে এবং সন্তুষ্ট হয়। ছ্বহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

« إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ »

" যখন কারো 'রূহ' কবয করা হয়, তখন তার চোখ 'রূহ'এর দিকে চেয়ে থাকে এবং দেখে তা কোথায় যাচ্ছে"।[১৯৫]

এই হাদীছ থেকে জানা গেল যে, 'রূহ'কে কবয করা হয় এবং দেহ থেকে রূহ বের হয়ে চলে যাওয়ার সময় তাকিয়ে দেখে। বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে এসেছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ»

"আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের 'রূহ'গুলো কবয করে নিয়েছেন। আবার

[১৯৫] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯২০।

যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের 'রূহ'গুলো ফেরত দিয়েছেন"।[১৯৬] নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ القيامة»

"মুমিন ব্যক্তির 'রূহ' পাখীর আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষরাজিতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিচরণ করতে থাকে"।[১৯৭]

কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে আরো অনেক দলীল সামনে আসছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মালাকুল মাওত 'রূহ'কে সম্বোধন করে কথা বলে, মুমিন ব্যক্তির 'রূহ' ঠিক সেভাবেই বের হয়, যেমন কলসীর মুখ থেকে পানির সর্বশেষ ফোটা বের হয়, মুমিন ব্যক্তির 'রূহ' উর্ধ্ব জগতে আরোহন করে এবং তা থেকে সর্বোত্তম সুঘ্রাণ বের হয়। অপর পক্ষে কাফেরের 'রূহ' থেকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট পঁচা-দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বের হয়। এর উপরই সালাফগণের ইজমা সংঘঠিত হয়েছে। সুস্থ বিবেকও তাকে সমর্থন ও সাব্যস্ত করেছে। অবাস্তব ধারণা এবং বিভ্রান্তিকর সন্দেহ ছাড়া বিরোধীদের কাছে আর কোনো দলীল নেই। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে কুরআন ও হাদীছের অকাট্য দলীল এবং সুস্থ বিবেক দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের বিরোধীতা করা যাবে না।

রূহ এবং নাফস্ কি একই জিনিস?

'রূহ' এবং নাফ্স (প্রাণ) কি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়? না কি একই জিনিসের দু'টি নাম? এ বিষয়েও লোকেরা মতভেদ করেছে। সঠিক কথা হচ্ছে অনেকগুলো বিষয় বুঝাতে নাফস্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এমনি 'রূহ' শব্দটিও একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো নাফ্স এবং 'রূহ' একই অর্থে আসে আবার কখনো উভয়টি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং নাফ্স সাধারণত 'রূহ' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে 'রূহ' যখন শরীরের সাথে যুক্ত থাকে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে নাফ্স বলা হয়। আর যখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন অধিকাংশ সময় 'রূহ' হিসাবেই নাম দেয়া হয়। নাফ্সকে রক্তও বলা হয়। হাদীছে এসেছে, যেই প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় না, তা পানিতে পড়ে মারা গেলে পানি নাপাক হয় না।[১৯৮]

---

[১৯৬] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫৯৫।

[১৯৭] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪২৭১, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬১৯১, নাসাঈ, হা/২০৭২। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ মেশকাতুল মাসাবীহ, হা/ ১৬৩২

[১৯৮] এটি আসলে হাদীছ নয়। তবে এই অর্থে বায়হাকী শরীফে সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হাদীছ নং- ২৭৪।

বদনযরকেও নাফ্স বলা হয়। যেমন বলা হয়, أصابت فلانا نفس অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির উপর বদনযর লেগেছে। যাত অর্থাৎ ব্যক্তি সত্তাকেও নাফ্স বলা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা নিজেদের লোকদের সালাম দাও, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বরকতময় ও পবিত্র অভিবাদন স্বরূপ। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আশা করা যায় তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে"। *(সূরা আন নূর: ৬১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। তবে পারস্পরিক রেযামন্দির ভিত্তিতে যদি ব্যবসার মাধ্যমে হয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান"। *(সূরা আন নিসা: ২৯)* এ রকম আরো আয়াত রয়েছে।

কিন্তু 'রূহ' শব্দটি কখনোই শরীর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 'রূহ' দেহ থেকে আলাদা হওয়ার পরেও 'রূহ'কে শরীর বলা হয় না এবং নাফ্সের সাথে মিলিত থাকা অবস্থায়ও 'রূহ'কে শরীর বলা হয় না। কুরআনকেও 'রূহ' বলা হয়। জিবরীল ফেরেশতাকেও রূহ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক 'রূহ'কে অহী করেছি। তুমি আদৌ জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি। কিন্তু সেই 'রূহ'কে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সোজা পথের দিক নির্দেশনা দান করছি। *(সূরা আশ-শূরা: ৫২)*

'রূহ' দ্বারা জিবরীল আলাইহিস সালাম ও উদ্দেশ্য হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾

"এটি রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা কিতাব। একে নিয়ে আমানতদার 'রূহ' (জিবরীল) নাযিল করেছে তোমার হৃদয়ে পরিষ্কার আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ককারী হয়ে যাও"। *(সূরা শুআরা: ১৯৩)*

মানুষের শরীরে চলাচলকারী হাওয়াকেও 'রূহ' বলা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা যে 'রূহ' দ্বারা তার অলীদেরকে শক্তিশালী করেন, তা হচ্ছে অন্য একটি রূহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভাল বাসছে যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করেছে। তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা গোষ্ঠীভুক্ত হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। আল্লাহ এসব লোকদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমুল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি 'রূহ'এর মাধ্যমে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রেখো আল্লাহর দলের লোকেরাই সফলকাম"। *(সূরা মুজাদালা: ২২)*

অনুরূপভাবে মানুষের শরীরে যেই শক্তি থাকে, তাকেও 'রূহ' বলা হয়। বলা হয় চোখের রূহানী শক্তি, কানের রূহানী শক্তি, নাকের রূহানী শক্তি ইত্যাদি।

উপরোক্ত সবগুলো বিষয়ের চেয়ে ভিন্ন একটি খাস জিনিসকে রূহ বলা হয়। সেটি হচ্ছে আল্লাহর মারেফতের শক্তি, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া, আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তা অর্জনের জন্য সুদৃঢ় হিম্মত ও ইচ্ছা পোষণ করা। এই রূহানী শক্তিকে রূহের দিকে সম্বোধিত করা শরীরের দিকে 'রূহ'কে সম্বোধিত করার মতই। সুতরাং ইলম হচ্ছে রূহ, ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করা হচ্ছে ইবাদতের রূহ, আল্লাহর মুহাব্বত রূহ, আল্লাহর উপর ভরসা করা 'রূহ' এবং সত্যবাদী হওয়াও 'রূহ'।

এই 'রূহ'গুলোর ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন স্তরভেদ রয়েছে। কোন কোন মানুষের মধ্যে এই রূহানী শক্তিগুলো জয়লাভ করে। ফলে সেই মানুষ রূহানী জগতের মানুষে পরিণত হয়। আবার কোনো কোনো মানুষ এগুলো হারিয়ে ফেলে কিংবা এর অধিকাংশই হারিয়ে ফেলে। তখন সে যমীনের পোকা-মাকড় ও পশুতে পরিণত হয়।

অনেক আলেমের উক্তি থেকে জানা যায় যে, বনী আদমের তিনটি নাফ্স রয়েছে। নাফ্সে মুতমাইন্নাহ (শান্ত আত্মা), নাফ্সে লাওয়ামাহ (দোষারোপকারী আত্মা) এবং নাফ্সে আম্মারা (দুষ্ট আত্মা)। কারো উপর এগুলো থেকে কোনো একটি নাফ্স জয়লাভ করে। আবার কারো কাছে অন্য একটি জয়লাভ করে। যেমন-

নাফ্সে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

"হে প্রশান্ত আত্মা! চলো তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে তুমি সন্তুষ্ট এবং তোমরা রবের প্রিয়পাত্র। শামিল হয়ে যাও আমার নেক বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে"। *(সূরা ফাজর: ২৭-৩০)* নাফ্সে লাওয়ামাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾

"আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী নাফ্সের"।[১৯৯] *(সূরা কিয়ামাহ: ২)*

---

[১৯৯] কুরআন মজীদে মানুষের নফসের তিনটি রূপ উল্লেখ করা হয়েছে। **(এক)** একটি নাফ্স মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এটির নাম নাফ্সে আম্মারা। **(দুই)** একটি নাফ্স অন্যায় কাজ করলে অথবা ভুল বা অন্যায় বিষয়ে চিন্তা করলে কিংবা খারাপ নিয়্যাত রাখলে লজ্জিত হয় এবং সেজন্য মানুষকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করে। এটির নাম "নাফ্সে লাউয়ামাহ"। আধুনিক পরিভাষায় একেই আমরা বিবেক বলে থাকি। **(তিন)** যে নাফসটি সঠিক পথে চললে এবং ভূল ও অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করলে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে তাকে বলে "নাফ্সে মুতমাইন্নাহা"। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কি কারণে কিয়ামতের দিন এবং তিরস্কারকারী নাফ্সের কসম করেছেন তা বর্ণনা করেননি। কারণ পরবর্তী আয়াতটি সে বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করছে। যে জন্য কসম করা হয়েছে তাহলো, মানুষের মরার পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তা করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম।

এখন প্রশ্ন হলো এ বিষয়টির জন্য এ দুটি জিনিসের কসম করার পেছনে কি যৌক্তিকতা আছে। কিয়ামতের দিনের কসম খাওয়ার কারণ হলো, কিয়ামতের আগমন নিশ্চিত ও অনিবার্য। গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করছে যে, এ ব্যবস্থাপনা অনাদী ও অন্তহীন নয়। এর বৈশিষ্ট ও প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে এটা চিরদিন ছিলনা এবং চিরদিন থাকতেও পারে না। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এ ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার সপক্ষে ইতিপূর্বেও কোন মজবুত দলীল-প্রমান খুঁজে পায়নি যে, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল এ পৃথিবী কখনো অনাদি ও অবিনশ্বর হতে পারে। কিন্তু এ পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে এ বিষয়টি তার কাছে ততই নিশ্চিত হতে থাকে যে, এ চাঞ্চল্য মুখর বিশ্ব-জাহানের একটি শুরু বা সূচনা আছে যার পূর্বে এটি ছিল না। আবার অনিবার্যরূপে এর একটি শেষও আছে, যার পরে এটি আর থাকবে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কিয়ামতেরই কসম করেছেন। কিয়ামতের দিনের কসম শুধু এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, একদিন বিশ্ব জাহানের এ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তাকে নিজের সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে এবং সে নিজের কৃতকর্মের ভাল বা মন্দ ফলাফল দেখবে। এর জন্য পুনরায় নাফ্সের লাওয়ামাহএর কসম করা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে বিবেক বলে কোন জিনিস নেই। এ বিবেকের মধ্যে অনিবার্যরূপে ভাল এবং মন্দের একটি অনুভূতি বিদ্যমান। মানুষ ভাল এবং মন্দ যাচায়ের যে মানদন্ডই স্থির করে থাকুক না কেন এবং তা ভুল হোক বা নির্ভুল হোক, চরম বিভ্রান্ত মানুষের বিবেকও মন্দ কাজ করলে কিংবা ভাল কাজ না করলে তাকে তিরষ্কার করে। এটিই প্রমান করে যে, মানুষ নিছক একটি জীব নয়, বরং একটি নৈতিক সত্ত্বাও বটে। প্রকৃতিগতভাবেই তার মধ্যে ভাল এবং মন্দের উপলব্ধি বিদ্যমান। সে নিজেই ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। সে অন্যের সাথে যখন কোন খারাপ আচরণ করে তখন সে ব্যাপারে নিজের বিবেকের দংশনকে

নাফ্সে আম্মারা (মন্দ কাজে প্ররোচনা দানকারী নফ্স) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"আমি নিজের নফ্সকে দোষমুক্ত করছি না। নাফ্স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া। অবশ্যই আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান"। *(সূরা ইউসুফ: ৫৩)*

তবে সঠিক কথা এই যে, নাফ্স একটিই। একই নাফসের একাধিক অবস্থা, বৈশিষ্ট ও স্বভাব রয়েছে। নাফ্সের কোনো স্বভাব মানুষকে পাপ কাজের প্রতি প্ররোচিত করে। আল্লাহ তা'আলা, পরকাল এবং অন্যান্য গায়েবী বিষয়ের প্রতি ঈমান যখন সামনে এসে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তখন তা তিরস্কার ও দোষারোপকারীতে পরিণত হয়। নাফ্সের কোন কোন স্বভাব নাফ্সকে পাপ কাজের প্ররোচনা দেয়। ফলে নাফ্স পাপকাজে লিপ্ত হয়। অতঃপর নাফ্সের লাওয়ামাহ নামক স্বভাব পাপ কাজের কারণে তিরস্কার শুরু করে। তার তিরস্কার করাটা হতে থাকে সৎকাজ না করার কারণে এবং অন্যায় কাজ বর্জন না করার কারণে। নাফ্সের মধ্যে ঈমান যখন শক্তিশালী হয়ে যায় এবং সৎকাজে আত্মনিয়োগ করে এবং পাপকাজ বর্জন করে, তখন নাফ্স শান্তিময় তথা নাফ্সে মুতমাইন্নায় পরিণত হয়। এ জন্যই নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ"

যাকে তার সৎকাজ আনন্দ দান করে এবং পাপ কাজ কষ্ট দেয়, সেই মুমিন।[২০০]

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ »

"যিনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না।[২০১]

দমন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও অন্য কেউ যখন তার সাথে একই আচরণ করে তখন আপনা থেকেই তার বিবেক দাবী করে যে, এ ধরনের আচরণকারীর শাস্তি হওয়া উচিত। এখন কথা হলো, মানুষের নিজ সত্তার মধ্যেই যদি এ ধরনের একটি নাফ্সে লাওয়ামাহ বা তিরষ্কারকারী বিবেকের উপস্থিতি একটি অনস্বীকার্য সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এ সত্যটিও অনস্বীকার্য যে, এ নাফ্সে লাওয়ামাই মৃত্যুর পরের জীবনের এমন একটি প্রমাণ যা মানুষের আপন সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। কেননা যেসব ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য মানুষ দায়ী সেসব কাজের পুরষ্কার বা শাস্তি তার অবশ্যই পাওয়া উচিত। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন ছাড়া আর কোনভাবেই তার এ দাবী পূরণ হতে পারে না। মৃত্যুর পরে মানুষের সত্তা যদি বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তার অনেক ভাল কাজের পুরষ্কার থেকে সে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত থেকে যাবে। আবার এমন অনেক মন্দ কাজ আছে যার ন্যায্য শাস্তি থেকে সে অবশ্যই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষই এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না।

[২০০] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২১৬৫, সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/৫৫০।

[২০১]. ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৪৭৫, মুসলিম হা/৫৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৩৬, আবূ দাউদ হা/৪৬৮৯।

‘রূহ’ কি মৃত্যু বরণ করে?

‘রূহ’ মৃত্যু বরণ করে কি না? এ ব্যাপারেও লোকেরা মতভেদ করেছে। একদল লোক বলেছে রূহ মৃত্যু বরণ করে। কেননা রূহ হচ্ছে নাফ্স। প্রত্যেক নাফ্সই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

“প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ পেতে হবে”। *(সূরা আনকাবুত: ৫৭, সূরা আলে-ইমরান: ১৮৫)* আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

“ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে”। *(সূরা আর-রাহমান: ২৬-২৭)* আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

“সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তার সত্তা ছাড়া”। *(সূরা কাসাস: ৮৮)*

এই মতের সমর্থকগণ বলেন, ফেরেশতাগণ যেখানে মৃত্যু বরণ করবে, তাই মানুষের রূহসমূহ মৃত্যুর আরো অধিক নিকটবর্তী। অন্যরা বলেন, ‘রূহ’ এর মৃত্যু নেই। কেননা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যই ‘রূহ’ সৃষ্টি করা হয়েছে। মৃত্যু হবে শুধু দেহের। মৃত্যুর পর ‘রূহ’কে আল্লাহ তা‘আলা পুনরায় দেহের মধ্যে ফেরত দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত ‘রূহ’এর শাস্তি পাওয়া অথবা শাস্তি ভোগ করাই প্রমাণ করে যে, ‘রূহ’ মরে না।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে দেহ থেকে ‘রূহ’ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বের হয়ে যাওয়াই ‘রূহ’এর মৃত্যু। ‘রূহ’এর মৃত্যু দ্বারা যদি এই পরিমাণ বুঝানো হয়, তাহলে বলতে হবে যে, ‘রূহ’ অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ পাবে। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, ‘রূহ’ একবারে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে বলতে হবে ‘রূহ’ কখনো এভাবে মরবে না। বরং ‘রূহ’ সৃষ্টির পর থেকে চিরদিন নিয়ামত বা আযাব ভোগ করতেই থাকবে। এ বিষয়ে সামনে আরো আলোচনা আসছে। ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতীদের সম্পর্কে বলেছেন যে,

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

“তারা সেখানে কখনো মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না। তবে দুনিয়াতে যে মৃত্যু এসেছিল তা তো এসেই গেছে। আর আল্লাহ তার করুণায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন”। *(সূরা আদ দুখান: ৫৬)*

এখানে যেই মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দেহ থেকে 'রূহ' বিচ্ছিন্ন হওয়া। জাহান্নামীরা বলবে,

﴿رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾

"হে আমাদের রব! প্রকৃতই তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো এবং দু'বার জীবন দান করেছো। এখন আমরা অপরাধ স্বীকার করছি। এখন এখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় কি আছে? *(সূরা গফির/মুমিন: ১১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"তোমরা আল্লাহর সাথে কিভাবে কুফুরী করতে পারো। অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করবেন। তারপর তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"। *(সূরা আল বাকারা: ২৮)*

আয়াতের অর্থ হচ্ছে তারা তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে এবং মাতাদের গর্ভে শুক্র আকারে ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করেছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে মৃত্যু দান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। কিয়ামতের দিনের পূর্বে তাদের 'রূহ'এর কোন মৃত্যু হবে না। অন্যথায় তিনবার মৃত্যু ঘটানো আবশ্যক হয়।

শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সময় সমস্ত রূহ বেহুশ হওয়াতে তাদের মৃত্যু আবশ্যক হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন যখন লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য আসবেন, তখন তারা বেহুশ হয়ে যাবে। আল্লাহর নূরে সমগ্র পৃথিবী জ্বলে যাওয়া মৃত্যু নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশা-আল্লাহ। মূসা আলাইহিস সালাম তুর পর্বতে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। এটি তার মৃত্যু ছিল না। ইসরাফীলের যেই ফুৎকারে মাখুলক বেহুশ হবে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা এর পূর্বে মৃত্যুর স্বাদ চাখেনি, তাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করানো। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

কিন্তু যারা মৃত্যুর স্বাদ একবার ভোগ করেছে, অথবা যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করা হয়নি, যেমন বেহেশতের হুর-গিলমান এবং জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামত, এগুলো থেকে কোন একটির দ্বিতীয়বার মৃত্যু হবে, কুরআনের আয়াতে এর কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

(৮৬) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ له أَهْلًا وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِه عَنْ رَبِّه وَدِينِه وَنَبِيِّه على مَا جَاءَتْ به الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ وَعَنِ الصَّحَابَة رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ وَالْقَبْرُ رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة أَوْ حُفْرَة مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ

আমরা কবরের আযাবের প্রতিও ঈমান রাখি। আরো বিশ্বাস করি যারা এই আযাবের যোগ্য, কেবল তাদেরকেই এ শাস্তি দেয়া হবে। নাকীর-মুনকার ফেরেশতাদ্বয় কবরে যেসব প্রশ্ন করবেন, তার প্রতিও আমরা ঈমান রাখি। তারা প্রশ্ন করবেন বান্দার রব সম্পর্কে, দীন সম্পর্কে এবং তার নাবী সম্পর্কে। এ বিষয়গুলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে আমরা ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করি। কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহের অন্যতম একটি বাগিচা অথবা তা জাহান্নামের গর্তসমূহের অন্যতম একটি গর্ত।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

আর ফেরাউনের সম্প্রদায়কে জাহান্নামের আগুন বেষ্টন করে ফেলেছে। সেই আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো"। *(সূরা মুমিন: ৪৫-৪৬)* আল্লাহ তা'আলা সূরা তুরের ৪৫- ৪৭ নং আয়াতে বলেন,

﴿فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"অতএব, হে নবী! তাদেরকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। যাতে তারা সে দিনটির সাক্ষাত পায়, যেদিন তাদেরকে বেহুশ করা হবে। সেদিন না তাদের কোন চালাকি কাজে আসবে, না কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। আর সেদিনটি আসার আগেও যালেমদের জন্য একটা আযাব আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না"।

এখানে আযাব দ্বারা দুনিয়াতে হত্যা ও অন্যান্যভাবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হতে পারে। বারযাখের জীবনে কবরের শাস্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে। এটিই অধিক সুস্পষ্ট। কেননা তাদের অনেকেই দুনিয়ার শাস্তি ভোগ না করেই মৃত্যুবরণ করেছে। অথবা এ আযাব দ্বারা দুনিয়ার, বারযাখের এবং অন্যান্য আযাবও উদ্দেশ্য হতে পারে।

কবরে নাকির-মুনকার ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন

বারা' বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা বাকী গোরস্থানে একটি জানাযায় শরীক ছিলাম। তখন আমাদের কাছে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। তিনি বসলেন এবং আমরাও তার চারপাশে বসে গেলাম। আমরা এত নিরব ছিলাম যে, আমাদেরকে মরা কাঠ মনে করে আমাদের মাথায় পাখি বসতে চাইলেও বসতে পারতো। তখনো কবরের খনন কাজ শেষ হয়নি। তখন তিনি এ দু'আ করলেন,

«أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই"। এই দু'আটি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার পাঠ করলেন।

তারপর তিনি বললেন, মুমিন বান্দার নিকট যখন দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখিরাতের প্রথম দিন উপস্থিত হয় তখন আকাশ থেকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের পোশাক এবং জান্নাতের সুঘ্রাণ। মুমিন ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা ততদূরে বসে পড়েন। এমন সময় মালাকুল মাউত উপস্থিত হন এবং তার মাথার পাশে বসে বলতে থাকেন, হে পবিত্র রূহ! তুমি আপন প্রভুর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আসো। এ কথা শুনার পর মুমিন ব্যক্তির 'রূহ' অতি সহজেই বের হয়ে আসে। যেমনভাবে কলসীর মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে।[২০২] 'রূহ' বের হওয়ার সাথে সাথে ফেরশতাগণ তাকে জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দেন এবং জান্নাতী সুঘ্রাণে তাকে সুরভিত করেন। তার দেহ থেকে এমন সুঘ্রাণ বের হতে থাকে যার চেয়ে উত্তম সুঘ্রাণ আর হতে পারে না। তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে উঠে যান। যেখান দিয়েই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেই ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, এটা কার পবিত্র রূহ? উত্তরে তার সেই সুন্দরতম নাম উচ্চারণ করে বলা হয়, যে নামে তাকে দুনিয়াতে ডাকা হতো, অমুকের পুত্র অমুক। তাকে নিয়ে প্রথম আকাশের নিকট গিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশের দরজা খুলতে বলেন। তার জন্য দরজা খুলে দেয়া হয়। অতঃপর প্রত্যেক আকাশের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ তাকে নিয়ে পরবর্তী আকাশ পর্যন্ত গমণ করেন। এভাবেই এক এক করে সেই আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যান, যেখানে রয়েছেন আল্লাহ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার নামটি ইল্লিয়্যীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দাও। অতঃপর তাকে নিয়ে যমীনে ফিরে যাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দিবো এবং সেখান থেকেই তাকে পুনরায় জীবিত করবো।

---

[২০২] এতে বুঝা যায় যে, সকলের মৃত্যু যন্ত্রনা এক রকম হবে না। সত্যিকার মুমিনদের রূহ অত্যন্ত সহজভাবে বের করা হবে। অপরপক্ষে পাপীদের রূহ বের করা হবে অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং তাদের মৃত্যুর যন্ত্রনাও হবে অত্যন্ত কঠিন।

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন কবরে তার দেহে রূহ ফেরত দেয়া হয়। অতঃপর সেখানে দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? তিনি উত্তরে বলেন, আমার রব আল্লাহ। আবার জিজ্ঞাসা করেন, দুনিয়াতে তোমার দীন কি ছিল? তিনি উত্তর দেন, আমার দীন ছিল ইসলাম। পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? জবাবে বলেন, তিনি আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন তাকে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কিভাবে তা জানতে পারলে? জবাবে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি ও তাকে সত্যায়ন করেছি। তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও, যেন সে জান্নাতের বাতাস ও সুঘ্রাণ পেতে পারে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর তার কাছে জান্নাতের সুঘ্রাণ আসতে থাকে। তার কবরটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর একজন সুন্দর আকৃতি ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক উত্তম পোশাক পরিহিত হয়ে এবং সুঘ্রাণে সুরভিত অবস্থায় তার কাছে আগমন করেন এবং বলেন, তুমি খুশীর সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমার সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা আজ পূর্ণ করা হবে। মুমিন ব্যক্তি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কল্যাণকর কিছু নিয়ে এসেছো। তিনি বলেন, আমি তোমার সেই সৎ আমল, যা তুমি দুনিয়াতে করেছিলে। তখন মুমিন ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ! তুমি এখনই কিয়ামত সংঘটিত করো। আমি আমার পরিবার ও ধন-সম্পদের কাছে ফিরে যাবো। অন্য বর্ণনায় আছে, তখন তাকে বলা হয় তুমি এখানে আরামে ও স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে থাকো। তোমার কোন চিন্তা ও ভয় নেই।

অপর পক্ষে কাফের ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার সময় হয় তখন কালো বর্ণের একদল ফেরেশতা তার কাছে এসে উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় (ছালার চট)। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তথায় তারা বসে পড়েন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাকে বলেন, ওহে অপবিত্র নাফ্স! বেরিয়ে আসো আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে। কাফের বা পাপীষ্ঠ ব্যক্তির রূহ তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন যেমনভাবে ভিজা পশমের মধ্য থেকে লোহার পেরেককে টেনে বের করা হয়। মালাকুল মাওত তার রূহ বের করার পরপরই অন্যান্য ফেরেশতাগণ তাদের আয়ত্তে নিয়ে নেন এবং রূহকে নিয়ে সেই পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখেন। তার রূহ থেকে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম দুর্গন্ধের ন্যায় গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তার রূহ নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকেন। যেখান দিয়েই তারা গমণ করেন সেখানকার ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, এই অপবিত্র রূহ কার? দুনিয়াতে যে নিকৃষ্টতম নামে তাকে ডাকা হতো, উত্তরে ফেরেশতাগণ সেই নাম উচ্চারণ করে বলতে

থাকেন, এটি অমুকের পুত্র অমুকের রূহ। তাকে দুনিয়ার আকাশের নিকটবর্তী করে আকাশের দরজা খুলতে বলা হলে তার জন্য আকাশের দরজাগুলো খোলা হয় না। অতঃপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

"তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে"। *(সূরা আল 'আরাফ: ৪০)*

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, সাত যমীনের নীচে সিজ্জীনে তার নাম লিখে দাও। তারপর তার রূহকে যমীনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল"। *(সূরা আল-হাজ্জ: ৩১)*

অতঃপর তার রূহকে দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন। অতঃপর তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, আফসোস! আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! আমি তাও জানিনা। তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, এই লোকটি মিথ্যা বলছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্যে জাহান্নামের দরজা খুলে দাও। যাতে তার কাছে জাহান্নামের গরম বাতাস ও তাপ পৌঁছতে পারে। তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বে ঢুকে যায়।

অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোশাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক এসে বলতে থাকে, তুমি দুঃখের সংবাদ গ্রহণ করো। ধ্বংস হোক তোমার! আজ তোমার সেই দিন যার অঙ্গিকার তোমার সাথে করা হয়েছিল। তখন কাফের ও মুনাফিক বলে, তোমার পরিচয় কি? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোন দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছো। উত্তরে লোকটি বলে, আমি তোমার সেই খারাপ আমল যা তুমি দুনিয়াতে করেছিলে। কিয়ামতের দিন যেহেতু তার জন্যে আরো কঠিন আযাব রয়েছে তাই সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন না হয়। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইমাম ইবনে মাজাহ হাদীছের প্রথমাংশ বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম এবং আবু আওয়ানা

ইসফারায়ীনী তাদের ছ্বহীহ কিতাব দু'টিতে এবং ইবনে হিব্বানও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[২০৩]

আহলে সুন্নাতের সকল ইমামই বারা বিন আযীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত কবরের আযাবের এ হাদীছের মর্মার্থকে গ্রহণ করেছেন। ছ্বহীহ বুখারীতে হাদীছটির পক্ষে একাধিক শাওয়াহেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) সাঈদ থেকে আর সাঈদ কাতাদাহ থেকে আর কাতাদাহ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ؟ فأما المؤمن فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ» قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ: لا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلا الثقَلَيْنِ»

"মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ দাফনের কাজ শেষ করে সেখান থেকে চলে যায় তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এ সময় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তখন তাকে বলা হয় তুমি তোমার জাহান্নামের ঠিকানা দেখো। আল্লাহ তা'আলা তা পরিবর্তন করে জান্নাতে তোমার ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় স্থানকেই দেখতে পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি কাফের বা মুনাফেক হয়ে থাকে তাহলে বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষেরা যা বলত আমিও তা বলতাম। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি জান নাই এবং শিখো নাই। অতঃপর লোহার একটি হাতুড়ী দিয়ে তার উভয় কানের মাঝখানে এমন জোরে আঘাত করা হবে, যাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জিন এবং মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তুই সে চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পাবে"।[২০৪]

কাতাদাহ বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এরপর হাদীছের বাকী অংশ উল্লেখ করেছেন।

---

[২০৩] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০।

[২০৪] ছ্বহীহ: বুখারী হা/১৩৩৮, মুসলিম হা/২৮৭০।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অথবা মদীনার কোন একটি বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দু'টি কবরের নিকট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন দু'জন মানুষের আওয়াজ শুনলেন। তাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, কবর দু'টির অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। আযাবের কারণ খুব বড় নয়। হ্যাঁ তা বড় পাপই তো। তাদের একজন নিজেকে পেশাব থেকে পবিত্র রাখত না। অন্যজন ছিল চোগলখোর। সে একজনের কথা অন্যজনের নিকট বলে বেড়াতো। অতঃপর নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন। ডাল আনয়নের পর তাকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কবরের উপর এক অংশ গেড়ে দিলেন। তাকে বলা হল, হে আল্লাহর নবী! আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বললেন, হতে পারে ডালগুলো না শুকানো পর্যন্ত তাদের আযাব হালকা করা হবে।[২০৫]

ইমাম আবু হাতিম তার ছ্বহীহ কিতাবে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মৃত মানুষকে কবরে রাখা হয়, তখন নীল চোখ বিশিষ্ট কালো বর্ণের দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের একজনকে বলা হয় নাকীর এবং অন্যজনকে বলা হয় মুনকার। এরপর তিনি শেষ পর্যন্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।[২০৬]

কবরের আযাব ও নেয়ামতের ব্যাপারে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতের সূত্রে অনেক ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যারা আযাবের হকদার কেবল তারাই কবরে আযাব ভোগ করবে এবং যারা নেয়ামতের হকদার, তারাই কেবল নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে। কবরে নাকীর-মুনকার ফেরেশতাদ্বয় প্রশ্ন করবে। এ বিষয়টিও ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এগুলো সুসাব্যস্ত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা জরুরী এবং এগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। তবে কবরের আযাব কী পদ্ধতিতে হবে, সে বিষয়ে আমরা কথা বলবো না। কেননা মানুষের জ্ঞান এই আযাবের পদ্ধতি সম্পর্কে পৌঁছতে সক্ষম নয়। সেই সাথে দুনিয়ার জীবনে থাকা অবস্থায় কবর জগতের যাবতীয় বিষয় অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের বিবেকের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব- ইসলামী শরী'আত এমন কিছু নিয়ে আসেনি। কিন্তু এমন ভয়াবহ ও বিশাল বিষয় এতে রয়েছে, যাতে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়। মরার পর দেহের মধ্যে পুনরায় রূহ ফিরে আসার ধরণ ও পদ্ধতি দুনিয়াতে জীবিত থাকাবস্থায় ঘুম থেকে জাগার সময় দেহের মধ্যে রূহ ফেরত আসার পরিচিত পদ্ধতির অনুরূপ নয়। বরং কবরে মৃত মানুষের দেহে রূহ এমন এক বিশেষ পদ্ধতিতে ফেরত দেয়া হয়, যা দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

---

[২০৫] ছ্বহীহ: বুখারী হা/২১৬, মুসলিম হা/২৯২।

[২০৬] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১০৭১। সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/১৩৯১।

দেহের সাথে রূহ এর সম্পর্কঃ

মোটকথা দেহের সাথে রূহ এর পাঁচ প্রকার সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক প্রকার ও অবস্থার হুকুম বিভিন্ন।

(১) শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন তার দেহের সাথে রূহ একটি বিশেষ অবস্থায় সম্পৃক্ত থাকে।

(২) মায়ের পেট থেকে শিশু ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পর রূহ অন্য একটি অবস্থায় সম্পৃক্ত থাকে।

(৩) মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখনো তার সাথে রূহ যুক্ত থাকে। তবে নিদ্রা অবস্থায় রূহ মানুষের সাথে দু'টি অবস্থায় থাকে। সে যেহেতু ঘুমের মধ্যে একেবারে মৃত্যু বরণ করে না, সে হিসাবে রূহ তার সাথে সম্পৃক্তই থাকে। অন্যদিকে ঘুমন্ত মানুষের চারপাশে যা ঘটে, তা যেহেতু সে অনুভব করতে পারে না, সে হিসাবে বলা যায় যে, ঘুমন্ত অবস্থায় রূহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

(৪) কবর জগতে মৃত মানুষের সাথে তার রূহ অন্য আরেকভাবে সম্পৃক্ত থাকে। কেননা তখন দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন ও আলাদা থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে এবং এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না যে, রূহ দেহের দিকে আর কখনো ফিরেই আসে না। কেননা ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন মুসলিম যখন কবর যিয়ারতের সময় মৃত মানুষকে সালাম দেয়, তখন মৃত মানুষের দেহে রূহ ফেরত দেয়া হয়। আরো বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দাফনকারীগণ যখন চলে যায়, তখন তাদের জুতার আওয়াজ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। এ সময় রূহকে দেহের মধ্যে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ফেরত দেয়া হয়। এর মাধ্যমে এটি আবশ্যক হয় না যে, দেহ তার রূহ ফেরত পেয়ে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত নতুন জীবন লাভ করে।

(৫) কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত মানুষের পুনরুত্থান হবে তখন দেহের সাথে রূহের আরেকটি সম্পর্ক তৈরী হবে। আর এটি হবে দেহের সাথে রূহের সর্বাধিক পরিপূর্ণ সম্পর্ক। ইতিপূর্বে দেহের সাথে রূহের যেই সম্পর্ক ছিল এর সাথে সেই সম্পর্কগুলোর কোন তুলনাই চলে না। দেহের সাথে রূহের এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর কোন মৃত্যু, নিদ্রা এবং অন্য কোন সমস্যা হবে না। নিদ্রা এই জন্য হবে না যে, তাও এক প্রকার মৃত্যু। প্রিয় পাঠক! আপনি দেহের সাথে রূহের এই সম্পর্কগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। এতে আপনার অনেক প্রশ্ন দূর হয়ে যাবে।

কবরে শুধু রূহকেই প্রশ্ন করা হবে না। যেমন বলে থাকেন ইমাম ইবনে হাযম এবং অন্যান্য আলেমগণ। বরং শরীরের সাথে রূহ যুক্ত থাকা অবস্থাতেই তা করা হবে। আর যারা বলে রূহ বিহীন দেহকেই প্রশ্ন করা হবে, তাদের কথা আরো অধিক বিভ্রান্তিকর। একাধিক ছ্বহীহ হাদীছ উপরোক্ত উভয় মতকেই প্রত্যাখ্যান করে।

এমনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল ইমামের ঐক্যমতে রূহ এবং শরীর উভয়েরই কবরের আযাব হবে। সেই সাথে রূহ দেহ থেকে আলাদা থাকা অবস্থায় নিয়ামত ভোগ করবে অথবা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। শরীরের সাথে যুক্ত থাকা অবস্থায়ও রূহ আরাম অথবা শাস্তি ভোগ করবে।[২০৭]

মনে রাখতে হবে যে, কবরের আযাবই বারযাখের আযাব। কবরের আযাবের হকদার হয়ে যে কেউ মারা যাবে, সে অবশ্যই তার জন্য নির্ধারিত আযাব ভোগ করবে। তাকে কবর দেয়া হোক বা না হোক। তাকে হিংস্র জীব-জানোয়ারে খেয়ে ফেলুক অথবা তাকে আগুন দিয়ে পুড়ে ছাই বানিয়ে ফেলা হোক অতঃপর বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হোক। এতে কিছু যায় আসে না। তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হোক কিংবা সাগরের পানিতে ডুবে মারা যাক তাতেও কিছু যায় আসে না। তার রূহ ও দেহ পর্যন্ত ঠিক ঐ পরিমাণ আযাবই পৌঁছে যাবে, যেই পরিমাণ আযাব ভোগ করতো কবরে দাফন করলে।

কবরে মৃত ব্যক্তিকে বসানো, কবরের চাপে ব্যক্তির একপাশের হাড্ডি অন্যপাশে ঢুকে যাওয়া এবং এ ধরণের অন্যান্য বিষয় রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই বুঝতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে। এ বিষয়ে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তার উপর কোন কিছু বাড়ানো যাবে না এবং তা থেকে কিছু কমানোও যাবে না। তার বাণীকে এমন অর্থে ব্যবহার করা যাবে না, যা তার কথা থেকে বুঝা যায় না এবং তার কথার উদ্দেশ্য থেকে কিছু কমিয়েও বুঝা ঠিক হবে না। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেদায়াতের যেই সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন, তার প্রতি অবহেলা করার কারণে এবং তা থেকে সরে যাওয়ার কারণে এত গোমরাহীর সূচনা হয়েছে, যার সঠিক পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। শুধু তাই নয়; আল্লাহর কালামকে ভালভাবে না বুঝা এবং রাসূলের সুন্নাতকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করার কারণে ইসলামে সকল বিদ'আত ও গোমরাহীর সূচনা হয়েছে। এখান থেকেই দীনের মূলনীতি ও শাখা মাসআলাগুলোতেও ভুল-ভ্রান্তির সূচনা হয়েছে। বিশেষ করে যখন বিদ'আতী ও কুচক্রীদের অসৎ উদ্দেশ্য এর সাথে যোগ হয়, তখন বিষয়টি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। আমরা এ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাই।

---

[২০৭] মুতাযিলারা কবরের আযাবকে অসম্ভব মনে করে থাকে। এ বিষয়ে তাদের সন্দেহ হচ্ছে তারা বলে, আমরা মৃত ব্যক্তিকে নড়াচড়া করতে দেখি না এবং তার উপর আযাবের কোন চিহ্ন দেখি না। আমরা তাদের জবাবে বলবো যে, মৃত ব্যক্তি আযাব ভোগ করলে অথবা নিয়ামত ভোগ করলে নড়াচড়া করা আবশ্যক নয়। উদাহরণ স্বরূপ ঘুমন্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে আরাম-আয়েশ ও কষ্ট উভয়ই ভোগ করে। আমরা তাদেরকে নড়াচড়া করতে দেখি না। এ বিষয়টি প্রত্যেকেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে। তা না হলে সে অস্বীকার করে বসতো। কবরের আযাবের বিষয়টি যে অস্বীকার করবে, সে যখন তা দেখবে ও ভোগ করবে, তখনই কেবল জানতে পারবে যে, সে একটি সম্ভাব্য বিষয়কেই কেবল অহংকার বশতই অস্বীকার করেছে।

বনী আদমের ঘর মোট তিনটি:

আসল কথা হচ্ছে বনী আদমের ঘর মোট তিনটি। দুনিয়ার ঘর, বারযাখের ঘর (কবর) এবং স্থায়ী ঘর। এই ঘরসমূহের প্রত্যেকটির জন্যই রয়েছে বিশেষ হুকুম-আহকাম। রূহ এবং দেহ মিলেই মানুষের গঠন সম্পন্ন করা হয়েছে। দুনিয়ার হুকুম-আহকাম প্রয়োগ করা হয় শরীরের উপর। তবে রূহগুলো হয় শরীরের অনুগামী। বারযাখী জীবনের হুকুম-আহকাম প্রযোজ্য হয় রূহের উপর। শরীর হয় তার অনুগামী। আর যখন সকল মানুষকে একত্রিত করার দিন উপস্থিত হবে এবং কবর থেকে সকল বনী আদমের বের হওয়া সময় হবে, তখন সকল হুকুম-আহকাম, সুখ-শান্তি ও আযাব একই সাথে রূহ এবং শরীরের উপর প্রযোজ্য হবে।

হে প্রিয় পাঠক! আপনি যদি এই ব্যাখ্যাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনার জন্য পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কবর হয়ত জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচায় কিংবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্তে পরিণত হবে। এটি একটি বিবেক সম্মত এবং এমন সত্য বিষয়, যাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এতে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই গায়েবের প্রতি বিশ্বাসীগণ অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা গুণে গুণান্বিত হয়।

আরো জানা আবশ্যক যে, কবরের আগুন কিংবা সুখ-শান্তি দুনিয়ার আগুন কিংবা আরাম আয়েশের অনুরূপ নয়। কবরে শায়িত ব্যক্তির উপরে ও নীচের মাটি এবং পাথরকে আল্লাহ তা'আলা এমন গরম করবেন, যা দুনিয়ার আগুনের চেয়ে অধিক গরম হবে। যদিও দুনিয়ার জীবিত মানুষেরা সেই মাটি ও পাথর স্পর্শ করে, অথচ তারা কোন গরমই অনুভব করে না। এর চেয়ে আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুইজন মানুষকে যদি একসাথে দাফন করা হয় এবং তাদের একজন যদি জাহান্নামের গর্তে থাকে এবং অন্যজন জান্নাতের বাগিচায় থাকে, তাহলেও জান্নাতের বাগানে বিচরণকারীর শরীরে তার প্রতিবেশীর আগুনের শাস্তির কোন কিছুই পৌঁছবে না। এমনি জাহান্নামের গর্তে অবস্থানকারীর কাছে তার প্রতিবেশীর নেয়ামতের কোন অংশই পৌঁছবে না। আল্লাহর কুদরত এর চেয়ে আরো অধিক বিশাল ও বিস্ময়কর। তবে মানুষের অবস্থা হচ্ছে, যে বিষয়কে তারা জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না, তাকে তারা দ্রুত অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে তার এমন অনেক বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখিয়েছেন, যা কবরের আযাবের বিষয়টির চেয়ে আরো বিরাট ও ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা তার কতক প্রিয় বান্দাকে যখন ইচ্ছা এগুলো থেকে কিছু দেখিয়ে থাকেন এবং অন্যদের থেকে তা আড়াল করে রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা যদি তার সকল বান্দাকে গায়েবের সকল বিষয় (কবরের আযাব ও অন্যান্য গায়েবী বিষয়) দেখাতেন, তাহলে ঈমান বিল গায়েবের কোন গুরুত্ব ও মর্যাদা থাকতো না এবং লোকেরা মৃত মানুষকে দাফনও করতো না। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنْهُ»

"এই উম্মতকে কবরের ফিতনায় ফেলা হবে। কবরের আযাব শুনালে আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে দাফন করা বর্জন করবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন কবরের আযাব থেকে তোমাদেরকেও কিছু শুনান, যা আমি শুনতে পাই"।[২০৮]

পশুদের ক্ষেত্রে যেহেতু এই হিকমত (আশঙ্কা) অনুপস্থিত, তাই পশুরা মানুষের কবরের আযাব শুনতে পায় এবং তা উপলব্ধি করতে পারে। কবরে নাকীর-মুনকার ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকদের জন্যই খাস কি না এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সকল নবীর উম্মতকেই কবরে প্রশ্ন করা হবে। অন্য একদল লোক বলেছেন, শুধু এই উম্মতকেই কবরে পরীক্ষায় ফেলা হবে; অন্য কোন উম্মতকে নয়।

এ ব্যাপারে তৃতীয় মতটি হচ্ছে কোন প্রকার মন্তব্য না করে চুপ থাকা। ইমাম ইবনে আব্দুল বারসহ একদল আলেম এই মত পোষণ করেছেন।

যারা বলেন, কবরের ফিতনা শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকদের জন্যই, তারা যায়েদ বিন ছাবেতের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا»

"এই উম্মতকে কবরের ফিতনায় ফেলা হবে"।[২০৯] কোন কোন রাবী تبتلى (ফিতনায় ফেলা হবে)এর স্থলে تسأل (প্রশ্ন করা হবে) উল্লেখ করেছেন। এই হাদীছের ভিত্তিতে বলা যায় কবরের ফিতনা শুধু এই উম্মতের জন্যই খাস। তবে এটি এমন বিষয়, যা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অন্যান্য উম্মতকে বাদ দিয়ে শুধু এই উম্মতকেই খাস করে কবরে প্রশ্ন করা হবে- এ কথা সুস্পষ্ট নয়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

কবরে শিশুদেরকেও প্রশ্ন করা হবে কি না, এতেও আলেমদের মতভেদ রয়েছে। সেই সাথে আরো মতভেদ করা হয়েছে যে, যার কবরের আযাব শুরু হবে, তার আযাব কি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে? নাকি নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত শাস্তি দেয়ার পর তা মুলতবী করা হবে?

এই প্রশ্নে উত্তর হচ্ছে কবরের আযাব হবে দুই ধরণের। এক প্রকার অপরাধী লোকদের কবরের আযাব কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[২০৮] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৮, কিতাবুল জান্নাহ।

[২০৯] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৮, কিতাবুল জান্নাহ।

﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

ফেরাউন সম্প্রদায়কে জাহান্নামের আগুন বেষ্টন করে ফেলেছে। আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো"। *(সূরা মুমিন: ৪৫-৪৬)*

বারা বিন আযাবের হাদীছে কাফেরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে,

"ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَقْعَدِهِ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ"

অতঃপর তার কবর থেকে জাহান্নাম পর্যন্ত একটি দরজা খোলা হবে। এই দরজা দিয়ে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা কিয়ামত পর্যন্ত দেখতে থাকবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) কোন কোন সনদে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

কবরের আরেক প্রকার আযাব নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত চালু থাকার পর মুলতবী হবে। এই আযাব হবে কতিপয় এমন পাপীর, যাদের অপরাধ ছিল হালকা। অপরাধ অনুপাতে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। অতঃপর তাদের আযাব হালকা করা হবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, দশ প্রকারের আমল মানুষকে আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করবে।

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রূহ এর আবাসস্থল সম্পর্কে আলেমদের মতভেদ

মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের রূহসমূহ কোথায় অবস্থান করে? আলেমগণ এ বিষয়েও মতভেদ করেছেন। বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহসমূহ জান্নাতে বসবাস করে। আর কাফেরদের রূহসমূহ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুমিনদের রূহসমূহ জান্নাতের আঙ্গিনায় এবং জান্নাতের দরজায় অবস্থান করে। জান্নাত থেকে তাদের জন্য নিয়ামত, জান্নাতের বাতাস এবং রিযিক আসতে থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, মৃত্যুর পর মুমিনদের রূহসমূহ কবরের আশে-পাশেই অবস্থান করে। ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, মৃত্যুর পর মুমিন ব্যক্তির রূহকে আযাদ করে দেয়া হয়। তা যেখানে ইচ্ছা গমন করে ও বিচরণ করে বেড়ায়।

আরেক দল লোক বলেছেন, মুমিনদের রূহসমূহ থাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট। তারা এর অতিরিক্ত আর কিছুই বলেননি।

কেউ কেউ বলেছেন, মুমিনদের রূহসমূহ দামেস্কের 'জাবিয়া' অঞ্চলে থাকে। আর কাফেরদের রূহগুলো ইয়ামানের হাযরা মাউত শহরের 'বারহুত' নামক কূপের মধ্যে অবস্থান করে।

কা'ব বলেন, মুমিনদের রূহ সপ্তম আকাশের উপর ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে এবং কাফেরদের রূহ সপ্তম যমীনের নীচে সিজ্জীনে শয়তানের বালিশের নীচে থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুমিনদের রূহসমূহ যমযম কূপে অবস্থান করে এবং কাফেরদের রূহসমূহ বারহুতের কূপের মধ্যে রাখা হয়।

কেউ কেউ বলেছেন, মুমিনদের রূহসমূহ আদম (আলাইহিস সালাম) এর ডান পাশে অবস্থান করে এবং কাফের ও জাহান্নামীদের রূহসমূহ আদম আলাইহিস সালাম এর বাম পাশে থাকে। ইমাম ইবনে হাযম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রূহসমূহ মানুষের দেহে প্রবেশ করার আগে যেখানে ছিল, দেহ থেকে বের হয়ে আবার সেখানে গিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শহীদদের রূহসমূহ অবস্থান করে জান্নাতে এবং সাধারণ মুমিনদের রূহ থাকে তাদের কবরের আঙ্গিনায়।

ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে খবর এসেছে যে, শহীদদের রূহসমূহ সবুজ রঙ্গের পাখির আকারে আরশের সাথে ঝুলন্ত থাকে। সেখান থেকে তারা সকাল ও বিকালে জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণ করতে যায়। প্রতিদিন তারা তাদের রব আল্লাহকে সালাম দেয়ার জন্য আগমন করে।

কোন কোন ফির্কার লোকেরা বলে থাকে, মৃত্যুর পর রূহ অস্তিত্বহীন জায়গায় গিয়ে স্থির হয়। এটি হচ্ছে ঐ সমস্ত লোকের কথা, যারা বলে রূহ শরীর থেকে আলাদা স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয়; বরং এটি হচ্ছে শরীরের একটি অবস্থা বিশেষ। এটি তার হায়াত (বেচে থাকা) এবং অনুভব করার মতই। তাদের কথা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিরোধী।

অন্য একটি দল বলেন, মৃত্যুর পর রূহ এমন সব শরীরে প্রবেশ করে, যা তার ঐ সমস্ত বৈশিষ্টের সাথে সংগতিপূর্ণ, যা সে জীবিত থাকাকালে অর্জন করেছিল। সুতরাং প্রত্যেক রূহ এমন প্রাণীর আকৃতিতে পরিণত হয়, যা সেই রূহের জন্য প্রযোজ্য। এটি হচ্ছে পুনর্জনমে বিশ্বাসী এবং আখিরাতের জীবনে অবিশ্বাসীদের উক্তি। এটি কোন মুসলিমের কথা হতে পারে না।

'রূহ'এর হাকীকত, দেহ থেকে বের হয়ে গিয়ে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত তার আবাসস্থল ইত্যাদি সম্পর্কে উপরে বর্ণিত সকল কথার দলীল উল্লেখ করা এবং তার পর্যালোচনা করা এই সংক্ষিপ্ত কিতাবের মধ্যে সম্ভব নয়। তবে সকল দলীলের সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, বারযাখী জগতে বনী আদমের রূহসমূহের বিরাট স্তরভেদ রয়েছে। সেখানে অনেক রূহ থাকে

ইল্লিয়্যীনের সর্বোচ্চ স্তরে উর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাদের সাথে। এগুলো হচ্ছে নবীদের রূহ। তাদের মর্যাদারও স্তরভেদ রয়েছে।

আরেক প্রকার রূহ থাকে সবুজ রঙ্গের পাখির মধ্যে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়। এগুলো হচ্ছে কতক শহীদের রূহ। তবে সকল শহীদের রূহ নয়। কেননা শহীদদের মধ্যে এমন শহীদও রয়েছে, যার উপর ঋণ থাকার কারণে তার রূহকে জান্নাতে বিচরণ করা থেকে বিরত রাখা হয়। যেমন মুসনাদে আহমাদে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে নিহত হই, তাহলে বিনিময়ে আমার জন্য আখিরাতে কী রয়েছে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল তখন তিনি বললেন, তবে ঋণ থাকলে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে আটকিয়ে রাখা হবে। জিবরীল আলাইহিস সালাম এখনই আমার সাথে চুপিসারে এই কথা বলেছেন।[২১০]

কিছু কিছু রূহকে জান্নাতের দরজার সামনে আটকিয়ে রাখা হবে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের সাথীকে দেখেছি যে, তাকে জান্নাতের দরজায় আটকিয়ে রাখা হয়েছে।[২১১] তার উপর ঋণ থাকার কারণেই তিনি এ কথা বলেছেন।

কোন কোনো রূহকে কবরের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হবে। কাউকে আটকিয়ে রাখা হবে যমীনে। কিছু কিছু রূহকে ঐ চুলার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে ব্যভিচারী নারী-পুরুষদের শাস্তি হচ্ছে। আরো অনেক রূহকে রাখা হবে রক্তের নদীতে। সেখানে সে সাতার কাটবে এবং তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হবে। এ কথাগুলোর সবই ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

আর শহীদগণ যেই বিশেষ জীবন লাভ করবেন এবং অন্যদের তুলনায় তারা যেই ভিন্ন মর্যাদা লাভ করবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত এবং যেসব

[২১০] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, ইরওয়াউল গালিল হা/১১৯৭।

[২১১] ছ্বহীহ: মু'জামুর কাবীর হা/৬৭৫০, সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/৩৪১৫।

ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌঁছেনি, তাদের জন্যও কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই, এ কথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তারা আল্লাহর পুরস্কার ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত ও উল্লাসিত এবং তারা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৬৯-১৭১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। এই ধরনের লোকেরা আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই"। *(সূরা আল বাকারা: ১৫৪)*

এখানে বলা হয়েছে যে, শহীদগণ আল্লাহর নিকট জীবিত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা শহীদদের রূহকে সবুজ রঙ্গের পাখির মধ্যে রাখেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীছে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

«لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ ، وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ قَالُوا : يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا لِئَلا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلا يَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الآيَاتِ عَلَى رَسُولِهِ»

"তোমাদের ভাইগণ যখন উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহগুলোকে সবুজ রঙ্গের পাখির মধ্যে স্থাপন করেছেন। তারা জান্নাতের নদীসমূহে গমণ করে। জান্নাতের ফল থেকে যা ইচ্ছা ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ায় স্বর্ণের ফানুসের কাছে আশ্রয় নেয়। তারা যখন তাদের পবিত্র পানাহারের স্বাদ এবং সুমধুর নিদ্রা উপভোগ করে, তখন বলে, আফসোস! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে যে সুন্দর আচরণ করেছেন এবং যে সুখময় জীবন আমাদেরকে প্রদান করেছেন, তা যদি আমাদের ভাইয়েরা জানতো, তাহলে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা হতে বিরত থাকতো না এবং জিহাদের ময়দান হতে পলায়নও করতো না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি তোমাদের পক্ষ হতে এই কথা তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের উপর উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং ইমাম আবু দাউদ (রাহিমাহুমাল্লাহ) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এ অর্থেই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২১২]

[২১২] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/ ১৮৮৭।

মুসলিম শরীফের বর্ণনাটি ঠিক এ রকম, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا»

“শহীদদের রূহসমূহ সবুজ রঙ্গের পাখির মধ্যে অবস্থান করে। আর সেই পাখির জন্য আরশের সাথে একটি ফানুস ঝুলন্ত থাকে। সেই ফানুস থেকে বের হয়ে তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে। অতঃপর তারা ফানুসে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আল্লাহ তা‘আলা তাদের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের আর কোন কামনা আছে কি? জবাবে তারা বলে, আমরা আর কী চাইবো? আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সাথে তিনবার একই কথা বলবেন। শহীদগণ যখন দেখবেন যে, নতুন কোন কিছু চাওয়া না হলে তাদেরকে ছাড়া হচ্ছেনা, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা চাচ্ছি যে, আমাদের রূহসমূহ পুনরায় আমাদের দেহে ফেরত দেয়া হোক। আমরা আরেকবার তোমার রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবো। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা যখন দেখবেন, তাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই, তখন তাদেরকে সেভাবেই ছেড়ে দিবেন।

শহীদদের এ মর্যাদা পাওয়ার কারণ হলো, তারা যখন আল্লাহর জন্য নিজেদের শরীরকে ব্যয় করেছে এমনকি আল্লাহর শত্রুরা তাদের শরীরকে নষ্ট করে ফেলেছে, তাই তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বারযাখী জীবনে তাদেরকে দুনিয়ার শরীরের চেয়ে উত্তম শরীর দান করেছেন। এই শরীরের মধ্যেই তারা কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। তাদের রূহগুলো এই শরীরগুলোর মাধ্যমেই সুখ-শান্তি ও নিয়ামত ভোগ করবে। আর সবুজ রঙ্গের পাখির শরীরের মধ্যে অবস্থান করে এই সুখ-শান্তি ভোগ করা শরীর থেকে বাইরে অবস্থান করে সুখ-শান্তি উপভোগ করার চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ হবে।

এই জন্যই মুমিনের রূহকে রাখা হবে পাখির আকৃতিতে অথবা পাখির মধ্যে। শহীদের রূহকে রাখা হবে পাখির পেটের মধ্যে। উভয় হাদীছের শব্দের মধ্যে আপনি গভীরভাবে চিন্তা করুন। অর্থাৎ শহীদদের রূহকে পাখির পেটের মধ্যে রাখার মাধ্যমে তারা সাধারণ মুমিনদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হবে।

হাদীছের অন্যতম গ্রন্থ ‘মুআত্তা’য় বর্ণিত হয়েছে, কাব বিন মালেক বর্ণনা করতেন যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ القيامة»

মুমিন ব্যক্তির 'রূহ' পাখীর আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষরাজিতে থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে বিচরণ করতে থাকে।[২১৩]

এখানে বলা হয়েছে মুমিনের রূহ পাখির আকৃতিতে থাকে। মুমিন বলতে শহীদ এবং অন্যান্য মুমিনও উদ্দেশ্য হতে পারে। অতঃপর শহীদকে খাস করে বলেছেন, শহীদের রূহ সবুজ রঙ্গের পাখির পেটের মধ্যে থাকবে। আর এটি জানা কথা যে, শহীদদের রূহ যখন সবুজ রঙ্গের পাখির পেটের মধ্যে থাকবে, তখন তাকে পাখি বলাও ঠিক আছে। এই দিক থেকে উভয় হাদীছই শহীদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং যেখানে বলা হয়েছে মুমিনের রূহ হবে পাখি এবং যেখানে বলা হয়েছে শহীদের রূহ থাকবে পাখির পেটের মধ্যে এই উভয় মর্যাদাতেই শহীদগণ শামিল হবেন। সুতরাং বারযাখী জীবনে শহীদের নিয়ামত বিছানায় মৃত্যু বরণকারী মুমিনদের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ হবে। যদিও বিছানায় মৃত্যু বরণকারী কোন কোন মুমিনের মর্যাদা অনেক শহীদের মর্যাদার উপরে হবে। যেমন ঋণ রেখে শাহাদাত বরণকারীর কথা বলা যেতে পারে। মোট কথা শহীদের জন্য বিশেষ এমন একটি নিয়ামত থাকবে, যাতে শহীদ ছাড়া অন্য কেউ শরীক হবে না। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা নবীদের শরীর ভক্ষণ করা যমীনের উপর হারাম করেছেন। সুনানের কিতাবসূহে এই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর দাফন করার অনেক পরেও অনেক শহীদের লাশ অপরিবর্তিত দেখা গেছে। উহুদের ময়দানে বন্যার পানি প্রবেশ করার কারণে সেখানকার শহীদদের কতকের লাশও এ রকম দেখা গেছে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শহীদদের লাশও কিয়ামত পর্যন্ত যমীনে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এও হতে পারে যে, দীর্ঘ দিন অপরিবর্তিত থাকার পর শহীদদের দেহ যমীনের সাথে মিশে যায়। এও বলা যেতে পারে যে, যার শাহাদাতের মর্যাদা যত অধিক পরিপূর্ণ হবে, সে তত অধিক মর্যাদাবান শহীদ বলে গণ্য হবে। সেই সাথে তার দেহও অধিক সময় পর্যন্ত যমীনে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে।

---

[২১৩] মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬১৯১, নাসাঈ, হা/২০৭২। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ছুহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ মেশকাতুল মাসাবীহ, হা/১৬৩২

(৮৭) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنُـؤْمِنُ بِالْبَعْـثِ وَجَـزَاءِ الْأَعْمَـالِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَالْعَـرْضِ وَالْحِسَـابِ وَقِـرَاءَةِ الْكِتَـابِ وَالثَّـوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ

পুনরুত্থান, কিয়ামাত দিবসে আমলের প্রতিফল, আল্লাহর সমীপে বান্দার আমলনামা পেশ, হিসাব নিকাশ, আমলনামা পাঠ করা, বান্দার আমলের ছাওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত এবং মীযান, এ সবের উপর আমরা ঈমান রাখি।

.....

ব্যাখ্যা: কিয়ামত ও পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, সুস্থ বিবেক এবং সৃষ্টিগত স্বভাব দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত কিতাবে এই সম্পর্কে খবর দিয়েছেন এবং এর উপর দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কুরআনের অধিকাংশ সূরায় কিয়ামত দিবসের প্রতি অবিশ্বাসীদের জবাব দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, আখিরাতের উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। আর সমস্ত বনী আদমই (কতিপয় নাস্তিক ব্যতীত) আল্লাহর রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। তাওহীদে রুবুবীয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করা একটি সৃষ্টিগত বা স্বভাবগত বিষয়। সকলেই তাদের রবের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। একমাত্র অহংকারী ও সীমা লংঘণকারী ব্যতীত অন্য কেউ আখিরাতকে অস্বীকার করে না। তাদের সংখ্যাও আবার খুবই নগণ্য। যেমন ফেরাআউন অহংকার বশত আল্লাহর রুবুবীয়াতকে অস্বীকার করে নিজেই রুবুবীয়াতের দাবী করেছিল। কিন্তু পরকালের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়টি ভিন্ন। অনেক মানুষই এটিকে অস্বীকার করেছে। মরার পর পুনরুর্জীবনে অবিশ্বাসীদের সংখ্যা প্রচুর। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শেষ নবী ছিলেন, তাকে যেহেতু কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি যেহেতু সকল নবীর পরে এসেছেন, তাই তিনি আখিরাতের বিষয়টির বিবরণ এত সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অন্যান্য নবীদের কিতাবসমূহে সে রকম বিস্তারিত বিবরণ নেই।

এ জন্যই একদল দার্শনিক এবং অন্যান্য লোক ধারণা করেছে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কোনো নবী শরীরের পুনরুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেননি। দার্শনিকরা এটিকে কাল্পনিক এবং সাধারণ বক্তব্য বলে মন্তব্য করেছে।

আলকুরআনুল কারীম মৃত্যুর সময় রূহের গন্তব্যস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছে। আর কিয়ামতে কুবরা সংঘটিত হওয়ার সময় শরীরের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কুরআন একাধিক স্থানে কথা বলেছে। দার্শনিকরা এই কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং মানব দেহের পুনরুত্থানকেও তারা অস্বীকার করে। তাদের কেউ কেউ বলে নবী-রাসূলদের মধ্যে কেবল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই শুধু কাল্পনিক পদ্ধতিতে দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কে সংবাদ

দিয়েছেন। এটি একদম ডাহা মিথ্যা। কেননা কিয়ামতে কুবরা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি সকল নবীই বলেছেন। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণও কিয়ামত সংঘটিত হবে বলে নিজ নিজ উম্মতকে জোর দিয়ে বলেছেন। আদমকে যখন জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠানো হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾

"তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত পৃথিবীতেই রয়েছে বসবাসের জায়গা ও জীবন যাপনের উপকরণ। আর বললেন, সেখানেই তোমাদের জীবন যাপন করতে হবে এবং সেখানেই মরতে হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের সবশেষে আবার বের করে আনা হবে"। (সূরা আল আরাফ: ২৪-২৫) অভিশপ্ত ইবলীস যখন বলল,

﴿رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾

"হে আমার রব! এ কথাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে যখন পুনরায় উঠানো হবে সে সময় পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও। আল্লাহ তা'আলা বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো যার সময় আমি জানি"। (সূরা ছ্বদ: ৭৯-৮১) নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতির লোকদেরকে বলেছেন,

﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাটি থেকে বিস্ময়কর রূপে উৎপন্ন করেছেন। আবার এ মাটির মধ্যে তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং হঠাৎ এ মাটি থেকেই তোমাদের বের করে আনবেন"। *(সূরা নূহ: ১৭-১৮)*

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার জাতির লোকদেরকে বলেছেন,

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

"আর তার কাছে আমি আশা করি, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। এরপর ইবরাহীম দু'আ করলো, হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো আর পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার সত্যিকার খ্যাতি ছড়িয়ে দিও আর আমার পিতাকে মাফ করে দিও, নিঃসন্দেহে তিনি পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত ছিলেন এবং সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না যেদিন সবাইকে জীবিত করে উঠানো হবে। যেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি

কোন কাজে লাগবেনা, তবে যে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে"। *(সূরা শুআরা: ৮২)*

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর কথা নকল করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আরো বলেন,

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾

"হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো। এখন এ যালেমরা যা কিছু করছে আল্লাহকে তোমরা তা থেকে গাফেল মনে করো না। আল্লাহ তো তাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তাদের চক্ষু নত হয়ে যাবে"। (সূরা ইবরাহীম: ৪১)

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উক্তি নকল করে আরো বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"আর সেই ঘটনাটিও সামনে রাখো, যখন ইবরাহীম বলেছিল আমার প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনজীবিত করো। প্রভু বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম জবাব দিলঃ বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চাই। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি ধরো এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানাও। তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রাখো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। ভালোবাসবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"। *(সূরা আল বাকারা: ২৬০)*

আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালাম এর কথা নকল করে কুরআনে বলেন,

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾

"কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তার সময়টা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পারে। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে সে যেন তোমাকে সে সময়ের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে"। *(সূরা তোহা: ১৫-১৬)*

ফেরাউন সম্প্রদায়ের মুমিন লোকটি কিয়ামত দিবস সম্পর্কে অবগত ছিল। সে মূসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি ঈমানও এনেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার ঘটনা কুরআনে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (٤١) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (٤٢) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٣) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)

"হে আমার কাওম! আমার ভয় হয়, তোমাদের উপর ফরিয়াদ ও অনুশোচনা করার দিনের ভয় করছি। (৩২) যখন তোমরা একে অপরকে ডাকতে থাকবে এবং দৌড়িয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু সেখানে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না (৩৩) আর অবশ্যই পূর্বে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ ইউসুফ এসেছিল, সে যা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল তা নিয়ে তোমরা সন্দেহে স্থির ছিলে; এমনকি যখন সে মারা গেল তখন তোমরা বললে, 'আল্লাহ তার পরে কখনো কোন রাসূল পাঠাবেন না।' যে সীমালংঘনকারী, সংশয়বাদী, আল্লাহ তাকে এভাবেই পথভ্রষ্ট করেন। (৩৪) যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন। (৩৫) ফেরাউন বললো, হে হামান, আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। (৩৬) অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মূসার ইলাহকে উকি দিয়ে দেখতে পারি। মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার

মনে হয়। এভাবে ফেরাউনের জন্য তার কুকর্মসমূহ সুশোভনীয় করে দেয়া হয়েছে এবং তার সোজা পথে চলা থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত তার নিজের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। (৩৭) যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলো, বললো, হে আমার কওমের লোকেরা, আমার কথা মেনে নাও। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি। (৩৮) হে আমার কাওম, দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েক দিনের জন্য। একমাত্র আখিরাতই চিরদিনের অবস্থানস্থল" (৩৯)। 'কেউ পাপ কাজ করলে তাকে শুধু পাপের সমান প্রতিদান দেয়া হবে আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে অগণিত রিয্ক দেয়া হবে।' (৪০) 'আর হে আমার সম্প্রদায়, আমার কি হল যে আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে ডাকছি আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে!' (৪১) 'তোমরা আমাকে ডাকছ আমি যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করি, তাঁর সাথে শরীক করি, যে ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞান নেই; আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি মহাপরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীলের দিকে।' (৪২) এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যার দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ সে, দুনিয়া বা আখিরাতে কারো ডাকের যোগ্য নয়। আর আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে আল্লাহর দিকে এবং নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা হবে আগুনের সাথী। *(৪৩)* 'আমি তোমাদেরকে যা বলছি অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমার বিষয়টি আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।' (৪৪) অতঃপর তাদের ষড়যন্ত্রের খারাপি হতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন আর ফির'আউনের গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলল কঠিন আযাব। (৪৫) আগুন, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় এর সম্মুখে উপস্থিত করা হয় আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), 'ফির'আউনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও।' (৪৬) *(সূরা মুমিন: ৩২-৪৬)*

মূসা আলাইহিস সালাম তার কাওমের লোকদের উদ্দেশ্যে আরো বলেছেন,

﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

"আর আমাদের জন্য এ দুনিয়ার কল্যাণ লিখে দাও এবং আখিরাতেরও, আমরা তোমার দিকে ফিরেছি। জবাবে বলা হলো, শাস্তি তো আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি কিন্তু আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের উপর পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। কাজেই তা আমি এমন লোকদের নামে লিখবো যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দেবে এবং আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনবে"। *(সূরা আল আরাফ: ১৫৬)* আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় গরু যবেহ করার ঘটনায় বলেন,

﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"সে সময় আমি হুকুম দিলাম, নিহতের লাশকে তার একটি অংশ দিয়ে আঘাত করো। দেখো এভাবে আল্লাহ মৃতদের জীবন দান করেন এবং তোমাদেরকে নিজের নিশানী দেখান, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো"। *(সূরা আল বাকারা: ৭৩)*

কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন জাহান্নামের প্রহরীগণ জাহান্নামীদেরকে বলবেন,

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

"কাফেরদেকে দলে দলে জাহান্নাম অভিমুখে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন দোযখের দরজাসমূহ খোলা হবে এবং তার প্রহরী তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে? তারা বলবে, হ্যাঁ, এসেছিল। কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে"। (সূরা আয যুমার: ৭১)

এখানে জাহান্নামে প্রবেশকারী কাফেরদেরও স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, রাসূলগণ তাদেরকে এই দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতে গুনাহগার ও অপরাধীদের জন্য যেই শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, সমস্ত রাসূলই তা হতে উম্মতদেরকে সতর্ক করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা হতে সতর্ক করেছেন। কুরআনের অধিকাংশ সূরাতেই মুমিনদের জন্য আখিরাতে জান্নাতের ওয়াদা এবং পাপীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিভিন্ন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এর উপর শপথ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

"কাফেররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। হে নাবী! তুমি বলো, আমার রবের শপথ, তা তোমাদের উপর অব্যশই আসবে। তিনি গায়েবের সকল খবর রাখেন। তার কাছ থেকে অণু পরিমাণ কোনো জিনিস আকাশসমূহে লুকিয়ে নেই এবং

পৃথিবীতেও না। অণুর চেয়ে বড়ই হোক, কিংবা তার চেয়ে ছোটই হোক, সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখা আছে"। (সূরা সাবা: ৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ﴾

"তারপর তারা জিজ্ঞেস করে যে, তুমি যা বলছো তা কি সত্য? বলো, আমার রবের শপথ! এটা সত্য এবং এর প্রকাশ হবার পথে বাধা দেবার মতো শক্তি তোমাদের নেই"। (সূরা ইউনুস: ৫৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"কাফেররা দাবী করে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে উঠানো হবে না। হে নাবী! তুমি তাদের বলো, আমার রবের শপথ, তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে। তারপর দুনিয়ায় তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। এটি আল্লাহর জন্য সহজ"। (সূরা তাগাবুন: ৭)

কিয়ামত অতি নিকটে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾

"কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে"। (সূরা কামার: ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾

"মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় কাছে এসে গেছে, অথচ সে গাফিলতির মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আছে"। (সূরা আম্বীয়া:) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾

"এক প্রশ্নকারী আযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। যে আযাব কাফেরের জন্য অবধারিত। তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। এটি আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি উর্ধারোহনের সোপানসমূহের অধিকারী। ফেরেশতারা এবং রূহ তার দিকে উঠে যায় এমন এক দিনে যা পঞ্চম হাজার বছরের সমান। অতএব, হে নবী! তুমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করো। তারা সেটিকে অনেক দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখছি তা অতি নিকটে"। *(সূরা মাআরেজ: ১-৭)*

আখিরাত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জবাবঃ

যারা পরকালকে অস্বীকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দোষারোপ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

"আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন, সেদিন এ দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এমন মনে হবে তারা পরস্পরের মধ্যে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্য নিছক একদন্ডের জন্য অবস্থান করেছিল। প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না"। *(সূরা ইউনুস: ৪৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا}] [الأنعام: ٣١]

এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে, তারা বলবে, 'হায় আফসোস, সেখানে আমরা যে ত্রুটি করেছি তার উপর।' *সূরা আল আন আম: ৩১।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ} [الشُّورَى: ١٨]

"ভাল করে শুনে নাও, যারা সেই সময়ের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বিতর্ক করে তারা গোমরাহীর মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে"। *(সূরা শূরা: ১৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন

﴿بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ﴾

"বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো হারিয়ে গেছে। উপরন্তু তারা সে ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। আসলে তারা সে ব্যাপারে অন্ধ"। *(সূরা আন নামল: ৬৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾

"এরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, আল্লাহ কোনো মৃতকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন না। কেন উঠাবেন না? এতো একটি ওয়াদা, যেটি পুরা করা তিনি নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। আর এটি এ জন্য প্রয়োজন যে, এরা যে সত্য সম্পর্কে মতবিরোধ করছে আল্লাহ সেটি এদের সামনে উন্মুক্ত করে

দিবেন এবং কাফেররা জানতে পারবে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী"। *(সূরা আন নাহাল: ৩৮-৩৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

"কিয়ামত নিশ্চয়ই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না"। *(সূরা মুমিন: ৫৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾

"আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় এবং অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যখনই জাহান্নামের অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে তখনই আমি তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব। এটা হচ্ছে তাদের এ কাজের প্রতিদান যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, যখন আমরা শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আবার আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করে উঠানো হবে? তারা কি খেয়াল করেনি, যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার অবশ্যই ক্ষমতা রাখেন? তিনি তাদের হাশরের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার আগমন অবধারিত। কিন্তু যালেমরা জিদ ধরেছে যে তারা তা অস্বীকার করেই যাবে"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৯৭-৯৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"এবং তারা বলে, আমরা যখন হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করে উঠানো হবে? এদেরকে বলো, তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও অথবা এমন কোনো সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বলো, তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে, এটা কবে হবে? বলো, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে। যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন, তোমরা তার প্রশংসার সাথে তার ডাকের জবাব দিবে এবং তখন তোমাদের এ ধারণা হবে যে, তোমরা অল্প কিছুক্ষণ মাত্র এ অবস্থায় কাটিয়েছ"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৪৯-৫২)*

হে প্রিয় পাঠক! তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব যেরকম বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে, তাতে আপনি চিন্তা করুন। তারা প্রথমে বলেছে, আমরা যখন হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করে উঠানো হবে? এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, তোমরা যদি ধারণা করে থাকো যে, তোমাদের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই এবং তোমাদের কোন রবও নেই, তাহলে তোমরা কেন এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও না, যার কোন মৃত্যু নেই। যেমন মজবুত পাহাড় এবং লোহা কিংবা তোমাদের ধারণায় এর চেয়ে অধিক মজবুত কোন সৃষ্টি। অতএব তোমরা যদি বলো যে, আমরা হচ্ছি এমন সৃষ্টি, যা চিরস্থায়ী হয় না, তাহলে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার মাঝে এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি করার মাঝে কোন জিনিস্ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো?

উপরের দলীলটি অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তোমাদেরকে যদি পাথর, লোহা অথবা এর চেয়ে অধিক শক্ত কোন বস্তু হতেও সৃষ্টি করা হতো, তাহলেও তিনি তোমাদেরকে নিঃশেষ করতে ও তোমাদের শরীরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে সক্ষম। শুধু তাই নয়; তোমাদের শরীরকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করতেও তিনি সক্ষম। মানুষের শরীরের হাড় এবং অন্যান্য জিনিস শক্ত হওয়া সত্ত্বেও যিনি একে নিঃশেষ ও মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে সক্ষম, তাকে এর চেয়ে কম কিছু করতে কিসে অক্ষম করতে পারে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কাফেররা আরেকটি প্রশ্ন করে থাকে। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কে আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে? বিশেষ করে যখন আমাদের দেহসমূহ পচে যাবে এবং মাটির সাথে মিশে যাবে, তখন কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ "বলো, তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। যখন তাদের উপর এই হুজ্জত কায়েম হয়ে গেল এবং তার হুকুম কবুল করে নেয়া আবশ্যক হয়ে গেল, তখন তারা অন্য একটি প্রশ্ন করে বসলো। তারা বলল, কিয়ামত কখন প্রতিষ্ঠিত হবে? তখন তাদের জবাবে বলা হয়েছে, অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে।

কিয়ামত ও পুনরুত্থান সত্য। এর দলীল স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে? এখন সে আমার উপর উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, এ হাড়গুলো যখন পচে গলে যাবে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে? তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ ও অবস্থা জানেন। তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? অবশ্যই রাখেন। তিনি মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়। পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"। *(সূরা ইয়াসীন: ৭৭-৮৩)*

বনী আদমের সর্বাধিক জ্ঞানী, সুস্পষ্টভাষী এবং বক্তৃতায় পারদর্শী লোকও যদি এর চেয়ে উত্তম দলীল-প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করে অথবা কুরআন যেই সংক্ষিপ্ত বাক্যমালা এবং সুস্পষ্ট ও সঠিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছে, তার অনুরূপ বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করে, তাহলে সে কখনো তার চেষ্টা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলো এমন একজন নাস্তিকের প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করেছেন, যার জবাব দেয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা যদি জোর দিয়ে দলীল পেশ না করতেন এবং অতিরিক্ত বিবরণ পেশ না করতেন, তাহলে শুধু তার এই বাণী: {وَنَسِيَ خَلْقَهُ} 'সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়' *সূরা ইয়াসীন: ৭৮।* তার জবাবের জন্য যথেষ্ট হতো না, দলীল-প্রমাণও যথাযথরূপে পেশ করা হতো না এবং সন্দেহও দূর হতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন। *সূরা ইয়াসীন: ৭৯।*

সুতরাং সৃষ্টির সূচনার মাধ্যমে পুনরায় এবং প্রথমবার সৃষ্টি করার মাধ্যমেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার উপর দলীল পেশ করেছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী লোকই জানে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি যদি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অক্ষম হন, তাহলে দ্বিতীয়বারের চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টি করতে আরো বেশী অক্ষম হওয়ার কথা। আর সৃষ্টি করার জন্য যেহেতু সৃষ্টির উপর স্রষ্টার শক্তি থাকা আবশ্যক এবং সৃষ্টির সকল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী, তাই তিনি বলেছেন, ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ "এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ ও অবস্থা জানেন"। *সূরা ইয়াসীন: ৭৯।* সুতরাং তিনি প্রথম সৃষ্টির উপাদান এবং তার সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। এমনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার উপাদান সম্পর্কেও তিনি অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, সৃষ্টির উপর যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, তাই হাড়গুলো পচে গলে যাওয়ার পর জীবিত করা কিভাবে তার জন্য অসম্ভব হবে?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও পুনরুত্থানের বিষয়কে একটি মজবুত দলীল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। এতে রয়েছে অন্য একজন নাস্তিকের প্রশ্নের জবাব। বলা হচ্ছে হাড়গুলো যখন পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবে, তখন তা ঠান্ডা ও শুষ্ক উপাদানে পরিণত হবে। আর হায়াত তথা জীবনের জন্য গরম ও ঠান্ডা উভয় প্রকার স্বভাব ও উপকরণ জরুরী। এটি মানুষের পুনরুত্থানের দলীল বহন করে। সুতরাং এতে সেই নাস্তিকের প্রশ্নের জবাব এবং পুনরুত্থানের দলীল উভয়ই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾

"তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো"। *(সূরা ইয়াসীন: ৮০)*

আল্লাহ তা'আলা এ উপাদানকে (আগুনকে) সৃষ্টি করেছেন, যার উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর ও শুষ্ক। এটিকে তিনি বের করেছেন সবুজ ও সতেজ বৃক্ষ থেকে, যা তরল ও ঠান্ডা উপদানে পরিপূর্ণ। যিনি কোন বস্তুকে তার বিপরীত ধর্মী বিষয় থেকে বের করেন এবং যার কাছে সমস্ত মাখলুক ও তার উপাদান বশ্যতা স্বীকার করে ও নত হয়, তার জন্য পচা গলা হাড়সমূহ থেকে মৃত মানুষকে জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়। আর এ বিষয়টিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে অবিশ্বাসী এই নাস্তিক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ও বিশাল বিশাল বস্তু সৃষ্টি করার মাধ্যমে তুলনা মূলক ছোট ছোট বস্তু সৃষ্টি করার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। কেননা প্রত্যেক বিবেকবানই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি বড় বড় কাজ করতে সক্ষম, তিনি ছোট কিছু করতে মোটেই অক্ষম নয়। যে ব্যক্তি এক কুইন্টাল ওজনের বোঝা বহন করতে সক্ষম, তার জন্য এক আউন্স পরিমাণ বহন করা খুবই মামুলী ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم﴾

"যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? *(সূরা ইয়াসীন: ৮১)* আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, যিনি এই বিশাল, প্রশস্ত ও বিস্ময়কর আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি পচে গলে যাওয়া হাড়সমূহকে পুনরায় জীবিত করতে অবশ্যই সক্ষম। তিনি পচা গলা ও মাটির সাথে যাওয়া হাড় ও মাংসকে পূর্বের অবস্থায় ফেরত দিতে সক্ষম। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না"। (সূরা মুমিন: ৫৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর এগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি; তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। *সূরা আহকাফ:৩৩।*

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জোর দিয়ে আরেকটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। তা হলো আল্লাহর কাজ মানুষের কাজের মত নয়। মানুষ কাজ করে যন্ত্রের সাহায্যে। কাজ করতে মানুষের পরিশ্রম হয়, ক্লান্তি ও কষ্ট লাগে। মানুষ সম্পূর্ণ নিজস্ব ক্ষমতায় কাজ করতে পারে না। তার কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ও একাধিক সহায়ক বস্তুর প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কাজ করতে চান, তখন কাজটি বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য তার ইচ্ছাই যথেষ্ট। তিনি যা সৃষ্টি করতে চান, তার জন্য শুধু كُنْ 'হয়ে যাও' বলাই যথেষ্ট। কুন শব্দটি বলার সাথে সাথেই যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন, জিনিসটি সেভাবেই সৃষ্টি হয়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরা ইয়াসীনে কিয়ামত ও সৃষ্টির পুনরুত্থান সত্য হওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে বর্ণনা করার পর এই কথা বলে বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর হাতেই। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিচালনা করবেন। তিনি বলেন,

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"। (সূরা ইয়াসীন: ৮৩) কিয়ামত ও পুনরুত্থান সত্য এবং তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি বীর্যরূপে এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়? অতঃপর তা মাংসপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তার সুন্দর দেহ বানালেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুসামঞ্জস্য করলেন। তারপর তা থেকে নারী ও পুরুষ দু'রকম মানুষ বানালেন। সেই স্রষ্টা কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন? *(সূরা কিয়ামাহ: ৩৬-৪০)*

আল্লাহ তা'আলা এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাদের উপর আদেশ-নিষেধ চাপিয়ে না দিয়ে এবং ভালো কাজের ছাওয়াব ও পাপ কাজের শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিবেন

না। তার হিকমত ও কুদরত এমনটি করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

"তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। সম্মানিত আরশের তিনিই মালিক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের কাছে। কাফেররা কখনো সফলকাম হতে পারে না। হে মুহাম্মাদ! বলো, হে আমার রব! ক্ষমা করো ও করুণা করো এবং তুমি সর্বোত্তম করুণাশীল"। *(সূরা মুমিনূন: ১১৫-১১৮)*

সুতরাং তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে শুক্রবিন্দুকে প্রথমে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করেছেন, অতঃপর জমাট রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছেন, অতঃপর তার মধ্যে শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে তৈরী করেছেন ইন্দ্রিয় শক্তি, হাড্ডি, পেশী, রগ-রেশা ইত্যাদি। এগুলো তাকে মজবুত এক সৃষ্টিতে পরিণত করেছে, তার গঠনকে সুনিপুন করেছে এবং তাকে এই আকৃতিতে বের করেছে। যিনি মানুষকে এই পূর্ণতম গঠন এবং সর্বোত্তম আকৃতি দান করেছেন, তার পক্ষে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নয়। যিনি মানুষকে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও পরিচর্যা দিয়েছেন, তিনি কিভাবে তাকে হিসাব না নিয়েই ছেড়ে দিতে পারেন? সুতরাং পুনরুত্থান ও হিসাব ছেড়ে দেয়া তার হিকমত ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং তার কুদরত ও ক্ষমতা তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা হতে অক্ষমও নয়।

হে প্রিয় পাঠক! সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এই বিস্ময়কর যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, আপনি তার দিকে লক্ষ্য করুন, যার চেয়ে অধিক সংক্ষিপ্ত; কিন্তু পরিপূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ আর হতেই পারে না। সেই সাথে আপনি এই সুস্পষ্ট বর্ণনার প্রতি খেয়াল করুন, যার চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট বর্ণনার কল্পনাও করা যেতে পারে না। হে প্রিয় পাঠক! এই দলীলগুলো এমন অকাট্য যে, কোনো প্রকার সন্দেহ এর ধারে-কাছেও আসতে পারে না।

কুরআনে অনুরূপ আরো অনেক যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ﴾

"হে লোক সকল! তোমরা যদি পুরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহ করো, তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্তপিন্ড থেকে, তারপর গোশতের টুকরা থেকে, যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় এবং আকৃতিহীন হয়। আমি এটি বলছি তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য। আমি যে শুক্রকে চাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত গর্ভাশয়ে স্থিত রাখি, তারপর একটি শিশু আকারে তোমাদের বের করে আনি, (তারপর তোমাদের প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা নিজেদের পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে যাও। আর তোমাদের কাউকে তার পূর্বেই ডেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং কাউকে হীনতম বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যাতে সবকিছু জানার পর আবার কিছুই না জানে। আর তোমরা দেখছো যমীন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর যখনই আমি তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখনই তা শষ্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এসব কিছু এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব জিনিসের উপর শক্তিশালী। আর একথার প্রমাণ যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কবরে যারা আছে তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন"। (সূরা হাজ্জ: ৫-৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

"আমি মানুষকে তৈরী করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিন্ডকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিন্ডে হাড্ডীসমূহ স্থাপন করেছি, তারপর হাড্ডীসমূহকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে, তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে। কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন, তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। অতঃপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে"। *(সূরা মুমিনূন: ১২-১৬)*

কিয়ামত ও পুনরুত্থান সত্য প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আসহাফে কাহাফের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কিভাবে তিনি তাদেরকে গুহার মধ্যে তিনশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন (ঘুম পাড়িয়েছেন)!! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেখান থেকে মানব সমাজে বের করে এনেছেন। সৌর বছর হিসাবে তিনশ বছর। আর চন্দ্রের হিসাবে তিনশ নয় বছর। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾

"এভাবে আমি নগরবাসীদেরকে তাদের অবস্থা জানালাম, যাতে লোকেরা জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই"। *(সূরা আল কাহাফ: ২১)*

আর যারা বলে মানুষের দেহ শুধু স্বনির্ভর একটি পদার্থ দিয়ে গঠন করা হয়েছে, তারা দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কে এলোমেলো কথা বলেছে। এ ব্যাপারে তারা দুই দলে বিভক্ত। এক দল বলেছে, মানুষের দেহ গঠনের উপদানগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তাকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে।

আরেক দল বলেছে, দেহের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাই একত্রিত করা হবে। যারা এই কথা বলে, তাদের উপর আপত্তি করা হয়েছে যে, আমরা দেখতে পাই যে কোন কোন মানুষকে হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলে। আবার মানুষও অনেক প্রাণী ভক্ষণ করে থাকে। তাই যেই মানুষকে কোন প্রাণী খেয়ে ফেলেছে, সেই প্রাণীর শরীরের অংশগুলোকেই যদি একত্রিত করে পুনরুত্থিত করা হয়, তাহলে তার ভক্ষিত মানুষটি যেহেতু তার শরীরের সাথে মিশে গেছে, তাই পুনরুত্থানের সময় তো শুধু প্রাণীটিই পুনরুত্থিত হবে। তার ভক্ষিত মানুষটি কোথায় যাবে? আর মানুষের ভক্ষিত প্রাণীগুলো দ্বারা যেহেতু মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পায়, তাই মানুষকে তার শরীরের অংশগুলোসহ পুনর্জীবিত করা হলে তার ভক্ষিত প্রাণীগুলোর কী অবস্থা হবে? আর যদি এ ক্ষেত্রে বলা হয় যে, হিংস্র প্রাণীর ভক্ষিত মানুষের অংশগুলো হিংস্র প্রাণী থেকেই পুনরুত্থিত হবে, তাহলে তো মানুষকে পুনরুত্থিত করা হলো হিংস্র প্রাণীর ভিতর থেকে; মানুষ থেকে নয়।

তাদের উপর আরো আপত্তি করা হয়েছে যে, মানুষের অবস্থা ও স্বভাব সবসময়ই পরিবর্তন ও বিলীন হতে থাকে। কোন অবস্থায় তাকে পুনরুত্থিত করা হবে? মৃত্যুর সময় যে অবস্থা ও স্বভাবের উপর সে ছিল, তাকে কি সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে? যদি এই কথা বলা হয়, তাহলে আবশ্যক হয় যে, তাকে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। অথচ এটি দলীল বিরোধী কথা।

এই কথার প্রবক্তাগণের কেউ কেউ দাবী করেছে যে, মানুষের দেহে এমন কতিপয় অংশ আছে, যা কখনো পরিবর্তন ও বিলীন হয় না এবং তা অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশেও না। মানুষ যেই প্রাণীগুলোকে ভক্ষণ করে, তার কোন অংশ মানুষের শরীরের এই অংশগুলোর সাথে মিশ্রিত হয় না।

বিদ্বানগণ অবগত আছেন যে, মানুষের শরীরের সব অংশই পরিবর্তন ও বিলীন হয় এবং পচে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং এই প্রকার

লোকেরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছে, তা দেহের পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী দার্শনিকদের সন্দেহকেই শক্তিশালী করেছে।

সালাফে সালেহীনগণ যে কথার উপর ছিলেন এবং যার উপর অধিকাংশ বিদ্বান রয়েছেন, তা হচ্ছে মানুষের দেহ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। মানুষের দেহ মাটির সাথে মিশে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে মাটি হতে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। যেমন প্রথমবার সৃষ্টির সময় সে অন্য বস্তুর সাথে মিশে ছিল। সে শুক্রকীটের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। অতঃপর সে জমাট রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছে। অতঃপর মাংসপিন্ডে পরিণত হয়েছে। অতঃপর তা গোশত ও মাংসে পরিণত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুঠাম দেহের একজন মানুষ হিসাবে তৈরী করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঅলা তাকে পুনরুত্থিত করবেন। তার সব অংশ পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর তাকে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। তবে তার দেহের 'আজবুয যানাব' নামক অংশটি (পিঠের একদম নীচের ক্ষুদ্রতম অংশটি) নষ্ট হয় না। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ ابن آدم وَفِيهِ يُرَكَّبُ»

"বনী আদমের দেহের অংশ 'আজবুয যানাব' ব্যতীত সবকিছুই যমীন খেয়ে ফেলে। এ থেকেই বনী আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কিয়ামতের দিন এ থেকেই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে"।[২১৪] অন্য হাদীছে এসেছে, কিয়ামতের দিন যমীনে পুরুষের বীর্যের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে। এর মাধ্যমে তারা কবর থেকে বের হবে। যেমন বৃষ্টি বর্ষণের ফলে যমীনে উদ্ভিদ উদগত হয়।[২১৫]

সুতরাং উভয় সৃষ্টির ধরণ এক হলেও তা মূলত দুই প্রকার। এক দিক থেকে তা পরস্পর সাদৃশ্য এবং অভিন্ন। আবার অন্য দিক থেকে উভয় সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। পুনরুত্থান প্রথম সৃষ্টির মতই। যদিও পুনরুত্থানের উপাদানের উৎস ও প্রথম সৃষ্টির উপাদানের উৎসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং মানব দেহের 'আজবুয যানাব' নষ্ট হয় না। আর অন্যান্য অংশ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং মানুষের যেই অংশ নষ্ট হয় না, তা থেকেই তাকে পুনরত্থিত করা হবে। এটি জানা কথা যে, কেউ কোন ব্যক্তিকে শিশু অবস্থায় দেখার পর পুনরায় বৃদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেলে বুঝতে সক্ষম হয় যে, এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে সে শিশু অবস্থায় দেখেছিল। যদিও মানুষের মধ্যে সদা পরিবর্তন সাধিত হয়। একই অবস্থা সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও।

---

[২১৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৯৫৫, কিতাবুল ফিতান।

[২১৫] যঈফ: হাকেম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন। দেখুন, শাইখের তাখরীজসহ শারহুল আক্বীদাহ আত তাহাবীয়া।

যে ব্যক্তি যখন কোন গাছকে ছোট অবস্থায় দেখে, অতঃপর সেটিকে বড় হওয়ার পর দেখে, তখন সে বলে, এটিই সেটি।

তবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির সময় মানুষের বৈশিষ্ট ও গুণাগুণ প্রথম সৃষ্টির বৈশিষ্টের অনুরূপ হবে না। সিফাত সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। বিশেষ করে জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা দুনিয়ার মত থাকবে না। জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের আকৃতি হবে আদম আলাইহিস সালাম এর মত। দৈর্ঘ হবে ৬০ হাত। ছ্বহীহ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে এটি বর্ণিত হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তার দৈর্ঘ হবে ৭ হাত। পুনরায় সৃষ্টির পর মানুষ আর কোনো বিপদা-পদের সম্মুখীন হবে না। অথচ এই পৃথিবীতে থাকাকালে মানুষ সবসময় বিপদাপদ ও মুছীবতের সম্মুখীন হয়ে থাকে।

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা কিয়ামাত দিবসে আমলের প্রতিফল প্রদানে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ "তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক"। (সূরা ফাতিহা: ৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾

"তারা যেন সেদিনের কথা ভুলে না যায়, যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী"। (সূরা আন নূর: ২৫)

এখানে দীন বলতে প্রতিদান ও বিনিময় উদ্দেশ্য। বলা হয়كما تدين تدان অর্থাৎ তুমি যেভাবে দীন গ্রহণ (আমল) করবে সেভাবেই তোমাকে বদলা দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"কেউ জানে না তাদের কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাদের চোখের শীতলতার জন্য কি সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে"। (সূরা সাজদা: ১৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿جَزَاءً وِفَاقًا﴾ "তারা তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ প্রতিফল পাবে"। (সূরা আন নাবা: ২৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হাযির হবে সৎকাজ নিয়ে তার জন্য রয়েছে দশগুণ প্রতিফল আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ নিয়ে আসবে সে ততটুকু প্রতিফল পাবে যতটুকু অপরাধ সে

করেছে এবং কারোর উপর যুলুম করা হবে না”। *(সূরা আল আনআম: ১৬০)* আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

“যে ব্যক্তি সৎ কাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভাল প্রতিদান পাবে এবং এ ধরণের লোকেরা সেদিনের ভীতি বিহবলতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যারা অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে মুখের উপর উপুড় করে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’ ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান পেতে পারো? (সূরা আন নামল: ৮৯-৯০) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভাল ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিত যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করতো তেমন প্রতিদানই পাবে”। *(সূরা কাসাস: ৮৪)*

কুরআন মজীদে এ রকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুর পক্ষ হতে বর্ণনা করতে গিয়ে আবু যার গিফরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে কুদসীতে বলেন,

«يَا عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ»

“হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের এই আমলসমূহ সংরক্ষিত করে রাখবো। অতঃপর আমি তার পূর্ণ বিনিময় প্রদান করবো। সুতরাং যে ব্যক্তি ভাল কিছু পাবে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া অন্য কিছু পাবে, সে যেন কেবল নিজেকেই দোষারোপ করে।[২১৬] অচিরেই এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত বিবরণ আসবে। ইনশা-আল্লাহ।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা আল্লাহর সমীপে বান্দার আমলনামা পেশ করা, হিসাব-নিকাশ, আমলনামা পাঠ করা, বান্দার আমলের ছাওয়াব ও শাস্তির প্রতিও ঈমান রাখি।

[২১৬] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৫৭৭।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ﴾

"সেদিন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবে। সেদিন আসমান চৌচির হয়ে যাবে এবং তার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। ফেরেশতারা এর প্রান্তসীমায় অবস্থান করবে। সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না। সে সময় যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমি জানতাম, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তাই সে মনের মত আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে। উন্নত মর্যাদার জান্নাতে। যার ফলের গুচ্ছসমূহ নাগালের সীমায় অবনমিত হয়ে থাকবে এসব লোকদের কে বলা হবে, অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো। আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেয়া হবে সে বলবে, হায় আফসোস! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো এবং আমার হিসাব যদি আমি আদৌ না জানতাম তাহলে কতই না ভাল হতো! হায় আফসোস! আমার সেই মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো। আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসলোনা। আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। আদেশ দেয়া হবে, পাকড়াও করো ওকে আর ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো এবং সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না এবং মিসকীনকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না। তাই আজকে এখানে তার সমব্যথী কোন বন্ধু নেই"। (সূরা হাক্কাহ: ১৫-৩৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾

"হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, পরে তার সাথে সাক্ষাত করবে। তারপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হয়েছে তার কাছ থেকে হালকা হিসাব নেয়া হবে এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে

ফিরে যাবে। আর যার আমলনামা তার পিছন দিক দেয়া হবে। সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে। সে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে আনন্দে ডুবে ছিল। সে মনে করেছিল, তাকে কখনো ফিরতে হবে না। না ফিরে সে পারতো কেমন করে? তার রব তার কার্যকলাপ দেখছিলেন"। (সূরা ইনশিকাক: ৫-১৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

"এবং সবাইকে তোমার রবের সামনে লাইনবন্দী করে পেশ করা হবে। নাও দেখে নাও, তোমরা এসে গেছো তো আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে যেমনভাবে আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরা তো মনে করেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুত ক্ষণ নির্ধারিতই করিনি। আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় এমন কোনো কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি যুলুম করবেন না"। *(সূরা কাহাফ: ৪৮-৪৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

"তাদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন পৃথিবী ও আকাশকে পরিবর্তিত করে অন্য রকম করে দেয়া হবে এবং সবাই এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে হাযির হবে। সেদিন তোমরা অপরাধীদের দেখবে, শিকলে তাদের হাত পা বাঁধা, আলকাতরার পোশাক পরে থাকবে এবং আগুনের শিখা তাদের চেহারা ঢেকে ফেলবে। এটা এ জন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। হিসাব নিতে আল্লাহর একটুও দেরী হয় না। এটি একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য এবং এটি পাঠানো হয়েছে এ জন্য যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তারা জেনে নেয় যে, আসলে আল্লাহ মাত্র একজনই আর যারা বুদ্ধি-বিবেচনা রাখে তারা সচেতন হয়ে যায়"। *(সূরা ইবরাহীম: ৪৮-৫২)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِالْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

"তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে অহী নাযিল করেন। যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়। সেটি এমন দিন যখন সব মানুষের সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহর কাছে তাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না, সেদিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, আজ রাজত্ব কার? সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি পরাক্রমশালী। আজ প্রত্যেক প্রানীকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী"। *(সূরা মুমিন: ১৫-১৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

"যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে সেদিনকে ভয় করো। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত সৎকর্মের ও অপকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারো উপর কোন যুলুম করা হবে না"। *(সূরা আল বাকারা: ২৮১)*

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় ছ্বহীতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يوم القيامة إِلاَّ هَلَكَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: فأما من أوتي كتابه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب»

"কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ কি বলেননি,

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

"যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, অচিরেই তার সহজ হিসাব নেয়া হবে? (সূরা ইনশিকাক: ৮) নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মূলত এটি হিসাব নয়; বরং তা হল শুধু আমলগুলো পেশ করা। কিন্তু কিয়ামতের দিন যার (কঠিন) হিসাব নেয়া হবে,

তাকে শাস্তি দেয়া হবে”।[২১৭] অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তার যেসব বান্দার কড়াকড়ি হিসাব নিবেন, তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে। তবে তিনি কারো উপর যুলুম করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা তার অনেক বান্দাকেই ক্ষমা করে দিবেন। ইনশা-আল্লাহ অচিরেই সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

ছ্বহীহ বুখারীতে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

«إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَفَاقَ قَبْلِى أَمْ جُزِىَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ»

“কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুশ হয়ে পড়বে। আমিই তখন সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাবো। তখন দেখবো যে, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আরশের একটি খুঁটি ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি আমার পূর্বেই হুশ ফিরে পেয়েছেন? না কি তুর পাহাড়ের বেহুশ হওয়ার কারণেই তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে?[২১৮]

এটি হচ্ছে কিয়ামতের মাঠের বেহুশ হওয়া। যখন আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য আসবেন এবং আল্লাহর নূরে সমস্ত যমীন আলোকিত হবে, তখন আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে সমস্ত মাখলুক বেহুশ হয়ে যাবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এখানে বেহুশ হওয়া দ্বারা যদি হাশরের মাঠের বেহুশ হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই হাদীছের কি জবাব হবে যেখানে বলা হয়েছে,

«فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ فَأَجد مُوسَى باطشا بِقَائِمَة الْعَرْشِ»

“কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুশ হয়ে পড়বে। আমার কবরই তখন সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হবে। তখন দেখতে পাবো যে, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আরশের একটি খুঁটি ধরে আছেন?[২১৯]

এর জবাব হচ্ছে হাদীছের এই শব্দটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এই কারণেই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখানে রাবী এক হাদীছকে অন্য একটি হাদীছের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দুই শব্দকে একসাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। তাই এভাবে হাদীছটি এসেছে। মূলত হাদীছ দু’টির একটি এ রকম:

«إِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ»

[২১৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০৩।

[২১৮] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৩৯৮।

[২১৯] ছ্বহীহ:

"কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুশ হয়ে পড়বে। আমিই তখন সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাবো"। যেমন পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অন্য হাদীছটি হচ্ছে, «أنا أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يوم القيامة» "কিয়ামতের দিন আমার কবরই সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হবে"। এই হাদীছটি বর্ণনাকারী অন্য হাদীছের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। যারা এই কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে ইমাম আবুল হাজ্জাজ আল মিয্যী, শাইখ শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম এবং আমাদের শাইখ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) অন্যতম।

এমনি কতক বর্ণনাকারী সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, «فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِى أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ» আমি জানি না, মূসা আলাইহিস সালাম কি বেহুশ হয়ে আমার পূর্বেই হুশ ফিরে পেয়েছেন? না কি তিনি ঐ সমস্ত সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বেহুশ হওয়া থেকে মুক্ত রেখেছেন?

তবে এ ক্ষেত্রে ঐ বর্ণনাটিই সংরক্ষিত হয়েছে, যা অনেকগুলো ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে প্রথম বর্ণনাটি এবং তার তাৎপর্যও সঠিক। কেননা কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য আগমন করবেন, তখন আল্লাহর নূর প্রকাশিত হওয়ার কারণে সমস্ত মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। মূসা আলাইহিস সালাম যদি তাদের সাথে তখন বেহুশ না হন, তাহলে সম্ভবত সেই দিনের বেহুশ হওয়ার বিনিময়ে তাকে দ্বিতীয়বার বেহুশ হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তুর পাহাড়ে স্বীয় নূর বিচ্ছুরিত করে পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তুর পাহাড়ে আল্লাহর নূর প্রকাশিত হওয়ার সময় মূসা আলাইহিস সালাম বেহুশ হওয়ার বদলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার আগমণে যখন সমস্ত সৃষ্টি বেহুশ হয়ে পড়বে, তখন তিনি বেহুশ হবেন না। হে পাঠক! আপনি এই মহান বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন এবং এ ব্যাপারে মোটেই গাফিলতি করবেন না।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম তিরমিযী এবং আবু বকর ইবনে আবীদ্ দুনয়া (রহিমাহুল্লাহ) হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনবারে আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। প্রথম ও দ্বিতীয়বার শুধু পরস্পর বিতর্ক ও দোষারোপ চলতে থাকবে এবং লোকেরা উযর-আপত্তি পেশ করবে। তৃতীয়বার পেশ করার সময় আমল নামা প্রদান করা হবে। তখন যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে এবং যাদের হিসাব সহজভাবে ও দ্রুত সম্পন্ন হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[২২০]

[২২০] যঈফ: ইবনে মাজাহ হা/৪২৭৭, মিশকাত হা/৫৫৫৭।

ইমাম ইবনে আবীদ্ দুনয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) হতে এ বিষয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কবিতার লাইনগুলো হচ্ছে,

وَطَارَتِ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي مُنَشَّرَة... فِيهَا السَّرَائِرُ وَالْأَخْبَارُ تُطَّلَعُ

فَكَيْفَ سَهْوُكَ وَالْأَنْبَاءُ وَاقِعَة... عَمَّا قَلِيلٍ، وَلَا تَدْرِي بِمَا تَقَعُ

أَفِي الْجِنَانِ وَفَوْزٍ لَا انْقِطَاعَ له... أَمِ الْجَحِيمِ فَلَا تُبْقِي وَلَا تَدَعُ

تَهْوِي بِسَاكِنِهَا طَوْرًا وَتَرْفَعُهُمْ... إِذَا رَجَوْا مَخْرَجًا مِنْ غَمِّهَا قُمِعُوا

طَالَ الْبُكَاءُ فَلَمْ يُرْحَمْ تَضَرُّعُهُمْ... فِيهَا، وَلَا رِقَّية تُغْنِي وَلَا جَزَعُ

لِيَنْفَعِ الْعِلْمُ قَبْلَ الْمَوْتِ عَالِمَه... قَدْ سَالَ قَوْمٌ بِهَا الرُّجْعَى فَمَا رَجَعُوا

সেদিন সকলের হাতে উন্মুক্ত আমলনামা প্রদান করা হবে। তাতে থাকবে তাদের সকল অপ্রকাশ্য আমল এবং তাদের প্রকাশ্য আমলের খবরও তাতে থাকবে।

তুমি কেমন করে গাফেল হয়ে আছো? অথচ অচিরেই সকল সংবাদ বাস্তবায়িত হবে। তুমি জাননা যে, কোথায় হবে তোমার ঠিকানা? তোমার ঠিকানা কি হবে জান্নাতে এবং এমন সাফল্যের স্থানে, যা কখনো নিঃশেষ হবে না? না কি তোমার আবাস্থল হবে জাহান্নাম? যা শরীরের কোন কিছুকেই অবশিষ্ট রাখবেনা এবং না জ্বালিয়ে ছাড়বে না।

জাহান্নামের অধিবাসীকে তার সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যখন তার আযাব থেকে বের হওয়ার আবেদন করবে, তখন তাদেরকে উপরে উঠানো হবে। কিন্তু বের হওয়ার কোন সুযোগ রাখা হবে না।

তারা সেখানে অনেক কাঁদবে, কিন্তু ক্রন্দনের পরও সেখানে তাদের উপর কোন প্রকার রহম করা হবে না। ক্রন্দন ও হা-হুতাশ করেও সেখানে কেউ লাভবান হবে না।

মৃত্যুর পূর্বেই যেন আলেম তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয়। কেননা অনেক লোকই সেখানে গিয়ে ফেরত আসার আবেদন করেছে। কিন্তু তারা ফিরে আসতে পারেনি।

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা পুলসিরাতের উপরও ঈমান রাখি। এটি হচ্ছে জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি পুল। হাশরের মাঠ মানুষের হিসাব-নিকাশ যখন শেষ হবে এবং সেখান থেকে যখন তারা সিরাতের নিকটস্থ অন্ধকারের নিকট আসবে, তখন জাহান্নামের উপর এই সিরাত স্থাপন করা হবে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, যেদিন এই আসমান-যমীনকে পরিবর্তিত করে অন্য রকম করে দেয়া

হবে, সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি জবাবে বললেন, লোকেরা সেদিন পুলসিরাতের নিকটস্থ অন্ধকারের মধ্যে থাকবে।[২২১] এই স্থানে মুনাফেকরা মুমিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং তারা মুমিনদের পিছনে পড়বে। মুমিনগণ মুনাফেকদেরকে পিছনে ফেলে আগে চলে যাবে। একটি প্রাচীর মুনাফেকদেরকে মুমিনদের থেকে আড়াল করে রাখবে এবং মুমিনদের সাথে মিলিত হতে তাদেরকে বাধা দিবে।

ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ছাত্র মাসরুক হতে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তিনি আরো বলেন, লোকদেরকে আমল অনুপাতে নূর দেয়া হবে। তাদের কারো সামনে পাহাড়ের মত বিশাল নূর দেয়া হবে। কাউকে এর চেয়েও বিশাল নূর দেয়া হবে। কাউকে তার ডান পাশে খেজুর গাছের ন্যায় বড় আকারের নূর দেয়া হবে। আবার কাউকে তার ডান পাশে এর চেয়ে কম পরিমাণ নূর প্রদান করা হবে। সবচেয়ে কম পরিমাণ নূর যাকে দেয়া হবে, তার পায়ের বৃদ্ধাংঙ্গুল পরিমাণ নূর দান করা হবে। তা একবার আলোকিত করবে অন্যবার নিভে যাবে। যখন আলোকিত হবে, তখন সে পা বাড়াবে। আর যখন আলো নিভে যাবে, তখন থেমে যাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলেন, তারা পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। পুলসিরাত হবে তলোয়ারের চেয়েও অধিক ধারালো এবং পিচ্ছিল। লোকদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের নূর অনুপাতে এর উপর দিয়ে চলো। তাদের কেউ তারকার গতিতে, কেউ দ্রুতগামী বাতাসের গতিতে, কেউবা চোখের পলকে, কেউ পায়ে হেটে এবং কেউ দৌড়িয়ে পুলসিরাত পার হবে। সুতরাং তাদের চলার গতি হবে আমল অনুযায়ী। এমনকি যার নূর হবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল পরিমাণ সে এমনভাবে চলবে যে, এক হাত কেটে যাবে, অন্য হাত দিয়ে ধরে ঝুলতে থাকবে এবং এক পা কেটে যাবে, কিন্তু অন্য পা ঝুলতে থাকবে। চারপাশ থেকে আগুন তাকে ঘিরে ধরবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর তারা পরিত্রান পাবে। যখন তারা পুলসিরাতের বিপদ থেকে মুক্ত হবে, তখন তারা বলবে, আমরা ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি তোমাকে আমাদের সামনে পেশ করেছেন। এরপর আমাদেরকে তোমার আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন নিয়ামত দান করেছেন, যা অন্য কোন মাখলুককে প্রদান করেননি।[২২২] আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾

[২২১] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৩১৫।

[২২২] ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আলহাকেম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। দেখুন: (২/৩৭৬-৩৭৭)। ইমাম আলবানী এই হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন ছ্বহীহুত তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হা/৩৫৯১।

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জাহান্নাম অতিক্রম করবে না। এ তো স্থিরকৃত সিদ্ধান্ত, যা সম্পন্ন করা তোমার রবের দায়িত্ব"। *(সূরা মারইয়াম: ৭১)*

এখানে জাহান্নাম অতিক্রম করার অর্থ নিয়ে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী মতে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾

"তারপর যারা মুত্তাকীদেরকে আমি বাঁচিয়ে নেবো এবং যালেমদেরকে তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো"। *(সূরা মারইয়াম: ৭২)*

ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে বাইআতকারী কোন লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কী এ কথা বলেননি, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে জাহান্নাম অতিক্রম করবে না? নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তুমি কী আল্লাহ তা'আলার এ কথা শোননি যেখানে তিনি বলেছেন, "অতঃপর মুত্তাকীদেরকে আমি বাঁচিয়ে নেবো এবং যালেমদেরকে তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো"।[২২৩]

নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে, জাহান্নাম অতিক্রম করা মানে তাতে প্রবেশ করা বুঝায় না। অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তাতে পতিত হওয়ার পর তা হতে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক হয় না। বরং তাতে পতিত হওয়ার আলামত প্রকাশ পাওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং যাকে হত্যা করার জন্য শত্রুরা অন্বেষণ করেছে, কিন্তু তারা তাকে ধরতে পারেনি, তার ব্যাপারে এটি বলা জায়েয আছে যে, نجاه الله منهم আল্লাহ তাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾

"তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেল তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং একটি কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচালাম"। *(সূরা হুদ: ৫৮)* আল্লাহ তা'আলা সূরা হুদের ৬৬ নং আয়াতে আরো বলেন,

---

[২২৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৬৩। আরো দেখুন: শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাখরীজসহ শারহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হাদীছ নং- ৬৭১।

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾

"শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়ছালা সময় এসে গেল তখন আমি নিজ অনুগ্রহে সালেহ ও তার উপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে বাঁচালাম। নিঃসন্দেহে তোমার রবই আসলে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী"। আল্লাহ তা'আলা এ সূরার ৯৪ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾

"শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়ছালার সময় এসে গেল তখন আমি নিজ রহমতে শোআইব ও তার সাথী মুমিনদের উদ্ধার করলাম। আর যারা যুলুম করেছিল একটি প্রচন্ড আওয়াজ তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করল যে, নিজেদের আবাসভূমিতেই তারা উপুড় হয়ে পড়ে রইল"।

এখানে যাদেরকে আযাব থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, তাদেরকে মূলত আযাব স্পর্শই করেনি। তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের জন্য নাজাতের ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে আল্লাহর আযাব মুমিনদেরকেও স্পর্শ করত।

জাহান্নাম অতিক্রমকারীদের অবস্থাও অনুরূপ। তারা জাহান্নামের উপরে স্থাপিত পুলসিরাত অতিক্রম করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে তা থেকে পরিত্রাণ দিবেন এবং যালেমদেরকে তথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিবেন। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মুমিনদের জাহান্নামে পতিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে পুলসিরাতের উপর দিয়ে জাহান্নাম পার হওয়া।

হাফেয আবু নাসর আল-ওয়ায়েলী (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি লোকদেরকে আমার সুন্নাত শিক্ষা দাও। যদিও তারা তা শিখতে অপছন্দ করে। তুমি যদি চাও যে, জান্নাতে প্রবেশের আগে পুলসিরাতের উপর এক মুহূর্ত আটকা থাকবে না, তাহলে আল্লাহর দীনের মধ্যে তোমার নিজস্ব রায় দ্বারা কোন কিছুই প্রবিষ্ট করাবে না।[২২৪] ইমাম কুরতুবী এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু বকর আহমাদ বিন আহমাদ বিন সুলায়মান আন নাজ্জাদ ইয়ালা বিন উমাইয়া হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

[২২৪] মাওযূ বা জাল হাদীছ: সিলসিলাহ যঈফাহ হা/২৬৫

কিয়ামতের দিন জাহান্নাম মুমিনকে বলবে, হে মুমিন! তুমি পার হয়ে যাও। তোমার নূর আমার লেলিহান শিখাকে নির্বাপিত করে দিয়েছে।[২২৫]

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আমরা মীযান তথা মানুষের আমলগুলো মাপার যন্ত্র দাঁড়িপাল্লার উপরও ঈমান রাখি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের আমলসমূহ মাপার জন্য বিশাল আকারের একটি দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾

"কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লাসমূহ স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম যুলুম করা হবে না। যার তিল পরিমাণ আমল থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসাব গ্রহণ করার জন্য আমিই যথেষ্ট"। (সূরা আম্বীয়া: ৪৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾

"অতঃপর যখনই শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাও করবেনা। সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে এমন সব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল"। *(সূরা মুমিনূন: ১০১-১০৩)*

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলেমগণ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন হিসাব-নিকাশ শেষ হবে, তখন বনী আদমের আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা আমলসমূহ ওজন করা হবে বদলা দেয়ার জন্য। তাই তা হিসাব-নিকাশের পরেই আমলের ওজন হওয়া বাঞ্চনীয়। বান্দা তার আমলসমূহ করেছে কিনা, তা স্বীকার করানোর জন্য হিসাব-নিকাশ হবে। আর ওজন করা হবে তার পরিমাণ প্রকাশ করার জন্য। যাতে করে সেই অনুপাতে বদলা দেয়া যায়। ইমাম কুরতুবী আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

"কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লাসমূহ স্থাপন করবো" সূরা আম্বিয়া :৪৭। এতে বুঝা যায় যে, সেখানে এমন অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা থাকতে পারে, যাতে

[২২৫] যঈফ: সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৩৪১৩।

বান্দার আমলসমূহ ওজন করা হবে। এও হতে পারে যে, দাঁড়িপাল্লা তথা ওজন করার যন্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত আমল উদ্দেশ্য, যা ওজন করা হবে। মীযান তথা 'দাঁড়িপাল্লা'কে বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করার দ্বারা ওজনযোগ্য বিভিন্ন প্রকার আমল উদ্দেশ্য'; এমনটি নয় যে, সেখানে বহু সংখ্যক দাঁড়িপাল্লা থাকবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

ছ্বহীহ সুন্নাতসমূহ প্রমাণ করে যে, যেই দাঁড়িপাল্লা দ্বারা বান্দার আমলসমূহ ওজন করা হবে, তার দু'টি পাল্লা থাকবে। বাস্তবেই দু'টি পাল্লা হবে এবং তা দেখা যাবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) আবু আব্দুর রাহমান আল-হুবালী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার উম্মতের একজন লোকের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকা হবে এবং তার সামনে ৯৯টি রেজিষ্টার বই খোলা হবে। চোখের দৃষ্টি যত দূর যায়, ততদূর লম্বা হবে এক একটি রেজিষ্টার। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি কি এ সমস্ত আমল থেকে কোনো কিছু অস্বীকার করতে পারবে? আমার পক্ষ হতে নিযুক্ত আমল সংরক্ষণকারী সম্মানিত লেখকগণ কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! না। কোন কিছুই অস্বীকার করতে পারবোনা। তাকে বলা হবেঃ তোমার কোনো ওযর-আপত্তি আছে কি? অথবা তোমার কোন নেকী আছে কি? তখন লোকটি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে থাকবে, না, আমার কোন নেক আমল নেই। অতঃপর বলা হবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমাদের কাছে তোমার একটি নেকী রয়েছে। তোমার উপর কোন প্রকার যুলুম করা হবে না। অতঃপর তার জন্য একটি কার্ড বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তখন ফেরেশতাদেরকে বলবেন, লোকটিকে উপস্থিত করো। লোকটি তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এত বিশাল বিশাল বইগুলোর সামনে এই কার্ডটির কোন মূল্য আছে কি? তখন তাকে বলা হবে, তোমার উপর কোন রকম যুলুম করা হবে না। এ কথা বলার পর রেজিষ্টারগুলো রাখা হবে এক পাল্লায় এবং কার্ডটি রাখা হবে আরেক পাল্লায়। এতে বইগুলোর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে এবং কার্ডটির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামের সাথে কোন জিনিসের ওজনই হবে না"।[২২৬] ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে আবীদ্ দুনয়া লাইছ থেকে এভাবেই এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী একটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, কোন জিনিসই আল্লাহর নামের চেয়ে অধিক

---

[২২৬] তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিজী হাদীছটি বর্ণনা করার পর ছ্বহীহ বলেছেন। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ও হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/১৩৫।

হাদীছে বর্ণিত আল্লাহর রহমত কেবল তার বেলায় প্রযোজ্য হবে যার প্রতি আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করবেন। এটা একান্তই আল্লাহ অনুগ্রহ। কাজেই উল্লেখিত রহমতের আশায় ইবাদত-বন্দেগী না করে বসে থাকা মোটেই উচিত নয়।

ভারী হবে না।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। তখন একজন লোককে এনে মীযানের (দাঁড়িপাল্লার) এক পাল্লায় রাখা হবে...।

এই বর্ণনায় এক বিরাট ফায়দা রয়েছে। এতে রয়েছে যে, আমলের সাথে সাথে আমলকারীকেও ওজন করা হবে। ছ্বহীহ বুখারীতে এই কথার সমর্থনে হাদীছ রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ». وَقَالَ: اقْرَءُوا ﴿فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾. (بخارى:٤٧٢٩)

কিয়ামতের দিন একজন মোটা মানুষ উপস্থিত হবে। অথচ আল্লাহ্র কাছে একটি মশার ডানার সমানও তার ওজন হবে না। তারপর তিনি বলেন, তোমরা চাইলে আল্লাহ্র এই বাণীটি পড়তে পারো ﴿فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ "সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন ওজনই দাঁড় করাবো না। অর্থাৎ তাদের আমলসমূহ ওজনই করবো না"। (সূরা কাহাফ: ১০৫)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরাক বৃক্ষের একটি মিসওয়াক বহন করতেন। তার পায়ের নলা ছিল খুবই সরু। একদা বাতাস তাকে ডানদিকে ও বামদিকে সরিয়ে দিতে লাগল। এতে ছাহাবীগণ হাসতে লাগলেন। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তোমরা কি কারণে হাসছ? তারা বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পায়েল চিকন নলা দেখে হাসছি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, ঐ আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তার পায়ের নলা দু'টি কিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়েও অধিক ভাড়ী হবে।

হাদীছে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং আমলগুলোকেই মাপা হবে। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে আবু মালেক আল আশআরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পবিত্রতা ঈমানের অংশ। আর আল-হামদুলিল্লাহ কিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দিবে"।[২২৭]

ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ

[২২৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২২৩।

اللَّهِ الْعَظِيمِ». (بخارى:٧٥٦٣)

“এমন দু’টি বাক্য আছে, যা দয়াময় আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়, উচ্চারণ করা খুবই সহজ, দাঁড়িপাল্লায় হবে খুব ভারী। বাক্য দু’টি হলো سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ আমি প্রশংসা সহকারে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। এটি ছ্বহীহ বুখারীর সর্বশেষ হাদীছ।

হাফেয আবু বকর বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন বনী আদমকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে মীযানের দুই পাল্লার মাঝখানে দাঁড় করানো হবে এবং তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। তার নেকীর পাল্লা যদি ভাড়ী হয়, তাহলে সেই ফেরেশতা এমন উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, সমস্ত মাখলুক তার আওয়াজ শুনতে পাবে। ফেরেশতা এই বলে ঘোষণা করবে যে, অমুক ব্যক্তি এমন সৌভাগ্যবান হয়েছে যে, সে আর কখনো হতভাগ্য হবে না। আর যদি নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যায়, তাহলে ফেরেশতা এই বলে এমন উচুঁ আওয়াজে ঘোষণা করবে যে, অমুক ব্যক্তি এমন হতভাগ্য হয়েছে যে, সে আর কখনো সৌভাগ্যবান হবে না।[২২৮]

সুতরাং উপরোক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বান্দার আমলসমূহ ওজন করা হবে। সুতরাং নাস্তিকদের কথার প্রতি কর্ণপাত করা যাবে না। তারা বলে আমল যেহেতু স্বয়ং অস্তিত্বশীল এবং কায়া ও আকৃতি বিশিষ্ট কোনো জিনিস নয়, তাই তা ওজন করার অযোগ্য। তারা আরো বলে, কায়া, আকৃতি ও অস্তীত্বশীল ও স্বনির্ভর বস্তুই কেবল ওজন করা যায়। তাদের কথার কোন মূল্য নেই। কেননা আল্লাহর পক্ষে কায়া, আকৃতি ও অস্তীত্বহীন বস্তুকে কায়া দান করা মোটেই কঠিন নয়। যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মওতকে সাদাকালো মিশ্রিত রঙের একটি ভেড়ার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে রেখে যবেহ করা হবে। বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! এই ডাক শুনে তারা মাথা উঁচু করে তাকাবে। জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করেও বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! তারাও মাথা উঁচু করে তাকিয়ে দেখবে। তারা মনে করবে সম্ভবত এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অতঃপর মওতকে যবেহ করা হবে এবং বলা হবে, সকলকেই চিরকাল জীবিত থাকতে হবে। আর কারো মৃত্যু হবে না।[২২৯] ইমাম বুখারীও এই অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

---

[২২৮] মাওযূ বা জাল হাদীছ: আবু নুআইম হিলইয়াতুল আওলীয়ায় (৬/১৭৪) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হাদীছের অন্যতম রাবী দাউদ বিন মাহবার মিথ্যা হাদীছ রচনার অভিযোগে অভিযুক্ত।

[২২৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৭৩০।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল যে, বনী আদমের আমলগুলো ওজন করা হবে। আমলকারীকেও ওজন করা হবে। যেই পুস্তকে আমল লিখা হয়েছে, তাও ওজন করা হবে। আরো প্রমাণিত হলো যে, মীযানের দু'টি পাল্লাও থাকবে। তবে এ সবের ধরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন।

আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে গায়েবী বিষয়সমূহে ঠিক সেভাবেই ঈমান আনয়ন করা যেভাবে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন। এতে কোন প্রকার বাড়ানো বা কমানো যাবে না।

আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে কিয়ামতের দিন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করাকে অস্বীকার করে। অথচ এ বিষয়ে সত্যবাদী নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন। দাঁড়িপাল্লা স্থাপনের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই তারা এটিকে অস্বীকার করেছে এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত আয়াত ও হাদীছসমূহে এই বলে আঘাত করেছে যে, ফেরী ওয়ালা ও মুদীর দোকানদারের জন্যই কেবল দাঁড়িপাল্লার দরকার। এ সব লোকই ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কোন ওজন প্রতিষ্ঠিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলা তার সকল বান্দার জন্য আদল প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ করার জন্যই আমলসমূহ ওজন করবেন। আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক উযর-আপত্তি কবুলকারী অন্য কেউ নেই। এ জন্যই তিনি সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং দাঁড়িপাল্লা স্থাপনের মধ্যে এমন সব হিকমত রয়েছে, যার সবগুলো আমরা অবগত নই।

হে প্রিয় পাঠক! আপনি ফেরেশতাদের কথার মধ্যে চিন্তা করুন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে বললেন,

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা সৃষ্টি করতে চাই। তখন তারা বললো, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান যে সেখানে ফাসাদ করবে এবং রক্তপাত করবে? আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা তো আমরা করেই যাচ্ছি। আল্লাহ বললেন আমি জানি যা তোমরা জানো না"। *(সূরা আল বাকারা: ৩০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৮৫)*

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাওয সম্পর্কে আলোচনা করার সময় ইমাম কুরতবীর উক্তি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হাওযে কাওছার হবে দাঁড়িপাল্লা স্থাপনের পূর্বে। আর দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করার পর হবে পুলসিরাত।

ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, মমিনগণ যখন পুলসিরাত পার হবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে আরেকটি পুলের উপর তাদেরকে আটকানো হবে। সেখানে পারস্পরিক যুলুমের বদলা নেওয়া হবে। তাদেরকে সেখানে পারস্পরিক যুলুম থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে।[২৩০]

ইমাম কুরতুবী এই পুলকে শুধু মমিনদের জন্য অন্য একটি পুলসিরাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। এখান থেকে কেউ কেটে পড়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে না। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

(৮৮) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد

আমরা আরো ঈমান রাখি যে, জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্বেই সৃষ্ট করা হয়েছে। এ দু'টি কোনো দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না এবং ক্ষয়প্রাপ্তও হবে না। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামকে অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্য বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যাকে ইচ্ছা তার পক্ষ হতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। প্রত্যেকেই সেই কাজ করবে যা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানেই সে যাবে। ভাল ও মন্দ উভয়ই বান্দার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

.....

ব্যাখ্যা: আহলে সুন্নাতের সকল আলেমের মতে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দু'টি এখানো প্রস্তুত রয়েছে। মুতাযিলা ও কাদরীয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আহলে সুন্নাতের লোকগণ এই আক্বীদার উপরই ছিল। পরবর্তীতে মুতাযিলা ও কাদরীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা এই বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করবেন। তাদের ভ্রান্ত মূলনীতিই তাদেরকে কথা বলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের ভ্রান্ত মূলনীতির মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার কর্মের

[২৩০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৫৩৫।

উপর আপত্তি উত্থাপন করেছে। তারা বলেছে, আল্লাহর উচিত ছিল এ রকম করা, এ রকম করা আল্লাহর জন্য উচিত হয়নি ইত্যাদি আরো অনেক কথাই তারা বলেছে। বান্দার কাজ-কর্মের উপর কিয়াস করে তারা এ কথা বলেছে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর কর্মকে বান্দার কর্মের সাথে তুলনা করে ফেলেছে। তাদের মধ্যে এই দরজা দিয়েই জাহমীয়া আক্বীদাহ প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ মাখলুকের মধ্যে যেসব গুণ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে সেসব গুণকে তারা এই অযুহাতে সরিয়ে ফেলেছে যে, আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করা হলে তাতে খালেকের সাথে মাখলুকের (স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির) তুলনা হয়ে যায়। সুতরাং তারা প্রথমে আল্লাহর সিফাতকে বান্দার সিফাতের উপর কিয়াস করেছে এবং পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে সেসব সিফাতকে বাতিল করে দিয়ে মুআত্তিলা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।

মুতাযিলারা আরো বলেছে, বদলা ও প্রতিদান নির্ধারণ করার পূর্বে জান্নাত তৈরী করা নিরর্থক। এতে বহুদিন পর্যন্ত জান্নাত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা আবশ্যক হয়। মুতাযিলারা আল্লাহ তা'আলার জন্য যেই ভ্রান্ত ও বাতিল শরী'আত (যুক্তি) নির্ধারণ করেছে, তার পরিপন্থী হওয়ার কারণে তারা কুরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট দলীলগুলো প্রত্যাখ্যাণ করেছে এবং কুরআন-হাদীছের দলীলগুলোকে তারা যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। সেই সাথে তারা তাদের মূলনীতির বিরোধীতা কারীদেরকে গোমরাহ ও বিদ'আতী বলেছে।

জান্নাত যে এখনো প্রস্তুত আছে, কুরআন থেকে তার দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন,

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"তোমরা দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে আল্লাহভীরু লোকদের জন্য। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৩৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

"দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেইসব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল"। *(সূরা আল হাদীদ: ২১)* আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

"তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৩১)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلطَّاغِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾

"আসলে জাহান্নাম প্রতিক্ষায় রয়েছে। বিদ্রোহীদের আবাস স্থল হিসাবে। সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে"। *(সূরা আন নাবা: ২১-২৩)* আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾

"তিনি তাকে আরেকবার দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। যার সন্নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত"। *(সূরা আন নাজম: ১৩-১৫)*

মিরাজের রাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহা দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছে জান্নাতুল মাওয়া দেখেছেন। ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিম শরীফে ইসরা ও মিরাজের ঘটনায় আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। হাদীছের শেষাংশে এসেছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর জিবরীল আমাকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট নিয়ে গেলেন। দেখলাম, এমন সব রং তাকে ঢেকে ফেলছে, যা আমি বলতে পারবো না।[২৩১] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, অতঃপর আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। দেখলাম জান্নাতের ছাদ হচ্ছে মুক্তার তৈরী। আর তার মাটি হচ্ছে কস্তুরী দ্বারা নির্মিত।[২৩২]

ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে তার আবাসস্থল পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতের অধিবাসী

---

[২৩১] সিদরাতুল মুনতাহা তথা শেষ প্রান্তের বড়ই গাছকে কিসে ঢেকে ফেলছিল বা সেখানে কি অবতরণ করছিল, সে বিষয়ে একাধিক কথা পাওয়া যায়। (১) কেউ কেউ বলেছেন যে, স্বর্নের প্রজাপতি অথবা ফড়িং সেখানে বসছিল এবং উঠছিল। তবে এই কথার পক্ষে কোন দলীল নেই। (২) কেউ কেউ বলেছেন, পাখীর আকারে ফেরেশতাগণ সেখানে অবতরণ করছিল। এই কথা সঠিক হতে পারে। কারণ এটিই হচ্ছে উপরের দিকে ফেরেশতাদের সর্বশেষ স্থান। এর উপরে তারা যেতে পারে না। (৩) কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর নূর গাছের উপর প্রকাশিত হচ্ছিল। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিদরাতুল মুনতাহার কাছে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা গাছের উপর স্বীয় নূর ছেড়েছিলেন। যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম)এর জন্য আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর নূর ছেড়েছিলেন। কিন্তু পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অথচ সিদরাতুল মুনতাহা বা সীমান্তের কুলবৃক্ষ পুড়ে যায়নি। কারণ সেই গাছের গঠন পাহাড়ের গঠনের চেয়ে অধিক মজবুত। আল্লাহর নূরের দিকে তাকিয়ে মূসা (আলাইহিস সালাম) বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেহুশ হননি। কারণ তার গঠন মূসা (আলাইহিস সালাম) এর গঠনের চেয়ে অধিক মজবুত ও তার ধারণ ক্ষমতা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর চেয়ে অধিক। (আল্লাহই অধিক জানেন)

[২৩২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৩৪২, মুসলিম হা/১৬৩, কিতাবুল ঈমান।

হয়ে থাকে, তাহলে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয়। আর জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে থাকলে প্রতিদিন তাকে তার জাহান্নামের ঠিকানা দেখানো হয়। বলা হয়, এটিই তোমার ঠিকানা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এখানে পাঠাবেন।[২৩৩]

বারা বিন আযিবের হাদীছ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আসমান থেকে একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করবে যে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাত পর্যন্ত একটি দরজা খুলে দাও। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর জান্নাতের সুঘ্রাণ ও খোশবু তার কাছে আসতে থাকবে।[২৩৪] বারা বিন আযিবের হাদীছের অর্থেই আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছটি একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

ছ্বহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একদা সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। সেই হাদীছে রয়েছে যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদেরকে যেসব বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে- এই স্থানে দাঁড়িয়ে আমি তার সবই দেখেছি। তোমরা যখন দেখলে, আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছি, তখন আমি মনে করছিলাম যে, আমি জান্নাতের ফলসমূহ থেকে এক থোকা ফল ছিড়ছি। আর তোমরা যখন দেখলে, আমি পিছনের দিকে সরে আসছি, তখন আমি জাহান্নামকে দেখতে পেয়েছি যে, তার এক অংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলছে।[২৩৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একদা সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। এই হাদীছে রয়েছে যে, লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা দেখলাম, আপনার স্থানে দাঁড়িয়ে আপনি কি যেন ধরতে যাচ্ছেন!! এরপর দেখলাম, আপনি পিছনে সরে আসছেন। তিনি তখন বললেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে জান্নাত দেখতে পেয়েছি। আমি জান্নাতের ফলের একটি থোকাও সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। আমি যদি তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হতাম, তাহলে তা থেকে তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত খেতে পারতে। আমি জাহান্নামও দেখতে পেয়েছি। আমি আজ জাহান্নামের যেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি, সেরকম ভয়াবহ দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীই হচ্ছে মহিলা। ছাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী কারণে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা। তিনি তখন বললেন, তাদের কুফুরীরর কারণে। বলা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফুরী করে? তিনি বললেন, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং স্বামীর ইহসান ও অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো জন্য সারা জীবন খরচ করো

[২৩৩] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৭৯, মুসলিম হা/২৭৬৬, কিতাবুল জান্নাহ।

[২৩৪] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৭৫৩, ছ্বহীহ জামে হা/১৬৭৬।

[২৩৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১২১২, মুসলিম হা/৯০১।

অতঃপর সে যদি তোমার পক্ষ হতে সামান্যতম ত্রুটি পায়, তখন বলে উঠেঃ আমি তোমার কাছ থেকে কখনো ভালো কিছু পাইনি।[২৩৬]

ছ্বহীহ মুসলিম শরীফে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি যা দেখছি, তোমরা যদি তা দেখতে তাহলে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কী দেখেছেন। জবাবে তিনি বললেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।[২৩৭]

মুআত্তা, সুনানের কিতাবসমূহ এবং মুসনাদে কা'ব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ القيامة»

"মুমিন ব্যক্তির 'রূহ' পাখীর আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষরাজিতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিচরণ করতে থাকে"।[২৩৮]

এই হাদীছে সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসের পূর্বেই রূহ জান্নাতে প্রবেশ করে।

ছ্বহীহ মুসলিম, সুনানের কিতাবসমূহ এবং মুসনাদে আহমাদে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ اذهب فانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَذهب فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ فقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بِالجنة فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ فانظر إِلَيْهَا وإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَنظر إليها ثم رَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خشيت أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ ثم أرسله إلى النار قال اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا قال فنظر إليها فإذا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ثم رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَدخلها أَحَدٌ سمع بها. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ ثم قَالَ اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا»

---

[২৩৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১৯৭, মুসলিম হা/৯০৭।

[২৩৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/ ৪২৬।

[২৩৮] ছ্বহীহঃ মুসনাদে আহমাদ, হা/ ১৬১৯১, নাসাঈ, হা/২০৭২। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন শাইখের তাহকীকসহ মেশকাতুল মাসাবীহ, হা/ ১৬৩২

"আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরীলকে বললেন, তুমি জান্নাতের দিকে যাও, তাতে দৃষ্টি দাও এবং আমি তাতে তার অধিবাসীদের জন্য যা তৈরী করেছি, তা দেখে আসো। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর জিবরীল জান্নাতে গেলেন, তাতে দৃষ্টি দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য তাতে যা তৈরী করে রেখেছেন, তাও দেখলেন। ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের শপথ! যে কেউ জান্নাতের বিবরণ শুনবে, সেই তাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর জান্নাতের ব্যাপারে আদেশ দেয়া হলো এবং তাকে কষ্টসাধ্য আমল দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে পুনরায় বললেন, তুমি আবার যাও। তুমি তা দেখো এবং তাতে তার অধিবাসীদের জন্য যেসব নিয়ামত তৈরী করে রেখেছি, তার প্রতি দৃষ্টি দাও। অতঃপর জিবরীল তা দেখে ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের শপথ! আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এত কষ্টসাধ্য আমল করে তাতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে জাহান্নামে পাঠালেন। পাঠানোর সময় বললেন, তুমি সেখানে যাও, তাতে দৃষ্টি দাও এবং তার অধিবাসীদের জন্য যেই আযাব তৈরী করে রেখেছি, তার প্রতি দৃষ্টি দাও।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর জিবরীল জাহান্নামের নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, জাহান্নামের এক অংশ তার অন্য অংশের উপর উঠে যাচ্ছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাছে ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের শপথ! যে কেউ তার ভয়াবহ আযাবের কথা শুনবে, সে কখনোই তাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর জান্নাতের ব্যাপারে আদেশ করা হলো এবং তাকে শাহওয়াত বা প্রবৃত্তির কাম্য বস্তু দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি আবার যাও এবং তাতে তার অধিবাসীদের জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছি, তাতে দৃষ্টি দাও। জিবরীল গেলেন এবং তাতে দৃষ্টি দিলেন। ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের শপথ! তাতে প্রবেশ না করে কেউ মুক্তি পাবে না।[২৩৯]

ছ্বহীহ সুন্নাতে এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই এখন প্রস্তুত রয়েছে।

যারা বলে কুরআন ও হাদীছে যেই জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তা হচ্ছে ঐ জান্নাত, যাতে আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন। অতঃপর তাকে সেখান থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জান্নাত এখনো তৈরী আছে। তবে এতে রয়েছে সুপ্রসিদ্ধ মতভেদ।

যারা বলে জান্নাত এখনো তৈরী হয়নি, তাদের সন্দেহ হচ্ছে, জান্নাত যদি এখন প্রস্তুত থাকে, তাহলে কুরআন ও সুন্নার দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য সৃষ্টির

[২৩৯] হাসান: তিরমিযী হা/২৫৬০, ছ্বহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব হা/৩৬৬৯।

সাথে তাও ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়; জান্নাতে যেই নিয়ামত আছে, তা ধ্বংস হওয়া আবশ্যক হয় এবং যারা এখন তাতে রয়েছে, তাদেরও মৃত্যু আবশ্যক হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র আল্লাহর চেহারা (সত্তা) ছাড়া। হুকুম একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তারই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে"। *(সূরা কাসাস: ৮৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾

"প্রত্যেক নাফ্সকেই মরতে হবে"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৮৫)*

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসরা ও মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমার পক্ষ হতে তোমার উম্মতকে সালাম বলো। তাদেরকে বলে দাও যে, জান্নাতের মাটি হচ্ছে পবিত্র, তার পানি খুব সুমিষ্ট এবং তার ময়দান সমতল ও খুবই প্রশস্ত। তাতে বৃক্ষ রোপন হচ্ছে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ।[২৪০] ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীছটি হাসান ও গরীব। তিরমিযীতে আবুয জুবাইর জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণনা করেছেন যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।[২৪১] হাদীছটি হাসান, ছ্বহীহ।

মুতাযিলা বলেছে, জান্নাত যদি এখন প্রস্তুত থাকতো, তাহলে তা সমতল প্রশস্ত রাখা এবং তাতে বৃক্ষ লাগানোর কোন অর্থ হতো না। তারা আরো বলে, ফেরাউনের স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, সে বলেছিল,

﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"হে আমার রব, আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও। আমাকে ফেরাউন ও তার কাজকর্ম থেকে রক্ষা করো এবং যালেম কওমের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও"। (সূরা তাহরীম: ১১)

---

[২৪০] হাসান: তিরমিযী হা/৩৪৬২, সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/ ১০৫।

[২৪১] ছ্বহীহ: তিরমিযী, হা/৩৪৬৪, সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/ ৬৪।

তাদের জবাবে আমরা বলবো যে, হে মুতাযিলা সম্প্রদায়! তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, কবর থেকে মানুষেরা যেমন এখনো উঠেনি এবং ইসরাফীল ফেরেশতা যেমন সিঙ্গায় এখনো ফুঁ দেয়নি, জান্নাতও ঠিক তেমনি এখনো প্রস্তুত নেই, তাহলে তোমাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। পূর্বের দলীলগুলো এবং আরো অনেক দলীল তোমাদের কথাকে বাতিল সাব্যস্ত করে।

আর যদি তোমাদের কথার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য জান্নাতের সকল নিয়ামত তৈরী করে শেষ করেননি; বরং আল্লাহ তা'আলা প্রতিনিয়ত সেখানে একটির পর একটি নিয়ামত সৃষ্টি করেই যাচ্ছেন এবং মুমিনগণ যখন সেখানে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রবেশের সময় আরো অনেক জিনিস তৈরী করবেন, তাহলে তোমাদের কথা ঠিকই আছে। তাদের উদ্দেশ্য এটি হলে, তা প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই। ভাষ্যকার মুতাযিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের দলীলসমূহ বড়জোর এই কথার প্রমাণ বহন করতে পারে। আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সত্তা ছাড়া। হুকুম একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তারই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে" *(সূরা কাসাস: ৮৮)* দ্বারা যেই দলীল গ্রহণ করেছো, তার জবাবে আমরা বলবো যে, তোমরা খুব মন্দভাবেই আয়াতের অর্থ বুঝেছ। জান্নাত ও জাহান্নাম এখন প্রস্তুত না থাকা প্রমাণ করতে গিয়ে তোমরা ঠিক সেই রকম দলীলই পেশ করেছ, যেমন দলীল পেশ করেছে তোমাদের অনুরূপ লোকেরা জান্নাত বিলীন হওয়া, তার অধিবাসী থেকে তা খালী হওয়া এবং তার অধিবাসীদের সকলেই মৃত্যু প্রমাণ করার জন্য। সুতরাং তোমরা এবং তোমাদের ভাইয়েরা আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। মুসলিম মিল্লাতের ইমামগণই কেবল আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

"প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হয়ে যাবে", ইমামগণ এই কথার একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন,

(১) এখানে প্রত্যেক বস্তু বলতে এমন প্রত্যেক বস্তু উদ্দেশ্য, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিলীন ও ধ্বংস হওয়া নির্ধারণ করেছেন। আর জান্নাত ও জাহান্নাম চিরকাল থাকার জন্য সৃষ্টি করেছেন; ধ্বংস হওয়ার জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলার আরশ ধ্বংস হবে না। কারণ তা হচ্ছে জান্নাতের ছাদ।

(২) কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে; তবে আল্লাহর রাজত্ব ধ্বংস হবে না।

(৩) কেউ কেউ বলেছেন, সকল বস্তুই বিলীন হবে। তবে যেসব বস্তু দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, ঐ সব বস্তু ধ্বংস হবে না।

(৪) কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন এই আয়াত নাযিল করলেন যে, ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হবে, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, যমীনের বাসিন্দারা অবশ্যই ধ্বংস হবে। তারা চিরকাল বেচে থাকার আকাঙ্খা প্রকাশ করলো। তখন আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, আসমান ও যমীনের সকল প্রাণীই মারা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র আল্লাহর চেহারা (সত্তা) ছাড়া"। (সূরা কাসাস: ৮৮) কেননা আল্লাহ তা'আলা হচ্ছে চির জীবন্ত, তিনি কখনো মরবেন না। তখন ফেরেশতাগণ নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিলেন যে, তারাও মরে যাবেন।

যেসব আয়াত ও হাদীছে বলা হয়েছে যে, সবকিছুই ধ্বংস হবে এবং যেসব দলীল প্রমাণ করে যে জান্নাত ও জাহান্নাম চিরদিন থাকবে- এই উভয় প্রকার দলীল একসাথে মিলিয়ে আলেমগণ বলেছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তু ধ্বংস হবে। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছায় যা ধ্বংসের বাইরে রাখবেন, তাও ধ্বংস হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে, ইনশা-আল্লাহ।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম কখনো ফানা হবে না এবং কখনো তা ধ্বংসও হবে না। এটিই হচ্ছে সালাফদের ও পরবর্তী যামানার অধিকাংশ ইমামের অভিমত।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের আরেক জামা'আত লোক বলেছে যে, জান্নাত চিরকাল থাকবে এবং জাহান্নাম এক সময় শেষ হয়ে যাবে। তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ের কিতাবসমূহে এই দু'টি মত বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মুআত্তিলা ও জাহমীয়া সম্প্রদায়ের ইমাম জাহাম বিন সাফওয়ান বলেছে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। ছাহাবী, উত্তমভাবে তাদের অনুসরণকারী তাবেয়ী এবং মুসলিমদের ইমামদের মধ্য হতে কেউ জাহামের মত সমর্থন করেননি। এমনকি আহলে সুন্নাতের কোন আলেমও এ রকম কথা বলেননি। আহলে সুন্নাতের সকল আলেম তার এই কথার কারণে তাকে কাফের বলেছে এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই তার ও তার অনুসারীদের প্রতিবাদ করেছে। জাহাম বিন সাফওয়ানের বাতিল মূলনীতিতে বিশ্বাস করেই তারা এই কথা বলেছে। তার সেই বাতিল মূলনীতিটি হচ্ছে امتناع وجود ما لايتناهى من الحوادث অর্থাৎ এমন কোন সৃষ্টি থাকা অসম্ভব, যার কোন শেষ নেই। অর্থাৎ সকল সৃষ্টিই ধ্বংস হবে। নিকৃষ্ট তর্কশাস্ত্রবিদদের এটিই হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হওয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ দলীল। এর মাধ্যমেই তারা দলীল গ্রহণ করেছে যে, অস্তিত্বশীল সকল বস্তুই সৃষ্টি এবং পরিবর্তনশীল সকল বস্তুই ধ্বংস হবে। অর্থাৎ অস্তীত্বশীল বস্তুগুলো আগে থেকেই ছিল

না; বরং নির্দিষ্ট একটি সময়ে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টিজগৎ প্রথমে ছিল না; বরং পরে তা সৃষ্টি করা হয়েছে- এই কথার পক্ষে কালামশাস্ত্র বিদদের সর্বোচ্চ দলীল হচ্ছে, **"এমন কোনো সৃষ্টি থাকা অসম্ভব, যার কোনো শেষ নেই"**। সুতরাং জাহাম বিন সাফওয়ান মনে করেছে যে, অতীতে যেমন প্রারম্ভহীন সৃষ্টি ছিল না, সে রকমই ভবিষ্যতেও অন্তহীন কোন সৃষ্টি থাকবে না। সুতরাং তার মতে ভবিষ্যতে সদাসর্বদা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করতেই থাকবেন অর্থাৎ তার সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে- এমনটি নয়। যেমন অতীতে তিনি একাই ছিলেন, কোনো সৃষ্টি ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেমন আদিতে একাই ছিলেন, কোন সৃষ্টি ছিল না, সে সবরকম ভবিষ্যতেও তিনি একাকী হবেন। কোন সৃষ্টিই থাকবে না। জান্নাত ও জাহান্নাম যেমন আগে ছিল না, পরে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এ দু'টি বস্তুও এক সময় ধ্বংস হবে!!!

মুতাযিলাদের উস্তাদ আবুল হুযাইল আল আল্লাফ জাহামের তৈরী মূলনীতির সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছে। তবে সে বলেছে যে, জাহামের এই মূলনীতির দাবী হচ্ছে সৃষ্টিজীবের সকল নড়াচড়া ও চলাচল এক সময় বন্ধ এবং শেষ হয়ে যাবে। তাই জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদের জীবনের গতিও থেমে যাবে ও নিঃশেষ হবে। পরিশেষে তারা চিরদিনের জন্য স্থবির হয়ে যাবে। তাদের কেউ কোন নড়াচড়া করতে পারবে না।

অতীতে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অবিরাম চলকে থাকা না থাকার ব্যাপারে দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতভেদ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে সবসময় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করতেই থাকা বা আল্লাহর সৃষ্টি অবিরামভাবে চলতে থাকার মাসআলা। আল্লাহ তা'আলা অতীতের সব সময়ে প্রতিপালক এবং যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম ছিলেন, বর্তমানেও সেভাবেই আছেন এবং ভবিষ্যতেও তিনি চির জীবন্ত, সকল সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত এবং যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করতে সক্ষম থাকবেন। সুতরাং এটি অসম্ভব যে, অতীতে আল্লাহ তা'আলা কোন কাজ করতে সক্ষম ছিলেন না, অতঃপর নতুন কিছু সৃষ্টি হওয়া ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। অতীতে আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না, যেখানে তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার আগে আল্লাহ তা'আলা কাজ করতে সক্ষম ছিলেন না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার জন্য এই ধরণের কল্পনা করা সম্পূর্ণ বাতিল।

জান্নাত চিরকাল থাকবে এবং তা কখনো ধ্বংস হবে না- এটি একটি জানা বিষয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক ছ্বহীহ হাদীছে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾

"আর যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন

পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান। এমন পুরস্কার তারা পাবে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না"। *(সূরা হুদ: ১০৮)*

অর্থাৎ বিরতিহীনভাবে তাদের জন্য জান্নাতের নিয়ামত জারী থাকবে। এই কথা এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী: "তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান"-এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

'যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে' আল্লাহ তা'আলা এই কথা বলার পর বলেছেন, 'তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান'- এই কথার ব্যাখ্যায় আলেমগণ অনেক কথাই বলেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তবে জাহান্নামে তারা যতদিন অবস্থান করবে ততদিন ব্যতীত। এই কথা কেবল ঐসব মুমিন লোকদের বেলাতেই প্রযোজ্য হতে পারে, যারা পাপের কারণে প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে। সকল জান্নাতী মুমিনদের বেলায় এই ব্যাক্য প্রযোজ্য নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, যতক্ষণ তারা হাশরের মাঠে অবস্থান করবে, সেই সময়টুকু ব্যতীত তারা অবিরাম আরাম-আয়েশের মধ্যেই থাকবে।

কেউ কেউ বলেছেন, কবর ও হিসাব-নিকাশের জন্য হাশরের মাঠে যতক্ষণ অবস্থান করবে সেই সময় ব্যতীত, তারা আর কখনো জান্নাতের বাইরে থাকবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী: সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা করবেন না। এই কথা হচ্ছে ঠিক সেই রকম যেমন আপনি বলে থাকেন, والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে মারবোই, তবে যদি অন্য কিছু মনে করি সে কথা ভিন্ন। অথচ আপনি অন্য কিছু মনে করেন না; বরং কেবল মারার জন্যই সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, কতিপয় নাহু শাস্ত্রবিদদের মতে এখানে إلا হরফে ইস্তেসনাটি وَ (এবং) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং তোমার রব যদি তাদেরকে আরো কিছু দিতে চান, তাও সেখানে থাকবে। ইমাম সিবওয়াই বলেন, এখানে إلا হরফে ইস্তেসনাটি لكن অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসাবে এখানে إلا হরফে ইস্তেসনাটি مستثنى منقطع এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে ইল্লা-এর পরের বিষয়টি তার পূর্বের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ তারা চিরকাল জান্নাতের নেয়ামতের মধ্যেই থাকবে। কোন দিনই তাদের থেকে জান্নাতী নিয়ামত বিচ্ছিন্ন হবে না। ইমাম ইবনে জারীর এই কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদার খেলাফ করেন না। আল্লাহ তা'আলা যা চান তা ব্যতীত- একথা বলার পর উল্লেখ করেছেন, عَطَاءً

غَيْرَ مَجْذُوذٍ "এমন পুরস্কার তারা পাবে, যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে জান্নাতীদের থেকে জান্নাতের নিয়ামত কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। যারা এই মত পোষণ করেছেন, তাদের কথা হচ্ছে এটি ঠিক সে রকম যেমন আপনি বললেন, أسكنتك داري حولا إلا ما شئت আমি তোমাকে আমার বাড়িতে একবছর থাকতে দিবো। তবে আমি অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন। অর্থাৎ এ ব্যতীত আরো কিছু সময় বেশী থাকতে দিলে সেটি আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। এই কথা আপনি তখনই বলেন, যখন আপনি এক বছরের চেয়ে বেশী সময় থাকতে দেয়ার ইচ্ছা করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে মুমিনদেরকে বলা হয়েছে যে, যদিও তারা জান্নাতে চিরকাল থাকবেন, তারপরও বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। তারা কখনোই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে যেতে পারবে না। এই ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলার ঐ কথার বিরোধী নয়, যেখানে তিনি দৃঢ়তার সাথে মুমিনদেরকে চিরকাল জান্নাতে রাখার ওয়াদা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾

"আর হে মুহাম্মদ! আমি চাইলে তোমার কাছ থেকে সবকিছুই ছিনিয়ে নিতে পারতাম, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিয়েছি, তারপর তুমি আমার মুকাবিলায় কোনো সহায়ক পাবে না যে, তা ফিরিয়ে আনতে পারে"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ৮৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার দিলের উপর মোহর মেরে দিতেন"। *(সূরা আশ শূরা: ২৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

"বলো, যদি এটিই হতো আল্লাহর ইচ্ছা তাহলে আমি এ কুরআন তোমাদের কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করবে না"? *(সূরা ইউনুস: ১৬)*

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে এই কাজগুলো করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। এই রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা হয়। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন না, তা হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ما شاء ربك এর মধ্যে ما শব্দটি من অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সৌভাগ্যবানদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ ছাড়া আরো অনেক কথাই বলা হয়েছে। সর্বোপরি আয়াতে বর্ণিত ইস্তেসনাটি মুতাশাবেহ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "সৌভাগ্যবানগণ এমন পুরস্কার পাবে, যার ধারাবাহিকতা তাদের থেকে কখনো ছিন্ন হবে না'-এটি হচ্ছে মুহকাম। এমনি আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ﴾

"এ হচ্ছে আমার রিযিক, যা কখনো শেষ হবে না"। (সূরা ছ্বদ: ৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ﴾

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত থাকবে, তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং তার ছায়ার বিনাশ নেই"। *(সূরা রা'দ: ৩৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾

"সেখানে তাদের না কোনো পরিশ্রম করতে হবে আর না তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে"। *(সূরা আল হিজর: ৪৮)*

কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা জোর দিয়ে বলেছেন যে, মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, জান্নাতীগণ ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ "সেখানে দুনিয়ার মৃত্যু ব্যতীত কখনো আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না।

এখানের ইস্তেছনাটিও মুস্তাছনা মুনকাতে। এ ইস্তেছনাকে যদি আল্লাহর বাণী: إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ "তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান" *সূরা হুদ :১০৮।* -এর মধ্যকার ইস্তেছনার সাথে মিলানো হয়, তাহলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপরোক্ত উভয় আয়াতের অর্থ হলো জান্নাতীগণ জান্নাতে যেই চিরকালীন জীবন যাপন লাভ করবে, তা থেকে শুধু ঐ সময়টুকু আলাদা করা হয়েছে, যে সময়টুকু তারা জান্নাতের বাইরে কাটাবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: জান্নাতীগণ ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ সেখানে দুনিয়ার মওত ব্যতীত কখনো আর কোন মৃত্যুর স্বাদ চাখবে না, এখানেও সকল প্রকার মৃত্যু হতে শুধু দুনিয়ার মৃত্যুকে আলাদা করা হয়েছে। সুতরাং চিরস্থায়ী জীবন লাভ করার

পূর্বে তারা দুনিয়ার এই মৃত্যুর স্বাদ চেখেছে। এমনি জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়ার আগে সৌভাগ্যবাণ মুমিনগণ পাপের কারণে জান্নাত থেকে কিছুকাল বিচ্ছিন্ন থাকবে।

জান্নাত চিরকাল বিদ্যমান থাকবে এবং তা কখনোই ধ্বংস হবে না। এ ব্যাপারে ছ্বহীহ সুন্নাতে অনেক দলীল রয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ ويخلد ولا يموت»

"যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে চিরকাল নিয়ামত ভোগ করবে এবং কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করবে না। জান্নাতে সে চিরকাল থাকবে এবং কখনো মৃত্যু বরণ করবে না।[২৪২] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا»

"কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে, কখনোই অসুস্থ হবে না এবং চিরকাল যুবক থাকবে, কখনোই বৃদ্ধ হবে না। এখানে তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনোই মৃত্যু বরণ করবেনা। এখানে তোমরা চিরকালই নিয়মাতের মধ্যে থাকবে, কখনোই দুর্দশাগ্রস্ত হবে না।"[২৪৩]

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে রেখে মওতকে যবেহ করার হাদীছ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে রয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে, কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না। জাহান্নামীদেরকেও ডাক দিয়ে বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে, কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না।

জান্নাত ও জাহান্নামের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আলেমদের মতভেদঃ

জাহান্নাম চিরকাল বিদ্যমান থাকবে কি না- এ ব্যাপারে লোকেরা ৮টি মত প্রকাশ করেছে।

(১) যে ব্যক্তি জাহান্নামে একবার প্রবেশ করবে, তারা কখনোই সেখান থেকে বের হতে পারবে না। তারা যেহেতু জাহান্নামে চিরকাল থাকবে, তাই জাহান্নামও চিরকাল থাকবে। খারেজী ও মুতাযিলারা এ মত পোষণ করে থাকে।

---

[২৪২] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৬, কিতাবুল জান্নাহ।

[২৪৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৭, কিতাবুল জান্নাহ।

(২) জাহান্নামের অধিবাসীরা প্রথমে সেখানে শাস্তি ভোগ করবে। অতঃপর তাদের স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে আগুনের স্বভাবে পরিণত হবে এবং এই অবস্থাতেই তারা চিরকাল থাকবে। ফলে তাদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট আগুনের বৈশিষ্টে পরিণত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা আগুন দ্বারা স্বাদ উপভোগ করবে। এটি হচ্ছে সুফীদের মধ্যে যারা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তাদের ইমাম ইবনে আরাবীর অভিমত।

(৩) জাহান্নামের অধিবাসীরা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত আযাব ভোগ করবে। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। তারা বের হয়ে আসলে তাদের স্থলে অন্য একদল লোক বাস করবে। ইয়াহূদীরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই কথা বর্ণনা করেছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে মিথ্যুক বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে মিথ্যুক বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"তারা বলে, জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, তবে কয়েক দিনের শাস্তি হলেও হয়ে যেতে পারে। এদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অঙ্গীকার নিয়েছো, যার বিরুদ্ধাচারণ তিনি করতে পারেন না? অথবা তোমরা যা জানো না তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছো। যে ব্যক্তিই পাপ কাজ করবে এবং পাপের জালে জড়িয়ে পড়বে সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে চিরকাল"। *(সূরা আল বাকারা: ৮০-৮১)*

(৪) জাহান্নামীদের সকলেই তা থেকে বের হয়ে আসবে। তারপর জাহান্নাম খালী পড়ে থাকবে। তাতে কোন মাখলুক থাকবে না।

(৫) জাহান্নাম নিজে নিজেই ফানা হয়ে যাবে। কারণ তা হচ্ছে সৃষ্ট বস্তু। যে জিনিসটি সম্পর্কে জানা যাবে যে, তা সৃষ্টি, তা স্থায়ী হওয়া অসম্ভব। এটি হচ্ছে জাহাম বিন সাফওয়ান ও তার দলের লোকদের কথা। তার নিকট জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। উভয়ই ধ্বংস হবে।

(৬) জাহান্নামের অধিবাসীদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা জড়পদার্থে পরিণত হবে। এতে করে তারা আযাবের আর কোন কষ্ট অনুভব করবে না। এটি হচ্ছে আবুল হুযাইল আল আল্লাফের উক্তি। এটিও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(৭) আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ইচ্ছা, তাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন। যেমন ছ্বহীহ সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর যতদিন ইচ্ছা তা বহাল রাখবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। মেয়াদ শেষে তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(৮) আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সেখান থেকে বের করবেন। যেমন ছুহীহ সুন্নাতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। শুধু কাফিরেরাই সেখানে অবস্থান করতে থাকবে, তাদের অবস্থানের সময় শেষ হবে না।

শেষের ৭ ও ৮ নং মত দু'টি ব্যতীত বাকী মতগুলো সুস্পষ্ট ভুল। এ দু'টি মতের পক্ষে দলীল রয়েছে। এই দলীলগুলোর মধ্যে দৃষ্টি দেয়া দরকার।

যারা বলে জাহান্নামও এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

"আগুনই তোমাদের ঠিকানা। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল। তা থেকে রক্ষা পাবে একমাত্র তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের রব জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন"। *(সূরা আল আনআম: ১২৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾

"যখন সেদিন আসবে তখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান। সুতরাং যারা দুর্ভাগ্যবান তারা জাহান্নামে যাবে তারা চীৎকার ও আর্তনাদ করতে থাকবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তবে যদি তোমার রব অন্য কিছু করতে চান। অবশ্যই তোমার রব যা চান তা পূর্ণ করেন"। *(সূরা হুদ: ১০৬-১০৭)*

জাহান্নামে হত্যভাগ্যদের আযাবের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে যে ইস্তেছনা এসেছে, তারপর এমন কোন বিষয় উল্লেখ করা হয়নি, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে জান্নাতীদের ব্যাপারে ইস্তেছনার পর। জান্নাতীদের আলোচনার পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "এমন পুরস্কার তারা পাবে, যা কখনো ছিন্ন হবে না। সূরা হুদ: ১০৮। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾"সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে"। *(সূরা নাবা: ২৩)*

জান্নাত চিরকাল থাকবে এবং জাহান্নাম যে এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে, এই কথাটি উমার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবদ ইবনে হুমাইদ তার প্রসিদ্ধ তাফসীরে স্বীয় সনদে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, 'আলিজ' নামক বালুর টিলার মধ্যে যে পরিমাণ বালু আছে জাহান্নামীরা যদি

জাহান্নামে সে পরিমাণ সময়ও অবস্থান করে, তারপরও এমন একটি দিন আসবে যেদিন তারা সেখান থেকে বের হবে।[২৪৪]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ "সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে"। *(সূরা নাবা: ২৩)*-এর ব্যাখ্যায় উপরোক্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আলেমগণ বলেছেন, জাহান্নাম আল্লাহর ক্রোধ আর জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর রহমত।

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করে শেষ করলেন, তখন একটি কিতাব লিখে তা আরশের উপর তার নিকট রেখে দিলেন। তাতে লিখা ছিল, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়যুক্ত হয়েছে।[২৪৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার রহমত আমার ক্রোধকে পরাজিত করেছে। ইমাম বুখারী তার ছ্বহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

যারা মনে করেন, জাহান্নাম এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা আরো বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আযাবের ব্যাপারে এই সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তা এক বিশাল দিনের আযাব (সূরা আল আনআম: ১৫)। তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তা এক যন্ত্রনা দায়ক দিনের আযাব। (সূরা হুদ: ২৬ এবং তিনি সূরা হজ্জের ৫৫ নং আয়াতে তিনি আরো বলেছেন যে, "তাদের উপর নাযিল হয়ে যাবে একটি ভাগ্যাহত দিনের শাস্তি"। জান্নাতের ব্যাপারে কুরআনের কোন স্থানেই এ কথা বলা হয়নি যে, তা হবে এক দিনের নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾

"শাস্তি তো আমি যাকে চাই তাকে দিয়ে থাকি। কিন্তু আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের উপর পরিব্যপ্ত হয়ে আছে"। *(সূরা আল আরাফ: ১৫৬)* আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

"তারা বলে, হে আমাদের রব, তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। তাই যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করছে তাদেরকে মাফ করে দাও এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো"। *(সূরা মুমিন: ৭)*

---

[২৪৪] যঈফ: ফাতহুল ক্বাদীর ২/৫২৭, দেখুন: শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাখরীজ ও তাহকীকসহ শারহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া।

[২৪৫] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৭৪২২, মুসনাদে আহমাদ।

সুতরাং আযাব ভোগকারী এই লোকদের জন্য আল্লাহর রহমত প্রশস্ত হওয়ার আবশ্যক। তারা যদি নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ ব্যতীত চিরকাল আযাবের মধ্যেই থাকে, তাহলে তো আল্লাহর রহমত তাদেরকে শামিল করল না।

ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিনটির পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছর।[২৪৬] এই দীর্ঘ সময়ে যারা আযাব ভোগ করবে, গুনাহ অনুপাতে তাদের আযাবও বিভিন্ন রকম হবে। সর্বোত্তম ফায়ছালাকারীর ফায়ছালা এবং সর্বাধিক রহমকারীর রহমতের দাবী এটি নয় যে, তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে চিরকাল এমন শাস্তি দিবেন, যার কোন শেষ নেই।

আর কিছু মাখলুক সৃষ্টি করে তাদেরকে নেয়ামতের মধ্যে রাখবেন এবং চিরকাল তাদের উপর রহমত করবেন- এটিই হিকমতে ইলাহীর দাবী। আল্লাহ তা'আলা মূলতই সকল সৃষ্টির প্রতি ইহসান তথা অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন। আর শাস্তি দেয়া বা প্রতিশোধ নেয়া সাধারণত বিশেষ পাপের কারণে হয়ে থাকে।

আর যেসমস্ত আয়াত ও হাদীছে বলা হয়েছে যে, জাহান্নীরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, সেখান থেকে বের না হওয়া এবং জাহান্নামের আযাব অনন্তকাল চলতেই থাকবে ও তা কখনো বন্ধ হবে না- তা সত্য সমর্থিত। এতে কোন মতভেদ নেই। এর অর্থ হচ্ছে যতদিন আযাবের ঘর বাকী থাকবে, ততদিন তাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

জাহান্নামের মধ্যে আযাব চালু থাকা অবস্থায় কেবল তাওহীদপন্থীরাই তা থেকে বের হবে। জেলখানা থেকে যে ব্যক্তি নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করে বের হয়ে আসে এবং যে ব্যক্তি জেলখানা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে বের হয়ে আসে তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

আর যারা বলে জান্নাতের ন্যায় জাহান্নামও চিরকাল থাকবে এবং তা কখনো ফানা হবে না, তাদের দলীলগুলো হচ্ছে,

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾

তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তা তারা পারবে না। তাদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে"। *(সূরা আল মায়িদা: ৩৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾

[২৪৬]. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৮৭।

"আর অপরাধীরা তারা চিরদিন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। তাদের আযাব কখনো কম করা হবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ অবস্থায় পড়ে থাকবে"। *(সূরা যুখরুফ: ৭৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾

"তোমরা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করো। আমি তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিছুই বাড়াবো না"। *(সূরা আন নাবা: ৩০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

"আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য উৎক্ষিপ্ত আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল, তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না" *(সূরা আল আহযাব: ৬৪-৬৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ} [الْحِجْرِ: ٤٨]

এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। *(সূরা হিজর:৪৮)*

﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

"তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হতে পারবে না"। *(সূরা আল বাকারা: ১৬৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ ﴾

"তাদের জান্নাতে প্রবেশ এমনই অসম্ভব ব্যাপার যেমন সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করানো"। *(সূরা আল আরাফ: ৪০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ ﴾

"আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের অস্তিত্ব খতম করে দেয়া হবে যাতে তারা মরে যাবে এবং না তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব কিছু কমানো হবে"। *(সূরা ফাতির: ৩৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

"জাহান্নামের আযাব তো সর্বনাশা"। *(সূরা আল ফুরকান: ৬৫)*

(২) অনেক প্রসিদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করবে, সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে। তাওহীদপন্থী পাপী মুমিনগণের জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার বিষয়টি শাফাআতের হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণিত। কবীরাহ গুনাহ এর কারণে

যেসব মুমিন জাহান্নামে যাবে, এই হুকুমটি শুধু তাদের জন্য খাস। কাফেররাও যদি বের হয়, তাহলে তারাও তো মুমিনদের পর্যায়ে হয়ে গেল এবং জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার বিষয়টি শুধু মুমিনদের জন্য খাস থাকলো না। জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়া তার নিজস্ব ক্ষমতা বলে নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা এ দু'টিকে চিরস্থায়ী রাখবেন বলেই চিরকাল বহাল থাকবে।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

"আর এটি একটি অকাট্য সত্য যে, বহু জিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মত বরং পশুর চেয়েও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে"। *(সূরা আল আরাফ: ১৭৯)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ»

"একদা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আনসারী গোত্রের একজন শিশুর জানাযা ছ্বলাত পড়ার জন্য ডাকা হলো। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তখন আমি বললাম, এই শিশুটির জন্য সুখবর। এই শিশুটি জান্নাতের চড়ুইসমূহের একটি চড়ুই। সে কোন পাপ কাজ করেনি এবং তার পাপ কাজের বয়সও হয়নি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, হে আয়েশা! এর ব্যতিক্রমও তো হতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য এমন কিছু মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, যারা এখনো তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশেই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য এমন কিছু মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, যারা এখনো তাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশেই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ এবং নাসাঈ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৪৭]

[২৪৭] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৬২।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

"আমি মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। অতঃপর আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী"। *(সূরা দাহার: ২-৩)*

এখানে হিদায়াত দ্বারা বিশেষ কোন পথ দেখানো কিংবা বিশেষ কোন গোষ্টিকে পথ দেখানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ হিদায়াত উদ্দেশ্য। এর চেয়ে আরো ব্যাপকার্থবোধক হিদায়াত হচ্ছে, যা আল্লাহ তা'আলা সূরা তোহার ৫০ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾

"মূসা জবাব দিল, আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন"। (সূরা তোহা: ৫০)

আল্লাহর সৃষ্টি মোট দু'প্রকার।

(১) যা স্বীয় তবীয়ত ও সৃষ্টিগত স্বভাব দ্বারাই আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও বাধ্যগত। আল্লাহর হুকুমের বাইরে যাওয়ার কোন ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। যেমন পাহাড়-পর্বত, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি।

(২) যা স্বীয় ইচ্ছা শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন মানুষ, জিন ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার সৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা যেই জন্য সৃষ্টি করেছেন কিংবা যেই স্বভাব তার জন্য নির্ধারণ করেছেন, তিনি তাকে সেই পথে চলার জন্য রাস্তা দেখিয়েছেন। এরা সেই পথেই চলে। সেই পথের বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা তাদের নেই।

আর দ্বিতীয় প্রকার সৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা এমন হিদায়াত করেছেন (পথ দেখিয়েছেন) যাতে চলার জন্য ইচ্ছা শক্তি ব্যয় করতে হয়। আর সেই ইচ্ছাটি তার অনুভূতি ও জ্ঞান অনুযায়ীই পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কোন্ কাজটি তার জন্য উপকারী এবং কোন্টি তার জন্য ক্ষতিকর, তা সে জানতে পারে ও জেনে বুঝেই সে তা সম্পন্ন করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় প্রকার (বিবেক সম্পন্ন) সৃষ্টিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে এক প্রকার সৃষ্টি শুধু ভালো কাজের ইচ্ছাই করে। তারা কখনোই খারাপ কাজের ইচ্ছা করে না। যেমন ফেরেশতাগণ। আরেক প্রকার সৃষ্টি রয়েছে, যারা শুধু

অকল্যাণের ইচ্ছাই করে। অকল্যাণ ও ক্ষতি ছাড়া এরা অন্য কিছু করে না। যেমন শয়তান। আরেক প্রকার সৃষ্টি রয়েছে, যার দ্বারা ভাল-মন্দ উভয়ের ইচ্ছাই হয়ে থাকে। যেমন জিন ও মানুষ। অতঃপর তিনি মানুষকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) এক প্রকার মানুষের ঈমান, আল্লাহর মারেফত এবং সুবুদ্ধি কুপ্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করে। ফলে সে ফেরেশতাদের পর্যায়ে পৌছে যায়।

(২) আরেক প্রকার মানুষ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে এরা শয়তানের সাথে মিলিত হয়।

(৩) আর তৃতীয় প্রকার মানুষ হচ্ছে এমন মানুষ, যাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর পাশবিক কাম-ভাব ও স্বভাব-চরিত্র জয়লাভ করে। ফলে এরা পশুর পর্যায়ে চলে যায়।

মোট কথা বিবেক সম্পন্ন ও বিবেকহীন- এই উভয় প্রকার সৃষ্টিকেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়কে নিজ নিজ পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টি নেই, আল্লাহর হিদায়াত ছাড়া আর কোন হিদায়াত নেই এবং আল্লাহর শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষাও নেই। এ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা, তার তাওহীদ এবং তার রুবুবীয়াতের সুস্পষ্ট দলীল ও নিদর্শন।

অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত ও অনুগহে জান্নাতে রাখবেন আর যাকে ইচ্ছা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাহান্নামে রাখবেন। এখানে বিশেষভাবে একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, ছাওয়াব (বিনিময় ও প্রতিদান) পাওয়ার কারণ পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা কাউকে ছাওয়াব থেকে মাহরুম করবেন না। আর আমলে সালেহ না করাই হচ্ছে ছাওয়াব না পাওয়ার কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

"আর যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তবে যদি সে মুমিন হয়, তাহলে এই ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দু মাত্র যুলুম করা হবে না"। *(সূরা আন নিসা: ১২৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾

"আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে এবং সেই সাথে সে মুমিনও হবে তার প্রতি কোন যুলুম বা অধিকার হরণের আশংকা নেই"। *(সূরা তোহা: ১১২)*

এমনি শাস্তি দেয়ার কারণ না পাওয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾

"তোমাদের উপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন" *(সূরা আশ শূরা: ৩০)*

সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই দানকারী এবং তিনিই প্রতিহতকারী। তিনি যা দান করেন, কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না এবং তিনি যা প্রতিহত করেন, কেউ তা দান করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও সৎ আমলের কারণে যখন মানুষের উপর অনুগ্রহ করবেন, তখন সেই অনুগ্রহের ফলে যা দিবেন, মূলত তার কোন প্রতিহতকারী নেই; বরং তিনি চক্ষু শীতলকারী এমন ছাওয়াব দান করবেন, যা কোন চোখ দিয়ে কেউ কোন দিন দেখেনি, যার বিবরণ কান দিয়ে কেউ কোনদিন শুনেনি এবং যা মানুষ হৃদয় দিয়ে কল্পনাও করতে পারে না। তিনি যখন কাউকে এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন, তখন তা পাওয়ার কারণ না থাকার কারণেই বঞ্চিত করবেন। আর সেই কারণটি হচ্ছে আমলে সালেহ।

কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। এ সবকিছুই তার হিকমত ও আদলের কারণেই। কাউকে যদি জান্নাতে যাওয়ার সেই কারণগুলো তথা আমলে সালেহ করার তাওফীক না দেন, তাও তার হিকমত ও আদলের কারণেই।

তবে সৎ আমল করার পর তাতে যে প্রতিদান আবশ্যক হয়, তা কখনো তিনি প্রতিহত করেন না। অন্যথায় সৎ আমল পাওয়া গেলেও সেগুলো সঠিক না হওয়ার কারণে তিনি তার বিনিময় প্রদান করেন না। আমল সঠিক ও কবুল না হওয়ার একাধিক কারণ থাকতে পারে। ভুল পদ্ধতিতে করার কারণে আমলটি বাতিল হতে পারে কিংবা অন্য এমন কারণেও আমল বাতিল হতে পারে, যা বিনিময় পাওয়ার প্রতিবন্ধক। যেমন আমলে ইখলাস না থাকা!! সুতরাং বিনিময় পাওয়ার দাবী না থাকার কারণে অথবা তা পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক থাকার কারণেই আমল করেও অনেক মানুষ ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

আর ঈমান না আনার কারণে এবং সৎ আমল সম্পন্ন না করার কারণে কাউকে যখন ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত করা এবং শাস্তি প্রদান করা হয়, তখন তাকে শুরুতেই এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ছাওয়াব পাওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত করা হয়।[২৪৮] সুতরাং উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক এবং

---

[২৪৮] মূলত আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও অনুগ্রহেই মুমিনগণ আল্লাহর আনুগত্য করার সুযোগ পেয়ে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করেন বলেই তারা সৎ আমল করতে পারে এবং সঠিক পথে অটল থাকতে পারে। আল্লাহর রহমত ও তার দয়া-অনুগ্রহের কারণেই তারা পরকালে জান্নাতের অধিকারী হবে। আর যারা সৎ পথ হতে বিচ্যুত হয়, তারা আল্লাহর তাওফীক ও হিদায়াত না পাওয়ার কারণেই কুফুরী ও পাপের পথে অগ্রসর হয় এবং শাস্তির হকদার হয়। এটিও আল্লাহর হিকমত ও আদলের (ন্যায় বিচারের) কারণেই হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমতটি কী, তা নিশ্চিত করে কোন মানুষ বলতে পারে না। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা কাউকে তা জানান না। সেটি জানার চেষ্টা করারও দরকার নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো কিছু মানুষকে তা বুঝিয়ে থাকেন।

তিনি সকল অবস্থাতেই প্রশংসিত। আল্লাহ তা'আলা যা দেন, তা তার অনুগ্রহের কারণেই দেন এবং যেই শাস্তি তিনি দেন, তা তার ইনসাফের কারণেই।

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন হাকীম। তিনি প্রত্যেক বিষয়কে তার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১২৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

"তাদের সামনে কোন আয়াত এলে তারা বলে, আল্লাহর রাসূলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তা আমাদের দেয়া হয় ততক্ষণ আমরা ঈমান আনয়ন করবো না। আল্লাহ নিজের রিসালাত কাকে দিবেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই সর্বাধিক অবগত আছেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ৫৩ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾

"আসলে আমি এভাবে মানুষের মধ্য থেকে এক দলকে আরেক দলের দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা এদেরকে দেখে বলে, এরা কি সেসব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? এ রকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে। সামনে এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসছে ইনশা-আল্লাহ।

বিষয়টি সহজভাবে বুঝানোর জন্য কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন কুরাইশ নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি আবু তালিবের ঈমান না আনা এবং কিয়ামতের দিন তার শাস্তি ভোগ করার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। সম্ভবত তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হিকমতটি এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বাপ-দাদাদের দীনের উপর রেখেই তার দ্বারা তার প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজত করবেন এবং মুসলিমদের চরম বিপদের সময় এমন কল্যাণ সাধন করবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে লিখা থাকবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আবু তালেবের দ্বারা ইসলামের বিরাট উপকার হয়েছে। এটি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু সে যেহেতু তার ভাতিজার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, তাই আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারের কারণেই পরকালের নিয়ামত তার ভাগ্যে জোটবে না।

এমনি বিষয়টিকে আরো খোলাসা করে বুঝানোর জন্য খিযির (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক মিসকীন লোকদের নৌকা ছিদ্র করে ফেলা ও একজন নিরপরাদ শিশুকে হত্যা করার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। এর পিছনে আল্লাহ তা'আলার কি হিকমত লুকায়িত ছিল- মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রথমে বুঝতে পারেননি বলেই তিনি খিযির (আলাইহিস সালাম) এর কাজের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। পরক্ষণেই খিযির (আলাইহিস সালাম) স্বীয় কর্ম-কান্ডের হিকমত খোলাসা করে বলে দিয়েছেন। মূলত শুধু শুধু ক্ষতির জন্যই আল্লাহ তা'আলার কোন কর্ম সংঘটিত হয় না। আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজের পিছনেই কোন কোন হিকমত ও কল্যাণ থাকে। আল্লাহ অযথা কোন কিছু সৃষ্টি করেন না এবং তার কোন কর্মও হিকমত ছাড়া সংঘটিত হয় না। যা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারি না। তবে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক কর্মের হিকমত অনুসন্ধান করা এবং এমন বলা ঠিক নয় যে, কেন এমন হলো? কেন এমনটি হলোনা? কেননা এই ধরণের প্রশ্ন অকল্যাণ ও গোমরাহীর পথ উন্মুক্ত করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ "তার কাজের জন্য কারো সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে। তাই আমাদের সকল অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক।

(৮৯) অতঃপর ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

যে শক্তি দ্বারা বান্দা কর্ম সম্পাদন করা হয় এবং যেটি আল্লাহর তাওফীকের অন্তর্ভুক্ত, তা কোনো বান্দার গুণ হতে পারে না। সেটি কর্ম বাস্তবায়ন করার সময় বিদ্যমান থাকে। এ প্রকার শক্তি কেবল আল্লাহরই গুণ। (এটি আল্লাহ তার আনুগত্যশীল বান্দাকেই দিয়ে থাকেন)।

আর যে শক্তি ও সামর্থ্য বলতে বান্দার সুস্থতা, কাজ করার মত শক্তি, সক্ষমতা, আমল করার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা বুঝায়, তা কর্ম শুরু করার পূর্বেই বিদ্যমান থাকা জরুরী। এটা বান্দার মধ্যে বিদ্যমান থাকলেই বান্দার উপর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ প্রযোজ্য হয়। নতুবা নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفسًا إِلَّا وُسعَهَا﴾

"তিনি কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না"। *(সূরা আল বাকারা: ২৮৬)*

.....

ব্যাখ্যা: استطاعة (সামর্থ্য), الطاقة (শক্তি), القدرة (ক্ষমতা) এবং الوسع (সাধ্য) এই শব্দগুলো সমার্থবোধক। কর্ম সম্পাদন করার জন্য বান্দার মধ্যে যেই শক্তি-সামর্থ্য থাকা দরকার, তা দুই প্রকার। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এটিই আহলে সুন্নাত ও মধ্যপন্থী দলের সকল আলেমের অভিমত।

কাদরীয়া এবং মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছে, কাজ শুরু করার পূর্বেই বান্দার মধ্যে কাজের শক্তি থাকা আবশ্যক। এর বিপরীতে আহলে সুন্নাতের একদল লোক বলেছে, কাজ শুরুর করার সময় বান্দার মধ্যে কাজ করার শক্তি অর্জিত হয়।

আর আহলে সুন্নাতের সকল আলেমের অভিমত হচ্ছে, বান্দার মধ্যে কর্ম সম্পাদন করার শক্তি ও ক্ষমতা থাকে। এ শক্তি ও ক্ষমতা থাকে বলেই তাকে কোন কাজের আদেশ দেয়া যুক্তি সঙ্গত হয় কিংবা তাকে কোন কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম করা যথার্থ হয়। কাজ শুরু করার আগেই শক্তি-সামর্থ্য থাকা আবশ্যক; শুরু করার সাথে সাথে বান্দার মধ্যে তা তৈরি হওয়ার জরুরী নয়। আর কাজ সম্পাদন করার মূহূর্তে যেই শক্তি দ্বারা বান্দা

কাজটি সম্পাদন করে, কাজ শুরু করার সময় তা বিদ্যমান থাকা জরুরী। কাজ করার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার কল্পনাও করা যায় না।[২৪৯]

এখন কথা হচ্ছে, যেই প্রকার শক্তি ও সামর্থ্য বলতে বান্দার সুস্থতা, কাজ করার মত শক্তি, সক্ষমতা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা বুঝায়, তা কর্ম শুরু করার পূর্বেই বিদ্যমান থাকা জরুরী। বান্দার এ প্রকার শক্তির কথা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾

---

[২৪৯] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বান্দার মধ্যে যখন আমলে সালেহ সম্পাদন করার সামর্থ্য, শক্তি, উপায়-উপকরণ, মাধ্যম অর্জিত হয় এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও নিরাপদ থাকে, তখন বান্দা কাজটি করবে কিনা, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সে আল্লাহর পথে চলবে? না কি স্বীয় প্রবৃত্তি ও শয়তানের পথে অগ্রসর হবে? এ রকম একাধিক বিষয় তার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। পরিশেষে যখন শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তার ইচ্ছা ও শক্তিকে এক আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে তখন আনুগত্যের কাজ তথা আমলে সালেহ সম্পাদন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য ও শক্তি আসে। এই প্রকার সাহায্য, সামর্থ্য ও শক্তিকেই বলা হয় আল্লাহর তাওফীক। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহর গুণ। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার আনুগত্যশীল বান্দাদেরকে সাহায্য করেন। এর আগে উপায়-উপকরণ এবং কাজ করার জন্য যেসব মাধ্যম বান্দার জন্য অর্জিত হয়, তা বান্দার গুণ। আল্লাহর তাওফীকে সৎ আমল শুরু করার পূর্বেই তা বিদ্যমান থাকা জরুরী।

অপর পক্ষে চিন্তা-ভাবনা করার পর যদি বান্দা আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের প্রতি তার ইচ্ছা ও শক্তিকে পরিচালিত না করে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য (তাওফীক) আসে না। ফলে তার দ্বারা সৎ আমল করাও সম্ভব হয় না। তাই দেখা যাচ্ছে অনেক লোকের কাছে অঢেল সম্পদ থাকার পরও হজ্জ করতে পারে না, যাকাতও দেয় না এবং শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার পরও ছুলাত পড়ে না এবং ছিয়ামও রাখে না। ঈমানের দাওয়াত কান দিয়ে শ্রবণ করা ও অন্তর দিয়ে বুঝার পরও ঈমান আনয়ন করেনা। আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য না থাকার কারণেই তারা তা করতে পারে না। আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য না আসার কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও শক্তি তৈরি করে রেখেছেন, তাকে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের দিকে পরিচালিত না করার কারণেই। কোন কোন তর্কবাজ লোক পাপ কাজ করে অযথা তাকদীর দিয়ে খোঁড়া অযুহাত পেশ করে এবং বলে সব কিছু যদি তাকদীরের লিখন অনুযায়ী হয়, তাহলে পাপের কারণ শাস্তি হবে কেন? অথচ কিয়ামতের দিন যখন জান্নাতীগণ জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন,

﴿ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾

"তোমাদেরকে কিসে সাকারে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে: আমরা ছুলাত পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম; এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম; মৃত্যু আগমণ পর্যন্ত আমরা এসব কাজেই লিপ্ত ছিলাম"। (সূরা মুদ্দাছছির: ৪২-৪৭)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কিয়ামতের দিন জাহান্নামীরা ভাগ্যের লিখনকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ মনে করবেনা। তারা সেদিন উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, জান্নাতবাসীদের ন্যায় সৎ আমল না করে তারা ভুল করেছে। বিবেক খাটিয়ে আমল না করার কারণে কেবল নিজেদেরকেই দোষারোপ করবে। কিন্তু দোষারোপ করেও সেদিন কোন লাভ হবে না। অতএব দুনিয়াতে জীবিত থাকাবস্থায় তাকদীর দিয়ে যুক্তি পেশ করে স্বেচ্ছায় পরকালের অংশ নষ্ট করা বোকামি।

"এবং আল্লাহর জন্য কাবা গৃহের হজ্জ করা সেসব মানুষের উপর ফরয, যারা শারিরীক ও আর্থিকভাবে কাবা পর্যন্ত পৌছঁতে সক্ষম এবং কেউ যদি হজ্জ করতে অস্বীকার করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৯৭)*

সুতরাং যার সামর্থ্য ও ক্ষমতা আছে তার উপর আল্লাহ তা'আলা হজ্জ ফরয করেছেন। যদি বলা হয় যে, হজ্জ করার আগে তা করার সামর্থ্য অর্জিত হয় না; বরং হজ্জ করার সময়ই তা অর্জিত হয়, এতে আবশ্যক হয় যে, হজ্জ কেবল ঐ ব্যক্তির উপরই ওয়াজিব, যে হজ্জ করেছে কিংবা হজ্জ করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করেছে। সুতরাং সামর্থ্যবান ব্যক্তি হজ্জে বের না হলে কিংবা হজ্জ না করলে গুনাহ্গার হবে না। এটি একটি সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী কথা। এমনি আল্লাহ তা'আলার বাণী: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "তাই যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো"। *(সূরা আত তাগাবুন: ১৬)*

সুতরাং সামর্থ্য ও সাধ্যানুপাতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর তাকওয়া আবশ্যক করেছেন। আল্লাহকে ভয় করতে সামর্থবান ব্যক্তি যদি আল্লাহকে ভয় না করে, তাহলে এটি আবশ্যক হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেছে, তার উপরই কেবল ভয় করা আবশ্যক। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে সক্ষম লোক যদি ভয় না করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। এই কথাটিও বাতিল।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ "যে ব্যক্তি একটানা দুই মাস ছিয়াম রাখার সামর্থ্য রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার দেবে"। (সূরা মুজাদালাহ: ৪)

এখানে সামর্থ্য বলতে তা পালন করার উপায়-উপকরণ, শরীর সুস্থ থাকা এবং মাধ্যমকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৪২ নং আয়াতে মুনাফেকদের কথা ব্যক্ত করে বলেন, ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ "তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, যদি আমরা বের হওয়ার সামর্থ্য রাখতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে চলতাম। তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ ভালো করেই জানেন তারা মিথ্যাবাদী"।

আল্লাহ তাদেরকে এই আয়াতে মিথ্যুক বলেছেন। যেই সামর্থ্য এবং উপায়-উপকরণ থাকলে বের হওয়া যায়, তারা যদি তা উদ্দেশ্য করতো, তাহলে তাদের মধ্যে তা নেই বললে তাদেরকে মিথ্যুক বলা হতো না। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাদেরকে মিথ্যুক বলেছেন, তাতে বুঝা গেল যে, তাদের কথার মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধি উদ্দেশ্য করেছে অথবা আল্লাহর রাস্তায় বের হলে মাল খরচ করতে হবে- এ জন্যই তারা ছলনা করে বলেছে, 'সাধ্য থাকলে আমরা বের হতাম'। অর্থাৎ তাদের সাধ্য ছিল; কিন্তু তাদের অন্তরে

মুনাফেকী থাকার কারণে সেই সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, যা আল্লাহর তাওফীক অর্থে ব্যবহৃত। যে প্রকার استطاعة শক্তি-সামর্থ্য উপায়-উপকরণ ও কাজ করার জন্য শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা না থাকার কারণে কেউ যদি আমল করতে অক্ষম হয়, তাকে দোষারোপ করা হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"দুর্বল ও রুগ্ন লোকেরা এবং যেসব লোক জিহাদে শরীক হবার জন্য পাথেয় পায় না, তারা যদি পিছনে থেকে যায় তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই, যখন তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী হবে। এ ধরনের সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবকাশই নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। অনুরূপভাবে তাদের বিরুদ্ধে ও অভিযোগের কোন সুযোগ নেই যারা নিজেরা এসে তোমার কাছে আবেদন করেছিল, তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে, কিন্তু তুমি বলেছিলে আমি তোমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না। তখন তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গিয়েছিল। তখন তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং নিজেদের অর্থ ব্যয়ে জিহাদে শরীক হতে অসমর্থ হবার দরূন তাদের মনে বড়ই কষ্ট ছিল। অবশ্যই অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে যারা বিত্তশালী হবার পরও জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চাচ্ছে। তারা পিছিয়ে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকাই পছন্দ করেছে। আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তারা কিছুই বুঝতে পারে না"। (সূরা তাওবা: ৯১-৯৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তার উচিত তোমাদের অধিকারভুক্ত মুমিন দাসীদের মধ্য থেকে কাউকে বিয়ে করে নেয়া"। *(সূরা আন নিসা: ২৫)*

এখানেও সামর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহ করার জন্য উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম ঠিক থাকা। তাওফীক উদ্দেশ্য নয়। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমরান বিন হুসাইনকে বলেছেন,

«صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

"তুমি দাঁড়িয়ে ছ্বলাত পড়ো। দাঁড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য না থাকলে বসে ছ্বলাত পড়ো। বসে পড়ার সামর্থ্য না থাকলে এক পার্শ্বের উপর শুয়ে ছ্বলাত পড়ো"।[২৫০] এখানেও দাঁড়িয়ে ও বসে ছ্বলাত পড়ার সামর্থ্যকেই নাকচ করা হয়েছে।

আর যে সামর্থ্যটি প্রকৃত পক্ষে তাওফীক অর্থে ব্যবহৃত, তার দলীল হিসাবে আলেমগণ আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾

"তারা (আল্লাহর কথা) শুনতেও পারতো না এবং তারা নিজেরা (আল্লাহর নিদর্শন) দেখতেও পেতো না"। *(সূরা হুদ: ২০)*

এখানে এটি বলা হয়নি শুনার উপায়-উপকরণ এবং কান ও চোখ না থাকার কারণে তারা শুনতে পায়নি। বরং শুনার সামর্থ্য ও শক্তি না থাকার কারণেই তারা শ্রবণ করা ও দেখা থেকে মাহরুম হয়েছে, যা তাওফীক অর্থে ব্যবহৃত। কেননা শ্রবণ করার ও দেখার যন্ত্র তাদের ছিল। শাইখের উক্তি لايطيقون إلا ما كلفهم আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর যা আবশ্যক করেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু করতে তারা সক্ষম নয়"- এ অংশের ব্যাখ্যা করা সময় এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

মূসা আলাইহিস সালাম এর সফর সঙ্গী খিযির আলাইহিস সালাম মূসাকে লক্ষ করে বলেছিলেন,

﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ "সে বললো, আপনি আমার সাথে সবর করতে পারবেন না"। (সূরা কাহাফ: ৬৭) আল্লাহ তা'আলা এই সূরার ৭২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ "সে বললো, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না?"

এখানে সবর করা বলতে তার শক্তি উদ্দেশ্য। সবর করার উপায়-উপকরণ এবং মাধ্যম উদ্দেশ্য নয়। কারণ এগুলো মূসা আলাইহিস সালাম এর কাছে বিদ্যমান ছিল।

প্রিয় পাঠক! আপনি কি দেখছেন না যে, সবর না করার কারণে খিযির আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালাম কে দোষারোপ করেছেন? কাজ করার উপায়-উপকরণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকার কারণে কেউ যদি কর্ম না করে, তাহলে তাকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। শুধু সেই ব্যক্তিকেই দোষারোপ করা হয়, যে আমল করার সামর্থ্য ও শক্তিকে (আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীক পাওয়ার সুযোগকে) নষ্ট করেছে। বান্দাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা বাদ দিয়ে অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে অথবা যা আদেশ করা

[২৫০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১১১৭।

হয়েছে, তার বিপরীত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণেই বান্দা আল্লাহর তাওফীক পাওয়ার সুযোগ হারায়।

আর যারা বলে, কাজ করার সময়ই কেবল বান্দার মধ্যে তা করার শক্তি তৈরি হয়, তাদের যুক্তি হচ্ছে, পরস্পর বিপরীতধর্মী দু'টি কাজের জন্য একই শক্তি প্রযোজ্য হয় না। কেননা কাজ করার সময় যেই শক্তি থাকে, তা শুধু সেই কাজটির জন্যই প্রযোজ্য হয়। কাজটি সম্পাদন করার জন্য সেই শক্তিটি জরুরী। ঐ কাজটি ছাড়া অন্যত্র সেই শক্তি বিদ্যমান থাকে না।

কাদারীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ভ্রান্ত মূলনীতির উপর নির্ভর করেই বলেছে যে, মুমিন, কাফের, সৎ এবং অসৎ সকলকেই সমানভাবে আল্লাহ তা'আলা সুপথে আসার জন্য সক্ষম করেন বা মাত্র একটি শক্তি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুমিন ও অনুগত বান্দাকে প্রদত্ত এক বিশেষ সাহায্যকে তারা সমর্থন করে না। বরং তাদের ভ্রান্ত কথা হচ্ছে মুমিন ব্যক্তি নিজে নিজেই আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া আনুগত্যের কাজ করাকে প্রাধান্য দেয় আর ফাসেক ও পাপিষ্ঠ লোক নিজেই অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়। মুতাযিলা ও কাদারীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা আরো বলে যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন, কাফের, সৎ এবং অসৎ সকলকেই সমানভাবে হেদায়াতের পথে আসার শক্তি দান করেন, তার দৃষ্টান্ত হলো যেমন একজন পিতা তার দুই ছেলের প্রত্যেককে একটি করে তলোয়ার দিলেন। কিন্তু এক ছেলে তার তলোয়ার দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করলো। আর অন্য ছেলে তা দিয়ে ডাকাতি করলো।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল আলেমের মতে এই কথা বাতিল। তারা বলেন ভাল-মন্দ সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে বলে বিশ্বাস করা শির্ক। আহলে সুন্নাতের লোকেরা আরো একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার অনুগত বান্দাকে এমন একটি দীনি নিয়ামত দান করেন, যা থেকে কাফেররা বঞ্চিত হয় এবং তাকে আনুগত্যের কাজে এমন এক বিশেষ সাহায্য করেন, যা কাফেরকে করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সুশোভনীয় করে দিয়েছেন। আর কুফুরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃনিত করে দিয়েছেন। মূলত তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত"। *(সূরা আল হুজুরাত: ৭)*

কাদারীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের কাছেই সাধারণভাবে ঈমানকে প্রিয় ও সুশোভিত করে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে ঈমানের

বিষয় সমূহকে সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন এবং সত্যের দলীলসমূহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতের দাবী হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা খাস করে মুমিনদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা তৈরী করে দিয়েছেন এবং তা তাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ "মূলত তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত"। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, কাফেররা সুপথ প্রাপ্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ সংকীর্ণ করে দেন এবং এমনভাবে তাকে সংকুচিত করতে থাকেন যে, মনে হতে থাকে যেন সে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ বেঈমানদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন"। *(সূরা আল আনআম: ১২৫)*

এ রকম আয়াত কুরআন মজীদে অনেক রয়েছে। আল্লাহু তা'আলা তাতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি চাইলে কাউকে সত্যের পথ দেখান আবার চাইলে কাউকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾

"যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পায় এবং যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন তার জন্য তুমি কোন পৃষ্ঠপোষক ও পথপ্রদর্শক পাবে না"। (সূরা কাহাফ: ১৭) এ বিষয়ে সামনে আরো বিস্তারিত বর্ণনা আসছে। ইনশা-আল্লাহ।

কাদারীয়াদের মূল কথা অনুযায়ী আনুগত্যকারী এবং আনুগত্য বর্জনকারীকে যেহেতু সমানভাবে সক্ষম করা হয়, তাই তাদের মূলনীতি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করার সময় কোনো ক্ষমতা (তাওফীক) থাকা আবশ্যক হয় না। কেননা যে শক্তি দ্বারা বান্দার কর্ম সম্পাদিত হয়, তা কর্ম বর্জনকারীর জন্য প্রয়োজ্য হয় না। কর্ম সম্পাদনকারীর জন্য কেবল ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। আর কর্ম সম্পাদন করার শক্তি আল্লাহ তা'আলাই দিয়ে থাকেন। তারা যখন দেখল কাজ করার পূর্বে শক্তি থাকা আবশ্যক, তখন তারা বলল, কাজ করার সময় আলাদা কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না। কেননা শক্তির মাধ্যমে কাজ করা বা বর্জন করা হয়। আর বান্দা যখন কর্ম সম্পাদন করে তখন সে বর্জনকারী হয় না। তাই তারা বলেছে কাজ করার পূর্বেই কেবল শক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এ কথা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা কোনো কাজ করতে গেলে যেসব শর্ত লাগে, তার অবর্তমানে কাজ হওয়া অসম্ভব। বরং কাজ করার সময় কাজের জন্য সমুদয় শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী। সুতরাং মুতাযিলাদের কথার বিপরীত কথাই সত্য। আর তা হলো কাজ করার সময় শক্তি থাকা

আবশ্যক। যারা বান্দার জন্য কাজ করার শক্তি আছে বলে সাব্যস্ত করে, তারা আবার দুই দলে বিভক্ত। তাদের কেউ বলেছে, শক্তি কেবল কাজ করার সময়ই পাওয়া যায়। তাদের ধারণা হলো শক্তির প্রকার মাত্র একটি। তা পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ার উপযোগী নয়। তাদের কেউ কেউ আবার ধারণা করেছে যে, শক্তি এমন একটি অবস্থা যা দু'টি সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং কাজ করার পূর্বে কাজ করার শক্তি বিদ্যমান থাকা অসম্ভব।

আসল কথা হলো শক্তি দুই প্রকার। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি হলো কাজকর্ম করার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রপাতি ঠিক থাকা। এটি ঠিক থাকলে কাজ করা বা না করা সম্ভব হয়। এই প্রকার শক্তি ঠিক থাকলেই বান্দাকে আদেশ দেয়া কিংবা নিষেধ করা সম্ভব হয়। এই প্রকার শক্তি আনুগত্যকারী এবং অবাধ্যতাকারী উভয়ের জন্যই বিদ্যমান থাকে। আর এটি কাজ শুরু করার পূর্বেই বিদ্যমান থাকা জরুরী। কাজ শুরু করার পূর্ব থেকে শুরু করার সময় পর্যন্ত এটি বিদ্যমান না থাকলে কোনো কার্যই সম্পাদিত হয় না। যারা বলে ক্ষমতা একটি অবস্থা, যা ক্ষমতাবানের সাথে সবসময় বিদ্যমান থাকে, তাদের মতে ক্ষমতাটি হুবহু বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে কাজ সম্পাদিত হয়। আর যারা বলে ক্ষমতা এমন একটি অবস্থা যা দু'টি সময়ের জন্য প্রযোজ্য হয় না, তাদের মতে তা নতুনভাবে তৈরী হওয়ার মাধ্যমে কর্ম সম্পাদিত হয়। আর এই ক্ষমতা পরস্পর দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য হয়। আল্লাহ তা'আলার আদেশগুলো এই প্রকার ক্ষমতার সাথেই শর্তযুক্ত। এই প্রকার ক্ষমতা যার মধ্যে থাকে না, আল্লাহ তা'আলার তার উপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। এই প্রকার ক্ষমতার বিপরীত হলো অপারগতা। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

যে প্রকার ক্ষমতা থাকলে শরী'আতের হুকুম-আহকাম জারি হয়, তা ঐ ক্ষমতার চেয়ে আলাদা, যা না থাকলে কোনো কাজই সম্পাদিত হয় না। যেই পরিমাণ ক্ষমতা থাকলে শরী'আতের হুকুম বাস্তবায়ন করার আদেশ করা যায়, তা পুরোপুরি না থাকলেও কাজ করা যায়। বিশেষ করে যখন কাজ করতে পুরোপুরি অক্ষম না হয়। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর সহজ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের উপর সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি তোমাদের দীনের মধ্যে কঠিন কিছু নির্ধারণ করেননি। রোগী কখনো কখনো কাজ করতে পারে। যদি এতে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা দেরীতে রোগমুক্ত হয় তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে সে অক্ষম। কেননা কাজ করতে গেলে তার ক্ষতি হয়। কিন্তু তাকে সক্ষম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা শুধু কাজ করার প্রতি দৃষ্টি দেননি; বরং তা সম্পাদন করার জন্য জরুরী বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। আর যদি কাজ করতে গেলে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে শরীয়তে এ জাতীয় ক্ষমতাকে কাজ করার জন্য শরী'আত সম্মত ক্ষমতা হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়নি। যেমন শারীরিক কিংবা আর্থিক মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কাজ করার ক্ষমতা রাখে, রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছ্বলাত পড়ে অথবা একটানা দু'মাস ছ্বিয়াম রাখে অথবা অনুরূপ কিছু করে। এসব

ক্ষেত্রে শরী'আতের প্রবর্তক যেখানে মারাত্মক ক্ষতি না হওয়ার বিষয়টি মূল্যায়নে রেখেছে, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম ব্যক্তিকে কিভাবে শরী'আতের হুকুম পালনে বাধ্য করা হবে?

তবে এ প্রকার ক্ষমতা কাজ শুরু করা পর্যন্ত বান্দার মধ্যে বিদ্যমান থাকাই কাজ বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই যদি হতো তাহলে কাজ সম্পাদনকারী তা বর্জনকারীর অনুরূপ হতো। অবশ্যই আরেকটি সহযোগী শক্তি তৈরী করা আবশ্যক, যা কাজের সাথে সাথে অব্যাহত থাকে। যেমন কর্ম সম্পাদনকারীকে ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন বানানোর প্রয়োজন রয়েছে। কেননা শক্তি ও ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কাজই সম্পন্ন হয় না। কাজ করার সময় যেই শক্তি থাকে তার সাথে সুদৃঢ় ইচ্ছা থাকা চাই। কিন্তু শরী'আতের হুকুম-আহকাম কারো উপর প্রয়োগ করার জন্য যেই শক্তি-সামর্থ থাকা শর্ত তার কথা ভিন্ন। শরী'আতের হুকুম-আহকাম বাস্তায়ন করার সময় দৃঢ় ইচ্ছা থাকা জরুরী নয়। কেননা যে ব্যক্তি আমল করার ইচ্ছা করে না তার উপরও আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের হুকুম-আহকাম চাপিয়ে দেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে কোনো আদেশ করেন না, যে কাজ করার ইচ্ছা করলেও করতে সক্ষম নয়

মানুষের পারস্পরিক আদেশ-নিষেদের বিষয়টিও অনুরূপ। মানুষ তার চাকরকে এমন আদেশ করে, যা তার চাকর বাস্তবায়ন করতে চায় না। তবে চাকরকে সে এমন আদেশ করে না, যা সে করতে অক্ষম। সুতরাং যখন কাজ করার সুদৃঢ় ইচ্ছা থাকে এবং তার সাথে শক্তি একত্রিত হয়, তখন কাজ সম্পন্ন হয়। এর উপর ভিত্তি করেই বান্দা যা করতে সক্ষম নয়, তা করার আদেশ হয়। যে বলবে কাজ করার সময়ই কেবল শক্তি দরকার, তার কথা অনুযায়ী প্রত্যেক কাফের ও ফাসেককে এমন কিছু করার আদেশ করা হয়েছে, যা সে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। বান্দা যা করতে সক্ষম নয়, তার ব্যাখ্যা দুইভাবে করা যেতে পারে। কাজ করার ক্ষমতা না থাকার কারণে বান্দা তা করতে পারে না। এ শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'আলা শরী'আত পালন করার হুকুম করেন না। আর কোনো বান্দা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে শরী'আতের আদেশ বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখে না। এ শ্রেণীর মানুষের উপর শরী'আতের দায়ভার চাপানো হয়েছে। মানুষের পারস্পরিক আদেশ-নিষেধের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তারা এ দুই শ্রেণীর ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করতে জানে। সুতরাং কোনো মনিব তার অন্ধ চাকরকে পবিত্র কুরআনে নুকতা লাগানোর আদেশ করে না। তবে চাকর বসা থাকলে তাকে দাঁড়ানোর আদেশ করে। সাধারণ বোধশক্তির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে মানুষ পার্থক্য করতে পারে।

(৯০) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ

বান্দারা যে সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পাদন করে, সেগুলোর স্রষ্টাও আল্লাহ। বান্দারা শুধু তা অর্জন করে।

.....

ব্যাখ্যাঃ বান্দারা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ-কর্ম নির্বাচন করে, তা নিয়ে লোকেরা মতভেদ করেছে। জাবরীয়া সম্প্রদায় এবং তাদের ইমাম জাহাম বিন সাফওয়ান আত্ তিরমিযীর মতে মানুষের সকল কাজ-কর্মই আল্লাহ তা'আলাই পরিচালনা করেন। তাদের সকল কাজেই তারা আল্লাহর বাধ্যগত। তাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা নেই। জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কম্পনে যেমন রোগীর কোন ইচ্ছা থাকে না, মানুষের নাড়ীর স্পন্দন যেমন মানুষের অনিচ্ছাতেই চলতে থাকে এবং গাছ-পালা যেমন বাতাসের ধাক্কায় নড়াচড়া করে, মানুষের কাজ-কর্মগুলোও ঠিক সে রকম। মানুষের কাজ-কর্মকে কেবল রূপকার্থেই মানুষের দিকে সম্বন্ধ করা হয়। কোনো জিনিসকে যেমন তার স্থানের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, মানুষের কাজগুলোও, ঠিক সে রকম। এমনটি নয় যে মানুষ প্রকৃতপক্ষে সেই কাজটি করেছে।

বান্দার কাজকর্মের ব্যাপারে মুতাযিলাদের মত

মুতাযিলাদের মত উপরোক্ত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বলেছে মানুষ এবং সকল প্রাণী নিজ ইচ্ছায় যেসব কাজ করে, তা তারা নিজেরাই সৃষ্টি করে। মাখলুকের কোনো কাজ-কর্মই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে না!! সেই সাথে মুতাযিলারা নিজেদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাজ-কর্মগুলো সৃষ্টি করতে সক্ষম কি না!!

হকপন্থীগণ বলেন, বান্দারা তাদের যেসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত কিংবা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে থাকে, সবই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা একাই সকল মাখলুক (মানুষ, তার কর্ম ইত্যাদি) সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই।

জাবরীয়ারা আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে এবং বলেছে বান্দার কাজে বান্দার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা ও শক্তি নেই। যেমন মুশাব্বেহা সম্প্রদায় আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর সিফাতগুলোকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনা করে ফেলেছে।

তাকদীরে অবিশ্বাসী কাদারীয়া (মুতাযিলা) সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে অসংখ্য স্রষ্টা নির্ধারণ করেছে। এ জন্যই তারা এই উম্মতের অগ্নিপূজকে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়; তারা অগিপূজকদের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট। কারণ অগ্নিপূজকরা মাত্র দুইজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী।[২৫১] আর এরা অগণিত স্রষ্টায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাদের মতে প্রতেক মানুষ যেহেতু তার নিজের কাজ নিজেই সৃষ্টি করে, তাই তাদের কথা মতে যত মানুষ, তত স্রষ্টা থাকা আবশ্যক হয়। (নাউযুবিল্লাহ)

মানুষেরা যেই সত্য নিয়ে মতভেদ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করেন।

জাবরীয়ারা তাদের মতের পক্ষে যেসব ছ্বহীহ দলীল খাড়া করেছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। বান্দার কাজ-কর্মও তার সমস্ত সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। তবে তাদের সেই ছ্বহীহ দলীলগুলোতে এই কথার প্রমাণ নেই যে, বান্দা কোন কাজ করে না, তার কোন ইচ্ছা নেই এবং সে নিজের কাজও নিজে বাছাই করে না। সেই সাথে এটিও বলা ঠিক নয় যে, বান্দার ইচ্ছায় সম্পাদিত কাজগুলো কম্পমান রোগীর কম্পনের মত, বাতাসের সাথে উড়ন্ত ধুলাবালির মত এবং ঝড়ো-হাওয়ার কারণে গাছ-পালার নড়াচড়ার মত। তাদের এই যুক্তি সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ শরী'আতের অনেক দলীল এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি প্রমাণ করে যে, মানুষের কাজে তার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে এই স্বাধীনতা তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এই ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিয়েই সে কাজ সম্পাদন করে। তবে তার এই স্বাধীনতা লাগামহীন নয়। তা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার অনুগামী।

আর কাদারীয়ারা (মুতাযিলারা) তাদের মতের পক্ষে যেসব ছ্বহীহ দলীল খাড়া করেছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিই প্রমাণ করে যে, বান্দা প্রকৃতপক্ষেই তার কাজ-কর্ম সে নিজেই করে, সেই তার কাজ-কর্মের ইচ্ছা করে এবং তা বাছাই করে। বান্দার দিকে বান্দার কাজসমূহের সম্বন্ধ হচ্ছে প্রকৃত। তবে তা এই কথা প্রমাণ করে না যে, বান্দার কর্মের উপর আল্লাহর কোন নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা ও তদারকি নেই এবং এ কথাও বুঝার কোন সুযোগ নেই যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছাড়াই বান্দার কাজ-কর্ম সম্পাদিত হয়।

হে প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত ফির্কাদ্বয়ের প্রত্যেকের কথার যে অংশটুকু সত্য, তা যদি একসাথে মিলান, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তা কেবল ঐ সত্যই বহন করে, যার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহর কিতাবে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত সকল কিতাবেই। কুরআন ও পূর্বের সকল আসমানী কিতাব যা বলছে, তা হলো পৃথিবীতে যত বস্তু জড়পদার্থ রয়েছে এবং পৃথিবীতে জিন-ইনসান ও অন্যান্য প্রাণীর যত ক্রিয়া-কলাপ সংঘটিত হয়, তার

[২৫১] অগ্নিপূজকরা বিশ্বাস করে, কল্যাণের স্রষ্টা হচ্ছে নূর আর অকল্যাণের স্রষ্টা হচ্ছে আঁধার।

সবগুলোর উপরই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন কুদরত ও ইচ্ছা। আর বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের ইচ্ছাতেই কাজ-কর্ম করে। সেই কারণেই বান্দাদের কাজের বিনিময়ে তারা প্রশংসা কিংবা নিন্দার হকদার হয়। বাস্তব অবস্থাও তাই। সত্যের দলীলসমূহ কখনো পরস্পর বিরোধী হয় না। যা সত্য তার এক অংশ অন্য অংশকে সত্যায়ন করে।

এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে মুতাযিলা ও জাবরীয়াদের সমস্ত দলীল উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে এই দলীলগুলো প্রায় একই রকম এবং খুবই দুর্বল। এক পক্ষের দলীল দ্বারা অপর পক্ষের দলীল গ্রহণকে বাতিল প্রমাণ করা যায়। তারপরও আমি উভয় দলের কিছু দলীল এখানে আলোচনা করবো। অতঃপর বর্ণনা করবো যে, তারা যেই বাতিল কথার পক্ষে দলীলগুলো খাড়া করতে চাচ্ছে, দলীলগুলো সেই কথাকে সমর্থন করে না।

জাবরীয়ারা বলে বান্দার সকল কাজ আল্লাহ তা'আলাই করেন। এতে বান্দার কোন ইচ্ছা ও শক্তি থাকেনা। তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ ﴾

"আর তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন"। *(সূরা আল আনফাল: ১৭)*

এখানে বলা হয়েছে, মুমিনগণ কাফেরদেরকে হত্যা করেনি, আল্লাহই হত্যা করেছেন এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের দিকে তীর নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন। এতে বুঝা গেল, বান্দার কাজে বান্দার কোন হাত নেই। জাবরীয়ারা আরো বলেছে, আমল করার বিনিময়ে কোন বদলা পাওয়া যাবে না। কেননা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بعَمَلِهِ » قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ، وَلا أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ رَحْمَةٍ منه وَ بِفَضْلٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ»

"তোমাদের কেউ তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা বললেন, আপনিও না হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আমিও না। যদি না আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ আমাকে ঘিরে নেয়। সুতরাং ইখলাসের সাথে আমল করো, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে ভাল লোক হলে বেশী বেশী নেক আমল করার সুযোগ পাবে এবং পাপী হলে অনুশোচনা করার সুযোগ পাবে"।[২৫২]

[২৫২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৪৬৩, মুসলিম হা/২৭১৬।

অপর পক্ষে কাদারীয়ারা বলে যে বান্দারাই তাদের কাজ-কর্মের স্রষ্টা। এতে আল্লাহর কোন হস্তক্ষেপ নেই। তারা যেসব দলীল পেশ করেছে, তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ "আল্লাহ তা'আলা বড়ই বরকত সম্পন্ন, তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা" *সূরা মুমিনূন: ১৪।*

তারা আরো বলেন, কিয়ামতের দিন আমলের বিনিময় স্বরূপই বদলা দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"সুতরাং কেউ জানে না, তাদের আমলের পুরস্কার হিসেবে তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কী ধরণের বস্তু লুকায়িত রাখা হয়েছে"। (সূরা সাজদাহ: ১৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"পৃথিবীতে তোমরা যেসব আমল করেছো তার বিনিময়ে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছো"। (সূরা যুখরুফ: ৭২) এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

জাবরীয়াদের দলীলের জবাব:

জাবরীয়াদের দলীলের জবাব হলো আল্লাহর বাণী বলা হয়েছে যে, وَمَا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ "আর তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন" সূরা আনফাল :১৮

এটি তাদের মতের পক্ষের দলীল নয়; বরং এটি তাদের মতের বিপক্ষের দলীল। কেননা এখানেই তো আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের জন্য নিক্ষেপ করা সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে'। সুতরাং জানা গেল যে, এখানে যা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং যা নাকচ করা হয়েছে, উভয়টি একই জিনিস নয়। অর্থাৎ নিক্ষেপ করা কাজটির রয়েছে প্রারম্ভ এবং শেষ। নিক্ষেপ করা কাজটি শুরু হয়েছে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছুড়ে মারার মাধ্যমে। আর শেষ হয়েছে গন্তব্য স্থলে পৌঁছার মাধ্যমে। উভয়টিকেই رمي বলা হয়। সুতরাং সঠিক অর্থ হচ্ছে তুমি যখন তীর নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি কেবল তা ছেড়েছিলে, কিন্তু শত্রুদের উপর তা নিয়ে পৌঁছাওনি; বরং

আল্লাহ তা'আলাই তীর শত্রুদের শরীরে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর তাওফীকেই তা তাদের গায়ে লেগেছে।[২৫৩]

এভাবে ব্যাখ্যা না করলে তাদের কথার ভিত্তিতে এও আবশ্যক হবে যে, وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى তুমি যখন ছ্বলাত পড়েছিলে, তখন তুমি ছ্বলাত পড়োনি; বরং আল্লাহই ছ্বলাত পড়েছেন। وما صمت إذ صمت ولكن الله صام তুমি যখন ছিয়াম রেখেছিলে, তখন তুমি ছিয়াম রাখনি; বরং আল্লাহ ছিয়াম রেখেছেন, وما سرقت.....ما زنيت إذ زنيت ولكن الله إذ سرقت ولكن الله..... ইত্যাদি আরো অনেক কথা আবশ্যক হবে। এ কথাগুলো যে ভুল ও বাতিল তা দিবালোকের মত পরিষ্কার।

আর আমলের ভিত্তিতে বিনিময় আসা বা আমলের বিনিময়ে জান্নাত লাভের মাসআলায় জাবরীয়া এবং মুতাযিলা উভয় দলই গোমরাহ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

আহলে সুন্নাতের লোকেরা বলেন, যেই হাদীছে বলা হয়েছে, আমলের বিনিময়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না এবং যেই আয়াতে আমলের কারণে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, উভয় স্থানে ب হরফে জারটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ» "তোমাদের কেউ তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"। এখানে بعمله -এর মধ্যে যে হরফে জার্ ب রয়েছে, তা বদলা, মূল্য ও বিনিময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির আমল জান্নাতে প্রবেশের মূল্য হওয়াকে এখানে নফী করা হয়েছে। মুতাযিলারা তাই মনে করে। তারা বলে আমলকারী আমলের বিনিময়ে তার রবের নিকট জান্নাতের হকদার। তাদের এই ধারণা ঠিক নয়; বরং আল্লাহর রহম ও অনুগ্রহেই বান্দারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর বাণী:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"সুতরাং কেউ জানে না, তাদের আমলের পুরস্কার হিসাবে তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কী ধরণের বস্তু লুকায়িত রাখা হয়েছে"। (সূরা সাজদাহ: ১৭)

---

[২৫৩] কেননা এক মুষ্ঠি মাটি হাতে নিয়ে নিক্ষেপ করলেই তা সমস্ত শত্রুর শরীরে পতিত হয় না। কোন মানুষ এটি করতে সক্ষমও নয়। সুতরাং যখন রাসূলকে বলা হয়েছে যে, তুমি নিক্ষেপ করোনি, তখন এই অর্থেই বলা হয়েছে, তুমি নিক্ষেপ করোনি। অর্থাৎ সমস্ত শত্রুর শরীরে তুমি মাটি নিক্ষেপ করোনি। আল্লাহই তা করেছেন। তুমি শুধু মাটি হাতে নিয়ে ছুড়ে মেরেছ, আল্লাহ তা কাফেরদের শরীর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন।

এ রকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে। এখানে بِمَا كَانُوا -এর মধ্যকার بِ হরফে জার্‌টি سببية (মাধ্যম, উপায়-উপকরণ, কারণ ইত্যাদি) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের আমলের কারণে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত মাধ্যম ও উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার কারণে যে ফলাফল অর্জিত হয়, তারও তিনি স্রষ্টা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সবকিছুরই কেন্দ্রস্থল শুধু আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ।

বান্দার কাজকর্মের ব্যাপারে মুতাযিলাদের মত

আল্লাহর বাণী: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ "কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন, তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা"। সূরা মুমিনূন: ১৪। এই আয়াতে الخالقين বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মুতাযিলারা এই বহুবচনের শব্দ দ্বারা দলীল পেশ করে মুতাযিলারা বলে যে, একাধিক সৃষ্টকর্তা রয়েছে। তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সর্বোত্তম স্রষ্টা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের জবাবে বলেন যে, এখানে أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ অর্থ হচ্ছে أحسن المصورين المقدرين সর্বোত্তম আকৃতি দানকারী ও নির্ধারণকারী। এ নয় যে সৃষ্টিকারী। অনেক ক্ষেত্রে الخلق (সৃষ্টি করা) শব্দটি উল্লেখ করা হয়; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, নির্ধারণ, আকৃতি দান করা। এখানে উদ্দেশ্য এটিই। কেননা আল্লাহই একক স্রষ্টা। যেমন

আল্লাহ তা'আলা বলেন: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। (সূরা রা'দ: ১৬ এবং সূরা যুমার: ৬২) অর্থাৎ প্রত্যেক মাখলুকের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং كل شيئ শব্দের মধ্যে যেই عموم (ব্যাপকতা) রয়েছে তার মধ্যে বান্দাদের আমলসমূহও রয়েছে।

মুতাযিলাদের দলীলের জবাব:

﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ 'প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, এই কথাকে দলীল হিসাবে পেশ করে মুতাযিলারা كل (প্রত্যেক) শব্দের ব্যাপকতার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহ থেকে তার কালাম কুরআনকে ঢুকিয়ে দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট কাজ করেছে। কেননা আল্লাহর কালাম আল-কুরআন মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভব।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তারা বান্দাদের কর্মসমূহ, যা আল্লাহর সৃষ্টি তাকে كل শব্দের ব্যাপকতা হতে বের করে দিয়েছে। كل শব্দের ব্যাপকতার মধ্যে মাখলুক (সৃষ্টি) ছাড়া অন্যকিছু প্রবেশ করতেই পারে না। আল্লাহর পবিত্র যাত ও সিফাতসমূহ এই ব্যাপকতার মধ্যে শামিল নয়। আল্লাহর সকল সৃষ্টিই কেবল এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা তৈরী করো তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন"। *সূরা ছফ্ফাত: ৯৬।*

আমরা এ কথা বলি না যে, এখানে ৮ টি মাসদার (ক্রিয়ামূল) অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ এমন নয় যে, **الله خلقكم وعملكم** (আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কাজকে সৃষ্টি করেছেন)। বরং এখানে **'ما'** মাওসুলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ **والذي تعملونه** আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের হাতের তৈরী বস্তুও সৃষ্টি করেছেন। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা ৮ টি মাসদারী হওয়াকে সমর্থন করে না। কেননা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম খোদাই করে তৈরী মূর্তিপূজা করার প্রতিবাদ করেছেন, **النحت** তথা খোদাই করার প্রতিবাদ করেননি। আয়াত প্রমাণ করে যে, খোদাই করে তৈরীকৃত মূর্তিগুলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। মানুষের কারু-কার্যের ফলেই তা মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং মানুষের কাজের ফলে ও প্রভাবে যা তৈরী হয়, তাও আল্লাহর তৈরী। **النحت** (খোদাই করা) কাজটির স্রষ্টা যদি আল্লাহ না হতেন, তাহলে **منحوت** (খোদাইকৃত মূর্তি) আল্লাহর সৃষ্টি হতো না। বরং তাকে শুধু কাঠ বা পাথরই বলা হতো; অন্য কিছু নয়।

পরবর্তীকালের মুতাযিলাদের অন্যতম ইমাম আবুল হুসাইন আল-বসরী বলেন, জানা আবশ্যক যে, বান্দা নিজেই যে তার কাজ-কর্ম করে থাকে, মানুষের বোধশক্তি ইহাই সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ ইহা সাব্যস্ত করার জন্য বাইরের কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

ইমাম রাযী বলেন, জানা আবশ্যক যে, বান্দা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে তার কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম নয়; বরং তা সম্পাদন করার জন্য এমন একটি শক্তি ও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, যা পাওয়া গেলে কাজটি বাস্তবায়ন হয়। আর তা না পাওয়া গেলে বান্দার কাজ বাস্তবায়ন হয় না। এটিও মানবীয় বোধশক্তি দ্বারাই বুঝা যায়। বাইরের কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তারা উভয়েই বোধশক্তি দ্বারা অর্জিত যে জ্ঞানের দাবী করেছেন যে, তা সঠিক। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের এই দাবী করা যে, তার কাছে যেই বোধশক্তি দ্বারা অর্জিত ইলম রয়েছে, তা প্রতিপক্ষের অর্জিত ইলমের দাবীকে বাতিল

করে দেয়, তা সঠিক নয়। বরং ইলম অর্জিত হওয়ার দাবীতে তারা উভয়ই সত্যবাদী। তাদের একজনের কাছে হকের যেই অংশ রয়েছে, অন্যজন তা অস্বীকার করে ভুল করেছে। কেননা বান্দা নিজেই তার কাজ সম্পাদন করে, -এই ধারণা এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতে বান্দার কাজ সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

"মানুষের নফসের শপথ এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার পাপ এবং তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন"। *(সূরা শামস: ৭-৮)*

আল্লাহ তা'আলার বাণী: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا "অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার পাপাচার ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন"-এর মধ্যকার فَأَلْهَمَهَا (তার প্রতি ইলহাম করেছেন) বাক্য তাক্বদীর তথা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ সাব্যস্ত হয়। একই সাথে পাপাচার ও তাকওয়াকে বান্দার নফসের দিকে সম্বন্ধ করার মাধ্যমে বান্দার জন্য কাজ করার শক্তি ও ইচ্ছাও সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে করে জানা যাচ্ছে যে, বান্দার নফসই পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং বান্দাই তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾

"নিঃসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে ভ্রষ্ট করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে"। *(সূরা শামস্: ৯-১০)*

এই আয়াত দু'টির মধ্যেও বান্দার কর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ রকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে। যেসব সন্দেহ মানুষকে দলে দলে বিভক্ত করেছে, তার মধ্যে আরেকটি সন্দেহ হলো, একদল লোক বলেছে, তোমাদের এই কথা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা গুনাহ এর কাজগুলো মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করার পর তাদেরকে গুনাহর কারণে শাস্তি দিবেন? তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মধ্যে তিনি যা করেছেন, তার কারণে শাস্তি দিলে আল্লাহর আদল (ন্যায়বিচার) গেল কোথায়? সারা বিশ্বের বহু মানুষের জবানেই এই প্রশ্নটি সবসময়ই চালাচালি হচ্ছে। যুগে যুগে প্রত্যেক আলেমই তার ইলম, মারেফত, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রশ্নটির জবাব দিয়ে যাচ্ছেন।

এই প্রশ্ন থেকেই মানুষের রাস্তা বিভিন্ন হয়েছে। একদল লোক মানুষের কাজ-কর্ম ও আমলকে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা থেকে বের করে ফেলেছে। অর্থাৎ তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা যদি পাপ কাজ সৃষ্টি করেন এবং মানুষ সেই পাপকাজ করলে শাস্তি দেন, তাহলে ইনসাফ ও আদলের ব্যঘাত ঘটে, তাই তারা বলেছে যে, আল্লাহ নয়;

বরং মানুষই তাদের কাজ-কর্ম সৃষ্টি করে ও তা সম্পাদন করে। তাতে আল্লাহর কোন তদারকি ও নযরদারি নেই।

ঐদিকে আরেকদল শরী'আতের হুকুম-আহকামের পিছনে কারণ ও হিকমত তালাশ করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর কাজের উপর আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

আরেক দল বলেছে, সবকিছু এমনকি বান্দার কাজেরও স্রষ্টা আল্লাহ। বান্দা তার কাজ সৃষ্টি করে না এবং তা সম্পাদনও করে না; বরং সে কেবল তার কাজ অর্জন করে। তবে তাদের এই কথা বোধগম্য নয়।[২৫৪] তারা আরো বলে এই كسب তথা অর্জনের কারণেই তার জন্য ছাওয়াব কিংবা শাস্তির বিধান নির্ধারিত হয়েছে।

আরেকদল এই কারণেই বলেছে, একই বিষয়ের উপর দুইজন (আল্লাহ এবং বান্দাকে) ক্ষমতবান নির্ধারণ করেছে এবং একই কর্ম দুইজনের (আল্লাহ এবং বান্দার) দ্বারা সংঘটিত হয় বলে মন্তব্য করেছে।

আরেক দল অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী হয়েছে অর্থাৎ বান্দার কাজে বান্দার কোন স্বাধীনতা নেই বলে মত প্রকাশ করেছে। তাদের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বান্দার কাজও আল্লাহ তা'আলাই সম্পাদন করেন। কাঠের পুতুলের মতই বান্দা সম্পূর্ণ অক্ষম। মানুষের বিবেক ও বোধশক্তি এই কথাকে সম্পূর্ণ বাতিল প্রমাণিত করে। তারা আরো বলেছে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এমন কাজ না করার কারণে শাস্তি দিবেন, যা মূলত তারা করতে সক্ষম নয় এবং এমন কাজ করার কারণে শাস্তি দিবেন, যা তারা বর্জন করার ক্ষমতা রাখে না। মূলত এই প্রশ্নের কারণেই এত দলাদলি ও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।[২৫৫]

---

[২৫৪] মূলত আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা জাবরীয়া ও কাদরীয়া মাজহাবের মাঝামাঝি এক অবস্থান গ্রহণ করতে গিয়ে বলেছে, বান্দার কাজ-কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ। বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা নয় এবং সে তার কর্ম সম্পাদনও করে না। বান্দারা শুধু তাদের কাজগুলো অর্জন করে। তাদের এই কথা বোধগম্য নয়। বাস্তবে এর কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেননা বান্দার জন্য فعل (কর্ম সম্পাদন করা) সাব্যস্ত করলে তাদের ধারণায় যে সমস্যা দেখা দেয়, كسب (অর্জন করা) সাব্যস্ত করলেও একই সমস্যা দেখা দিবে। কেননা এর মধ্যেও فعل এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এক কথায় عمل زيد (যায়েদ কাজ করল) এবং كسب زيد (যায়েদ অর্জন করল) এই উভয় বাক্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[২৫৫] মূলত এই প্রশ্নটি উত্থাপন করাই ঠিক নয়। আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করবেন। তার কাজে আপত্তি করার কেউ নেই। তার কোন কাজ হিকমত থেকেও খালী নয়। সেই হিকমত অনুসন্ধান করা ও জানার মধ্যে আমাদের জন্য কোন কল্যাণও নেই। মূলত আল্লাহর আনুগত্য করা এবং একমাত্র তার ইবাদত করার মধ্যেই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এই প্রশ্নের কারণেই অনেক মানুষ গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ "তার কাজের জন্য কারো সামনে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে না বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

উপরোক্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব হচ্ছে, গুনাহ এর কাজগুলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি হলেও তার মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়। সুতরাং বান্দার জন্য গুনাহয় লিপ্ত হওয়াই একটি শাস্তি । এই শাস্তির কারণ হলো তার পূর্বের গুনাসমূহ। এক পাপ অন্য পাপকে টেনে আনে। আর খারাপ আমলের পর শাস্তিও খারাপ হয়। গুনাহসমূহ মূলত ঐ সমস্ত রোগের মত, যার একটি অন্যটিকে ওয়ারিছ বানায়। অর্থাৎ বংশানুক্রমে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রামিত হয়।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, যেই গুনাহটি অন্যান্য গুনাহর সূত্রপাত ঘটায়, সেই প্রথম গুনাহটি কিভাবে প্রকাশিত হলো?

জবাবে বলা যেতে পারে যে, বান্দাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যেই ফিতরাতের উপর তাকে গঠন করা হয়েছে, সে অনুযায়ী কাজ না করার কারণেই শাস্তি স্বরূপ প্রথম গুনাহটি এসেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে একমাত্র তার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তার কোন শরীক নেই। সেই সাথে বান্দার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন, আল্লাহকেই একমাত্র মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করার স্বভাব ও প্রকৃতি স্থাপন করেছেন এবং তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করার ফিতরাত দিয়েই গঠন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾

"অতঃপর তুমি একনিষ্ঠভাবে সেই দীনের দিকে ধাবিত হও যেটা মেনে নেয়ার ফিতরাতের উপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই"। *(সূরা আর রূমঃ ৩০)*

সুতরাং যে উদ্দেশ্যে বান্দাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার, তার ইবাদত করা এবং তার দিকে ফিরে যাওয়ার যেই ফিতরাত দিয়ে তাকে গঠন করা হয়েছে, সে যখন তা বাস্তবায়িত করেনি, তখন তাকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছে যে, শয়তান তার জন্য শির্ক ও অন্যান্য গুনাহর কাজগুলোকে সুন্দর করে দেখিয়েছে। অতঃপর শয়তান বান্দার অন্তরকে এমন শূণ্য অবস্থায় পেয়েছে যে, তা ভাল ও মন্দের যে কোন একটি গ্রহণ করার উপযোগী। বান্দার অন্তর যদি এমন কল্যাণ ও নেক আমল দ্বারা ভর্তি থাকতো, যা তার মধ্যে বিপরীতটি প্রবেশ করার প্রতিবন্ধক হত, তাহলে তার অন্তরে অকল্যাণ প্রবেশের কোন রাস্তা পেত না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾

"মহিলাটি তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং ইউসুফও তার প্রতি আসক্ত হয়ে যেতো, যদি না তার রবের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো"। তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে

রাখার জন্য এভাবে আমার নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত"। *(সূরা ইউসুফ: ২৪)* আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেন,

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

"সে বললো, তোমার বড়ত্বের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই। তবে একমাত্র যাদেরকে তুমি একনিষ্ঠ করে নিয়েছো তাদেরকে ছাড়া"। *(সূরা সোয়াদ: ৮২-৮৩)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা হিজরের ৪১-৪৩ নং আয়াতে ইবলীসের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

"সে বললো, "হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো। তবে এদের মধ্য থেকে তোমার যেসব বান্দাকে তুমি নিজের জন্য খালেস করে নিয়েছো তাদের ছাড়া। তিনি বললেন, এটিই আমার নিকট পৌঁছুবার সোজা পথ। যারা আমার প্রকৃত বান্দা হবে তাদের উপর তোমার কোনো জোর খাটবে না। তোমার জোর খাটবে শুধুমাত্র এমন বিপথগামীদের উপর যারা তোমার অনুসরণ করবে এবং তাদের সবার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তির অঙ্গীকার"।

الإخلاص। অর্থ হচ্ছে শুধু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কিছুকে মাবুদ বানানো হতে অন্তরকে খালি করা, অন্তর দিয়ে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যাত করা এবং শুধু তাকেই ভালোবাসা। এতে করে অন্তর শুধু আল্লাহর জন্যই খালেস (একনিষ্ঠ) হয়ে যায়। সুতরাং শয়তান তাতে প্রবেশের কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। কিন্তু শয়তান যখন অন্তরকে ইখলাস ও আল্লাহর ভালোবাসা থেকে শূণ্য পায়, তখন সেই শূণ্যতা অনুপাতে সে তাতে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় অন্তরে ইখলাস না থাকার কারণে অন্তরকে গুনাহগার ও অপরাধী বানিয়ে দেয়াও বান্দার জন্য এক প্রকার শাস্তি। এটি আদল তথা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন, বান্দার অন্তরে ইখলাস না থাকা কে সৃষ্টি করলো?

জবাবে বলা হয়েছে যে, এই প্রশ্নটি মূলতই ভুল। কেননা অন্তরে ইখলাস ও আল্লাহর ভালোবাসা না থাকার বিষয়টি সৃষ্টি ও তৈরীর সাথে সম্পৃক্ত নয়। অন্তরে ইখলাস না থাকা কিংবা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা না থাকা এমন কোন অস্তিত্বশীল বিষয় নয় যে, তার জন্য فاعل (কর্তা) খুঁজতে হবে। বরং তা নিরেট অপকর্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর

এই অপকর্মের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার দিকে করা অশোভনীয়। যেমন ছ্বলাত শুরু করার দু'আর ব্যাপারে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"হে আমার প্রভু! আমি তোমার হুকুম পালন করতে সদা প্রস্তুত ও উপস্থিত আছি। আমি তোমার আনুগত্যের জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার উভয় হস্তেই নিহিত। অকল্যাণকে তোমার প্রতি সম্বন্ধ করা শোভনীয় নয়। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রতি মুখাপেক্ষী ও নিজেকে তোমার উপর সোপর্দকারী এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। তুমি বরকতের অধিকারী ও মহিমান্বিত। তোমার কাছেই আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটই তাওবা করছি"।[২৫৬]

আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি শয়তানকে কেবল ঐসব লোকের উপর শক্তিশালী করে দেন, যারা শয়তানকেই বন্ধু বানায় এবং তার প্ররোচনায় আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ﴾

"শয়তানের আধিপত্য কেবল তাদের উপর, যারা তাকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নেয় এবং তার প্ররোচনাতেই আল্লাহর সাথে শির্ক করে"। *(সূরা আন নাহাল: ১০০)*

সুতরাং তারা যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে বন্ধু বানালো এবং শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করলো, তখন শয়তানকে তাদের উপর শক্তিশালী করে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হলো। আর এই শয়তানকে বন্ধু বানানো এবং আল্লাহর সাথে শরীক নির্ধারণ করাই অন্তরকে ইখলাস থেকে খালী করার শাস্তি। অন্তরের মধ্যে তাকওয়া ও সৎকাজের ইলহাম করা হচ্ছে ইখলাসের ফলাফল। আর অন্তরে পাপাচারের ইলহাম করা (নির্দেশনা দেয়া) হচ্ছে অন্তরকে ইখলাস থেকে খালী রাখার শাস্তি।

এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন, অন্তরে ইখলাস না থাকা কিংবা ইখলাস বর্জন করার বিষয়টি যদি অস্তিত্বশীল বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে তো নতুন করে আবার সেই প্রশ্নই চলে আসবে।[২৫৭] আর যদি অস্তিত্বহীন বিষয় হয়, তাহলে যে বিষয়টি মূলত নাই, তাতে শাস্তি আসে কিভাবে?

---

[২৫৬] ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: রাতের ছ্বলাতের দু'আ।

[২৫৭] সম্ভবতঃ এখানে ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) ইঙ্গিত করেছেন যে, তা যদি আল্লাহই বান্দার অন্তরে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে এর জন্য শাস্তি দিবেন কেন? এই প্রশ্ন এবং তার জবাব পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কিতাবের একাধিক স্থানেই এই প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। এই প্রশ্নে অন্যতম জবাব হচ্ছে, বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যই

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, অন্তরে ইখলাস না থাকার অর্থ এই নয় যে, তা নফসের চাহিদা ও প্রবৃত্তি থেকে নফসকে বিরত রাখা ও প্রতিরোধ করার নাম। এটিকে অস্তিত্বময় বিষয় হিসাবে নাম দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনা চলছে কল্যাণের উপায়-উপকরণ থেকে অন্তর খালী ও শূণ্য থাকার বিষয় নিয়ে। আর অন্তরের এই শূণ্যতা শুধু ঐ বিষয় (এখলাস) হতে খালী হওয়ার নাম, যা অন্তরের জন্য সর্বাধিক উপকারী। আম্‌রে অস্তিত্বহীন বিষয়ের কারণে যেই শাস্তি আসে, তা মূলত গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণেই। এটি ঐ শাস্তি নয়, যা নবী-রাসূলদের দাওয়াত আসার পর এবং তাদের দাওয়াতের উপর পর্যাপ্ত দলীল-প্রমাণ পেশ করার পর আগমন করে থাকে।

বান্দার অন্তর ইখলাস থেকে খালী থাকলে বা অন্তরে ইখলাস না থাকলে আল্লাহর পক্ষ হতে দু'টি শাস্তি আসে।

(১) আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহগার ও অপরাধী বানিয়ে দেন। এটি হচ্ছে অন্তরে ইখলাস না থাকা, আল্লাহর দিকে ফিরে না আসা এবং আল্লাহর দিকে ঝুকে না পড়ার শাস্তি। অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তি এই শাস্তির কষ্ট নাও পেতে পারে। কেননা তা বান্দার নফসের চাহিদা মোতাবেক এবং কুপ্রবৃত্তির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই একটি বিরাট ও ভয়াবহ শাস্তি।

(২) আর পাপাচার ও গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়ার পর যেই শাস্তি আসে, তা হয় খুবই যন্ত্রনাদায়ক। উপরোক্ত উভয় শাস্তিকে আল্লাহ তা'আলা একসাথে মিলিয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ "তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেলো তখন তাদের জন্য সমৃদ্ধির সকল দরজা খুলে দিলাম"। এটি হচ্ছে প্রথম শাস্তি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ﴾ "শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছিল তার মধ্যে যখন তারা নিমগ্ন হয়ে গেলো তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তখন অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিল"। *(সূরা আল আনআম: ৪৪)* এটি হলো তাদের দ্বিতীয় শাস্তি।

আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, তাদের অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করা ব্যতীত, তাদেরকে আল্লাহর জন্য মুখলিস হিসেবে তৈরী করা ব্যতীত, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানানো এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী হিসাবে গড়ে তুলা ব্যতীতই কি তাদের জন্য নিজেদের অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ইচ্ছা ও

আল্লাহ তা'আলা সকল পাপাচারিতা সৃষ্টি করেছেন। পাপ ও গুনাহর কাজ সৃষ্টি করার পিছনে এটি হচ্ছে হিকমতে ইলাহীর অন্যতম।

সংকল্প তৈরী করা এবং নিজেদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তৈরী করা সম্ভব ছিল? না কি তাদের অন্তরসমূহ তা স্থাপন করে দেয়া হয় এবং তাদের অন্তরে তা ঢেলে দেয়া হয়।

এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, না তারা নিজেরাই তাদের অন্তরে ইখলাস এবং আল্লাহর ভালোবাসা তৈরী করতে সক্ষম নয়; বরং তা কেবল আল্লাহর দয়া এবং তার অনুগ্রহেই বান্দাদের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর হাতে যেসব কল্যাণ রয়েছে এবং বান্দারা আল্লাহর যেসব নিয়ামত পেয়ে ধন্য হয়ে থাকে, তার মধ্যে ইখলাস হচ্ছে বান্দার সর্ববৃহৎ নিয়ামত। আল্লাহর দুই হাতেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ। এই কল্যাণসমূহ থেকে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যা দান করেন, বান্দা কেবল তাই অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে যেই অকল্যাণ থেকে হেফাজত করেন, বান্দা কেবল তা থেকেই বাঁচতে পারে।

আরো যদি প্রশ্ন করা হয়, বান্দারা যখন তাদের অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, তাদেরকে ঐ জন্য তাওফীকও দেয়া হয়নি এবং নিজেরা চেষ্টা করে তা অর্জন করার কোন রাস্তা পায়নি, তাহলে (তা না থাকার কারণে শাস্তি দেয়া হলে) তো আগের প্রশ্নই পুনরায় চলে আসলো। সেই সাথে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করা তো যুলুম হয়ে গেল। তাহলে কি আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে, রাজা তার রাজ্যকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই চালাবেন, এটিই হচ্ছে আদল বা ন্যায় বিচার? রাজার ইচ্ছা মোতাবেক রাজ্য পরিচলানা করাই কি ন্যায় বিচার? বিষয়টি এ রকম যে,﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ "তার কাজের জন্য কারো সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে"?

এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে এখলাস থেকে খালী রেখে কিংবা তাদেরকে তাতে বঞ্চিত করে যালেমে পরিণত হননি। যালেম তো হয় কেবল ঐ ব্যক্তি, যার উপর অন্যের হক রয়েছে এবং সে মাযলুমকে তার প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করে। আল্লাহ তো এই ধরণের যুলুম নিজের উপর হারাম করে রেখেছেন এবং বিপরীত করা নিজের উপর আবশ্যক করেছেন।

আর তিনি যদি কাউকে এমন জিনিস থেকে মাহরুম করেন, যা তার প্রাপ্য ছিল না; বরং তা ছিল শুধু তার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া, তাহলে তিনি তা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে যালেমে পরিণত হয়ে যাননি। কাউকে তার প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করা যুলুম। আর কারো উপর অনুগ্রহ ও দয়া না করা আদল তথা ন্যায় বিচারের অন্তর্ভুক্ত। কাউকে কিছু না দেয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার আদল বিদ্যমান। যেমন তিনি তার সৃষ্টিকে দান করার মাধ্যমে অনুগ্রহ ও দয়াকারী।

আরো যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও রহমত যদি তার তাওফীকেই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে তাই করেন নি কেন? সকলকেই সেই তাওফীক

দেন না কেন? অথবা তার অধিকাংশ সৃষ্টির বেলাতেই তা করেননি কেন? যেমন তিনি লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন যে, তার রহমত তার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে।

জবাবে বলা যেতে পারে যে, এই স্থানে এটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, বান্দাকে তাওফীক থেকে বঞ্চিত করে যেই শাস্তি দেয়া হয় এবং সত্য দীন গ্রহণ করা হতে পিছিয়ে থাকার কারণে যেই শাস্তি আবশ্যক হয়, তা যুলুম নয়। বরং তা শুধু ইনসাফ ও আদল।

আসলে এই প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর ঐ হিকমত সম্পর্কে, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার অনুগ্রহ ও দয়ার উপরে আদলকে (ন্যায় বিচারকে) প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক করেছে।

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল বান্দাকে এক সমান তাওফীক ও অনুগ্রহ দান করলেন না কেন? প্রশ্নগুলোর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করলেন কেন? অন্যদের উপর অনুগ্রহ করলেন না কেন? আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

"এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল"। *(সূরা আল হাদীদ: ২১, জুমুআহ: ৪)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الْحَدِيدِ: ٢٩]

(তা এজন্য যে,) আহলে কিতাবগণ যেন জেনে নিতে পারে, আল্লাহর অনুগ্রহের কোন বস্তুতেই তারা ক্ষমতা রাখে না। আর নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। *(সূরা আল হাদীদ: ২৯)*

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা যখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই উম্মতকে খাস করে দ্বিগুন পুরস্কার দেয়ার কারণ এবং তাদেরকে একটি করে বিনিময় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি কি তোমাদের হক থেকে কোন কিছু কমিয়ে দিয়েছি। তারা বললেন, না কোন কিছুই কমিয়ে দেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটি হচ্ছে আমার অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা আমি তা দান করি। কাউকে দেয়া আবার কাউকে না দেয়ার বিষয়ে আল্লাহর হিকমত সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রত্যেক মানুষের জন্য জরুরী নয়।[২৫৮] আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোন বান্দার অন্তর খুলে দেন,

---

[২৫৮] হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ হচ্ছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا

যার ফলে সে আল্লাহর সৃষ্টি, তার আদেশ, তার পুরস্কার ও শাস্তি, নির্দিষ্ট করে কাউকে কিছু দেয়া ও কাউকে মাহরুম করার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সামান্যতম হিকমত সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং ঐ বিষয়গুলো রাখার স্থানসমূহ নিয়ে চিন্তা করে তখন সে তার জ্ঞাত হিকমতগুলোর মাধ্যমে অজানা কিছু হিকমতসম্পর্কে জানতে পারে!!

আল্লাহর দুশমন মুশরিকরা যখন বান্দাদের কারো উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি বুঝতে অক্ষম হলো এবং তারা বললো,

﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا﴾

"আসলে আমি এভাবে মানুষের মধ্য থেকে একদলকে আরেক দলের মাধ্যমে পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা এদেরকে দেখে বলে, এরা কি সেসব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? *সূরা আল আনআম: ৫৩।*

আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে বলেছেন, ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ "আল্লাহ কি তার শোকরগুজার বান্দা কারা, সেটা এদের চেয়ে বেশী জানেন না? *সূরা আল আনআম: ৫৩।*

প্রিয় পাঠক! আপনি এই জবাব নিয়ে চিন্তা করুন। দেখবেন, এর মধ্যে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ঐসব মহল সম্পর্কে অবগত আছেন, যা নেয়ামতের বৃক্ষ রোপন করার উপযোগী এবং যা নিয়ামতের বৃক্ষ রোপনের জন্য উপযুক্ত নয়। সুতরাং যেই স্থান নিয়ামতের বৃক্ষ রোপনের উপযোগী, সেখানে নিয়ামতের বৃক্ষ রোপন করলে তা কৃতজ্ঞতার ফল দেয়। আর যেই স্থান নেয়ামতের গাছ লাগানোর উপযুক্ত নয়, তাতে গাছ লাগানো হলেও ফল দিবেনা। সেখানে গাছ লাগানো হলে সময় ও শ্রম নষ্ট হবে, যা হিকমতের পরিপন্থী। যেমন-

---

الْقُرْآنَ، فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً؟ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ»

"পূর্বের জাতিসমূহের তুলনায় দুনিয়াতে তোমাদের অবস্থানের মেয়াদ হল আসরের ছ্বলাতের সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আহলে তাওরাতকে তাওরাত কিতাব দেয়া হয়েছে। তারা অর্ধেক দিন পর্যন্ত তাওরাত অনুযায়ী আমল করে অক্ষম হয়ে গেল। তাদেরকে এক কীরাত করে বিনিময় প্রদান করা হল। তারপর ইঞ্জিলের অনুসারীদেরকে ইঞ্জিল কিতাব দেয়া হল। তারা আসরের ছ্বলাতের সময় পর্যন্ত আমল করে দুর্বল হয়ে পড়ল। তাদেরকেও এক কীরাত করে ছাওয়াব প্রদান করা হল।

অতঃপর আমাদেরকে কুরআন মজীদ প্রদান করা হয়েছে। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করলাম। আমাদেরকে দু'কীরাত করে ছাওয়াব দেয়া হয়েছে। এতে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারীরা বললঃ হে আমাদের প্রভু! এদেরকে দু'কীরাত করে ছাওয়াব দিলেন এবং আমাদেরকে এক কীরাত করে দিলেন? অথচ আমরা তাদের তুলনায় অনেক বেশী আমল করেছি। আল্লাহ তাআলা বললেনঃ পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে আমি কি তোমাদের উপর যুলুম করেছি? তারা বললঃ না, আমাদেরকে কম দেয়া হয়নি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেনঃ এটি আমার অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই তা প্রদান করে থাকি। (ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫৫৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه﴾ "আল্লাহর নিজের রিসালাত কাকে দিবেন, তা তিনি জানেন"। *(সূরা আল আনআম: ১২৪)*

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনারা যখন ফায়ছালা করেই ফেললেন যে, বান্দা তার কাজ-কর্ম সৃষ্টি করতে পারে না, এটি তার জন্য অসম্ভব, তাহলে কি ধরে নেয়া যায় যে, আসলে বান্দার কোন কাজই নেই?

এর জবাব হচ্ছে বান্দা প্রকৃতপক্ষেই তার কাজ সম্পাদন করে, কাজ করার জন্য তার ক্ষমতাও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ "আর যা কিছু সৎকাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানেন"। *(সূরা আল বাকারা: ১৯৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

"নূহের প্রতি অহী নাযিল করা হলো এ মর্মে যে, তোমার গোত্রের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া এখন আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করা পরিহার করো"। *(সূরা হুদ: ৩৬)* এ রকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

সুতরাং যখন প্রমাণিত হলো যে, বান্দার কাজ-কর্মে বান্দারও ইচ্ছা ও স্বাধীনতা রয়েছে, তাহলে জেনে রাখুন যে, তার কর্মসমূহ দুই প্রকার। বান্দার পক্ষ হতে এমন কিছু হয়, যাতে তার কোন ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকে না। এটিকে বলা হয় তার সিফাত স্বভাব, বৈশিষ্ট, গুণ ইত্যাদি। এটি মূলত তার কাজ নয়। যেমন জ্বরে আক্রান্ত কিংবা ভীত-সন্ত্রস্ত কম্পমান ব্যক্তির কাপাকাপি ও নড়াচড়া করার কথাই বলা যেতে পারে। এতে কম্পমান ব্যক্তির কোন ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকে না।

বান্দার আরেক প্রকার ক্রিয়া সংঘটিত হয়, যা তার ইচ্ছা ও নির্বাচনের মিলনেই হয়েই সংঘটিত হয়। এই প্রকার কর্মকে একই সাথে সিফাত, কাজ এবং বান্দার অর্জনও বলা হয়। যেমন বান্দার ইচ্ছা ও ইখতিয়ার দ্বারা সংঘটিত কাজ-কর্মসমূহ। আল্লাহ তা'আলাই বান্দাকে স্বেচ্ছায় কর্ম সম্পাদনকারী বানিয়েছেন। তিনিই একমাত্র তা করতে সক্ষম। এতে তার কোন শরীক নেই।

এ জন্যই সালাফগণ বান্দার কাজ-কর্মে তার কোন স্বাধীনতা নেই- এই কথা বলার প্রতিবাদ করেছেন। কেননা অপারগ, অক্ষম ও বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষ হতে ইচ্ছা বহির্ভূত কর্ম সংঘটিত হয় না। যেমন বলা হয়, إجبار البكر الصغيرة للأب ولاية على النكاح অর্থাৎ পিতা তার কুমারী নাবালিকা মেয়েকে বলপ্রয়োগ করে বিবাহ দেয়ার

অধিকার রাখে। কিন্তু সে সাবালিকা মেয়ের উপর জোর খাটাতে পারবে না। অর্থাৎ তার ইচ্ছার বাইরে তাকে বিবাহ দিতে পারবে না।

সুতরাং এই কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার কাজ-কর্মে বাধ্য করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টিকর্তা এবং তা দ্বারা যেই কর্ম সম্পাদিত হয় তারও স্রষ্টা। তিনি বান্দাকে স্বেচ্ছায় কর্ম ইখতিয়ার ও নির্বাচনকারী বানাতে সক্ষম। কিন্তু বান্দা নিজেকে সেরকম বানাতে সক্ষম নয়।

এই জন্যই রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানীতে الجبل (স্বভাব ও প্রকৃতিগত) শব্দটি এসেছে। الجبر (জবরদস্তিমূলক) শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। যেমন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল কাইস গোত্রের নেতা মুনযিরকে বলেছিলেন,

«إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخلقين تَخَلَّقْت بِهِمَا أَم جُبِلْتُ عَلَيْهِمَا فقَالَ بَلِ خُلُقَانِ جُبِلْتَ عَلَيْهِمَا فقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَبَلَنِى عَلَى خُلقين يُحِبُّهُمَا اللَّهُ»

"নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। একটি হচ্ছে সহনশীলতা এবং অন্যটি হচ্ছে ধীরস্থিরত। মুনযির তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এ দু'টি স্বভাব কি আমি অর্জন করেছি? না কি এ দু'টি স্বভাবের উপরই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, না, বরং এ দু'টি স্বভাব দিয়েই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন মুনযির বললেন, আমি ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে এমন দু'টি স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন"।[২৫৯]

বান্দারা যেসব মন্দ কাজ তাদের স্ব-ইচ্ছায় নির্বাচন করে আল্লাহ তা'আলা কেবল তার কারণেই শাস্তি দিবেন। স্বেচ্ছায় মন্দ কাজ করার কারণে শাস্তি দেয়া এবং অনিচ্ছায় মন্দ কাজ হলে শাস্তি না দেয়ার বিষয়টি মানুষের বিবেক ও ফিতরাত দ্বারা সমর্থিত।

এখন যদি আবার প্রশ্ন করা হয়, মন্দ কাজ সৃষ্টি করা এবং তার সাথে শাস্তি সৃষ্টি করা কি যুলুম নয়? এই প্রশ্নের উত্তরটি এভাবে দেয়া যেতে পারে, বিষ পান করা কাজটি সৃষ্টি করা অতঃপর বিষ পান করার কারণে কারো মৃত্যু হওয়া যেমন যুলুম নয় সেরকমই পাপাচার সৃষ্টি করা এবং বান্দা তাতে লিপ্ত হলে শাস্তি দেয়া যুলুম নয়। সুতরাং বিষপান যেমন মৃত্যুর কারণ পাপ কাজে লিপ্ত হওয়াও তেমন শাস্তি ভোগের কারণ। কোনটিতেই যুলুম হয় না।[২৬০]

---

[২৫৯] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭।

[২৬০] পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ জাতিয় প্রশ্ন করা ঠিক নয়। কারণ এগুলো শয়তানের পথ উন্মুক্ত করে। বান্দাদের উচিত এই ধরণের প্রশ্ন না করে, যেসব কাজ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের উপকারে আসবে, তাই করা। তারপরও যুগে যুগে মানুষের মুখে যেহেতু প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হচ্ছে, তাই সম্মানিত শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ)

বান্দা প্রকৃত পক্ষেই তার কর্ম সম্পাদন করে; আল্লাহ তা'আলা তার কাজের স্রষ্টা

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, বান্দার কাজ প্রকৃত পক্ষেই তার নিজস্ব কাজ। কিন্তু তা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা। বান্দার কাজের ফলাফলও আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন। তবে কাজটি সরাসরি আল্লাহ তা'আলা করেন না। সুতরাং কাজ করা এবং কাজের ফলাফল, সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টি এগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই অর্থ ও পার্থক্যের দিকেই শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেছেন, وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দারা যে সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পাদন করে, সেগুলোর স্রষ্টাও আল্লাহ। বান্দারা শুধু তা অর্জন করে। গ্রন্থকার এখানে الكسب (অর্জন) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। الكسب বলা হয়, বান্দার ঐ কাজকে, যা তার সম্পাদনকারীর জন্য লাভ অথবা ক্ষতি বয়ে আনে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল সে নিজেই ভোগ করবে এবং যে গুনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তার উপরই বর্তাবে"। *(সূরা আল বাকারা: ২৮৬)*

(৯১) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ وَهُوَ تَفْسِيرُ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ نَقُولُ: لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا حَرَكَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا تَحَوُّلَ لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللهِ، وَلَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا، وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الْحِيَلَ كُلَّهَا، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

"আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর তাদের সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেননি। আর আল্লাহ তাদেরকে যা করার শক্তি দিয়েছেন, তারা কেবল তাই করতে সক্ষম। আর এটিই হচ্ছে لا حول ولا قوة إلا بالله এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া

এখানে এ ধরণের কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে তিনি এও বলেছেন যে, প্রত্যেক যুগের আলেমগণই তাদের নিজ নিজ যোগ্যতাবলে তাকদীর সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছেন। একেকজন একেকভাবে মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

কেউ কোনো অন্যায় কর্ম হতে বিরত থাকতে পারে না এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ সৎ কাজ করারও ক্ষমতা রাখে না। তাই আমরা বলি যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য ছাড়া আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কারো কোন কৌশল, কোন শক্তি এবং কোন ক্রিয়া ফলপ্রসু হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য করার এবং তার উপর দৃঢ় থাকার কারো কোনো সাধ্য নেই।

সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, তার জ্ঞান, তার ফায়ছালা এবং তার তাক্বদীর অনুসারেই সংঘটিত হয়ে থাকে। তার ইচ্ছা সমস্ত ইচ্ছার উপর জয়লাভ করে এবং তার অভিপ্রায় সমস্ত অভিপ্রায়ের উপর জয়যুক্ত হয়। তার ফায়ছালা সৃষ্টির সকল কলা-কৌশলকে পরাভূত করে। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি কখনো কারো উপর অত্যাচার করেন না। তিনি সর্ব প্রকার কলুষতা ও কালিমা হতে পবিত্র এবং সব রকম দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। পক্ষান্তরে বান্দাদের সকলেই তাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। *(সূরা আল আম্বিয়া: ২৩)*

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ কারোর উপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না"। *(সূরা আল বাকারা: ২৮৬)* আল্লাহ তা'আলা এই মর্মে আরো বলেন, ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ "আমি কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করি না"। *(সূরা আল আরাফ: ৪২)*

আবুল হাসান আশআরী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া বিবেক দ্বারা সমর্থিত। অতঃপর আবুল হাসান আশআরীর অনুসারীগণ এই মর্মে সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, শরীয়াতে এমন কোন বিষয় আছে কি, বান্দা যা কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে না? না কি এ ধরণের কোন বিষয়ের অস্তিত্ব শরীয়াতে নেই?

যারা এমন বিষয় আছে বলে মত প্রকাশ করেছে, তারা আবু তালেবের প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশকে দলীল হিসাবে পেশ করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তার নসীবে ঈমান জুটবে না এবং সে অচিরেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। এরপরও তাকে ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয়েছে। অথচ জানা কথা যে, সে ঈমান আনবে না। সুতরাং এই আদেশ পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়কে একত্রিত করার আদেশ দেয়ার শামিল। আর এটি বাস্তবায়ন হওয়া অসম্ভব।

এর জবাবে আমরা বলবো, পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়কে একত্রিত করা অসম্ভব। আবু লাহাবকে ঈমান আনয়নের আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে, অথচ আল্লাহ জানেন যে, সে ঈমান

আনবে না, তাই তাকে একটি অসম্ভব বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, আমরা এই কথা সমর্থন করি না।[২৬১] কেননা যেই শক্তি দ্বারা মানুষ ঈমান আনয়ন করতে সক্ষম হয়, তা আবু লাহাবের মধ্যে ছিল। সুতরাং সে ঈমান আনতে অক্ষম ছিলনা। তাকে কেবল সেই আদেশই দেয়া হয়েছে, যা সে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম ছিল। যেমন ইতিপূর্বে সামর্থ ও শক্তির ব্যাখ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে।[২৬২]

তবে ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ, ﴿أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ "যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় তাহলে এই জিনিসগুলোর নাম বলো তো দেখি?" *সূরা আল বাকারা: ২১।* অথচ আল্লাহ জানেন যে, তাদের কাছে ঐ জিনিসগুলোর নাম সম্পর্কে কোন ইলম নেই এবং ছবি নির্মাণকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর এই আদেশ যে, তোমরা এগুলোতে রূহ প্রদান করো। অতএব আল্লাহর এ ধরণের আদেশ দ্বারা দলীল পেশ করে এ কথা বলা যাবে না যে, অসম্ভব বিষয়ের আদেশ করা সম্ভব। কেননা এই আদেশগুলো ঐ সমস্ত আদেশ নয়, যাতে বান্দার নিকট থেকে বিশেষ কোন আমল তলব করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করার বিনিময়ে ছাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে ও তা বর্জনকারীকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। বরং এগুলো হচ্ছে অক্ষমতা ও অপারগতা প্রমাণ করার সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত।

এমনি আল্লাহর নিকট মুমিনদের দু'আ: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ "হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ো না"। *সূরা আল বাকারা: ২৮৬)*

কেননা যে ব্যক্তির যা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা নেই, তার উপর তা চাপিয়ে দেয়াকে তাকলীফ বলা হয় না। অর্থাৎ শরী'আতের বোঝা বহন করার ক্ষমতা যার নেই, তার উপর

---

[২৬১] আল্লাহ তা'আলার চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, সে ঈমান আনবেনা। তিনি সেই ইলম অনুযায়ী খবর দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর জানা শরী'আতের তাকলীফ বা আদেশ-নিষেধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

[২৬২] পূর্বে আমরা বলেছি যে, ঈমান আনয়ন করতে এবং সৎ আমল বাস্তবায়ন করতে যেই শক্তি এবং সাধ্য, সামর্থ ও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তা দুই প্রকার। একটি সৎ আমল শুরু করার পূর্বেই থাকার দরকার। অর্থাৎ আমল করার জন্য যেসব উপায়-উপকরণ, উপযুক্ত পরিবেশ, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা দরকার তা সৎ আমল শুরু করার পূর্বেই প্রস্তুত থাকতে হয়। এই প্রকার শক্তি-সামর্থ বিদ্যমান না থাকলে শরী'আতের আদেশ-নিষেধ কারো উপর প্রয়োগ করা হয় না। এটি আবু তালেবের মধ্যে বিদ্যমান ছিল বলেই তাকে ঈমান আনয়নের আদেশ দেয়া হয়েছে। এই অর্থে সকল কাফেরই ঈমান আনয়নের আদেশপ্রাপ্ত এবং এই প্রকার শক্তি থাকা সত্তেও ঈমান না আনার কারণে কাফেররা শাস্তি ভোগ করবে।

আরেক প্রকার শক্তি ও সামর্থ কাজ শুরু করার সময় বিদ্যমান থাকা দরকার। এটি না থাকলে আমল বাস্তবায়ন হয় না। এই প্রকার শক্তি আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া কোন সৎ আমলই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যদিও ব্যক্তির মধ্যে আমল করার উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকে এবং সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত হয়। এমনি আল্লাহ সাহায্য ছাড়া কোন পাপাচার থেকেই বিরত থাকা সম্ভব নয়। চলমান অধ্যায়ে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শরী'আতের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া বৈধ নয়। যে ব্যক্তি পাহাড় বহন করার শক্তি রাখে না, তার উপর যদি তা চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না।

ইবনুল আনবারী (রহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যা আদায় করা আমাদের জন্য কঠিন। যদিও আমরা কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখি।

ইবনুল আনবারী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, আরবদের জ্ঞান ও বিবেক-বোধশক্তি অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করেছেন। কেননা আরবদের কেউ যাকে ঘৃণা করে, তাকে সম্বোধন করে বলেঃ আমি তোমার দিকে দৃষ্টি দেয়ার ক্ষমতা রাখিনা। অথচ সে তার দিকে তাকিয়ে দেখার ক্ষমতা রাখে। তবে তার দিকে তাকাতে গেলে কষ্ট হয়।

বান্দাকে এই উদ্দেশ্যে পাহাড় বহন করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হিকমতে ইলাহীর দাবীতে বৈধ নয় যে, সে যদি পাহাড় বহন করে, তাহলে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে এবং তা বহন করতে অস্বীকার করলে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি কাউকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন করেন না।

আশআরী ও মুতাযিলাদের কেউ কেউ বলেছেন, বান্দা যেই আমল করতে অক্ষম, বান্দাকে তার দায়িত্ব দেয়া বৈধ নয়। তবে উক্ত আমলের বিপরীতটি করার মধ্যে মাশগুল থাকার কারণে যে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, তাকে সেই কাজের দায়িত্ব অর্পন করা বৈধ।

এদের কথার তাৎপর্য ইসলামের ইমামদের কথার সাথে মিলে যায়, কিন্তু বান্দা যেই আমল বর্জন করে থাকে, তার বিপরীতটিতে লিপ্ত থাকার কারণেই বান্দাকে তা বর্জনকারী হিসাবে নির্ধারন করা শরী'আত ও ভাষাগত দিক থেকে একটি বিদ'আত হিসাবে গণ্য। কেননা এই কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বান্দা যা করে না, বান্দা তা করার সামর্থ ও শক্তি রাখে না। তারা এই মাযহাবকেই নিজেদের জন্য স্থির করে নিয়েছে। তারা বলেছে যেই শক্তি সামর্থ, উপায়-উপকরণ এবং কাজ বাস্তবায়নের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাই শক্তি। এটি কাজ বাস্তবায়নের সময়ই অর্জিত হয়। তাই তারা বলেছে, যে ব্যক্তি কোন কাজ করেনি, সে তা করার শক্তি রাখেনি বলেই করেনি।

এ কথা কুরআন সুন্নার দলীল এবং সালাফে সালেহীনের ইজমার পরিপন্থী। সেই সাথে অধিকাংশ বিবেকবানদের মতেরও পরিপন্থী। ইতিপূর্বে الاستطاعة শক্তি, সামর্থ, উপায়-উপকরণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এই দিকে

ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২৬৩]

আমল শুরু করার সময় এবং আমল চলাকালে আমল করার যেই শক্তি-সামর্থ (আল্লাহর তাওফীক) অর্জিত হয়, তা শরী'আতের আদেশ-নিষেধ প্রদান করার জন্য শর্ত নয়। বান্দার মধ্যে যেহেতু কাজ করার প্রকৃত ইচ্ছা রয়েছে, অর্থাৎ মানুষকে যেহেতু ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সে যেহেতু স্বীয় ইচ্ছায় কাজ করবে কি করবে না, তা নির্বাচন করতে পারে, তাই তাকে শরী'আতের আদেশ বাস্তবায়ন করার এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে।

মুতাযিলারা কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা দলীল পেশ করে যে, ﴿مَاكَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ "তারা (আল্লাহর কথা) শুনতেও পারতো না এবং তারা নিজেরা (আল্লাহর নিদর্শন) দেখতেও পেতোনা"। (সূরা হুদ: ২০)

মূসা আলাইহিস সালাম এর সফর সঙ্গী খিযির আলাইহিস সালাম মূসাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ "আপনি আমার সাথে সবর করতে পারবেন না"। *(সূরা কাহাফ: ৬৭)*

এখানে আয়াত দ্বয়ে শ্রবণ করার ও সবর করার প্রকৃত শক্তি উদ্দেশ্য। সবর করার উপায়-উপকরণ এবং মাধ্যম উদ্দেশ্য নয়। বরং সেই শক্তি (আল্লাহর তাওফীক) উদ্দেশ্য, যা মুমিন বান্দার আমল শুরু করার সময় থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শুনতে না পারার কারণে এইসব কাফেরদেরকে দোষারোপ করেছেন। অর্থাৎ শ্রবণ করার জন্য তাদের উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকা এবং শ্রবণ করার পর তা অনুধাবন করার ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তারা সুযোগ কাজে লাগায়নি, তাই তাদেরকে দোষারোপ করা হয়েছে। এখানে যদি শ্রবণ করার ঐ শক্তি (তাওফীক) উদ্দেশ্য হতো, যা কাজ করার সময় অর্জিত হয়, তাহলে সকল সৃষ্টিই শ্রবণ করতে অক্ষম হতো এবং এদেরকে না শোনার কারণে বিশেষভাবে দোষারোপ করাও নিরর্থক হতো। তবে আসল কথা হচ্ছে এরা সত্যকে অপছন্দ ও ভারী মনে করে বলে সত্যকে শ্রবণ করতে পারে না। সত্যকে না শোনার কারণ সত্যের বাহকের সাথে তাদের হিংসা থাকা কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণে হতে পারে।

মূসা আলাইহিস সালাম খিযিরের কাজের উপর সবর করতে পারেনি।[২৬৪] কেননা তিনি

---

[২৬৩] এ সকল কথার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, মুতাযিলাদের মতে বান্দা শুধু একটি শক্তি দ্বারা কাজ সম্পন্ন করে এবং আল্লাহ শুধু কাজ করার একটি শক্তিই সকলকে সমানভাবে দিয়েছেন। সেটি কাজ করার সময়ই হয়ে থাকে। তারা الاستطاعة। তথা শক্তি ও সামর্থকে কাজ করার জন্য শরীর সুস্থ থাকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা ও উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকা এবং আল্লাহর তাওফীক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতী নয়।

[২৬৪] মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সবর করা তো দূরের কথা; বরং তার উপর খিযির (আলাইহিস সালাম) এর কাজগুলোর প্রতিবাদ করাই ওয়াজিব ছিল। কারণ তিনি দেখছিলেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যেই শরী'আত নিয়ে এসেছেন, তার সুস্পষ্ট

বাহ্যিকভাবে শরী'আতের বিরোধীতা হতে দেখছিলেন। আর তার নিকট খিযির আলাইহিস সালাম এর কাজের গভীর রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না।

আরবদের ভাষা এবং অন্যসব জাতির ভাষাতেও এ রকম কথা বলা হয়। যে ব্যক্তি অন্যকে অপছন্দ করে, তার সম্পর্কে বলা হয় যে, সে তার অপছন্দের লোকটির প্রতি অনুগ্রহ করতে পারে না। তাকে অত্যন্ত অপছন্দ ও ঘৃণা করার কারণেই এমন বলা হয়। আসলেই যে সে তাকে সাহায্য করার মত ক্ষমতা রাখে না এমনটি নয়। আর যে ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে তার ব্যাপারে বলা হয়, সে অমুককে (তার প্রিয় ব্যক্তিকে) শাস্তি দিতে সক্ষম নয়। তাকে অত্যন্ত ভালোবাসার কারণেই এমনটি বলা হয়। মূলত বিষয়টি এমন নয় যে, আসলেই সে তাকে শাস্তি দিতে অক্ষম। সুতরাং একটু বাড়িয়ে এভাবে প্রত্যেক ভাষাতেই বলা হয়। যেমন বলা হয় لأضربنه حتى يموت আমি তাকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রহার করবো। আসলে এখানে পিটিয়ে মেরে ফেলা উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রচুর ও শক্তভাবে প্রহার করা উদ্দেশ্য। সুতরাং এগুলো কোন দলীল নয়। বান্দাদেরকে যদি তাদের খেয়াল খুশী ও মর্জি মোতাবেক আদেশ দেয়া হতো, তাহলে আসমান-যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ﴾

"আর সত্য যদি কখনো তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যকার সবকিছুর ব্যবস্থাপনা উলট পালট হয়ে যেতো। বরং আমি তাদেরকে এমন কিতাব দিয়েছি, যাতে তাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। অতঃপর তারা নিজেদের জন্য প্রেরিত কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে"। *(সূরা আল মুমিনুন: ৭১)*

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ)এর উক্তি, ولا يطيقون إلا ما كلفهم ...الخ আল্লাহ তাদেরকে যা করার শক্তি দিয়েছেন, তারা কেবল তাই করতে সক্ষম। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা করার শক্তি দেন, তারা কেবল তাই করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে হিদায়াতের পথে থাকার যেই তাওফীক দান করে এই প্রকার শক্তি সেই তাওফীকের মধ্যে শামিল। আমল করার জন্য শারীরিক যেই সুস্থতা, সামর্থ্য, শক্তি এবং উপায়-উপকরণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকার দরকার হয়, তা উদ্দেশ্য নয়।

لا حول ولا قوة إلا بالله অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ কোনো অন্যায় কর্ম করা হতে বিরত থাকতে পারে না এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ সৎ কাজ করারও ক্ষমতা

বিরোধীতা হচ্ছে। এখান থেকে দীনের দাঈদেরকেও শিক্ষা নিতে হবে এবং শরী'আত বিরোধী কাজ হতে দেখলে মুখে তালা লাগিয়ে রাখা যাবে না।

রাখে না, -এটিই তাক্বদীর সাব্যস্ত করার দলীল। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তার কথার মধ্যে একটি সমস্যা রয়েছে। কেননা তাকলীফ কথাটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বান্দাকে কাজ করার উপর সক্ষম করা অর্থে ব্যবহৃত হয় না। শুধু শরী'আতের আদেশ ও নিষেধ অর্থেই তাকলীফ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ "আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর তাদের সাধ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেননি। আর আল্লাহ তাদেরকে যা করার শক্তি দিয়েছেন, তারা কেবল তাই করতে সক্ষম"।

এখানে যে দু'টি বাক্য রয়েছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় বাক্যের অর্থ একই। বাক্য দু'টির মর্মার্থ সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর যে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশী দায়িত্ব পালন করার সামর্থ্য তাদের রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য সহজ ও হালকা করার ইচ্ছা করেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ "আল্লাহ তোমাদের সাথে নরম নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে চান না"। *(সূরা আল বাকারা: ১৮৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ "আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে শরী'আতের বিধি-নিষেধ হাল্কা করতে চান। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে"। *(সূরা আন নিসা: ২৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি"। *সূরা আল হাজ্জ:৭৮।*

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যা ফরয করেছেন, তার উপর যদি আরো কিছু বাড়িয়ে দিতেন, তাহলেও আমরা তা পারতাম। কিন্তু তিনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করে আমাদের উপর দীনকে সহজ করে দিয়েছেন। আমাদের উপর দীনের মধ্যে কঠিন কিছু চাপিয়ে দেননি।

সুতরাং এভাবেই উপরোক্ত সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। "আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর তাদের সাধ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেননি। আর আল্লাহ তাদেরকে যা করার শক্তি দিয়েছেন, তারা কেবল তাই করতে সক্ষম"। এখানে শক্তি বলতে তাওফীক উদ্দেশ্য। আমল করার জন্য যেই বাহ্যিক শক্তি তথা স্বাস্থ্য ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা এবং উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকার দরকার, এখানে তা উদ্দেশ্য নয়।

অতএব ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তির মধ্যে ভেজাল রয়েছে। সুতরাং বিষয়টি ভালভাবে বুঝা উচিত।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, তার জ্ঞান, তার ফায়ছালা এবং তার তাক্বদীর অনুসারেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এখানে ক্বদ্বা ও কাদার বলতে আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণগত তাক্বদীর ও ফায়ছালা উদ্দেশ্য; শরী'আতের ফায়ছালা ও হুকুম উদ্দেশ্য নয়। কেননা ক্বদ্বা বা ফায়ছালা কখনো সৃষ্টি করা ও নির্ধারণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো শরী'আতের হুকুম-আহকাম অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমনি আল্লাহর ইচ্ছা, আদেশ, অনুমতি, লেখা, হুকুম, হারাম, কালেমা এবং এই ধরণের অন্যান্য বিষয়ও দুইভাগে বিভক্ত হয়। (১) সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ফায়ছালা, ইচ্ছা, আদেশ ইত্যাদি এবং (২) শরী'আতগত ফায়ছালা, ইচ্ছা, আদেশ ইত্যাদি।

সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ফায়ছালার উদাহরণ হচ্ছে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

"অতঃপর তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আসমান বানালেন এবং প্রত্যেক আসমানে তিনি তার বিধান অহী করলেন। আর পৃথিবীর আসমানকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং ভালভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম। এসবই এক মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নির্ধারণ"। *(সূরা হামীম সাজদাহ: ১২)*

আর ক্বদ্বায়ে শরঈ ও দীনি তথা যেই ক্বদ্বা শরী'আতের আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী: আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"তোমার রব এ ফায়ছালা দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ২৩)*

ইরাদায়ে কাওনীয়া সৃষ্টিগত ইচ্ছা এবং শরী'আতগত ইচ্ছার আলোচনা ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি لايكون إلا ما يريد আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, কেবল তাই হয়, -এই কথার উপর আলোচনা করার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।[২৬৫]

---

[২৬৫] **ইরাদাহ কাওনীয়া এবং ইরাদা শারঈয়া বা আল্লাহর সৃষ্টিগত ও শরী'আতগত ইচ্ছা:**

আল্লাহ তা'আলার إرادة ইরাদাহ (ইচ্ছা) দু'প্রকার। (১) আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা। অর্থাৎ ভাল-মন্দ এমনকি পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতেই সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্ধারিত হয়েছে। এই প্রকার ইরাদাহ এবং

المشيئة একই জিনিস। উভয়টি পরস্পর সমার্থবোধক। এই প্রকার ইরাদাহএর উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ "আমি যখন কোনো জনবসতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ দেই, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে। অতঃপর আযাবের ফায়ছালা সেই জনবসতির উপর বলবত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে দেই"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾

আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলী বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়ছালা করে ফেলেন তখন কারো প্রতিহত করায় তা প্রতিহত হয় না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এমন জাতির কোন সাহায্যকারী থাকে না"। (সূরা রা'দঃ ১১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا "আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন"।

আর দ্বিতীয় প্রকার ইরাদাহ হচ্ছে إرادة دينية شرعية ইরাদায়ে দীনীয়া শারঈয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শরী'আতগত ইচ্ছা। এই প্রকার ইচ্ছার মাধ্যমেই তিনি তার বান্দাদের উপর শরী'আতের সকল হুকুম-আহকাম বিধিবদ্ধ করেছেন। এর উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী:

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨) ﴾

"আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির লালসার অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে বিধি-নিষেধ হাল্কা করার ইচ্ছা করেন। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে"। (সূরা নিসা: ২৭-২৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

আল্লাহ তোমাদের উপর কোন প্রকার সংকীর্ণতা করে দেয়ার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিতে, যাতে তোমরা শোকর গুজার হও"। (সূরা মায়িদা: ৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িওনা। ছলাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো ইচ্ছা করেন তোমাদের নবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে"। (সূরা আহযাব: ৩৩)

ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শরঈয়ার মধ্যে পার্থক্য:

(১) ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছার মাধ্যমে যা হয়, আল্লাহ কখনো তাকে ভালোবাসেন ও তাতে সন্তুষ্ট থাকেন আবার কখনো তা তিনি ভালবাসেন না এবং উহার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না।

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত আদেশের উদাহরণ হলো যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে এই বলে আদেশ করেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়"। *(সূরা ইয়াসীন: ৮২)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَافَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ।﴾

"আমি যখন কোনো জনবসতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার বিত্তশালী লোকদেরকে নির্দেশ দেই, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর আযাবের ফায়ছালা সেই জনবসতির উপর বলবত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে দেই"। *(সূরা বানী ইসরাঈল: ১৬)*

আর ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে যা সংঘটিত হয়, তাকে তিনি অবশ্যই ভালোবাসেন এবং উহার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন। সুতরাং সকল প্রকার পাপকাজ এবং অকল্যাণও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শামিল। সে হিসাবে সৃষ্টি ও নির্ধারণগত দিক থেকে তিনি পাপাচারিতা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পাপ কাজকে ভালবাসেন না এবং উহার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না।

(২) ইরাদায়ে কাওনীয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা সৃষ্টি করাই মূল উদ্দেশ্য হয় না; বরং তা অন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইবলীস এবং সকল প্রকার পাপাচারিতা ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে মানুষ নফ্সে আম্মারা ও শয়তানের সাথে সদা জিহাদে লিপ্ত থাকে এবং শয়তানের খপ্পরে পতিত হয়ে মানুষ পাপকাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও আল্লাহর কাছে তাওবা করে এবং ক্ষমা চায়। এমনি আরো ভালো উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন।

ঐদিকে ইরাদায়ে শরঈয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা মূলতই উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি ও শরী'আতগত এই উভয় দিক থেকেই ইচ্ছা করেছেন যে, বান্দারা আনুগত্য করুক। কেননা তিনি আনুগত্যের কাজকে ভালবাসেন এবং উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

(৩) আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে কাওনীয়া অবশ্যই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, সাথে সাথে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে এই বলে হুকুম করেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। পবিত্র সেই সত্তা, যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"। (সূরা ইয়াসীন: ৮২-৮৩)

আর আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে শারঈয়া সকল ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়। কখনো তা সংঘটিত হয়, আবার কখনো হয় না।

এই আয়াতে যেই নির্দেশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত নির্দেশ কিনা সে বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে সর্বাধিক শক্তিশালী মত হচ্ছে এখানে সৃষ্টি, প্রকৃতি ও নির্ধারণগত নির্দেশ উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলার যেই আদেশ দ্বারা কোন হুকুম সাব্যস্ত করা হয়, তাকে শরী'আতের আদেশ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ﴾

"আল্লাহ ন্যায়-নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদের দান করার হুকুম দেন। তিনি অশ্লীল-নির্লজ্জতা, অন্যায় এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন"। *(সূরা আন নাহাল: ৯০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

"হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করার সময় আদল ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো"। *(সূরা আন-নিসা: ৫৮)*

এমনি আল্লাহর অনুমতিও দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইযনে কাওনী ও ইযনে শারঈ। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, প্রকৃতি ও নির্ধারণগত ইযন বা অনুমতি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এমন অনুমতি, যা শরী'আতের আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর এই বাণীতে সৃষ্টিগত অনুমতির বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ﴾

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া যাদুর মাধ্যমে তারা কারো ক্ষতি করতে পারতোনা"। *(সূরা আল বাকারা: ১০২)*

এখানে আল্লাহর অনুমতি বলতে তাক্বদীর বা নির্ধারণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যাদুও যেহেতু আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি, তাই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তা প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু এটি আল্লাহর এমন অনুমতি, যাতে আল্লাহর ভালোবাসাকে আবশ্যক করে না।

আর আল্লাহর যেই অনুমতি তার হুকুম অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾

খেজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছো কিংবা যেসব গাছকে তার মূলের উপর আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা সবই ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে। আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছিলেন এ জন্য যাতে তিনি ফাসেকদেরকে লাঞ্ছিত করেন। *(সূরা আল হাশর: ৫)*

এমনি আল্লাহর কিতাব তথা লিখনও দু'প্রকার। (১) এমন লিখন, যা তাক্বদীর বা সৃষ্টিগত নির্ধারণ অর্থে ব্যবহৃত। এই প্রকার লিখন কখনো পরিবর্তন হয় না। এটি অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"কোন আয়ু লাভকারী আয়ু লাভ করলে এবং কারো আয়ু কিছু কম করা হলে তা অবশ্যই একটি কিতাবে লেখা থাকে। আল্লাহর জন্য এসব একদম সহজ"। (সূরা ফাতির: ১১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

আর যাবুরে আমি উপদেশের পর একথা লিখে দিয়েছি যে, যমীনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দারা"। (সূরা আম্বীয়া: ১০৫)

আর যেই কিতাব বা লিখন শরী'আতের আদেশ ও হুকুম-আহকাম অর্থে ব্যবহৃত হয়, উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ ﴾

"তাওরাতে আমি ইয়াহূদীদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্য সমপর্যায়ের বদলা"। *(সূরা আল মায়িদা: ৪৫)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো"। *(সূরা আল বাক্বারা: ১৮৩)*

আল্লাহর হুকুমও দুই প্রকার। হুকমে কাওনী তথা সৃষ্টি ও নির্ধারণগত হুকুম এবং আরেকটি হচ্ছে শরী'আতের হুকুম, যা আদেশ বা নিষেধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর ছেলের উক্তির মধ্যে হুকমে কাওনীর বর্ণনা এসেছে, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾

"এখন আমি তো এখান থেকে কখনোই যাবোনা যে পর্যন্ত না আমার বাপ আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোন ফায়ছালা করে দেন, কেননা তিনি সবচেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী"। *(সূরা ইউসুফ: ৮০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾

"রাসূল বললো, হে আমার রব! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়ছালা করে দাও। তোমরা যেসব কথা তৈরি করছো তার মুকাবিলায় আমাদের দয়াময় রবই আমাদের সাহায্যকারী সহায়ক"। *(সূরা আম্বীয়া: ১১২)*

আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে যেই হুকুমের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা শরী'আতের হুকুম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾

"তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত সব পশুই হালাল করা হয়েছে। তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া। কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না। আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন"। (সূরা মায়িদা: ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"এটা আল্লাহ্‌র হুকুম; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়ছালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়"। (সূরা মুমতাহানা: ১০)

সুতরাং উপরোক্ত দুই আয়াতে যে হুকুমের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা শরী'আতের বিধানাবলী এবং হালাল-হারাম ইত্যাদি হুকুম-আহকাম উদ্দেশ্য।

হারামও দুই প্রকার। এক প্রকার হারামের সম্পর্ক হচ্ছে সৃষ্টি, নির্ধারণ ও ফায়ছালার সাথে সম্পৃক্ত। আরেকটি হচ্ছে ঐসব বিষয় ও বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা ইসলামী শরী'আতের মধ্যে হারাম করেছেন। প্রথম প্রকার হারামের বর্ণনা এসেছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে:

﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

"আল্লাহ জবাব দিলেন, ঠিক আছে, তাহলে। ঐ দেশটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে, এ নাফরমানদের প্রতি কখনো সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করো না"। (সূরা মায়িদা: ২৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

"আর যে জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তার অধিবাসিরা আবার ফিরে আসবে, এটা সম্ভব নয়"। (সূরা আম্বীয়া: ৯৫)

এখানে হারাম দ্বারা শরী'আতের হারাম উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর ফায়ছালা ও নির্ধারণগত হারাম উদ্দেশ্য।

আর শরী'আতের হারামের কথা বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতজীব, রক্ত, শূকরের গোশ্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহকৃত পশু এবং কণ্ঠরুদ্ধ করে হত্যাকৃত প্রাণী, লাঠির আঘাতে নিহত প্রাণী, উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে মৃত পশু, অন্য পশুর আঘাত খেয়ে বা অন্য পশুর শিং এর আঘাতে নিহত প্রাণী, কোন হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন জীব, তবে এ ধরণের প্রাণীকে জীবিত পেয়ে তোমরা যবেহ করতে পারলে সেটি ছাড়া। আর যা কোন বেদীমূলে যবেহ করা হয়েছে তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য জায়েয নয়। এগুলো ফাসেকীর কাজ"। *(সূরা আল মায়িদা: ৩)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগিনী ও তোমাদের সেই সমস্ত মাকে যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা ও তোমরা তোমাদের যেসব স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছ, ঐসব স্ত্রীদের মেয়েদের ঐসব কন্যাকেও বিবাহ করা হারাম, যারা তোমাদের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছে, তবে যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো, তাহলে তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করতে কোন অসুবিধা নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও। আর দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। *(সূরা আন নিসা: ২৩)*

এই আয়াতে এবং পূর্বের আয়াতে যেই হারামের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা শরী'আতের হারাম উদ্দেশ্য। যাতে লিপ্ত হতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন।

এমনি আল্লাহ তা'আলার কালিমা দু'প্রকার। সৃষ্টি, নির্ধারণ ও ফায়ছালা সম্পর্কিত কালেমা এবং এমন কালেমা, যার সম্পর্ক শরী'আতের হুকুম-আহকামের সাথে। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে আল্লাহর সৃষ্টি, নির্ধারণ ও ফায়ছালাগত কালেমার উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾

"এভাবে বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তোমার রবের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। কারণ তারা সবর করেছিল।"। *(সূরা আল আরাফ: ১৩৭)*

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণীতেও কালেমায়ে কাওনীয়ার কথা এসেছে। তিনি বলেন,

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির অনিষ্ট হতে ঐ সমস্ত কালেমার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলো কোন নেককার কিংবা বদকারের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়"।[২৬৬]

আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে কালেমায়ে শরঈয়ার কথা এসেছে। এর দ্বারা শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও বিধানাবলী উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾

"স্মরণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হলেন"। *(সূরা আল বাকারা: ১২৪)*

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, يفعل مايشاء وهو غير ظالم أبدا আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি কখনো কারো উপর যুলুম করেন না। কুরআনের একাধিক আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাকে বান্দাদের উপর যুলুম করা থেকে পবিত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সত্তা যুলুম থেকে পবিত্র, এটা কাদারীয়া এবং জাবরীয়া সম্প্রদায়ের মতের মাঝামাঝি একটি কথা আবশ্যক করে। সুতরাং বনী আদমের যেসব

[২৬৬] মুসনাদে আহমাদ, (৩/৪১৯)। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলা ছ্বহীহা, হা/৮৪০।

কাজ যুলুম ও নিকৃষ্ট বলে গণ্য হয়, সে কাজগুলো সৃষ্টি করার দিক থেকে আল্লাহর দিকে সম্বোধিত হলে তা নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে না। যেমন বলে থাকে মুতাযিলা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা।[২৬৭] বান্দার পক্ষ হতে যে যুলুম হয়, তাকেই আল্লাহর যুলুম মনে

---

[২৬৭] বনী আদমের দ্বারা যেসব কাজ সংঘটিত হয়, তার মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দ উভয়েরই স্রষ্টা। বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মন্দ কাজও সৃষ্টি করেছেন। তাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। অপর দিকে তিনি ভাল সৃষ্টি করেছেন এবং তা সম্পাদন করার আদেশও দিয়েছেন। বান্দা তা সম্পাদন করুক, -তিনি এটা পছন্দও করেন। কিন্তু পাপাচারকে যেহেতু তিনি পছন্দ করেন না, তাই তাতে লিপ্ত হওয়ার আদেশও দেন না; বরং তা থেকে নিষেধ করেন। তবে তিনি মন্দেরও স্রষ্টা। তিনি কেন মন্দ সৃষ্টি করেছেন? তার জবাব এই পুস্তকের একাধিক স্থানে প্রদান করা হয়েছে। তিনি তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই উহা সৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়া এটি জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা মহান স্রষ্টা, তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক এবং রাজত্ব একমাত্র তারই। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তার কাজে কোন আপত্তি উত্থাপন করা অন্যায়।

মুতাযিলারা বলে, বান্দার কাজ বান্দা নিজেই করে। কারণ তার কাজের মধ্যে যুলুমও রয়েছে। যদি বলা হয়, বান্দার কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা, তাহলে আবশ্যক হয় যে, তিনি যুলুমও করেন। সুতরাং তিনি যেহেতু যুলুম সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি নিজেও যুলুম থেকে মুক্ত নন। নাউযুবিল্লাহ অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যুলুম থেকে পবিত্র রেখেছেন। কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল দ্বারাই তা প্রমাণিত। মুতাযিলারা আল্লাহ তা'আলাকে যুলুম থেকে পবিত্র করতে গিয়ে বলেছে, বান্দার কাজ বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে; আল্লাহ তা'আলা নন। কারণ তাদের মতে আল্লাহ তা'আলার দ্বারা যুলুম সৃষ্টি হওয়া আর বান্দার দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া একই কথা। তারা যেহেতু যুলুম ও পাপাচার সৃষ্টির পিছনে হিকমতে ইলাহী বুঝতে না পেরে নিজেদের বোধশক্তির উপর নির্ভর করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যুলুম সৃষ্টি হওয়াকেই অস্বীকার করেছে, তাই আমরাও যুক্তি দিয়ে বলবো যে, (১) কোন শিক্ষক যদি তার ছাত্রদেরকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্নপত্রে ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন রাখে এবং বলে সঠিক হলে এই চিহ্ন (✓) এবং ভুল হলে এই চিহ্ন (✗) দাও, সে ক্ষেত্রে ছাত্ররা যদি সব স্থানেই এই চিহ্ন (✓) দেয় কিংবা কিছু ভুলকেও সঠিক বলে চিহ্নিত করে, তাহলে শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করা হয় না। শিক্ষক ভুল বা ছাত্রের উপর যুলুম করেছে, তাও বলা হয় না। কারণ তিনি প্রশ্নপত্রে ভুল-শুদ্ধ করণ সংক্রান্ত প্রশ্ন রেখেছেন ছাত্রকে পরীক্ষা করার জন্য।

আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। তাই শিক্ষকের কাজকে আল্লাহর কাজের সাথে তুলনা করছি না। বিষয়টি সহজভাবে বুঝানোর জন্য এবং যুক্তির জবাব যুক্তি দ্বারা প্রদান করার জন্যই উদাহরণটি পেশ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে মানুষের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র স্বরূপ করেছেন। এতে তিনি ভুল-শুদ্ধ এবং ভাল-মন্দ উভয়ই সৃষ্টি করেছেন। এতে আল্লাহ তা'আলা মোটেই দোষী হতে পারেন না। কেউ যদি খারাপ কাজে লিপ্ত হয় তাতেও তিনি দোষী নন। ভুল প্রশ্নকে সঠিক হিসাবে সাব্যস্তকারী ছাত্রের ন্যায় বান্দাই দোষী হয়। মহান পরীক্ষক বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যই মদ, চুরি ব্যভিচার ইত্যাদি পাপাচার সৃষ্টি করেছেন।

(২) আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র এক কথায় সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এতে অন্য কারো কোন অংশিদারিত্ব নেই। যুলুম বলা হয়, অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করাকে। সুতরাং সবকিছুর মালিক যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাই তার মালিকানায় তিনি যা করেন, তা কখনো যুলুম বলে গণ্য হবে না। তিনি যা করেন, তার মালিকানাতেই করেন। এতে কারো আপত্তি করার কিছু নেই।

(৩) আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবকিছুর স্রষ্টা, তাই যুলুম এবং মন্দও সবকিছুর মধ্যে শামিল। বান্দা যুলুম করে বলেই আল্লাহকে দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন আপনি একজন রং মিস্ত্রির সাথে আপনার দেয়ালে উন্নত মানের রং লাগানোর চুক্তি করলেন। এখন সে যদি দেয়ালে রং লাগায়, তাহলে রং লাগানোর কাজটি রং মিস্ত্রির দিকেই সম্বোধিত হয়। সে যদি রং এর কারখানা থেকে ভাল রং ক্রয় করে এবং তা দেয়ালে লাগায়, তাহলে তার দিকেই রং করা কাজটি সম্বোধিত হয় এবং খারাপ রং লাগালেও তার দিকেই কাজটির সম্বোধন করা হয়। খারাপ রং লাগালে আপনার জন্য এই কথা বলা অযৌক্তি হবে যে, আমি রং এর কারখানাটিই ভেঙ্গে ফেলবো। কারণ কারখানায় খারাপ রং তৈরী হওয়ার কারণেই আমার দেয়ালে খারাপ রং লেগেছে।

করা আল্লাহকে বান্দার সাথে তুলনা করার শামিল এবং তাকে বান্দার উপর কিয়াস করার মতই। আল্লাহ হলেন সবকিছুর প্রভু, অমূখাপেক্ষী এবং সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। বান্দারা হলো দুর্বল, অসহায় ও আল্লাহর বশীভূত।

সেই সাথে যুলুম করা এমন কোন অসম্ভব বিষয় নয়, যা করতে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম নন। যেমন বলে থাকে তর্কশাস্ত্রবিদ এবং অন্যরা। তারা বলে সৃষ্টির মধ্যে যুলুম বলতে কিছু নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যাই সৃষ্টি করেন অথবা আল্লাহর পক্ষ হতে যা কিছু হয়, তার সবই ন্যায়সঙ্গত। যুলুম শুধু তাদের পক্ষ থেকেই হয়, যারা অন্যের দ্বারা আদেশ কিংবা নিষেধপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যুলুম কেবল বান্দার দ্বারাই হয়। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কারো দ্বারা আদেশ বা নিষেধপ্রাপ্ত নন, তাই তার দ্বারা যুলুম হওয়া অকল্পনীয়। তাদের এই কথা সঠিক নয়।[২৬৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾

"আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সেই সাথে মুমিনও হবে, তার প্রতি কোনো যুলুম বা অধিকার হরণের আশঙ্কা নেই। (সূরা তোহা: ১১২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

"আমার কথার কোন রদবদল হয় না। আর আমি বান্দাদের জন্য যালেমও নই। ক্বফ: ২৯। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুখরুফের ৭৬ নং আয়াতে আরো বলেন,

---

আপনার এই কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ কারখানা শুধু একটি মাত্র খারাপ রং তৈরী করেনি; বরং তাতে ভালো-খারাপ সব মিলে শতাধিক রং তৈরী হতে পারে। আর কারখানা রং মিস্ত্রিকে খারাপ রং ক্রয় করতে বাধ্যও করেনি। সকল প্রকার রং এর গুণাগুণ তার সামনে বর্ণনা করার পর নিজের ইচ্ছায় মিস্ত্রি সস্তা রং নির্বাচন করেছে বলে তাকেই দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত। কারখানাকে দোষারোপ করা অযৌক্তিক।

সুতরাং মুতাযিলারা নিজিদেরকে যুক্তিবাদী দল বলে দাবী করে আল্লাহর জন্য ন্যায় বিচার সাব্যস্ত করতে গিয়ে এবং তাঁকে যুলুম থেকে পবিত্র করতে গিয়ে বান্দার অন্যায় আমল আল্লাহর সৃষ্টি নয় বলে যে যুক্তি পেশ করেছে, তা যুক্তির আওতায় পরে না। ভাল-মন্দ সবকিছু সৃষ্টির পিছনে হিকমতে ইলাহীকে বুঝতে না পেরেই তারা এই খোঁড়া যুক্তি পেশ করেছে।

প্রকৃত কথা হলো আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ভালোটি করার এবং মন্দটি বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় সেটি নির্বাচন করার শক্তি ও সামর্থও দিয়েছেন। এখন বান্দা যদি ভালো কাজ করে, তাহলে বান্দাই প্রশংসিত হবে। আর খারাপ করলে তাকেই নিন্দা করা হবে। মন্দের সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলাকে দোষারোপ করা যাবে না। এই কথা বলা যাবেনা যে, আল্লাহ তা'আলা মন্দ সৃষ্টি করেন না; বরং বান্দাই মন্দ সৃষ্টি করে। কারণ আল্লাহর রাজত্ব ও মালিকানায় অন্য কারোর কোন সৃষ্টি নেই।

[২৬৮] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, বনী আদমের দ্বারা যেই যুলুম ও পাপাচার হয়, তাও যেহেতু তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি বান্দার উপর যুলুম করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি নিজ অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে বান্দার উপর সামান্যতম যুলুমও করেন না।

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾

"আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই যুলুম করেছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফের ৪৯ আয়াতে আরো বলেন,

﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

"তারা যা কিছু করেছে, সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি যুলুম করবেন না"। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনের ১৭ নং আয়াতে বলেন,

﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

"আজ প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোন যুলুম হবে না। আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী"।

সুতরাং উপরোক্ত আয়াতগুলো তর্কশাস্ত্রবিদদের কথাকে বাতিল সাব্যস্ত করে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুর পক্ষ হতে বর্ণনা করে বলেন,

« يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا»

"হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের উপর যুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও ইহাকে হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না"।[২৬৯]

এই হাদীছও কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোকে সমর্থন করে। এই হাদীছ দু'টি বিষয়ের প্রমাণ করে। (১) আল্লাহ তা'আলা তার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছেন। সুতরাং যুলুম করা যদি আল্লাহর ক্ষমতাধীন না হতো, তাহলে এ কথা বলতেন না যে, তিনি তা নিজের উপর হারাম করেছেন। (২) তিনি যেমন সংবাদ দিয়েছেন যে, যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করেছেন, ঠিক তেমনি সংবাদ দিয়েছেন যে, সৃষ্টির উপর রহম করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন। সুতরাং যারা বলে, যুলুম কেবল ঐ ব্যক্তিই করার ক্ষমতা রাখে, যে অন্যের দ্বারা আদেশ বা নিষেধপ্রাপ্ত হয়, আর আল্লাহ তা'আলা তেমন নন, -তাদের এই যুক্তি বাতিল।[২৭০]

---

[২৬৯] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩৭।

[২৭০] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবকিছুই করতে সক্ষম, তাই তার দ্বারা যুলুম হওয়াও সম্ভব। তবে তিনি অনুগ্রহ স্বরূপ নিজের উপর যুলুম করা হারাম করেছেন। যারা বলে আল্লাহর দ্বারা যুলুম হওয়া মোটেই সম্ভব নয় কিংবা তিনি যুলুম করতে সক্ষম নন, সেসব বাতিলপন্থীদের জবাব দেয়ার জন্য এই কথা বলা হয় যে, যুলুম আল্লাহর দ্বারা হওয়া সম্ভব। আক্বীদাহ হিসাবে সাব্যস্ত করার জন্য নয়। আমরা সাধারণভাবে এই আক্বীদাহ পোষণ করিনা যে, আল্লাহ তা'আলা যুলুম করেন। কেননা তিনি তার নিজ সত্তাকে যুলুম থেকে পবিত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা

তাদের যুক্তির জবাবে আরো বলা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপর রহম করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন এবং যুলুম করাকে তার উপর হারাম করেছেন। সুতরাং তিনি নিজের উপর কেবল এমন জিনিসই আবশ্যক করেছেন এবং এমন জিনিসকে নিজের উপর হারাম করেছেন, যা তিনি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। তিনি অসম্ভব কিছুকে নিজের উপর হারাম করেন নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ "সে কোন যুলুম বা অধিকার হরণের আশঙ্কা করবে না", সূরা ত্বহা:১১২।

-সালাফগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যুলুমের আশঙ্কা নেই, এই কথার অর্থ হলো এক বান্দার উপর অন্যের পাপের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে না। الهضم অর্থ হলো কমিয়ে দেয়া। অর্থাৎ কারো সৎ আমলের ছাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ "কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৫)

আরো বলা হবে যে, মানুষ এমন কোন জিনিসকে কখনো ভয় করে না, যা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ কোন মানুষ অন্য মানুষের পক্ষ হতে এমন কোন জিনিসের আশঙ্কা করেনা, যা সংঘটিত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই কিংবা যে ধমক দাতা তার ধমক বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখে না, তার মধককে কেউ মোটেই পরোয়া করে না। যাতে করে তাকে নিরপত্তা দেয়ার প্রয়োজন পরতে পারে। যার পক্ষ হতে ভয় রয়েছে, তার থেকেই কেবল নিরাপত্তা দিতে হয়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যখন ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ "সে কোন যুলুম বা অধিকার হরণের আশঙ্কা করবে না", সূরা ত্বহা:১১২। -বলে নিরাপত্তা দিয়েছেন, এতে বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলা যুলুম বা অধিকার হরণ করার ক্ষমতা রাখেন। এমনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর ক্ষেত্রে একই কথা, তিনি বলেন,

﴿ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

"তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করো না। আমি আগেই তোমাদের কাছে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছি। আমার কথায় কোন রদবদল হয় না। আর আমি তাদের উপর যুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই যুলুম করেছে"। (সূরা কাফ: ২৮-২৯)

বলেন, وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا "তোমার রব কারো উপর যুলুম করেন না"। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতেই সক্ষম। কোনো কিছুই তার নিকট অসম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলো দ্বারা এমন কোন জিনিস নফী করেন নি, যার উপর তিনি ক্ষমতাবান নন এবং যা অসম্ভব; বরং যা তার ক্ষমতাধীন এবং যা হওয়া সম্ভব, তিনি তাই নফী করেছেন। যে আমল বান্দারা করেনি, তার কারণে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, -তিনি এমন সম্ভাবনাকেই নাকচ করেছেন।

সুতরাং জাবরীয়াদের কথা, মূলত আল্লাহ তা'আলা কোন কাজ থেকেই পবিত্র নন, কোন কিছু থেকেই তিনি পবিত্র থাকেন না; বরং সবকিছুই তার দ্বারা হওয়া সম্ভব, আল্লাহ তা'আলাকে তার কোন কাজ থেকে পবিত্র করা হবে না, তার সব কাজই ভালো, তার কাজের মধ্যে মন্দের কোন অস্তিত্ব নেই, -কুরআন এই কথাকে বাতিল সাব্যস্ত করে। কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে এমন কাজ থেকে পবিত্র করেছেন, যা তার জন্য শোভনীয় নয়। সুতরাং জানা গেল যে, তিনি মন্দ কাজ এবং নিন্দনীয় কাজ থেকে পবিত্র। এমনি তিনি খারাপ স্বভাব ও দোষযুক্ত বৈশিষ্ট থেকেও পবিত্র। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

"তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?" (সূরা মুমিনুন: ১১৫)

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে অনর্থক মাখলুক সৃষ্টি করা থেকে পবিত্র করেছেন এবং যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করে তার প্রতিবাদও করেছেন। অথচ অনর্থক সৃষ্টি করাও একটি কাজ।[২৭১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} [الْقَلَمِ: ٣٥]

তবে কি আমি মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অবাধ্যদের মতই গণ্য করব? সূরা ক্বালাম:৩৫।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾

"যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদেরকে আমি কি সমান করে দেবো ? মুত্তাকীদেরকে কি আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো করে দেবো?" (সূরা সোয়াদ: ২৮)

যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা পাপাচারী এবং সৎকর্মশীলদেরকে সমান করবেন, এখানে তাদের কড়া প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[২৭১] এবং তিনি তা করার ক্ষমতাও রাখেন।

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

"যেসব লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে এবং মুমিন ও সৎকর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ভুক্ত করে দেবো যে তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? তারা যে ফায়ছালা করে তা অত্যন্ত জঘন্য"। *(সূরা জাসিয়াঃ ২১)*

যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা এমন করবেন, -এই আয়াতে তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে।[২৭২] আরো বলা হয়েছে, যারা এমন ফায়ছালা করে, তাদের ফায়ছালা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। এটি মূলত এমন ফায়ছালা, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) তার সুনানে এবং হাকেম তার মুস্তাদরেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাদাহ ইবনে সামিত এবং যায়েদ বিন ছাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ»

"আল্লাহ তা'আলা যদি আসমান-যমীনের সমস্ত অধিবাসীকে শাস্তি দেন, তাতে তিনি তাদের উপর যুলুমকারী বলে বিবেচিত হবেন না।[২৭৩] আর যদি তাদের সকলের উপর রহম করেন, তাহলে তাদের উপর সেই রহমত তাদের আমলের তুলনায় অনেক বড় এবং উত্তম হবে।[২৭৪]

জাবরীয়ারা এই হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছে।[২৭৫] মুতাযিলাদের বাতিল মূলনীতির সাথে এই হাদীছ মিলেনা। তাই তারা ইহাকে মিথ্যা বলেছে অথবা এর তাবীল করেছে।[২৭৬]

---

[২৭২] এসব দলীল পেশ করে, শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) ঐসব জাবরীয়া ও সুফীদের প্রতিবাদ করেছেন, যারা বলে আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীল বান্দা এবং অপরাধীরা একই রকম। (নাউযুবিল্লাহ) মূলত এই ধারণা থেকেই সুফীবাদ ও মারেফতের দোহাই দিয়ে একদল লোক শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তারা শরী'আতের হুকুম-আহকামের ধারেকাছেও যায়না। মদ্যপান, ব্যভিচারসহ সব রকম পাপাচারেই তারা লিপ্ত হয়।

[২৭৩] কেননা তিনি সবকিছুর মালিক। তিনি তার রাজত্বে যা ইচ্ছা তাই করবেন। এতে যুলুমের কিছু নেই। (দেখুনঃ আউনুল মা'বুদ, (১০/২১৭)

[২৭৪] ছ্বহীহঃ মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত হা/১১৫।

[২৭৫] অর্থাৎ তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা বিনা কারণেই শাস্তি দেন এবং আমল ছাড়াই ছাওয়াব প্রদান করেন। তারা আরো বলে, শাস্তি দেয়া এবং ছাওয়াব প্রদানে আমলের কোন প্রভাব নেই। মুতাযিলাদের মূলনীতির সাথে না মিলার কারণে তারা এই হাদীছকে অস্বীকার করেছে। কেননা তাদের অন্যতম মূলনীতি হলো বান্দার আমলের কারনেই আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি বা ছাওয়াব দেন। তারা আরো বলে, বান্দার কাজ বান্দা নিজেই

এই হাদীছ দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই সর্বাধিক লাভবান হয়েছে। তারা ইহাকে বিশ্বাস করেছে এবং কবুল করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছে। তারা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের পরিমাণ এবং উহার পুরোপুরি হক আদায় করতে না পারার বিষয়টিও বুঝতে পেরেছে। অপারগতার কারণেই হোক বা অজ্ঞতার কারণেই হোক কিংবা অলসতার কারণেই হোক অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা না থাকার কারণেই তারা পূর্ণরূপে আল্লাহর নেয়ামতের যথাযথ হক আদায় না করতে পারার বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

আসমান ও যমীনবাসীর উপর আল্লাহ তা'আলার হক হচ্ছে, তারা আল্লাহর আনুগত্য করবে, তার নাফরমানী করবেনা, তাকে সবসময় স্মরণ করবে, তার যিকির থেকে কখনো গাফেল হবে না, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তার নেয়ামতের কুফরী করবে না। সেই সাথে তাকেই সর্বাধিক ভালোবাসবে, তার দিকেই ফিরে যাবে, তার উপরই ভরসা করবে,

---

সৃষ্টি করে এবং নিজেই তা সম্পাদন করে। বান্দার দ্বারা কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তা জানতেও পারেন না। (নাউযুবিল্লাহ)

[২৭৬] উপরোক্ত দীর্ঘ বক্তব্যের সারমর্ম হলো, জাবরীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন ঐসব দলীলের প্রতি দৃষ্টি দিল, যেখানে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, সবকিছুর উপরই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতা, বান্দার কর্মগুলোও যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি, বান্দা তার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করতে পারে না, তখন তারা বলল, সৃষ্টিজগতের মধ্যে যা কিছু হয়, সব আল্লাহর একক ইচ্ছাতেই হয়। এতে বান্দার কোন এখতিয়ার বা স্বাধীনতা নেই। পাপাচার ও সৎকাজ উভয়ই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি, তাই তাও আল্লাহর একক ইচ্ছাতেই হয়। সুতরাং তাদের মতে শাস্তি ভোগ করাতে আমলের কোন প্রভাব নেই। কারণ পাপাচারও আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু পাপাচারও সৃষ্টি করেছেন আর বান্দা তাতে লিপ্ত হলে তাকে শাস্তি দেয়া অন্যায়। তাই তারা বলে থাকে, আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। তার কাজের মধ্যে কোন হিকমত অনুসন্ধান করা অথবা কাকে কী কারণে শাস্তি দিবেন বা জান্নাতে দিবেন তা অনুসন্ধান করা ঠিক নয়। তারা আরো বলে থাকে, যারা ভাল কাজ করে আর যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

মুতাযিলারা জাবরীয়াদের বিপরীত। তারা যখন দেখল, বান্দার কাজের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয়ই রয়েছে, আর মন্দের সম্বন্ধ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দিকে করা শোভনীয় নয় এবং আল্লাহ তা'আলা যদি বান্দার কর্মগুলোও সৃষ্টি করেন, অতঃপর বান্দা তাতে লিপ্ত হলে শাস্তি দেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার ন্যায় বিচার ঠিক থাকেনা। তাই তারা বলল, বান্দার কর্ম বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে; আল্লাহ তা'আলা নন।

উপরোক্ত উভয় দলই এ বিষয়ে ভুল করেছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীলগুলো বুঝার ক্ষেত্রে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করার তাওফীক পেয়েছে। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর স্রষ্টা। বান্দার কর্মের মধ্যে যেই যুলুম ও পাপাচার রয়েছে, তাও আল্লাহর সৃষ্টি। কারণ আল্লাহর রাজ্যে অন্য কারো সৃষ্টি থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ "অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও সৃষ্টি করেছেন"। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলা কেন যুলুম সৃষ্টি করেছেন?

এর জবাব আমরা এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এবং শারহুল ওয়াসেতীয়ায় প্রদান করার চেষ্টা করেছি। পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য তা তিনি সৃষ্টি করেন নি' বরং বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য তা সৃষ্টি করেছেন। বান্দা তার আদেশ-নিষেধের প্রতি অনুগত থাকে কি না, তা যাচাই করার জন্য তিনি ভালো-মন্দ উভয়ই সৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়া কেউ যদি প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পাপ কাজে লিপ্ত হয়েও যায়, তারপরও যেন তাওবা করে ফিরে আসে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তাকেই ভয় করবে, তার প্রতিই একনিষ্ঠ হবে এবং তার কাছেই আশা করবে। এক কথায় উপরের সবগুলো বিষয়ই কেবল আল্লাহর দিকেই ফিরাবে এবং তার জন্যই নির্দিষ্ট করবে। যাতে করে বান্দার অন্তর সবসময় তার ভালোবাসার দিকেই ঝুকে থাকে এবং তার ইবাদতের দিকেই আকৃষ্ট হয়। একমাত্র তার একত্বের দিকেই যেন অন্তর একনিষ্ঠ থাকে, জবান যেন তার যিকিরের মধ্যেই মশগুল থাকে এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন তার আনুগত্যের উপর আবদ্ধ থাকে। নিঃসন্দেহে বান্দা এই কাজগুলো করতে সক্ষম। কিন্তু সমস্যা হলো মানুষের নফস এগুলো বাস্তবায়নে কৃপণতা করে। তাদের কৃপণতার স্তর এত অধিক, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গণনা করে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীলদের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন বিষয়ে কার্পণ্য করে। যদিও সে অন্যান্য বিষয়ে পুরোপুরি হক আদায় করে থাকে।

সুতরাং কোথায় সেই ব্যক্তি, যার অন্তর শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় ভরপুর এবং তার প্রিয় আমল করাতেই সবসময় মশগুল। এমন কে আছে, ক্ষণিকের জন্য হলেও ঐ উদ্দেশ্যের বিপরীত করে না, যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনবাসীর উপর ন্যায় বিচার করেন, তাহলে ন্যায় বিচারে স্বার্থেই তিনি সকলকে শাস্তি দিতে পারবেন। শাস্তি দিলে তিনি মোটেই তাদের জন্য যালেম বলে গণ্য হবেন না। বান্দার তাওবা করা এবং গুনাহ স্বীকার করা তার সর্বোচ্চ সৎকাজ হিসাবে ধরা যেতে পারে, যা আল্লাহর শাস্তির অন্তরায় হতে পারে। কিন্তু তাওবা করার সুযোগ পাওয়া আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যদি বান্দাকে পাপের কারণে শাস্তি দেন, তাহলে তিনি যালেম হবেন না। যদিও ধরে নেয়া হয় যে, সেগুনাহ থেকে তাওবা করেছে। তবে তিনি তার রহমত ও দয়ার দাবি অনুযায়ী নিজের উপর রহম করাকে আবশ্যক করে নিয়েছেন। সুতরাং সৃষ্টির উপর তার রহমত ও ক্ষমাই সর্বাধিক প্রশস্ত। কারো আমল এই পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা যে, সে উহা দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেতে পারে কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।

আল্লাহর সর্বাধিক অনুগত বান্দা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ». قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلا أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ منه وفضل»

"আমলের বিনিময়ে তোমাদের কেউ জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও না? তিনি বললেন আমিও না। তবে আমাকে যদি আল্লাহ্ তার রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করে নেন সে কথা ভিন্ন"।[২৭৭]

[২৭৭] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৬৪৬৩, মুসলিম হা/২৮১৬, মুসনাদে আহমাদ

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিতে বললেন, যার একদা মাধ্যমে তিনি ছ্বলাতে দু'আ করতে পারেন। তখন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এই দু'আ করবে,

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

"হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি অনেক যুলুম করেছি। তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই। তুমি আমাকে আপনার পক্ষ হতে ক্ষমা করো। আমার উপর রহমত বর্ষণ করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়"।[২৭৮]

এই যদি হয় আবু বকরের অবস্থা, অথচ তিনি হলেন নবী-রাসূলদের পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি, তাহলে অন্যদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? তিনি তো পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নেয়ামতের হক আদায় করেই সিদ্দীক উপাধী লাভ করেছেন। আল্লাহর হক পূর্ণরূপে আদায় করার মধ্যে এটিও শামিল যে, বান্দা আল্লাহর যথাযথ মারেফত হাসিল করবে, তার হক ও বড়ত্ব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করবে, আল্লাহ তা'আলার জন্য বান্দার হকগুলো জানবে এবং বান্দা নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কেও অবগত হবে।

সুতরাং ঐসব লোকদের জন্য আফসোস! যারা মনে করে বান্দারা তাদের প্রভুর মাগফেরাতের প্রতি অমূখাপেক্ষী এবং আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের প্রতি তাদের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা এবং তার হক সম্পর্কে এসব লোকদের মূর্খতার চেয়ে অধিক মূর্খতা আর আছে কি?

ওহে মূর্খ! তুমি যদি উপরোক্ত কথাগুলো বুঝতে অক্ষম হয়ে থাকো, তাহলে তুমি আল্লাহ তা'আলার কোমল ও নরম নিয়ামত সম্ভারের দিকে দৃষ্টি দাও এবং সেগুলোর হকসমূহের প্রতি খেয়াল করো। সেই সাথে যারা এগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যারা অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের মাঝে তুলনা করো। তাহলে তুমি অবশ্যই জানতে পারবে, আল্লাহ তা'আলা যদি আসমান ও যমীনবাসীকে শাস্তি দেন, তাহলে তিনি তা অবশ্যই করতে সক্ষম। এতে করে তিনি তাদের উপর যালেম বলে গণ্য হবেন না।

[২৭৮] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৮৩৪, মুসলিম হা/২৭০৫।

(৯২) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وفي دُعَاءِ الأَحْياءِ وَصَدَقَاتِهِم مَنْفَعَةٌ لِلأَمْوَات

জীবিত ব্যক্তিদের দু'আ এবং দান খয়রাত দ্বারা মৃত বক্তিরা উপকৃত হয়।

.....

ব্যাখ্যাঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের ঐক্যমতে মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের দু'প্রকার আমল দ্বারা উপকৃত হয়।

(১) মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকাকালে যেই আমলের রাস্তা উম্মুক্ত করে গিয়েছে কিংবা যেই কাজে তারও ভূমিকা থাকে।

(২) মৃত ব্যক্তির জন্য মুসলিমদের দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা, সাদকাহ এবং হজ্জ। তবে হজ্জের ছাওয়াব থেকে যা পৌঁছে, তা নিয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, (বদলী) হজ্জের সফরে যা খরচ করা হয়, তার ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে। আর হজ্জের ছাওয়াব কেবল হাজীই পাবে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে যার পক্ষ হতে (বদলী) হজ্জ করা হয়, হজ্জের ছাওয়াব সেই পায়। এটিই সঠিক কথা।

শারীরিক ইবাদতের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন ছ্বলাত, ছ্বিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এবং অধিকাংশ সালাফের মতে এইসব আমলের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে থাকে। ইমাম শাফেঈর প্রসিদ্ধ মতে এবং ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর মতে এগুলোর ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না। আর কতক বিদ'আতী লোকের মতে মৃত ব্যক্তির কাছে জীবিতদের কোন আমলের ছাওয়াবই পৌঁছে না। এমনকি মুসলিমদের দু'আ অথবা অন্যান্য ইবাদতের ছাওয়াবও পৌঁছে না।

আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতের দলীল দ্বারা তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত। এই শ্রেণীর লোকেরা কিছু মুতাশাবেহ আয়াত দ্বারা দলীল দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

"মানুষ যে চেষ্টা-সাধনা করে তা ছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই"। (সূরা নাজমঃ ৩৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"আজ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে"। (সূরা ইয়াসীন: ৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজের জন্যই এবং যে গুনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তার উপরই বর্তাবে"। (সূরা বাকারা: ২৮৬)

মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকাকালে যেই আমলের রাস্তা উম্মুক্ত করে গিয়েছে কিংবা যেই কাজে তারও ভূমিকা থাকে, মৃত্যুর পরও মৃত ব্যক্তি সেই আমলের ছাওয়াব পেতে থাকার ব্যাপারে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده

"মানুষ যখন মারা যায়, তখন সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের দরজা বন্ধ হয় না। ছাদকায়ে জারিয়া রেখে গেলে কিংবা এমন সৎ সন্তান রেখে গেলে যে তার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবে অথবা এমন দীনি শিক্ষা রেখে গেলে, যার দ্বারা মানুষ তার পরেও উপকৃত হয়।[২৭৯]

এতে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, জীবিত থাকাকালে যেই আমলের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ভূমিকা ও প্রচেষ্টা ছিল, মৃত্যুর পরেও সে উক্ত আমল দ্বারা উপকৃত হয়। আর যেই আমলের পিছনে জীবিত থাকা অবস্থায় তার কোন ভূমিকাই ছিল না, সেই আমলের ছাওয়াব সে পাবে না।

যারা বলে, যেসব আমল প্রতিনিধির মাধ্যমে করানো যায় যেমন সাদকাহ ও হজ্জ, ঐসব আমলের ছাওয়াবই কেবল মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে এবং যেসব আমল কোন অবস্থাতেই অন্যকে দিয়ে করানো যায় না যেমন ইসলাম গ্রহণ, ছ্বলাত, ছ্বিয়াম কুরআন তেলাওয়াত, এগুলোর ছাওয়াব কেবল আমলকারীর জন্যই নির্দিষ্ট, সে ছাড়া অন্য কেউ তা পাবেনা। জীবিত থাকা অবস্থায় যে আমল একজনের পক্ষ হতে অন্যজন করতে পারে না এবং যে আমলের ক্ষেত্রে আমলকারীর বদলে অন্যের প্রতিনিধিত্ব চলেনা, সেই আমলের ব্যাপারে কথা হলো মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে জীবিতরা এই জাতিয় আমল করলে, তার ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছবে না।

[২৭৯] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১।

এই মতের সমর্থকরা ইমাম নাসাঈ স্বীয় সনদে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যেই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার মাধ্যমে দলীল পেশ করেছে। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة

"কেউ কারো পক্ষ হতে ছ্বলাত পড়বে না এবং একজন অন্যজনের পক্ষ হতে ছ্বিয়ামও রাখবে না। তবে প্রত্যেক দিন ছ্বিয়াম রাখার বদলে এক মুদ পরিমাণ গম প্রদান করবে।[২৮০]

জীবতদের যেসব আমলে (অথচ তাতে মৃত ব্যক্তির কোনো ভূমিকা নেই) মৃত ব্যক্তির উপকৃত হওয়াঃ

যেসব আমলের পিছনে মৃত ব্যক্তির ভূমিকা ও প্রচেষ্টা ছিল না, তার দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হওয়া কুরআন, সুন্নাত, ইজমা এবং বিশুদ্ধ কিয়াসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে ক্ষমা করো। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না"। *(সূরা আল হাশর: ১০)*

যেসব মুমিন পূর্বে চলে গেছে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, মৃতদের জন্য জীবিতরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়। জানাযার ছ্বলাতে মৃত ব্যক্তির জন্য যেই দু'আ করা হয়, মুসলিমদের ঐক্যমতে তার দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়। জানাযার ছ্বলাতের যেই দু'আগুলো পাঠ করা হয়, তা একাধিক প্রসিদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এমনি দাফনের পরে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার হাদীছও প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তির আমল দ্বারা উপকৃত হয়।

সুনানে আবু দাউদে উছমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করতেন, তখন কবরের উপর দাঁড়িয়ে বলতেন,

---

[২৮০] সুনানুল কুবরা, হা/ ২৯১৮, অধ্যায়: মৃতের পক্ষ হতে জীবিত ব্যক্তির ছ্বিয়াম রাখা।

استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

" তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার জন্য ঈমানের উপর স্থিরতা ও দৃঢ়তা কামনা করো, কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে" ।[২৮১]

এমনি কবর যিয়ারতের সময় মৃত ব্যক্তিদের জন্য যেই দু'আ করা হয়, তাতেও প্রমাণিত হয় যে, তারা জীবিতদের আমল দ্বারা উপকৃত হয়। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা দিতেন তারা যেন কবর যিয়ারতের সময় এই দু'আ পাঠ করে,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ حِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"সকল মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীর উপর সালাম। আল্লাহ চাহে তো আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আমাদের এবং আপনাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি" ।[২৮২]

ছ্বহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদা নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যখন কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থন করেন, তখন কী বলেন? তিনি তখন আয়েশাকে বললেন, তুমি বলবে,

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ

"সকল মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীর উপর সালাম। আমাদের মধ্য হতে যারা পূর্বে চলে গেছে এবং যারা পরবর্তীতে মৃত্যু বরণ করবে, তাদের সকলকে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হবো" ।[২৮৩]

---

[২৮১] ছ্বহীহ: আবু দাউদ, হা/৩২২১, ছ্বহীহ জামি হা/৯৪৫।

[২৮২] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৭৫।

[২৮৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৭৪।

জীবিতদের দান-খয়রাত, ছিয়াম ও হজ্জের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছার দলীলঃ

সাদকার ছাওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হওয়ার দলীল হলো, যেমন ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে বললো,

يا رسول الله! إن أمى أفتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال: نعم

"জনৈক ব্যক্তি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছেন। তাই কোন অছিয়ত করতে পারেননি। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে দান-সাদকা করার আদেশ দিতেন। আমি তার পক্ষ থেকে সাদকা করলে তিনি কি এর ছাওয়াব পাবেন? রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই পাবেন"।[২৮৪]

ছ্বহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সা'দ বিন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মা মারা গেল। তিনি তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলেন না। তিনি নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন,

يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَىْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِى الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

" হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছে। তখন আমি তার কাছে ছিলাম না। আমি যদি তার পক্ষ হতে সাদকাহ করি, তাহলে সেই সাদকাহ তার উপকার করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার মিখরাত নামক বাগানটি আমার মায়ের নামে ওয়াকফ করে দিলাম"।[২৮৫]

ছিয়ামের ছাওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من مات وعليه صيام صام عنه وليه

" যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে তার উপর ছিয়াম ওয়াজিব ছিল, তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিছগণ ছিয়াম রাখবে"।[২৮৬]

---

[২৮৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮, মুসলিম হা/১০০৪।

[২৮৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৭৫৬।

[২৮৬] ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৯৫২, মুসলিম হা/১১৪৭।

তবে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ছিয়ামের বদলে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে খাদ্য দান-সাদকা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের দলীল। ফিকহের কিতাবসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। হজ্জের ছাওয়াব পৌঁছার ব্যাপারে ছ্বহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا الذي له فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

“জুহায়না গোত্রের জনৈক মহিলা নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিল। কিন্তু হজ্জ করার পূর্বেই তিনি মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ করো। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর, যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি সে ঋণ পরিশোধ করতেনা? আল্লাহর ঋণ আদায় কর। কেননা আল্লাহর পাওনা পরিশোধের অধিকতর হকদার”।[২৮৭] এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে।

মুসলিমগণ এই মর্মে ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, মৃত ব্যক্তির উপর ঋণ থাকলে তা অন্য কেউ পরিশোধ করে দিলেই মৃত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যদিও পরিশোধকারীর সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক না থাকে এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পরিশোধ করা হয়। আবু কাতাদার হাদীছ দ্বারা এটি প্রমাণিত। আবু কাতাদাহ একজন মৃত ব্যক্তির দুই দীনার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব নিল। তিনি যখন তা পরিশোধ করলেন, তখন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন তার শরীরের চামড়া ঠান্ডা হলো।[২৮৮]

মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের সকল প্রকার আমল দ্বারা লাভবান হওয়ার বিষয়টি শরী‘আতের দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর সেই দলীলটি হলো কিয়াস। কেননা ছাওয়াব হলো আমলকারীর হক। সে যদি উহা তার কোন মুসলিম ভাইকে দান করে, তাতে কোন বাধা নেই। যেমন জীবিত অবস্থায় কেউ তার মাল থেকে অন্যকে কিছু দান করে দিলে মৃত্যুর পর তার পক্ষ হতে সেই দান কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না। মৃত ব্যক্তির কাছে জীবিত ব্যক্তির ছিয়ামের ছাওয়াব পৌঁছার সংবাদ দেয়ার মাধ্যমে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবহিত করেছেন যে, কুরআন পাঠ এবং শারীরিক অন্যান্য ইবাদতের

[২৮৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৫২, মুসলিম হা/১১৪৮।

[২৮৮] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, হাকেম এবং অন্যান্য ইমাম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন: আহকামুল জানায়েয, পৃষ্ঠা নং- ১৬।

ছাওয়াবও পৌঁছে থাকে। পরিষ্কার কথা হলো ছিয়ামের মধ্যে নিয়্যাতের যেহেতু পানাহার এবং ছিয়াম ভঙ্গকারী অন্যান্য বিষয় থেকে বিরত থাকা হয়, আসলে ছিয়ামের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন কাজই করতে হয় না, তারপরও যেখানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট করেই বলেছেন যে, ছিয়ামের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে থাকে, তাহলে কুরআন পাঠের ছাওয়াব কেন পৌঁছবে না? বিশেষ করে যখন জানা গেল যে, কুরআন পাঠের মধ্যে নিয়্যাত ও আমল উভয়ই রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ "মানুষ যে চেষ্টা-সাধনা করে তা ছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই" সূরা আন নাজম :৩৯। আল্লাহর এই বাণী দ্বারা দলীল হিসাবে পেশ করে যারা বলে, মৃত ব্যক্তিদের কাছে জীবিতদের কোনো আমলের ছাওয়াব পৌঁছে না, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ তাদের কথার একাধিক জবাব দিয়েছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ জবাব হলো দু'টি।

যারা বলে মৃত ব্যক্তির কাছে জীবিতদের কোনো আমলের ছাওয়াবই পৌঁছে না, তাদের জবাবঃ

প্রথম জবাবঃ মানুষ তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং উত্তম আচার-আচরণের মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধব সংগ্রহ করে, বিবাহ-শাদি করে, সন্তান জন্ম দেয়, দান-খয়রাত করে এবং মানুষের ভালোবাসা ও সম্প্রীতি অর্জন করে। ফলে মানুষেরা তার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে, দু'আ করে এবং তার জন্য সৎআমলের ছাওয়াব হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দেয়। এটি তার প্রচেষ্টার ফসল। শুধু তাই নয়; ইসলামের মূল বাক্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে একজন অমুসলিম যখন তার মুসলিম ভাইদের কাতারে শামিল হয়, তখন তার এই কালেমা পাঠ দ্বারা তার প্রত্যেক ভাই উপকৃত হওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম। এই কালেমা পাঠ দ্বারা সে জীবিত অবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরও উপকৃত হতে পারে। মুসলিমদের একজনের দু'আ তাদের সকলকে শামিল করে নেয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে এমন উপকরণ বানিয়েছেন, যার কারণে ঈমানদার মুসলিম তার অন্যান্য মুসলিম ভাইদের দু'আ ও সৎ আমলের মাধ্যমে উপকৃত হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন ঈমান আনয়ন করে তখন সে এমন একটি মাধ্যম অর্জন করে, যা তার জন্য অন্য মুসলিমের পক্ষ হতেও কল্যাণ বয়ে আনে।

দ্বিতীয় জবাবঃ এই জবাবটি প্রথম জবাবের চেয়ে আরো বেশী শক্তিশালী। কুরআনের উক্ত আয়াতে একজনের আমল দ্বারা অন্যজনের উপকৃত হওয়াকে অস্বীকার করেনি। কুরআন শুধু অন্যের আমলের মালিক হয়ে যাওয়াকে অস্বীকার করেছে। অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া আর অন্যের আমলের মালিক হয়ে যাওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, যা অতি সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষ কেবল নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা

অর্জিত জিনিসের মালিক হয়। অন্যের প্রচেষ্টার ফসলের মালিক প্রচেষ্টাকারী হয়ে থাকে। সুতরাং চেষ্টা করে যে ব্যক্তি যা অর্জন করে, সে ইচ্ছা করলে তা অন্যকে দিতে পারে। আর ইচ্ছা করলে তা নিজের জন্য রেখে দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন

{أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النَّجْم: ٣٨, ٣٩]

"কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। মানুষ যে চেষ্টা-সাধনা করে তা ছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই" সূরা আন নাজম: ৩৮-৩৯। এই আয়াত দু'টি মুহকাম-স্পষ্ট। আয়াত দু'টির দাবি হলো আল্লাহ তা'আলা আদল-ইনসাফের বিশেষণে বিশেষিত। সুতরাং প্রথম আয়াতটি প্রমাণ করে যে, তিনি অন্যের অপরাধে কাউকে শাস্তি দিবেন না এবং একজনের অপকর্মের কারণে অন্যকে পাকড়াও করবেন না। যেমন দুনিয়ার যালেম রাজা-বাদশারা করে থাকে।

দ্বিতীয় আয়াতটির দাবি হলো, মানুষ কেবল নিজের আমল দ্বারাই সাফল্য লাভ করবে, যাতে করে বাপ-দাদা, সৎকর্মশীল পূর্বসূরী এবং শাইখদের আমলের মাধ্যমে নাজাত পেয়ে যাবে, -এই আশায় কেউ হাত গুটিয়ে বসে না থাকে। যেমন মিথ্যা আশা পোষণকারীগণ করে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই কথা বলেননি যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় যা অর্জন করে, কেবল তা দ্বারাই সে উপকৃত হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ "প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল সে নিজেই ভোগ করবে এবং যে গুনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তার উপরই বর্তাবে" সূরা আল বাকারা :২৮৬

এবং ﴿ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ "যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে", সূরা ইয়াসীন: ৫৪ -এই আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গ প্রমাণ করে যে, এক বান্দাকে অন্য বান্দার আমলের কারণে শাস্তি দেয়া হবে না। এখানে এই কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"আজ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে"। (সূরা ইয়াসীন: ৫৪)

إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله "মানুষ যখন মারা যায়, তখন সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়", এই হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে যারা বলে, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের আমল দ্বারা উপকৃত হয় না, তাদের জবাব হলো উক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল। কেননা নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বলেননি যে, আমল দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ বাতিল হয়ে যায়; বরং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তার নিজের আমল করার

সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যের আমল অন্যের জন্যই। অর্থাৎ আমলকারীর জন্যই থাকবে। সুতরাং সে যদি তার আমলের ছাওয়াব অন্যকে দান করে, তাহলে তার নিকট আমলকারীর ছাওয়াব পৌঁছে যাবে। আমলকারীর নিজস্ব ছাওয়াব তারই থাকবে। এটি ঠিক ঐ ঋণের মতই, যা মানুষ অন্যের পক্ষ হতে পরিশোধ করে থাকে। এতে করে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যায়। তবে যেই মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হলো, তার ছাওয়াব সে ব্যক্তি পাবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিশোধ করলো, ছাওয়াব সেই পাবে। কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি শুধু দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

আর যারা আর্থিক এবং শারীরিক ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য করে অর্থাৎ বলে শারীরিক ইবাদত একজনের পক্ষ হতে অন্যজন করতে পারে না, কিন্তু আর্থিক ইবাদত একজনের পক্ষ হতে অন্যজন করতে পারে, তাদের কথা ঠিক নয়। কেননা নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতু ব্যক্তির পক্ষ হতে ছ্বিয়াম রাখার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ ছ্বিয়ামে প্রতিনিধিত্ব চলে না। জাবের রাদ্বিয়াল্লাহুর আনহুর হাদীছটিও অনুরূপ। তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল আযহার ছ্বলাত পড়লাম। ছ্বলাত শেষে একটি দুম্বা আনয়ন করা হলে তিনি উহা কোরবানী করলেন। যবেহ করার সময় তিনি বললেন,

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»

"বিসমিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার। হে আল্লাহ! ইহা আমার পক্ষ হতে এবং আমার উম্মতের ঐস লোকের পক্ষ হতে, যারা কোরবানী করতে পারেনি"।[২৮৯] ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর যেই হাদীছ দু'টি দুম্বা কুরবানী করার কথা এসেছে, তার একটি যবেহ করার সময় তিনি বলেছেন,

اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعاً "হে আল্লাহ তুমি ইহা আমার সমস্ত উম্মতের পক্ষ হতে কবুল করো"।[২৯০]

অন্যটি যবেহ করার সময় বলেছেন, « اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ » "হে আল্লাহ! তুমি ইহা মুহাম্মাদের পক্ষ হতে এবং মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ হতে কবুল করো"।[২৯১]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কোরবানীর মধ্যে যেই ইবাদতটি হয়, তা হলো রক্ত প্রবাহিত করা। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের পক্ষ হতে উহা সম্পাদন করেছেন।

---

[২৮৯] ছ্বহীহ: আবু দাউদ, হা/ ২৮১০, আল ইরওয়া হা/১১৩৮।

[২৯০] যঈফ: মুসনাদে আহমাদ।

[২৯১] হাসান: মুসনাদে আহমাদ।

অনুরূপ হজ্জও শারীরিক ইবাদত। মাল খরচ করা হজ্জের কোন রুকন নয়। মাল খরচ করা কেবল একটি মাধ্যম মাত্র। আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, মক্কাবাসী কোন লোক যদি আরাফাতের ময়দান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে, তাহলে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব। তার কাছে মাল থাকা জরুরী নয়। এটিই সর্বাধিক সুস্পষ্ট মত। অর্থাৎ হজ্জ একই সাথে আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত নয়। এটি শুধু শারীরিক ইবাদত। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এর অনুসারীদের মধ্য হতে পরবর্তী কালের একদল লোক সুস্পষ্ট করেই এই কথা বলেছে।

হে পাঠক! আপনি ফরযে কেফায়া আমলগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে কতিপয় লোক অন্যদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তাদের কাজ করে থাকে। এটি ছাওয়াব প্রদান করার নামান্তর। এতজনের স্থলাভিক্তি হয়ে অন্যদের আমল করা নয়। যেমন কারো ব্যক্তিগত শ্রমিকের জন্য জায়েয নেই যে, সে অন্য একজনকে তার বদলে নিয়োগ করবে। তবে তার জন্য জায়েয আছে যে, সে কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিবে।

মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়ার ব্যাপারে কারীদেরকে ভাড়া করার হুকুমঃ

আর মানুষদের মধ্যে কারীদেরকে ভাড়া করে এনে কুরআন পাঠ করানো এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য ছাওয়াব দান করার (ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব বখশাইয়া দেয়ার) যে প্রথা রয়েছে, সালাফদের কেউ তা করেননি, ইসলামের কোনো ইমাম এই কাজ করার আদেশ দেননি এবং শরীয়তে এর অনুমতিও নেই। কারীদেরকে ভাড়া করে এনে কুরআন পাঠ করানো আলেমদের ঐক্যমতে নাজায়েয। তবে কুরআন শিখানোর জন্য বা অনুরূপ এমন কিছু করার জন্য, যাতে অন্যরা উপকৃত হয়, সেসব ক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষক বা কারীকে ভাড়া করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

মৃত ব্যক্তির কাছে শুধু ঐ আমলের ছাওয়াবই পৌঁছে থাকে, যা ইখলাসের সাথে আল্লাহর জন্যই করা হয়। আর কারীদেরকে ভাড়া করে এনে কুরআন পাঠ করা হলে তা আল্লাহর জন্য ইবাদত হিসাবে সম্পাদিত হয় না। সুতরাং কারীর কাছে এমন কোন ছাওয়াব থাকে না, যা মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে পারে। এই জন্যই কোন ইমামই বলেননি যে, কাউকে ভাড়া করে এনে ছিয়াম রাখানো, ছ্বলাত পড়ানো এবং তার ছাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করা (বখশাইয়া দেয়া) জায়েয। তবে যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে, কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে তা পড়ায়, তার কাজে সহযোগিতা করার জন্য যখন কিছু দেয়া হয়, তখন এই দানকে মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে সাদকাহ স্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে এবং এটি জায়েযও বটে।

হানাফী মাজহাবের অন্যতম কিতাব আল ইখতিয়ার এর মধ্যে রয়েছে যে, কেউ যদি এই অসীয়ত করে, মৃত্যুর পর যেন তার কবরের উপর কুরআন পড়া হয় এবং কারীকে যেন

তার মাল থেকেই কিছু দেয়া হয়, তাহলে তার এই অসীয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এটি ভাড়া করার অন্তর্ভুক্ত। ইখতিয়ার এর ভাষ্য এখানেই শেষ।

যাহেদী তার 'গুনিয়াহ' নামক কিতাবে বলেন, কেউ যদি তার কবরের উপর কুরআন পাঠ করার জন্য কাউকে নিয়োগ করে, তাহলে সেই নিয়োগ বাতিল হবে।

তবে কুরআন পাঠ করে বিনা মূল্যে এর ছাওয়াব অন্যকে দান করলে তার ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছবে। যেমন পৌঁছে থাকে ছিয়াম ও হজ্জের ছাওয়াব। যদি প্রশ্ন করা হয়, এই নিয়ম সালাফদের মধ্যে পরিচিত ছিল না এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তাদেরকে এই নির্দেশনা প্রদানও করেননি। তাহলে কিভাবে এটি জায়েয হতে পারে?

প্রশ্নকারী যদি হজ্জ, ছিয়াম এবং দু'আর ছাওয়াব পৌঁছার কথা স্বীকার করে, তাহলে তাকে প্রশ্ন করা হবে, হজ্জ, ছিয়াম ও দু'আ এবং কুরআন পাঠ করার ছাওয়াব পৌঁছার মধ্যে পার্থক্য কী?[২৯২] সুতরাং সালাফগণ এটি করেননি বলেই তা জায়েয না হওয়ার দলীল হতে পারে না। সুতরাং ব্যাপকভাবে সৎআমলের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছার বিষয়টি অস্বীকার করার দলীল কোথায়?

আরো যদি প্রশ্ন করা হয়, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিয়াম রাখা, হজ্জ করা, সাদকাহ করা ও দু'আ করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কুরআন পাঠের অনুমতি দেননি, তাহলে এর জবাব কী হবে?

জবাবে বলা হয়েছে যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা প্রশ্নে নিজের পক্ষ হতে ঐ কাজগুলো মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে করার অনুমতি দেননি। বরং ছাহাবীগণ প্রথমে প্রশ্ন করেছেন। আর তিনি তাদের জবাবে উক্ত কাজগুলো করার অনুমতি দিয়েছেন। একজন তার মৃত আত্মীয়ের জন্য হজ্জ করার অনুমতি চেয়েছেন, তাই তিনি তা করার অনুমতি দিয়েছেন। আরেকজন ছিয়াম রাখার অনুমতি চাইলে তাকেও অনুমতি দিয়েছেন। এতে জানা গেল যে, এ ছাড়া অন্যান্য আমল করতে তাদের সামনে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। সুতরাং যে ছিয়ামের মধ্যে শুধু নিয়্যাত ও পানাহার থেকে বিরত থাকা ছাড়া আর কিছুই নেই, তার ছাওয়াব পৌঁছার মধ্যে এবং কুরআন পাঠ ও যিকির-আযকারের ছাওয়াব পৌঁছার মধ্যে পার্থক্য কী?

আরো যদি প্রশ্ন করা হয়, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমলের ছাওয়াব পৌঁছানোর হুকুম কী?

এর জবাব হলো পরবর্তীদের কেউ কেউ এটিকেও মুস্তাহাব বলেছেন। কেউ কেউ আবার এটিকে বিদ'আত বলেছেন। কেননা ছাহাবীগণ এমনটি করতেন না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের প্রত্যেক আমলকারীর সমান ছাওয়াব তিনি এমনিতেই

[২৯২]. অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। হাজ্জ, ছিয়াম ও দু'আর ব্যাপারে দলীল রয়েছে, কিন্তু কুরআন পাঠের ছাওয়াব পৌঁছানোর দলীল নেই।

পাবেন। এতে আমলকারীর ছাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। কেননা তিনিই তার উম্মতকে প্রত্যেক ভালো কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করেছেন।

কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম আর মৃত ব্যক্তি যেহেতু তা শুনতে পায়, তাই যারা বলেছে মৃত ব্যক্তির কাছে কুরআন পাঠ করা হলে তা দ্বারা সে উপকৃত হয়,[২৯৩] তাদের কথা সঠিক নয়। প্রসিদ্ধ কোন ইমাম থেকে এই কথা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। মৃত ব্যক্তি কুরআন শুনতে পায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রবণ করার পর তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার কথা সঠিক নয়। শ্রবণ করে ছাওয়াব অর্জন করার জন্য জীবিত থাকা শর্ত। কেননা আমল করার জন্য ইচ্ছা, শক্তি ও এখতিয়ার থাকা জরুরী। মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমে তার ইচ্ছা করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়; মৃতু ব্যক্তির নিকট কুরআন পড়া হলে সে কষ্ট পেতে পারে। বিশেষ করে যখন সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধগুলো বাস্তবায়ন করতে পারছে না অথবা যেহেতু সে তার নেকীর মধ্যে আর কিছুই বাড়াতেও পারছে না।

কবরের নিকট কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে আলিমগণের তিনটি মত পাওয়া যায়।

(১) কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা সর্বদাই মাকরূহ।

(২) কবরের পাশে কুরআন পাঠ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

(৩) দাফনের সময় পাঠ করা বৈধ, কিন্তু পরবর্তীতে পুরাতন কবরের নিকট পাঠ করা মাকরূহ।

যারা বলেছেন, দাফন করার সময় এবং পুরাতন কবরের পাশে কুরআন পাঠ করা মাকরূহ, তাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) অন্যতম। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) থেকেও অনুরূপ একটি মত পাওয়া যায়। তাদের মতে এটি বিদ'আত। সুন্নাত দ্বারা এটি সাব্যস্ত নয়। কুরআন পাঠ করা যেহেতু ছ্বলাতের মতই, আর কবরের উপর যেহেতু ছ্বলাত আদায় নিষেধ, তাই কুরআন পাঠ করাও নিষেধ।

আর যারা বলেছে কবরের পাশে কুরআন পাঠ করাতে কোন অসুবিধা নেই, তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহিমাহুল্লাহ) অন্যতম। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা

[২৯৩] হাদীছে রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি দাফনকারীদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। জীবিতদের কুরআন তেলাওয়াত মৃত ব্যক্তি শুনে কি না তার কোন দলীল নেই। সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু না বলে নীরবতা পালন করা উচিত।

দলীল পেশ করেছেন। ইবনে উমার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি অসীয়ত করেছিলেন, দাফনের সময় তার কবরের নিকট যেন সূরা বাকারার প্রথম ও শেষাংশ পাঠ করা হয়।[২৯৪] কতিপয় মুহাজির ছাহাবী থেকে কবরের উপর সূরা বাকারা পাঠ করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

দাফন করার সময় কবরের পাশে কুরআন পাঠ করা মাকরুহ না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) থেকেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে উমার এবং কতিপয় মুহাজির ছাহাবীর বর্ণনা দ্বারাই তিনি দলীল পেশ করেছেন। আর দাফনের পরে কবরের পাশে কুরআন পাঠ করা, যেমন বর্তমানে পালাক্রমে কবরের পাশে তা পাঠ করা হয়, ইহা মাকরুহ। কেননা সুন্নাতে এর কোনো দলীল আসেনি। সালাফদের কারো থেকে এ রকম কিছুই বর্ণিত হয়নি। সম্ভবত অন্যান্য মতের চেয়ে এ মতটিই সর্বাধিক শক্তিশালী। কেননা এতে উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে।[২৯৫]

---

[২৯৪] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। দেখুন: আহকামুল জানায়েয, পৃষ্ঠা নং- ১৯২।

[২৯৫] উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে জানা গেল, জীবিতদের যেসব আমল দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হয়, তা তো সরাসরি দলীল দ্বারাই প্রমাণিত। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট কোনো দ্বিমত নেই। তবে যেসব আমলের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে বলে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি, যেমন ছ্বলাত, কুরআন পাঠ, যিকির-আযকার ইত্যাদি, তা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে অন্য কেউ করতে পারবে কি না অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির সেসব আমলের ছাওয়াব দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে কি না, সে ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের মধ্যে দু'টি মত পাওয়া যায়।

এক শ্রেণীর আলেম বলেন, ছ্বলাত, ছিয়াম, কুরআন পাঠ, যিকির-আযকার সবকিছুর ছাওযাব দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়। তাদের দলীলগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে। তাদের সর্বাধিক বড় দলীল হলো কিয়াস। অর্থাৎ যেসব আমলের ছাওয়াব পৌঁছার কথা বলা হয়নি, সেগুলোকে তারা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুমদিত আমলগুলোর উপর কিয়াস করে থাকে। তারা আরো বলে থাকে, আমলের ছাওয়াব হলো আমলকারীর অধিকারভুক্ত। সে যাকে ইচ্ছা উহা দিতে পারে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, তার সুযোগ্য শিষ্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ) এবং আরো অনেকের মতেই হাদীছে বর্ণিত আমলসমূহ ও যেসব আমলের কথা বর্ণিত হয়নি, সেগুলোর ছাওয়াবও মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠানো যাবে এবং তা দ্বারা মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হবে। শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এই মতকেই সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন।

অপর পক্ষে ইমাম মালেক, শাফেঈ এবং আরো অনেক আলেমের মতে মৃত ব্যক্তিরা শুধু জীবিতদের ঐসব আমল দ্বারাই উপকৃত হয়, যেসব আমলের ছাওয়াব পৌঁছার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এবং যেসব আমলের পিছনে জীবিত থাকাকালে মৃত ব্যক্তির ভূমিকা ছিল। সেগুলো হলো সাদকায়ে জারীয়া, তার রেখে যাওয়া সৎ সন্তানের দু'আ, উপকারী ইলম এবং তার জন্য জীবিতদের দু'আ, সাদকাহ, হজ্জ, ছিয়াম ও কুরবানী। এ ছাড়া জীবিতদের অন্যান্য ইবাদত যেমন ছ্বলাত, কুরআন পাঠ ও যিকির-আযকারের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের জন্য পাঠানো নাজায়েয-অবৈধ। পরবর্তীদের মধ্যে শাইখ আলবানী, বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উছাইমীনসহ আরো অনেকেই এ মতকেই সমর্থন করেছেন।

শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, الأصل في العبادة المنع অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত ইবাদত ব্যতীত অন্য কিছুই ইবাদত হিসাবে সম্পাদন করা যাবে না। সুতরাং মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে যেসব ইবাদত করার দলীল নেই, তা করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, العبادة لايجري فيها القياس অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে কিয়াস চলে না। যারা বলে আমলের ছাওয়াবের মধ্যে আমলকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সে যাকে ইচ্ছা এ ছাওয়াব দান করতে পারে, তাদের জবাবে বলা হয়েছে যে, আমলের ছাওয়াবের উপর আমলকারীর মালিকানা

প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমলের ছাওয়াব দেয়ার বিষয়টি শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়, তা কবুল হলো কি না তা জানারও কোন উপায় নেই। সুতরাং তাতে আমলকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কোন মানুষই জানে না যে, তার আমল কবুল হলো কি না। সে তার আমলের ছাওয়াব পাবে কি না, তাও জানে না। সুতরাং আমলকারী তার আমলের ছাওয়াবের মালিক হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনের ৬০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾

"এবং যারা দান করে তাদের অবস্থা হলো, যা কিছুই তারা দান করে তা এমতাবস্থায় তাদের অন্তর ভীত-কম্পিত থাকে। এ জন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে"। আয়াতের পরিপূর্ণ অর্থ এ দাড়ায় যে, আল্লাহর রাস্তায় তারা যা কিছু খরচ করে সেজন্য একটুও অহংকার কিংবা তাকওয়ার বড়াই করে না এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যাওয়ার অহমিকায় লিপ্ত হয় না। বরং নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সবকিছু করার পরও এ মর্মে আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে থাকে যে, না জানি এসব তার কাছে গৃহীত হবে কি না এবং রবের কাছে মাগফিরাতের জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে কি না।

ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং হাকেম রহিমাহুমুল্লাহ উপরোক্ত অর্থেই এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াতের মর্মার্থ কি এ যে, এক ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ও মদ পান করার সময়ও আল্লাহকে ভয় করবে? এর জবাবে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, না, হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং এর অর্থ হলো এমন লোক, যে ছ্বলাত পড়ে, ছিয়াম রাখে, যাকাত দেয় এবং মহান আল্লাহকে ভয় করতে থাকে, তার আমলগুলো কবুল হলো কি না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমল করলেই যে, ছাওয়াব পাওয়া যাবে এবং সেই ছাওয়াব যাকে ইচ্ছা দেয়া যাবে, এমন ধারণা করা ঠিক নয়।

প্রাধান্যযোগ্যমত: উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে ছ্বলাত পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, যিকির-আযকার করা, মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা করা, প্রতিবছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা ও মিলাদ শরীফ পাঠ করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। এগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। আজকাল আমাদের সমাজে হাফেয ও কারীদেরকে ভাড়া করে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম করানো হয়। এটাকে আমাদের দেশের পরিভাষায় সাবীনা পাঠ বলা হয়। অনেক সময় দুই পক্ষের মাঝে দামাদামি করে হাদীয়া নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পুর্বযুগের সকল আলেম এই ব্যাপারে একমত যে, মৃতদের জন্য ভাড়া করা হাফেয-কারী দিয়ে কুরআন খতম করানো হারাম। পূর্বযুগের কোন আলেম বা নির্ভরযোগ্য কোন ইমাম এ ব্যাপারে অনুমতি দেননি। পরবর্তী যুগের কিছ পেটপূজারী দুনিয়াদার আলেম অন্যায়ভাবে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য এ পন্থাটি চালু করেছে। এটি একটি বিদ'আতী আমল, যা মৃত ব্যক্তির কোন কল্যাণে আসবে না। এর দ্বারা যে অর্থ উপার্জন করা হয়, তাও সম্পূর্ণ হারাম। আরো কঠোরভাবে হারাম হবে, যখন ছোট ছোট ইয়াতীম শিশুদের সম্পদ থেকে কুরআন পাঠের বিনিময়ে অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা হবে।

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়ায় এসেছে, আমরা জানি না যে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কুরআন পড়ে তার ছাওয়াব আত্মীয়দের বা অন্য কাউকে দান করেছেন। কুরআন পড়ার ছাওয়াব যদি মৃতদের কাছে পৌছতো, তাহলে অবশ্যই তিনি উহা পাঠানোর জন্য আগ্রহী হতেন এবং উম্মতের জন্য তা বর্ণনা করতেন। যাতে করে তারা তাদের মৃতদের উপকার করার সুযোগ পেতে পারে। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য খুবই দয়ালু ছিলেন। তার মৃত্যুর পরে ন্যায়পরায়ণ খলীফাগণ এবং ছাহাবীগণ তার আদর্শের উপর ছিলেন। আমরা জানিনা যে, তাদের কেউ কুরআন পাঠ করে অন্যকে ছাওয়াব দান করেছেন। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং ছাহাবীদের পথে চলার মধ্যেই রয়েছে সকল প্রকার কল্যাণ। বিদ'আত এবং নতুন নতুন বিষয় অনুসরণ করার মধ্যে যতসব অকল্যাণ। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ'আত থেকে সাবধান করতে গিয়ে বলেছেন,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة

(৯৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَاللهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الحَاجَاتِ

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের দু'আ কবুল করেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো"। (সূরা মুমিন: ৬০)

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

"হে নবী! আমার বান্দারা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলো, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের উচিত আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার উপর ঈমান আনয়ন করা। হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে"।

"তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা"। (আবু দাউদ) রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় তৈরী করবে, যা তার অন্তর্গত নয়, তা প্রত্যাখ্যত হবে"। (বুখারী ও মুসলিম) সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করা জায়েয নেই। কুরআন পাঠের ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছার কোন দলীল নেই। বরং এটি বিদ'আত।

কুরআন পাঠ ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের কথা হলো, যেগুলোর ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছার কথা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা মেনে নেয়া আবশ্যক। যেমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদকাহ করা, তার জন্য দু'আ করা এবং তার পক্ষ হতে হজ্জ করা। যে ব্যাপারে কোন দলীল নেই, তা মৃত ব্যক্তির জন্য করা যাবে না, যতক্ষণ না দলীল পাওয়া যাবে। তাই আলেমদের দু'টি মতের মধ্য থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করা জায়েয নেই। কুরআন পাঠের ছাওয়াবও মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে না। সুতরাং তার জন্য কুরআন পাঠ করা বিদ'আত। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

মুসলিম কিংবা অন্যান্য মিল্লাতের অনুসারী এমনকি বিধর্মীদের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে যে, দু'আ কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ প্রতিরোধের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা যখন সাগরে ভ্রমণ করার সময় বিপদে পড়ে তখন তারা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য একমাত্র আল্লাহকেই আহবান করে। আল্লাহ তা'আলা আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষ বিপদে পড়ে শুয়ে কিংবা বসে অথবা দাঁড়িয়ে আল্লাহকেই ডাকে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের আহবান শুনেন। চাই সেই বান্দা মুসলিম হোক বা কাফের হোক। আর বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে যা চায়, তা তিনি দান করেন। তারা আল্লাহর কাছে রিযিক জাতিয় কিছু চাইলে কিংবা সাহায্য-সহযোগিতা চাইলে তাও দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তার সার্বভৌম রুবুবীয়াতের দাবিতেই বান্দাকে তা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে শাস্তি দেয়ার জন্য এবং তার ক্ষতি করার জন্যই কখনো কখনো দান করেন। বিশেষ করে বান্দার কুফুরী ও পাপাচারে উহাকে আবশ্যক করে।

সুনানে ইবনে মাজাহয় আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"من لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ"

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে চায় না, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগ করেন।[২৯৬] কেউ কেউ এই অর্থে কবিতা রচনা করতে গিয়ে বলেন,

الرب يغضب إن تركت سؤاله + وبني آدم حين يسأل يغضب

"তুমি যদি রবের কাছে না চাও, তাহলে তিনি রাগ করেন। আর বনী আদমের কাছে চাইলেই সে রাগান্বিত হয়"।

ইবনে আকীল বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে দু'আ করার আদেশ করেছেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করার একাধিক তাৎপর্য রয়েছে।

(১) এতে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমানিত হয়। কেননা যার অস্তিত্ব নেই, তাকে ডাকা হয় না।

(২) এতে আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষীতা প্রমানিত হয়। কেননা অভাবীকে কেউ আহবান করে না।

(৩) এতে সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করেন। কেননা বধিরকে ডাকা হয় না।

---

[২৯৬]. হাসান: সুনানে তিরমিযী হা/৩৩৭৩, ছ্বহীহ জামে হা/২৪১৮, সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/২৬৫৪।

(৪) আল্লাহ তা'আলা দান করা ও বদান্যতার বিশেষণে বিশেষিত। কারণ কৃপণকে কেউ কিছু পাওয়ার জন্য আহবান করে না।

(৫) আল্লাহ তা'আলার রয়েছে সীমাহীন রহমত। কারণ নিষ্ঠুর ও কঠোর গুণের অধিকারীকে কেউ ডাকে না।

(৬) এতে প্রমাণিত হয় যে,আল্লাহ তা'আলা প্রচুর শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। কেননা অক্ষম ও অপারগকে কেউ আহবান করে না।

যারা বলে প্রকৃতিবাদীরা অবশ্যই জানে যে, আগুনকে এ কথা বলা হয় না যে, নিভে যাও, তারকাকে বলা হয় না যে, আমার মেজায ঠিক করে দাও। কেননা তাদের মতে প্রাকৃতিকভাবে এই জিনিসগুলোর প্রভাব রয়েছে। তবে ইচ্ছা ও শক্তির মাধ্যমে নয়। তাই প্রকৃতিবাদীদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য দু'আ এবং বৃষ্টি প্রার্থনার ছ্বলাত কে শরী'আতের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

যারা বলে দু'আ করার মধ্যে কোনো উপকার নেই তাদের জবাবঃ

দর্শনিকদের একদল এবং সুফীদের গোমরাহ লোকেরা বলে যে, দু'আর মাধ্যমে কোন কল্যাণ হাসিল করা যায় না। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা যদি বান্দার প্রয়োজন পূরণ করার ইচ্ছা করেন, তাহলে দু'আ করার কোন প্রয়োজন হয় না। আর যদি তা না করেন, তাহলে দু'আ করেও কোন লাভ হবে না।

সুফীদের কেউ কেউ আবার বলে থাকে, দু'আ করা আল্লাহর খাস বান্দাদের কাজ নয়। আল্লাহর কাছে দু'আ করা সাধারণ লোকদের কাজ। তারা আরো বলে থাকে, খাস বান্দাগণ আল্লাহর কাছে দু'আ করতে গেলে তাদের মর্যাদা খাটো হয়ে যায়। এটি তাদের দুর্বলতার পরিচয়ও বটে। এই ধারণা কতিপয় সুফীদের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।[২৯৭]

দীন ইসলামের দলীল-প্রমাণ দ্বারা যেমন এ কথা বাতিল হয়, তেমনি বিবেক ও বোধশক্তির দলীল দ্বারাও ইহা বাতিল সাব্যস্ত হয়। কেননা দু'আর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি সমস্ত মানব জাতির অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত এবং সকল জাতিই এতে ঐক্যমত পোষণ করেছে। এমনকি দার্শনিকরাও বলে থাকে, ইবাদতখানায় হরেক রকম ভাষায় নানা রকমের ইবাদতের আওয়াজের শোরগোল মহাশূন্যের বন্ধনকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে"। দর্শনিকরা নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ যারা প্রকৃতির প্রভাবে বিশ্বাসী, তারা মনে করে পৃথিবীতে যা কিছু হয়, প্রাকৃতিকভাবেই হয়। তারা স্রষ্টার

---

[২৯৭] সুফীদের কিছু গোমরাহ লোক বলে থাকে, علمه بحالي يغني عن سؤالي আল্লাহ তা'আলা আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। সুতরাং তার কাছে চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শাইখ এটিকে তাদের ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত এটি তাদের কুফুরী ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে হিদায়াত করুন। আমীন

অস্তিত্ব ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। তারা আরো মনে করে যে, পৃথিবীর ঘটনাসমূহে আকাশের তারকা ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু তাদের এই ধারণাকে মাসজিদ, মন্দির ও গীর্জায় হরেক রকমের ভাষায় নানা প্রকার ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার ও স্রষ্টার দরবারে দু'আর শোরাগোল ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় বলে তারা নিজেরাই স্বীকৃতি দিয়েছে।

সুফীদের উপরোক্ত সন্দেহের জবাব দিতে গিয়ে আমরা বলবো, তারা যেই দু'টি ভূমিকা (যুক্তি) পেশ করেছে, আমরা ভূমিকা দু'টির মধ্যেই সীমিত মনে করি না। কেননা তাদের কথা, আল্লাহ তা'আলা যদি বান্দার প্রয়োজন পূরণ করার ইচ্ছা করেন, তাহলে দু'আ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না, আর যদি তা না করেন, তাহলে দু'আ করেও কোন লাভ হবে না, ভূমিকা শুধু দু'টির মধ্যেই সীমিত নয়; বরং এখানে তৃতীয় আরেকটি বিষয় রয়েছে। তা হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা কখনো শর্তসাপেক্ষ বাস্তবায়ন করেন। সেই শর্ত পাওয়া গেলে তার প্রয়োজন পূরণ করেন আর শর্ত পাওয়া না গেলে প্রয়োজন পূরণ করার ইচ্ছা করেন না। বান্দার দু'আ কখনো সেই শর্তের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন ছাওয়াব পাওয়ার শর্ত হলো আমলে সালেহ সম্পাদন করা। তাই আমল না করলে ছাওয়াব পাওয়া যায় না।

সুতরাং প্রয়োজন পূরণ করাকে যদি দু'আর সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে সুফীদের এই কথা বলা ঠিক নয় যে, দু'আর মধ্যে কোন উপকার নেই। যেমন এই কথা বলা ঠিক নয় যে পানাহার করার মধ্যে উপকার নেই, বীজ বপন করে কোনো লাভ নেই এবং অন্যান্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও একই কথা যে, এগুলো গ্রহণ করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। অতএব, সুফীদের কথা যেমন শরী'আত বিরোধী তেমনই বোধশক্তি ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত। এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে জানা দরকার, তা হলো একদল আলেম বলেছেন, শুধুমাত্র বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দিকে ঝুকে পড়া তাওহীদের মধ্যে ত্রুটি স্বরূপ, তেমনি উপায়-উপকরণ অবলম্বন করাকে উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম হিসাবে স্বীকার না করা বোধশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির মধ্যে ত্রুটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এমনি উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ করা থেকে একেবারেই সরে আসা শরী'আতকে দোষারোপের শামিল।[২৯৮] আল্লাহর উপর আশা ও ভরসা তাওহীদ, বোধশক্তি ও শরী'আতের দাবি থেকেই নির্মিত হওয়া উচিত।

---

[২৯৮] তাওহীদের পূর্ণতা হলো, বান্দা যেমন একদিকে উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রম করবে অন্য দিকে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা করবে। উপায়-উপকরণ, মাধ্যম, কৌশল ও প্রচেষ্টার উপর যেমন পুরোপুরি নির্ভর করবেনা, ঠিক তেমনি এগুলোকে একেবারে বাদও দিবেনা; বরং অবশ্যই পরিশ্রম করবে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে ও তার কাছে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দু'আও করবে। এটিই তাওহীদ ও তাওয়াক্কুলের পূর্ণতা। কিন্তু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উপায়-উপকরণ, মাধ্যম, কৌশল ও পরিশ্রমের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা তাওহীদ ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। এমনকি বান্দার অবস্থা অনুপাতে উপায়-উপকরণের উপর নির্ভরশীলতা কুফরী ও শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। ইসলামী শরী'আত উদ্দেশ্য হাসিল করতে এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছে। শাইখ আব্দুল মুহসিন আলআবক্ষাদ বলেন, الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد وقدح في

উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা হলো, উপায়-উপকরণের দিকে ঝুকে পড়া, অন্তরকে ঐদিকেই বেধে রাখা, অন্তর দিয়ে উহাই কামনা করা ও উহার উপরই ভরসা করা তাওহীদের পরিপন্থী। কেননা মাখলুকের মধ্যে এমন কিছু নেই, যার প্রতি এভাবে ভরসা করা যেতে পারে। কোন মাখলুকই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় এবং সে নিজস্ব ক্ষমতায় কিছুই করতে পারে না। মাখলুকের দ্বারা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গেলে একাধিক সহায়ক বস্তুর সাহায্য নিতে হয়। এত কিছু অবলম্বন করার পর এবং সমস্ত উপায়-উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা যদি উহাকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বশীভূত না করেন, তাহলে উহা গ্রহণ করেও কোন লাভ হয় না।[২৯৯]

সুফীদের কথা, আল্লাহ তা'আলা যদি বান্দার প্রয়োজন পূরণ করার ইচ্ছা করেন, তাহলে তো প্রয়োজন পূরণ করবেনই, সুতরাং দু'আ করার কোন প্রয়োজন আছে কি? এর জবাবে আমরা বলবো, কখনো কখনো সেই প্রয়োজন ছাড়া দ্রুত কিংবা দেরীতে অন্যান্য ফায়দা হাসিল করার জন্য কিংবা বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের বিপদাপদ দূর করার জন্য দু'আ করার প্রয়োজন পড়ে। এমনি সুফীদের কথা, আল্লাহ তা'আলা যদি বান্দার প্রয়োজন পূরণ করার ইচ্ছা না করেন, তাহলে দু'আ করেও কোন লাভ হবে না, এই কথার জবাবে আমরা বলবো, দু'আর মধ্যে অনেক উপকারিত রয়েছে। যেমন নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবহিত করেছেন যে, দু'আর মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন হয় এবং বিপদাপদ দূর হয়। দু'আর মাধ্যমে ইহজগতে বান্দা তার প্রভুর মারেফত হাসিল করে এবং তার রবের একত্বের স্বীকৃতি দেয়। সেই সঙ্গে আরো স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার অতি নিকটে, তিনি সবকিছু শুনেন, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি মহা বিজ্ঞ ও দয়ালু। দু'আর

التوكل وترك الأسباب قدح في العقل والشرع "উপায়-উপকরণের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা বান্দার তাওহীদকে ত্রুটিযুক্ত করে ফেলে এবং আল্লাহর উপর ভরসাকেও দুর্বল করে দেয। ঠিক তেমনি উপায়-উপকরণ অবলম্বন বর্জন করা বিবেক-বোধশক্তিকে অস্বীকার করার শামিল এবং শরী'আতকে দোষারোপ করা ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ করার গুরুত্ব বোধশক্তি দ্বারাই সাব্যস্ত। মুসলিম, অমুসলিম, কাফের সকলেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপায়-উপকরণ, মাধ্যম ও কলা-কৌশল অবলম্বন করে। কেউ এর গুরুত্বকে অস্বীকার করে না। সুতরাং যা হওয়ার তা হবেই, তাই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আমল করা, আল্লাহর কাছে দু'আ করা এমনকি অন্যান্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে লাভ কী? সুফীদের এই কথা বোকামি, বোধশক্তিকে অস্বীকার করা এবং শরী'আতকে বর্জন করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শ্রম ব্যয় করা, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা শুধু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই সাব্যস্ত নয়; এমনকি পশু-পাখিরাও তাদের পেট পূর্তি করার জন্য বাসা থেকে বের হয়, উড়াল দেয় এবং খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে।

ঐদিকে উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করেই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করা শরী'আতকে দোষারোপ করা, ত্রুটিযুক্ত মনে করা এবং উহা বর্জন করার শামিল। কারণ শরী'আত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমল করা এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছে। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[২৯৯] তাই দেখা যায় একই পীড়ায় পিড়িত দুইজন রোগী একই ঔষধ সেবন করেও একজন ভালো হয় এবং অন্যজনের অসুখ আরো বৃদ্ধি পায়। রোগী সুস্থ হওয়ার জন্য যদি শুধু ঔষধই যথেষ্ট হতো এবং এখানে ঔষধই যদি একমাত্র প্রভাব সৃষ্টিকারী হতো, তাহলে উভয় রোগীই ভাল হয়ে যাওয়ার কথা।

মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে স্বীয় অভাবের কথা প্রকাশ করে এবং তার দিকে নিজ প্রয়োজন তুলে ধরে। এ ছাড়া বান্দা মূলত দু'আর মাধ্যমেই তার সর্বোচ্চ কাম্য বস্তু জান্নাতের নিয়ামত এবং পবিত্র জীবন লাভ করে থাকে।

যদি বলা হয়, একজন মানুষ যেমন অন্যজনের কাছ থেকে কিছু চেয়ে নেয়, তেমনি দু'আর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে দিয়ে থাকেন, তাহলে আবশ্যক হয় যে, বান্দা দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর উপর এমন প্রভাব খাটায়, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে দিতে বাধ্য হন!! (নাউযুবিল্লাহ)

এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলাই বান্দাকে তার কাছে দু'আ করার তাওফীক দেন। আল্লাহর নিকট থেকেই সে এই কল্যাণটি প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহেই সে দু'আ পূর্ণ করে। যেমন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার দু'আ কবুল হলো কি না, তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং দু'আ করার প্রতি আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে দু'আ করার প্রতি আমার অন্তরে যদি ইলহাম হয়, তাহলে বিশ্বাস করি যে, দু'আ অবশ্যই কবুল হবে। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলার বাণী এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত উপরে তার কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর"। *(সূরা সাজদাহ: ৫)*

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তার নিকট থেকেই শুরু হয়। অতঃপর যেসব বিষয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা তিনি সম্পন্ন করেন, তা সম্পন্ন হওয়ার পর তার দিকেই উর্ধ্বগামী হয়। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলাই বান্দার অন্তরকে দু'আর প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং দু'আর প্রতি অন্তরের এই আগ্রহকে সেই কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, যা তিনি বান্দাকে দান করেন। আমল করা এবং আমলের ছাওয়াব দান করার একই কথা। তিনিই তার বান্দাকে আমল করার তাওফীক দান করেন। অতঃপর বান্দা যখন আমল করবে, তখন আমলের ছাওয়াবও তিনিই প্রদান করেন। তিনিই বান্দাকে তাওবা করার তাওফীক দেন। অতঃপর তিনিই বান্দার তাওবা কবুল করেন। তিনিই বান্দাকে আমলের তাওফীক দান করেন। অতঃপর তিনিই ছাওয়াব দান করেন। তিনিই দু'আ করার তাওফীক দান করেন। অতঃপর তিনিই তা কবুল করেন। সুতরাং মাখলুকের কিছুই আল্লাহ তা'আলার মধ্যে প্রভাব খাটাতে পারে না। বরং তিনি যা করেন, তার করার কারণ তিনি নিজেই নির্ধারণ করেন। তাবেঈদের অন্যতম মুতার্‌রিফ বিন আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বান্দাদের আমল সমূহের মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম যে, আল্লাহ তা'আলা থেকেই তা শুরু হয়, তিনিই তার তাওফীক দান

করেন এবং তিনিই তার পূর্ণতা দান করেন। আমি আরো দেখলাম যে সব আমলের মূল হচ্ছে দু'আ।

এখানে একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন রয়েছে। তাহলো, কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে চায়। অথচ তাকে কিছুই দেয়া হয় না অথবা সে যা চায়, তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু দেয়া হয়। এর উত্তর কী? এই প্রশ্নের কয়েকটি জবাব দেয়া হয়েছে। তিনটি জবাব খুবই সঠিক।

প্রথম জবাব: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

"হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলো, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের উচিত, আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার উপর ঈমান আনয়ন করা, হয়তো তারা সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে"। *(সূরা আল বাকারা: ১৮৬)*

এখানে তো এই কথা বলা হয়নি যে, বান্দা যা চাইবে, তাই দেয়া হবে। বরং বলা হয়েছে যে, তিনি দু'আকারীর দু'আর জবাব দেন। দু'আকারীর দু'আ কবুল করার বিষয়টি সাহায্য প্রার্থীকে প্রার্থিত বস্তুটি দান করার চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»

"আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আমার নিকট দু'আ করবে? আমি তার দু'আ কবুল করবো। কে আমার কাছে সাহায্য চাইবে? আমি তাকে সাহায্য করবো। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করবো"।[৩০০]

সুতরাং দু'আকারী এবং দানপ্রার্থীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দু'আকারীর দু'আ কবুল করা এবং দানপ্রার্থীকে দান করার মধ্যে আম-খাসের পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ দু'আ করা ও দু'আ কবুল করা হলো আম আর সাহায্য প্রার্থনাকারীর কথা উল্লেখ করার পর ক্ষমা প্রার্থনাকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে ব্যাপকার্থ বোধক শব্দ, তারপর নির্দিষ্ট অর্থবোধক, অতঃপর নির্দিষ্টতর অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন। বান্দারা যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অতি নিকটে এবং তিনি দু'আকারীর দু'আয় সাড়া দেন, তখন তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করবে এবং নিজেদের

[৩০০] বুখারী হা/৭৪৯৪ ও মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুত দাওয়াত।

প্রয়োজন তার কাছে ব্যক্ত করবে। তারা আরো জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন, তিনি বান্দাদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। অতঃপর তারা কখনো কখনো دعاء العبادة অর্থাৎ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে আবার কখনো দু'আর মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। আবার কখনো এক সাথে উভয়টিই করবে। কেননা দু'আ হলো এমন বিষয়ের নাম, যা ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা উভয়কে শামিল করে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ "তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ করো। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো" এখানে দু'আ দ্বারা দু'আউল ইবাদহ তথা ইবাদতের দু'আ এবং প্রার্থনা করার দু'আ উভয়ই উদ্দেশ্য।[৩০১] আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

"যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে" সূরা মুমিন: ৬০। প্রথম অর্থকেই শক্তিশালী করে।

দ্বিতীয় জবাব: বান্দা আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট করে কিছু চেয়ে যখন দু'আ করে, সেই দু'আ কবুল করা বান্দাকে তার কাম্য বস্তুটি হুবুহু দেয়ার চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩০২] তিনি বলেছেন,

«ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها"، قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر قال:"الله أكثر»

[৩০১] অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আযাবের ভয় এবং তার রহমতের আশা নিয়ে ছ্বলাত, ছ্বিয়াম, কুরবানী ও মানতসহ নানা প্রকার ইবাদত সম্পন্ন করাকে দু'আউল ইবাদাহ বা ইবাদতের দু'আ বলা হয়। আর দু'আকারী দু'আর মধ্যে নির্দিষ্ট করে উপকারী বস্তু আল্লাহর কাছে চায় কিংবা ক্ষতিকর বস্তু অপসারনের জন্য আবেদন করে তাকে দু'আউল মাসআলা বা প্রার্থনার দু'আ বলা হয়। এই উভয় প্রকার দু'আ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ইবাদতের প্রত্যেক দু'আই প্রার্থনার দু'আকে আবশ্যক করে এবং প্রত্যেক দুআউল মাসআলাই দু'আউল ইবাদতকে আবশ্যক করে।

[৩০২] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, হাদীছটি ছ্বহীহ মুসলিমে নেই, রয়েছে মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য কিতাবে।

"যখনই কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে দু'আ করে, তাতে যদি কোনো পাপাচার[৩০৩] ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ না থাকে, তাহলে আল্লাহ তার দু'আর বিনিময়ে তিনটি উত্তম বিষয়ের যে কোনো একটি প্রদান করেন। (ক) দু'আতে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে যা চায়, তা তিনি তৎক্ষণাৎ দান করেন। (খ) অথবা তার জন্য অনুরূপ কল্যাণ মজুদ রাখেন। (গ) অথবা তার উপর থেকে অনুরূপ ক্ষতি বিদূরিত করেন। ছাহাবীগণ তখন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তাহলে অধিক পরিমাণ দু'আ করবো। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে আল্লাহও অধিক ছাওয়াব দিবেন।[৩০৪]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, যেই দু'আর মধ্যে কোনো অন্যায় থাকে না, তাতে যাই চাওয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা তা অনতি বিলম্বেই দান করেন অথবা বিলম্বে হলেও অনুরূপ কল্যাণ দান করেন অথবা অনুরূপ ক্ষতি দু'আকারীর উপর থেকে বিদূরিত করেন।

তৃতীয় জবাবঃ দু'আ উদ্দেশ্য হাসিলের অন্যতম মাধ্যম। তবে তা কবুল হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। এমনি দু'আ কবুলের রয়েছে বেশ কিছু প্রতিবন্ধক। শর্তগুলো যখন বাস্তবায়ন হবে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হবে, তখন উদ্দেশ্য হাসিল হবে। অন্যথায় দু'আর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। বরং অনেক সময় দু'আর মাধ্যমে যা চাওয়া হয়, তা ব্যতীত অন্যান্য বস্তু হাসিল হয়। এমনি অন্যান্য পবিত্র বাক্যসমূহ এবং যেসব যিকির-আযকারের সাথে কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ দূর হওয়ার বিষয়টি যুক্ত করে দেয়া হয়েছে, তার ব্যাপারেও একই কথা। কেননা দু'আ এবং যিকির-আযকার অস্ত্রধারীর হাতে অস্ত্রের মতই। অস্ত্র পরিচালনার শক্তি এবং যোগ্যতা ব্যবহার করে অস্ত্র চালালে যেমন অস্ত্র চালিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, দু'আও ঠিক সেরকম। কেননা আপনি অনেক সময় দেখবেন যে, একদল লোক একই দু'আ করেছে এবং তাদের দু'আ কবুল হয়েছে। আবার অনেক লোক সেই দু'আ করেছে, কিন্তু তা কবুল হয়নি। অর্থাৎ হাতে অস্ত্র থাকলেই তা দিয়ে লাভবান হওয়া যায় না। অস্ত্র চালানোর মত শক্তি, সাহস এবং প্রশিক্ষণ থাকা জরুরী। ঠিক তেমনি শুধু দু'আ করলেই তা কবুল হয় না এবং তার দ্বারা আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায় না। দু'আ করার সময় অন্তরে কবুলের সুদৃঢ় আশা রাখতে হবে, ঈমানী শক্তি পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকতে হবে, দু'আ কবুলের প্রতিবন্ধক দূর হতে হবে, কবুলের সময় ও স্থানগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে, একই দু'আ একাধিকবার করতে হবে ইত্যাদি।

---

[৩০৩] পাপাচারের দু'আর স্বরূপ এই যে, যেমন কোনো বান্দা দু'আর মাধ্যমে হারাম কোনো জিনিস প্রার্থনা করলো অথবা বলল, হে আল্লাহ আমাকে অনেক সম্পদ দান করো। আমি তা দ্বারা মদের ব্যবসা করবো অথবা গান-বাজনার আয়োজন করবো। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার উদাহরণ এরূপ হতে পারে যে, কেউ দু'আ করলো, হে আল্লাহ! তুমি অমুককে তার পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও অথবা হে আল্লাহ! তুমি তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যকার সুসম্পর্ক নষ্ট করে দাও। এ রকম দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[৩০৪] ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/৩৫৭৩, সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/২৪০০।

যার দু'আ কবুল করা হলো তার অবস্থা সম্ভবত এমন ছিল যে, দু'আ করার সময় প্রার্থিত বস্তুর প্রতি দু'আকারীর খুব প্রয়োজন ছিল, সে আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুকে পড়েছিল অথবা দু'আ শুরু করার পূর্বে এমন সৎকর্ম সম্পাদন করেছিল, যাকে আল্লাহ তা'আলা সেই সৎকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তার দু'আ কবুলের মাধ্যম বানিয়েছেন। অথবা দু'আ কবুলের সময় দু'আটি সম্পন্ন হয়েছে অথবা অনুরূপ অন্যান্য কারণে তার দু'আ কবুল হয়েছে। কেউ কেউ মনে করতে পারে, যার দু'আ কবুল হয়েছে, সেখানে দু'আ করাই হলো তা কবুল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই দু'আ কবুলের জন্য আবশ্যিক বিষয়গুলো বাদ দিয়েই অন্যরা দু'আ করে থাকে। তাই অন্যদের দু'আ কবুল নাও হতে পারে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উপযুক্ত সময়ে যে ব্যক্তি উপকারী ঔষধ সেবন করলো, সে ঔষধ সেবন করে ফল পেল। এখন অন্য ব্যক্তি যদি মনে করে ফল পাওয়ার জন্য শুধু ঔষধ সেবনই যথেষ্ট, তাহলে সে ভুল করবে। কেননা প্রথম ব্যক্তি ঔষধ সেবন করার সময় ডাক্তারের নির্ধারিত নিয়ম ও সময়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ঔষধ সেবন করেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই ঔষধ খেয়েছে এবং শুধু ঔষধকেই উপকারী মনে করেছে।

কেউ কেউ কবরের পাশে গিয়ে এবং তথায় দু'আ করে ফল পায়। অন্যরা মনে করে দু'আ কবুলে কবরের প্রভাব রয়েছে। বোকারা জানে না যে, হতে পারে কবরের পাশে দু'আকারীর দু'আটি কবুল হওয়ার মূল কারণ হলো প্রার্থিত বস্তুটির প্রতি তার খুব প্রয়োজন ছিল। তাই সে আল্লাহ তা'আলার কাছেই কাকুতি-মিনতি করে একনিষ্ঠতার সাথে দু'আ করেছে। তাই তার দু'আটি কবুল হয়েছে। তবে এ দু'আটি যখন আল্লাহ তা'আলার ঘরসমূহ থেকে কোন একটি ঘরে হবে, তখন আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম ও প্রিয় হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দু'আ করা, আশ্রয় প্রার্থনা ও ঝাড়-ফুঁক অস্ত্রের মতই। অস্ত্রধারী যখন অস্ত্র চালায়, তখন সে তাতে শক্তি প্রয়োগ করে। সে ফলও পায়। অস্ত্র শুধু ধারালো হলেই তা দিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং অস্ত্র যখন ধারালো ও দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হবে, অস্ত্রধারী তা চালাতে শক্তিশালী হবে, টার্গেট ঠিক হবে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হবে, তখন অস্ত্র চালিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করা যাবে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর কোন একটি ছুটে গেলে অস্ত্র চালিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং দু'আটি যদি অনুপযোগী হয় অথবা দু'আকারীর জবান ও অন্তর যদি এক না হয় অথবা দু'আ কবুলের যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তাহলে দু'আ কবুল হবে না।

(৯৪) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلاَ يَمْلِكُهُ شَيْءٌ وَلاَ غِنَى عَنِ اللهِ تَعَالى طَرْفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الحَيْنِ

"আল্লাহ তা'আলা সব কিছুরই মালিক এবং তার মালিক কেউ নয়। মুহূর্তের জন্যও কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মুহূর্তের জন্যও নিজেকে আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করবে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং ধ্বংস হবে।

.....

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত কথাগুলো সত্য, সুস্পষ্ট এবং তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। الحين শব্দের حاء বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। এর অর্থ হলো الهلاك অর্থাৎ ধ্বংস হওয়া।

(৯৫) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

واللهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى لاَ كَأَحَدٍ مِنَ الوَرَى

"আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন, তবে তার রাগান্বিত হওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়া কোনো মাখলুকের রাগান্বিত হওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়ার মত নয়"।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩، والتوبة: ١٠٠، والمجادلة: ٢٢، والبينة: ٨]

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন (সূরা মায়িদা ১১৯, সূরা তাওবা ১০০, সূরা মুজাদালার ২২, সূরা বাইয়্যিনা ৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাইআত করছিলো"। (সূরা ফাতাহ: ১৮)

আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদার ৬০ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

"বস্তুত যাদের উপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদত করেছে, তারা আরো নিকৃষ্ট এবং তারা সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, তথায় সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার উপর লানত করেছেন এবং তার জন্য প্রস্তুত করেছেন কঠিন শাস্তি"। *(সূরা আন নিসা: ৯৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন

{وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} [الْبَقَرَة: ٦١]

তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হল (সূরা আল বাকারা ৬১)। এ রকম আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

সালাফদের এবং সমস্ত ইমামদের মাযহাব হলো রাগান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, শত্রুতা পোষণ করা, বন্ধু গ্রহণ করা, ভালোবাসা, ঘৃণা করা ইত্যাদি আরো যেসব বিশেষণ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত করা এবং এগুলোর এমন তাবীল (অপব্যাখ্যা) থেকে দূরে থাকা, যা আল্লাহ তা'আলার শানে শোভনীয় প্রকৃত অর্থ থেকে উহাকে সরিয়ে ফেলে। যেমন আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ করা, দেখা, কথা বলা ইত্যাদি সমস্ত সিফাতের তাবীল করে থাকে। যেমন ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, শাইখ বলেছেন,

إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين

জান্নাতে আল্লাহকে দেখা এবং রবের প্রতি সম্বোধিত যাবতীয় বিশেষণের প্রকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোনোরূপ অপব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা না করা এবং সেটাকে অবিকৃতভাবে মেনে নেয়া। এটাই হচ্ছে মুসলিমদের দীন বা তাদের অনুসৃত অন্যতম নীতি।

الاستواء তথা আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া সম্পর্কে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) কে যখন প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, তার প্রতি আপনি লক্ষ করুন। তিনি বলেছেন, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة "আরশের উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়। এর পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ

অবগত নয়। উহার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব এবং উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত"।[৩০৫]

উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মারফু ও মাওকুফ সূত্রে উপরোক্ত কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩০৬] ইতিপূর্বে শাইখের উক্তি অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه "যে ব্যক্তি রবের প্রতি সম্বোধিত গুণাবলীকে অস্বীকার এবং সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্য করা থেকে বিরত থাকবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে ও সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে"।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি সামনে আসছে যে, إن الإسلام بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل "দীনের সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মাঝামাঝি হলো ইসলামের অবস্থান। আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সেগুলোতে তাশবীহ তথা সাদৃশ্য নির্ধারণ কিংবা সেই নাম ও গুণাবলীকে অর্থহীন করার মাঝেই ইসলামের অবস্থান"।

সুতরাং শাইখের কথা, واللهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى لاَ كَأَحَدٍ مِنَ الوَرَى "আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন, তবে তার রাগান্বিত হওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়া কোনো মাখলুকের রাগান্বিত হওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়ার মত নয়"। এখানে তার রাগান্বিত হওয়া মাখলুকের রাগান্বিত হওয়া কিংবা তাদের কারো সন্তুষ্ট হওয়ার মত নয়" এই বাক্য দ্বারা মাখলুকের মধ্যে আল্লাহর সাদৃশ্য থাকাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই কথাও বলা যাবে না যে, এখানে সন্তুষ্ট হওয়া দ্বারা ছাওয়াব প্রদান করার ইচ্ছা করা উদ্দেশ্য এবং রাগান্বিত হওয়া দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা করা উদ্দেশ্য। কেননা এতে আল্লাহর সিফাতের অস্বীকার হয়ে যায়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ঐক্যমত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং যা কিছু পছন্দ করেন, তা করার জন্য মাখলুককে আদেশ দিয়ে থাকেন। যদিও তিনি কখনো কখনো উহা সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেন না। আর যা কিছু তিনি অপছন্দ করেন ও ঘৃণা করেন এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হন, তা হতে নিষেধ করেন। যদিও তিনি উহা সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেন। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে আল্লাহ তা'আলা এমন জিনিসকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন,

---

[৩০৫] অতঃপর সেই বিদ'আতী লোকটিকে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর মজলিস থেকে বের করে দেয়া হলো। কেননা এটি এমন প্রশ্ন, যা সালাফে সালেহীনের কোনো লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেননি।

[৩০৬] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফু হিসাবে এই বর্ণনা ছ্বহীহ নয়। এই কথা উম্মে সালামা থেকে মাওকুফ হিসাবে অথবা ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) থেকেই এই বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ। (দেখুন: শাইখের তাহকীক ও তাখরীজসহ শারহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়া)

যা সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেন না এবং এমন জিনিসকে অপছন্দ ও ঘৃণা করেন, যা সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেন।[৩০৭]

যারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধান্বিত হওয়া এবং সন্তুষ্ট হওয়াকে শাস্তি দেয়া বা ছাওয়াব দেয়ার ইচ্ছা করার দ্বারা ব্যাখ্যা করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন তোমরা এই ব্যাখ্যা করো? জবাবে সে অবশ্যই বলবে, হৃৎপিন্ডের রক্ত উথলিয়ে উঠার নাম হচ্ছে ক্রোধ এবং প্রিয় বস্তুর প্রতি অন্তর ঝুকে পড়া ও কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হওয়ার নাম হলো ভালোবাসা। আর আল্লাহ তা'আলার শানে এই অর্থ শোভনীয় নয়।

তাদের এই কথার জবাবে বলা হবে যে, বনী আদমের হৃৎপিন্ডের রক্ত উথলিয়ে উঠা ও উত্তপ্ত হওয়া এমন একটি বিষয়, যার উৎপত্তি রাগ থেকেই হয়; তা হুবুহু রাগ নয়।[৩০৮] তাদেরকে আরো বলা হবে, বনী আদমের ইচ্ছাও অনুরূপ। কোনো জিনিসের প্রতি মানুষের অন্তর ঝুকে পড়া অথবা এমন জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়ে যাওয়াকে ভালোবাসা বলা হয়, যা তার জন্য উপযোগী ও মানানসই হয়। কেননা বনী আদমের যে কোনো ব্যক্তি কেবল

---

[৩০৭] এখানে শাইখ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই কিতাব এবং আমাদের অন্যতম কিতাব শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসেতীয়ার একাধিক স্থানে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা দু'প্রকার। (ক) সৃষ্টিগত ও নির্ধারণগত ইচ্ছা এবং (খ) আল্লাহ তা'আলার শরী'আতগত ইচ্ছা তথা শরী'আতের আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধানসমূহ। প্রথম প্রকার ইচ্ছায় তার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা থাকা জরুরী নয়। অর্থাৎ তিনি যা ভালোবাসেন তাও সৃষ্টি করেছেন এবং যা ভালোবাসেন না, যেমন কুফরী ও পাপাচার, বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তাও সৃষ্টি করেছেন।

আর দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছার মধ্যে আল্লাহর পছন্দ ও ভালোবাসা থাকা জরুরী। অর্থাৎ তিনি যা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, কেবল তারই আদেশ দেন। কুফরী ও পাপাচারের আদেশ করেন না। কারণ তিনি এগুলো পছন্দ করেন না। দলীল-প্রমাণসহ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই কিতাবের একাধিক স্থানে এবং ওয়াসেতীয়ায় রয়েছে। পাঠকদেরকে তা পাঠ করার অনুরোধ করা গেল।

[৩০৮] বরং রাগের প্রভাব মাত্র। তারা আল্লাহর সিফাতগুলো মানুষের সিফাতের মত করে বুঝার চেষ্টা করার কারণেই গোমরাহ হয়েছে। মূলত আল্লাহর ক্রোধ ও মানুষের ক্রোধ এক রকম নয়। আল্লাহ হলেন মহান স্রষ্টা, প্রভু এবং সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর বান্দা হলো সৃষ্টি, আল্লাহর প্রতিপালন ও মালিকানাধীন। সুতরাং কী করে বান্দার ক্রোধান্বিত হওয়া ও আল্লাহর ক্রোধান্বিত হওয়া এক হতে পারে? আল্লাহ তা'আলার জন্য ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সাব্যস্ত করলে তা হুবহু বান্দার সিফাতের মত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহর সৃষ্টি সব মানুষের রাগ ও তার প্রভাব যেখানে এক রকম হয় না সেখানে আল্লাহর রাগ বান্দার রাগের মত হওয়ার ধারণা হয় কিভাবে? দেখা যায় কেউ রাগের সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, কেউ অন্যকে মারধর শুরু করে, কেউ এটা করে, কেউ ওটা করে, কেউবা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। আবার কেউ ক্রোধান্বিত অবস্থায় পানাহার ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ঠিক রাখে, তার কথাবার্তা ও চাল-চলনে রাগের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। বান্দার অন্যান্য স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রে একই কথা। বান্দার সিফাত বান্দার মতই। আর আল্লাহর সিফাত আল্লাহর মতই। তাই আল্লাহ তা'আলার জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া এবং সন্তুষ্ট হওয়া বিশেষণ সাব্যস্ত করা হলে আল্লাহ তা'আলা ও তার সুউচ্চ সিফাতগুলো বান্দা ও তার সিফাতের সদৃশ হওয়ার প্রশ্ন তোলা বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও তারা যুক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক বহির্ভূত হওয়ার দোহাই দিয়ে আল্লাহর সুউচ্চ সিফাতগুলো অস্বীকার বা তাবীল করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা শুরা: ১১)

উহাই ইচ্ছা করে, যা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে কিংবা তার উপর থেকে অকল্যাণ বিদূরিত করে। যার প্রতি সে মুখাপেক্ষী, সে কেবল তাই ইচ্ছা করে এবং যার প্রতি সে অভাব বোধ করে, সে কেবল তাই কামনা করে। কাম্য বস্তু পেয়ে গেলে অন্তরে উহার প্রতি আগ্রহ ও ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পায়। আর উহা না পেলে ইচ্ছা কমে যায়। সার কথা হলো, যেই অর্থ বাদ দিয়ে তোমরা অন্য অর্থ গ্রহণ করছো, উভয়ই সমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর জন্য ইচ্ছা সাব্যস্ত করা জায়েয হলে সন্তুষ্ট হওয়া ও রাগান্বিত হওয়া সাব্যস্ত করতে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি সন্তুষ্ট হওয়া ও রাগান্বিত হওয়া বিশেষণ সাব্যস্ত করা নাজায়েয হয়, তাহলে ইচ্ছা সাব্যস্ত করাও নাজায়েয হবে।

আল্লাহর সিফাতের অপব্যাখ্যাকারীরা যদি আরো বলে, আল্লাহ তা'আলার যেই ইচ্ছা রয়েছে, তা বান্দার ইচ্ছা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের জবাবে বলা হবে, যেই ক্রোধ ও সন্তুষ্টি দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত করা হয়, তাও বান্দার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার ইচ্ছা রয়েছে। সুতরাং যেই যুক্তি দিয়ে আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা সাব্যস্ত করা হচ্ছে, সেই একই যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জন্য অন্যসব সুউচ্চ সিফাত সাব্যস্ত করা সম্ভব।

সুতরাং আল্লাহর সিফাতের তাবীল করা ঠিক নয়। বরং তাবীল বা ব্যাখ্যা বর্জন করা আবশ্যক। তাহলেই আপনি পরস্পর বিরোধীতা ও অসংগতি থেকে বেঁচে যাবেন। সেই সাথে আপনি বিনা কারণে আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতসমূহ বাতিল করা থেকেও নিরাপদ থাকবেন। কেননা বিনা কারণে কুরআনের শব্দকে তার প্রকাশ্য ও প্রকৃত অর্থ থেকে সরিয়ে ফেলা হারাম।[৩০৯] মানুষের বোধশক্তি যাকে সরানোর কারণ বলে মনে করে তা কখনো গ্রহণযোগ্য কারণ হতে পারে না। কেননা মানুষের বোধশক্তি বিভিন্ন রকম। বোধশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধিকে কারণ মনে করা হলে প্রত্যেকেই বলবে, তার বোধশক্তি অন্যের বোধশক্তির বিপরীত বিষয়ের প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলার কোনো একটি সিফাতকে যারা এই যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করবে যে, তা মাখলুকের মধ্যেও রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যই একই কথা বলা হবে। কেননা বান্দা আল্লাহ তা'আলার সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে অবশ্যই এমন কিছু বাড়তি অর্থ সাব্যস্ত করবে, যা বান্দার কাছে পরিচিত মাখলুকের সিফাত থেকে ভিন্ন। এই কথা শুধু সিফাতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও একই কথা। বান্দার জন্য যেমন অস্তিত্ব শোভনীয়, তার অস্তিত্ব ঠিক তেমনই। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য যেমন অস্তিত্ব শোভনীয়, তার পবিত্র সত্তার অস্তিত্ব ঠিক তেমনই। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব বিলীন হওয়া অসম্ভব। আর সৃষ্টির অস্তিত্ব বিলীন হওয়া অসম্ভব নয়।

---

[৩০৯] ইমাম ইবনে আব্দিল বার্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সমস্ত আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কুরআন ও হাদীছের শব্দগুলো তার বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অর্থেই ব্যবহার করা হবে। বিনা দলীলে বাহ্যিক অর্থ পরিহার করে অন্য অর্থের দিকে যাওয়া যাবে না। এমনকি সমস্ত আরব একমত হয়েছে যে, আরবী ভাষার শব্দগুলো প্রকাশ্য অর্থেই ব্যবহার করার ব্যাপারে আরবদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

সুতরাং মহান প্রভুর যেসব নাম রয়েছে, তার সৃষ্টিসমূহের জন্যও সেখান থেকে কিছু নাম ব্যবহার করা যায়। যেমন الحي (জীবন্ত), العليم (জ্ঞানী), القادر (ক্ষমতাবান) ইত্যাদি। এমনি আল্লাহ তা'আলার যেসব সিফাত রয়েছে, তা থেকে কতিপয় সিফাত তার বান্দাদের মধ্যেও রয়েছে। যেমন الغضب (ক্রোধান্বিত হওয়া), الرضى (সন্তুষ্ট হওয়া) ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলার জন্য এসব নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করা হলে কী অর্থ হয়, তা আমরা অন্তর দিয়ে বুঝতে অবশ্যই সক্ষম যে, তা সত্য, সাব্যস্ত এবং তার অস্তিত্ব রয়েছে। আর বান্দার জন্য এসব সাব্যস্ত করা হলে কী অর্থ হয়, তাও আমরা বুঝতে সক্ষম। আমরা আমাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক দিয়ে আরো বুঝতে সক্ষম যে, উপরোক্ত উভয় অর্থ থেকে আল্লাহ তা'আলা ও তার বান্দার জন্য নির্দিষ্ট একটি যৌথ পরিমাণ সাব্যস্ত হলেও মস্তিষ্কের বাইরে এবং বাস্তবে এই অর্থের মধ্যে কোনো শরীকানা নেই। মস্তিষ্কের ভিতরেই কেবল আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সিফাতের যৌথ অর্থের ধারণা ও কল্পনা উদিত হয়।[৩১০] মস্তিষ্কের বাইরে ও বাস্তবে আল্লাহ এবং বান্দার জন্য আলাদা আলাদা অর্থই বিদ্যমান।[৩১১] সুতরাং প্রত্যেকের জন্য ঐ অর্থই সাব্যস্ত করা হবে, যা তার জন্য শোভনীয়। জাহান্নামের প্রহরীর রাগ এবং অন্যান্য ফেরেশতার রাগ বনী আদমের রাগের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা ফেরেশতারা মানুষের ন্যায় চারটি মিশ্রদ্যব দ্বারা সৃষ্ট নয়।[৩১২] যাতে করে তাদের অন্তরের রক্তসমূহ রাগের সময় বনী আদমের হৃৎপিন্ডের রক্তের ন্যায় উথলিয়ে উঠতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার রাগের ক্ষেত্রে বনী আদমের মত অন্তরের রক্ত উথলিয়ে উঠার ধারণাই হতে পারে না।

জাহাম বিন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি সিফাতকেই অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহর কালাম, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, ভালোবাসা ঘৃণা করা, রাগান্বিত হওয়া এবং অনুরূপ সব সিফাতকেই অস্বীকার করেছে। তারা বলে, এগুলো আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু এবং তার পবিত্র সত্তা থেকে আলাদা। তিনি তার সত্তায় এগুলোর কোনোটি দ্বারাই

---

[৩১০] আল্লাহ তা'আলা এবং বান্দার সিফাতের মধ্যে কোনো অংশীদারিত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা ও তার বান্দার কোনো একটি সিফাতকে একই শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হলেও অর্থের মধ্যে কোনো অংশীদারিত্ব নেই। অর্থাৎ যেই শব্দ আল্লাহর জন্য যেই অর্থ সাব্যস্ত করে বান্দার জন্য হুবহু তা সাব্যস্ত করা আবশ্যক নয়। সেই শব্দ আল্লাহ ও বান্দার জন্য সমান অর্থ সাব্যস্ত করেনা; আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত অর্থ এবং বান্দার জন্য সাব্যস্ত অর্থের পরিমাণের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

[৩১১] অর্থাৎ সিফাতকে যার দিকে সম্বোধিত করা হয়, তখন উহা তার জন্য শোভনীয় সাব্যস্ত হয় এবং তার জন্যই নির্দিষ্ট হয়। হাতির দাঁত ও পা হাতির জন্য শোভনীয়, পীপড়ার হাত-পা পীপড়ার জন্য শোভনীয়, মানুষের জন্য যেমন হাত শোভনীয় তার রয়েছে সেই রকম। তেমনি আল্লাহ তা'আলার জন্য যেমন হাত শোভনীয়, তার বরকতময় হাত সেরকমই। তা কোনো বনী আদমের অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির হাতের মত নয়। আল্লাহ শুনেন, বান্দাও শুনে, কিন্তু উভয়ের শ্রবণ করার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য।

[৩১২] প্রাচীন দার্শনিকদের মতে মানুষ যেই চারটি মিশ্রদ্রব্যে তৈরী, তা হলো আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস। মেডিকেল সাইন্সের প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী এগুলোকে অন্যান্য নামেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

বিশেষিত নন!!

সিফাই ইবনে কুল্লাব এবং তার অনুসারীরা জাহমিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলাকে এমন কোনো বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা যাবে না, যা প্রকৃতপক্ষে তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। অর্থাৎ ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন সময় তার সিফাতগুলো নিত্য-নতুন হয় না। বরং এসব সিফাত আল্লাহর সত্তার জন্য আবশ্যকীয়, প্রাক্তন, অবিনশ্বর ও চিরন্তন। তিনি এক সময়কে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিশেষ সময়ে সন্তুষ্ট হন না।[৩১৩] এমনি কোনো এক সময়কে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিশেষ সময়ে রাগান্বিত হন না। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শাফা'আতের হাদীছে বলেছেন,

«إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ»

"আমার প্রভু আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, যেমন রাগান্বিত আর কখনো হননি। আজকের পর আর কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না"।[৩১৪]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীরা! তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার সামনে উপস্থিত আছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট আছো? তারা বলবেন, কেন সন্তুষ্ট হবো না? অথচ তুমি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছো, যা তোমার অন্য কোনো সৃষ্টিকে প্রদান করোনি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দান করবো। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে? অতঃপর তিনি

---

[৩১৩] তাদের কথার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা অতীতে একবারই রাগান্বিত হয়েছেন এবং একবারই সন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুন করে এবং বান্দার কাজ অনুযায়ী কোনো সময়কে বাদ দিয়ে অন্য সময় রাগান্বিত হন না কিংবা সন্তুষ্ট হন না। অর্থাৎ তিনি যখন যার উপর ইচ্ছা রাগান্বিত হন না কিংবা যখন যার উপর ইচ্ছা সন্তুষ্ট হন না। তাদের মতে রাগান্বিত হওয়া কিংবা সন্তুষ্ট হওয়া বান্দার আমলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এমনটি নয় যে, বান্দা একবার ভালো আমল করলে তাতে আল্লাহ তা'আলার তার উপর সন্তুষ্ট হবেন, আবার খারাপ আমল করলে তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। বরং তিনি একবারই সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং একবারই রাগান্বিত হয়েছেন। কিন্তু কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের দলীল তাদের কথাকে বাতিল করে।

[৩১৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৭১২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৪।

বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করবো। এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না”।[৩১৫]

এই হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা কখনো কখনো তার সৃষ্টির উপর সন্তুষ্টি নাযিল করেন। সন্তুষ্টি নাযিল করার পর আবার কখনো অসন্তুষ্ট হন। যেমন কখনো অসন্তুষ্টি নাযিল করার পর সন্তুষ্টিও হন। তবে এসব জান্নাতী লোকদের উপর এমন সন্তুষ্টি নাযিল করবেন, যার পর কখনো তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসবে না।

কুল্লাবিয়ারা আরো বলেছে, আল্লাহ তা‘আলা যখন ইচ্ছা কথা বলেন না, যখন ইচ্ছা হাসেন না, যখন ইচ্ছা ক্রোধান্বিত হন না, যখন ইচ্ছা সন্তুষ্ট হন না; বরং তারা সন্তুষ্ট হওয়া, রাগান্বিত হওয়া, ভালোবাসা এবং ঘৃণা করাকে ইচ্ছা হিসাবে নাম দিয়ে থাকে অথবা অন্য সিফাত দ্বারা ব্যাখ্যা করে। তাদের মতে উভয় অবস্থাতেই উপরোক্ত কোনো সিফাত আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার সাথে সংশিষ্ট নয়। কেননা তাদের মতে এই সিফাতগুলো যদি ইচ্ছা ও ক্ষমতার সাথে সংশিষ্ট হয়, তাহলে আল্লাহর পবিত্র সত্তা حوادث (সৃষ্ট বস্তুসমূহ) অনুপ্রবেশ করার মহলে পরিণত হওয়া আবশ্যক হয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতে কুল্লাবিয়ারা আল্লাহ তা‘আলার সিফাতে ফেলীয়াগুলোকেই অর্থাৎ কর্মগুলোকেই অস্বীকার করেছে। যেমন জাহমিয়রা একবাক্যে সিফাতে যাতীয়া ও ফেলীয়া উভয়কেই অস্বীকার করেছে। তাদের যুক্তি হলো আল্লাহর সত্তা أعراض (সৃষ্টির গুণাবলী ও নশ্বর বস্তু) প্রবেশের স্থান নয়।[৩১৬]

তাদের জবাবে বলা হবে যে, কুল্লাবিয়ারা যেগুলোকে حوادث (সৃষ্ট বস্তুসমূহ) হিসাবে নাম দিয়েছে সেগুলোর এই নাম দেয়া ঠিক নয়; বরং এগুলোকে আল্লাহর কর্ম বলে নাম

---

[৩১৫] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭৫১৮, মুসলিম হা/২৮২৯।

[৩১৬] অর্থাৎ যারাই আল্লাহ তা‘আলার সিফাতকে অস্বীকার করেছে, তারা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহর সিফাতগুলোকে প্রথমে সৃষ্টির সিফাতের দৃষ্টিতে দেখেছে। যেমন তারা বলেছে, জীবিত থাকা, ক্ষমতাবান হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, শ্রবণ করা, দেখা, ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি সৃষ্টির বিশেষণ। তারা বলেছে সৃষ্টির এই সিফাতগুলো স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ এগুলো অন্যের সাহায্য ছাড়া অস্তিত্বশীল ও প্রতিষ্ঠিত হয় না। এগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে হলে জিসিম তথা দেহ, আকৃতি, কায়া ও শরীরের প্রয়োজন হয়। সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্ব যেহেতু দেহ ও কায়াহীন, তাই এগুলো তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা এমন কোনো মহল নন, যাতে অন্য কিছু প্রবেশ করতে পারে। তারা আরো বলেছে, যার মধ্যে কোনো সৃষ্ট বস্তু প্রবেশ করে, তাও নশ্বরে পরিণত হয়। আল্লাহ তা‘আলা নশ্বর নন; বরং তিনি অবিনশ্বর ও চিরন্তন। তাই তারমধ্যে মাখলুকের সিফাত সদৃশ কোনো কিছু প্রবেশ করা অসম্ভব। মুতাযিলারা আরো বলেছে, আল্লাহ তা‘আলার জন্য একাধিক সিফাত সাব্যস্ত করা হলে একাধিক অবিনশ্বর সত্তা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। সেই সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলার চিরন্তন, অবিনশ্বর সত্তার সাথে একাধিক চিরন্তন সিফাতও সাব্যস্ত হয়ে যায়। এতে করে আল্লাহর তাওহীদ ঠিক থাকেনা। তাই তারা তাওহীদ সংরক্ষণের দোহাই দিয়ে একবাক্যে আল্লাহর সমস্ত সুউচ্চ সিফাতকে অস্বীকার করে। কুরআন, সুন্নাহ, মুসলিমদের ইজমা এবং বোধশক্তির দলীল দ্বারা তাদের যুক্তিগুলো বাতিল করা হয়েছে।

দেয়া হবে। এগুলোকে সিফাত হিসাবেও নাম দেয়া যায়; أعراض তথা নশ্বর বস্তু হিসাবে নয়।

পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এই সংক্ষিপ্ত কিতাবের একই স্থানে আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত আলোচনাগুলো একসাথে একত্রিত করেননি। অনুরূপ তাক্বদীর সম্পর্কিত কথাগুলোর একই কথা। তিনি তাতে ধারাবাহিকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেননি।

দীনের মূলনীতি সম্পর্কে রচিত কিতাব রচনার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, তা হাদীছে জিবরীলে বর্ণিত নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব অনুযায়ী আক্বীদাহর বিষয়গুলো সাজানো হবে। সেখানে জিবরীল যখন তাকে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি জবাব দিয়েছেন যে,

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তার ফেরেস্তাদের উপর (৩) তার কিতাব সমূহের উপর (৪) তার রসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর"।[৩১৭]

সুতরাং তিনি যদি প্রথমে তাওহীদ অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সিফাত, অতঃপর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করতেন, অতঃপর ফেরেশতাদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন, পরিশেষে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন, তাহলে খুব ভালো হতো।

(৯৬) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسُولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وَلاَ نُفرطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُم؛ وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم، وَبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نُذْكُرُهُم إِلاَّ بِخَيْرٍ وَحُبُّهُم دِينٌ وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ

আর আমরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদেরকে ভালোবাসি। আমরা তাদের কারো ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি না। যারা ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদের সমালোচনা করে আমরাও তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাদের ভাল কর্মগুলো বর্ণনা করি। ছাহাবীদেরকে ভালোবাসা হচ্ছে দীন, ঈমান ও ইহসান এবং তাদেরকে ঘৃণা করা কুফুরী, নিফাকী, যুলুম ও সীমালংঘন।

---

[৩১৭] মুসলিম, হা/৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে শাইখ রাফেযী ও নাওয়াসেব (ছাহাবীদের সমালোচকদের) প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ছাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদানের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য। (সূরা আত তাওবা: ১০০)

আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতাহ এর ২৯ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে রুকুকারী ও সিজদাবনত অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাদের এ পরিচয় তাওরাতে দেয়া হয়েছে। আর ইনযীলে তাদের উপমা পেশ করা হয়েছে এই বলে যে, একটি শস্যক্ষেত যা নির্গত করে কিশলয়। অতঃপর তাকে শক্তি করে, তা পুষ্ট হয় এবং মজবুত হয়ে স্বীয় কান্ডে ভর করে দাঁড়িয়ে যায়। যা কৃষককে খুশী করে। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনয়ন করছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বাইয়াত করছিলো। তিনি তাদের মনের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন, পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে আশু বিজয় দান করেছেন"। (সূরা ফাতাহ: ১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ﴾

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজের জানমালের ঝুকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরত কারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসলে তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু হিজরত করেনি তারা হিজরত করে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বের ও অভিভাবকত্বের কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন। যারা কুফুরী করেছে তারা পরস্পরের সাহায্য সহযোগীতা করে। যদি তোমরা এটা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি হবে ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য-সহায়তা করেছে তারাই সাচ্চা মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সর্বোত্তম রিযিক। আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত"। *(সূরা আল আনফাল: ৭২-৭৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

"কী ব্যাপার? তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছো না কেন? অথচ যমীন ও আসমানের মালিকানা তারই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে তারা কখনো সেসব বিজয়ী লোকদের সমকক্ষ হতে পারবে না যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায়

তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। *(সূরা হাদীদ: ১০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

"এ সম্পদ সেসব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী লোক। আবার তা সেসব লোকের জন্যও যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরতে বসবাস করেছিলো। তারা ভালোবাসে সেসব লোকদের যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না এবং যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়। মূলত যে লোককে তার মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম। তা সেই সব লোকের জন্যও যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে। তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করো যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু"। (সূরা হাশর: ৮-১০)

এই আয়াতগুলোতে ছাহাবীদের প্রশংসা করা হয়েছে। সেই সাথে যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তাদেরও প্রশংসা করা হয়েছে। পরবর্তীতে আগমনকারীগণ ছাহাবীদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে আরো প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা যেন, তাদের অন্তরে ছাহাবীদের প্রতি কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ না রাখেন।

এই আয়াতগুলো আরো প্রমাণ করে যে, এই সমস্ত লোকই তথা আনসার ও মুমিনগণই গণীমতের মালের অধিক হকদার। সুতরাং যাদের অন্তরে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে এবং যারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত প্রমাণ করে যে, তারা গণীমতের কোন অংশ পাবে না।

ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, খালেদ বিন ওয়ালীদ এবং আব্দুর রাহমান বিন আওফের মাঝে কিছু মনোমালিন্য

ছিল। একদা খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে গালি দিল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন,

"لا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذُهُبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ"

তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তথাপিও সে তাদের কারো একজনের এক মুদ্দ বা তার অর্ধেক পরিমাণ জিনিস দান করার সমান ছাওয়াব পর্যন্ত পৌঁছবে না।[৩১৮]

খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে গালি দেয়ার কথাটি শুধু ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। এটি ইমাম বুখারী উল্লেখ করেননি।

সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালেদ বিন ওয়ালীদ এবং অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিয়ো না। অর্থাৎ তোমরা আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার মত অন্যদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার অন্যান্য ছাহাবীগণ ইসলামের সূচনাতেই সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সৎকর্মে তারা ছিলেন অগ্রগামী। তারাই মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন। তারা ছিলেন বাইআতুর রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারী। বাইআতুর রিযওয়ানের পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের তুলনায় বাইআতুর রিযওয়ানের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীগণ বেশী সম্মানের অধিকারী হয়ে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচার্য পেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর এবং মক্কাবাসীদের সাথে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যারা ইসলামে প্রবেশ করেছেন, তাদেরকে বাইআতুর রিযওয়ানের পরে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে এরা ঐ সমস্ত মুসলিমদের চেয়ে অধিক অগ্রগামী ছিলেন, যারা মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে মুক্ত-স্বাধীন বলা হয়। আবু সুফিয়ান ও তার ছেলে ইয়াযীদ ও মুআবীয়া তাদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

মোটকথা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে ইসলাম গ্রহণকারীগণকে প্রথমে ইসলাম কবুলকারীদেরকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারীগণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচার্যের এমন মর্যাদা পেয়েছেন, যাতে পরবর্তীদের শরীক হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি পরবর্তীগণের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান করে তাহলে তার এই বিশাল দান প্রথমে ইসলাম কবুলকারীদের কারো এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দান করার সমতুল্য ছাওয়াবও পাবে না। এই যদি হয়

[৩১৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, মুসলিম হা/২৫৪১।

হুদায়বিয়ার ঘটনার পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অবস্থা, তাহলে যারা ছাহাবী নয়, ছাহাবীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা কত কম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তা'আলা সকল ছাহাবীদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী আনসার ও মুহাজিরগণ তারাই, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। বাইআতুর রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের সকলেই তাদের মধ্যে শরীক ছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল একহাজার চার শতের অধিক।

কেউ কেউ বলেন, যেসব মুসলিম দুই কিবলার দিকে ফিরে ছ্বলাত পড়েছেন, তারাই প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে গণ্য। তবে এই মতটি দুর্বল। কেননা শুধু রহিত কিবলার দিকে ফিরে ছ্বলাত পড়া কোন ফযীলতের বিষয় নয়। কেননা কিবলা রহিত করা তাদের আমলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। রহিত কিবলার দিকে ফিরে ছ্বলাত পড়ার ফযীলতে কোন দলীল পাওয়া যায় না। যেমন দলীল পাওয়া যাচ্ছে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করা, মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, জিহাদ করা এবং হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে বাইআত করার ফযীলতের ব্যাপারে।

আর নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, أصحابي كالنجزم بأيهم اقتديتم اهتديتم "আমার ছাহাবীগণ আকাশের তারকাসম। তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলেই তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে" এই হাদীছটি যঈফ। ইমাম বায্যার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছটি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। হাদীছের কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবেও এটি বর্ণিত হয়নি।[৩১৯]

ছ্বহীহ মুসলিমে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলা হলো, কিছু লোক তো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদেরকে গালি দিয়ে থাকে। এমনকি তারা আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে গালি দেয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন বললেন, তোমরা কি এতে আশ্চর্যবোধ করো না? রসূলের ছাহাবীদের থেকে আমলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন যে, তাদের থেকে ছাওয়াবের ধারা বিছিন্ন না হোক।[৩২০]

ইমাম ইবনে বাত্তা ছ্বহীহ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদেরকে গালি

---

[৩১৯] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি একটি মওযূ বা বাতিল হাদীছ। দেখুন, সিলসিলায়ে যঈফা, হা/৫৮।

[৩২০] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছটি আমার নিকট গরীব। ব্যাখ্যাকার এই হাদীছ মুসলিম শরীফে আছে বলে উল্লেখ করলেও আমি তা মুসলিমে খুঁজে পাইনি। দেখুন, শাইখের তাহকীকসহ শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হা/৬৬৮।

দিওনা। কেননা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের কারো এক ঘন্টা অবস্থান করা তোমাদের কারো চল্লিশ বছর আমল করা হতেও উত্তম।[৩২১]

ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে ইমরান বিন হুসাইন এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

«خَيْرُ الناس قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِى أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»

“আমার উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে ঐ সমস্ত মানুষ যাদের মধ্যে আমি জীবিত আছি। অর্থাৎ আমার ছাহাবীগণ। অতঃপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে আগমনকারীগণ। অতঃপর উত্তম হচ্ছে যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে। ইমরান বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরে দুই যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছি না। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর তোমাদের পরে এমন সব লোক আসবে, যাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা না হলেও সাক্ষ্য দেয়ার জন্য এগিয়ে আসবে, তারা খেয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মানত করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না। আর তাদের মধ্যে মোটা মানুষ দেখা দিবে”।[৩২২]

ছ্বহীহ মুসলিমে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»

“হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে বাইআতকারী কোনো লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না”।[৩২৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

“আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি। যারা অত্যন্ত কঠিন সময়ে তার অনুসরণ করেছিল। যদিও তাদের মধ্য হতে একদল লোকের অন্তর

---

[৩২১] ছ্বহীহ, দেখুন, শাইখের তাহকীকসহ শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হা/৬৬৯।

[৩২২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৬৫২। অর্থাৎ আখেরী যামানায় মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারা প্রচুর পানাহার করবে। এতে তাদের দেহ খুব মোটা হয়ে যাবে এবং শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমবে। হাদীছে প্রচুর পানাহার গ্রহণ করে ও চর্বিযুক্ত খাবার খেয়ে শরীর মোটা করাকে নিন্দা করা হয়েছে। কেননা মাত্রাতিরিক্ত মোটা মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং শরীর ভারী হওয়ার কারণে ইবাদত-বন্দেগী ঠিক মত করতে পারে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

[৩২৩] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/২৪৯৬, দেখুন, শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এর তাখরীজসহ শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হা/৬৭১।

বক্রতার দিকে আকৃষ্ট হতে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা এ বক্রতার অনুগামী না হয়ে নাবীর সহযোগী হয়েছেন। ফলে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ লোকদের প্রতি তিনি বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান"। *(সূরা আত-তাওবা: ১০৩)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন সকল বান্দার মধ্যে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনি তাকে নিজের জন্য মনোনিত করেছেন এবং তাকে স্বীয় রিসালাতসহ পাঠিয়েছেন। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পর আল্লাহ তার অন্যান্য বান্দাদের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। এবার তিনি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীদের অন্তরগুলোকে সর্বোৎকৃষ্ট অন্তর হিসাবে পেলেন। তাই তিনি তাদেরকে তার নাবীর সাহায্যকারী হিসাবে নির্ধারণ করলেন। তারা তার দীনের পথে লড়াই করবে। সুতরাং মুসলিমগণ যেই কাজকে উত্তম মনে করে, সেটি আল্লাহর নিকট সুন্দর হিসাবে গৃহীত হয়। আর তারা যেই কাজকে খারাপ মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও খারাপ হিসাবে গণ্য হয়।[৩২৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীগণ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খলীফা বানানোকে উত্তম মনে করেছেন। ইতিপূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি অতিক্রান্ত হয়েছে, যে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি অন্য কারো সুন্নাতের অনুসরণ করতে চায় সে যেন মৃতদের সুন্নাতের অনুসরণ করে.....। শাইখের বক্তব্য: আমরা সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসরণ করি, এই কথার ব্যাখ্যা করার সময় ইবনে মাসউদের উক্তিটি অতিক্রান্ত হয়েছে।

ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যার অন্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন ও নবী-রাসূলদের পরে সর্বোত্তম অলীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে? বরং তাদের চেয়ে ইয়াহূদীরাও একদিক থেকে উত্তম। ইয়াহূদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমাদের দীনের অনুসারীদের মধ্যে কারা সর্বোত্তম? তারা বলেছিল মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথীগণ। খ্রিস্টানদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের দীনের অনুসারীদের মধ্যে কারা সর্বোত্তম? তারা বলেছিল ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাথীগণ।

রাফেযীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তোমাদের দীনের অনুসারীদের মধ্যে কারা সর্বাধিক নিকৃষ্ট? তারা বলেছিল মুহাম্মাদের ছাহাবীগণ!! অল্প সংখ্যক ছাহাবী ব্যতীত বাকী

---

[৩২৪] হাদীছটি মাওকুফ হিসাবে হাসান। ইমাম তায়ালেসী ও আহমাদ (রাহিমাহুমাল্লাহ) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম একে ছ্বহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তাতে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মানুষের জবানে হাদীছটি মারফু হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও তার সনদে রয়েছে একজন মিথ্যুক রাবী। তবে মাওকুফ হওয়াই সঠিক। মারফু ও মাওকুফ উভয় বর্ণনাই সিলসিলায়ে যঈফায় উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, হা/৫৩২ ও ৫৩৩।

সকলকেই তারা গালি দিয়ে থাকে। যাদেরকে তারা গালি দিয়েছে তাদের মধ্যে এমন ছাহাবীও রয়েছেন, যারা তাদের দ্বারা গালিপ্রাপ্তদের চেয়ে বহুগুণে ভাল।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি: আমরা ছাহাবীদের কারো ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না, এর তাৎপর্য এই যে, আমরা তাদের কোন একজনের ভালোবাসায় সীমা লংঘন করি না। যেমন করে থাকে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। তা করলে আমরা সীমা লংঘনকারী বলে গণ্য হবো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾

"হে আহলে কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর সত্য ছাড়া কোন কথা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করো না। মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর একজন রাসূল ও একটি কালেমা (বাক্য) ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আল্লাহ মারইয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রূহ (যা মারইয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল)। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো এবং 'তিন' বলো না। 'তিন' বলা হতে নিবৃত্ত হও। এটা তোমাদের জন্যই ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধে। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তার মালিকানাধীন এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট"। *(সূরা আন-নিসা: ১৭১)*

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমরা তাদের কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি না। যেমন করেছে রাফেযীরা। তাদের নিকট বারা ব্যতীত কোন ওয়ালা নেই অর্থাৎ তারা মনে করে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা পর্যন্ত কেউ আহলে বাইতকে ভালোবাসতে ও বন্ধু বানাতে পারবে না। আহলে সুন্নাতের লোকেরা সকল ছাহাবীকেই ভালোবাসে এবং ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করে। গোড়ামি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নয়। কেননা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও গোড়ামি করে তা করলে যুলুম তথা সীমালংঘন করার অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

"এবং দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট হিদায়াত দান করেছিলাম। অতঃপর তাদের মধ্যে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তা (অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং) জ্ঞান আসার পরেই হয়েছিল এবং এ কারণে হয়েছিল যে, তারা একে অপরের উপর যুলুম করতে চাচ্ছিল। তারা যেসব

ব্যাপারে মতভেদ করে আসছিল আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই সব ব্যাপারে ফায়সালা করবেন"। *(সূরা জাসিয়া: ১৭)*

এ অর্থই কোন কোন সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সত্য আগমন করার পর তা নিয়ে মতভেদ করা যেমন যুলুম ও সীমালংঘন, তেমনি বিনা ইলমেই কারো ব্যাপারে অকাট্য সাক্ষ্য দেয়া বিদ'আত এবং কারো সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করাও বিদ'আত। সালাফদের মধ্য হতে যেসব ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে এই কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আবু সাঈদ খুদরী, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ এবং যাহহাক অন্যতম। এখানে সাক্ষ্য দেয়া অর্থ হচ্ছে, নির্দিষ্ট কোন মুসলিমের শেষ পরিণাম আল্লাহর নিকট কী হয়েছে, তা না জেনেই এই কথা বলা যে, সে জাহান্নামী অথবা ইহা বলা যে, সে কাফের।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ)এর বক্তব্য: ছাহাবীদেরকে ভালোবাসা দীন, ঈমান এবং ইহসান তথা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শামিল। কেননা পূর্বে অনেক দলীল অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এতে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ»

"তোমরা আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্রে পরিণত করো না। যে ব্যক্তি আমার ছাহাবীদেরকে ভালোবাসলো, সে আমার ভালোবাসার খাতিরেই তাদেরকে ভালোবাসলো। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করলো, সে আমাকে ঘৃণা করার কারণেই তাদেরকে ঘৃণা করলো, যে তাদেরকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল, সে স্বয়ং আল্লাহকেই কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দিবে, অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।[৩২৫]

ছাহাবীদের ভালোবাসাকে ঈমান হিসাবে নাম দেয়া ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর কাছে কঠিন। কেননা ভালোবাসা অন্তরের আমল হলেও তা তাসদীক (সত্যায়ন) নয়। যাতে করে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ বিষয়ে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি সেখানে বলেছেন, ঈমান হচ্ছে জবানের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের

[৩২৫] ইমাম তিরমিযী এই হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, এই হাদীছটি হাসান গরীব। হাদীছটি এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইমাম আলবানী যঈফ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলায়ে যঈফা, হা/২৯০১।

বিশ্বাসের নাম। তিনি আমলকে ঈমানের মধ্যে শামিল করেননি। এই মাসআলাটি ঈমানের মাসআলাসমূহের মধ্য হতে আহলে সুন্নাতের একটি প্রসিদ্ধ মাযহাব। তবে আমলকে রূপকার্থে ঈমান হিসাবে নাম দেয়া যেতে পারে।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন, ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করা কুফরী, নিফাকী এবং যুলুম। বিদ'আতীদেরকে কাফের বলা যাবে কিনা, এ বিষয়ে আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে এই কুফুরী আল্লাহর এই বাণীতে বর্ণিত কুফুরীর মতই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়ছালা করে না তারাই কাফির"। (সূরা মায়িদা: ৪৪) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

(৯৭) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ

আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বপ্রথম আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের স্বীকৃতি দেই। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আমরা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করি এবং তাকে উম্মতের সমস্ত মুসলিমের উপর প্রাধান্য দেই।

.....

ব্যাখ্যা: আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত কি শরী'আতের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে? না কি ছাহাবীদের নির্বাচনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে? এ নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) এবং আহলে হাদীছের একদল লোকের মতে অস্পষ্ট দলীল এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, তা সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর আহলে হাদীছের আরেকদল, মুতাযিলা এবং আশায়েরাদের মতে ছাহাবীদের ইখতিয়ারের মাধ্যমে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত সাব্যস্ত হয়েছে।

যারা বলেছে শরী'আতের দলীল দ্বারা তার খিলাফত সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের মতের পক্ষে একাধিক দলীল রয়েছে। ইমাম বুখারী জুবাইর বিন মুতঈম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

«أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إليه قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَرِيد الْمَوْتَ، قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ»

“একদা এক মহিলা নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করল। তিনি তাকে পুনরায় আসার আদেশ দিলেন। মহিলাটি বলতে লাগলো, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই, তাহলে আমি কার কাছে যাবো? মনে হচ্ছে যে, সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাওতকে উদ্দেশ্য করেছিল। তিনি তখন বললেন, তুমি এসে যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকরের কাছে যাবে”।[৩২৬]

এই হাদীছ অন্যান্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। এ রকম আরো অনেক হাদীছ রয়েছে, যা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের সুস্পষ্ট দলীল। হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»

“আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমার এই দুইজনের অনুসরণ করবে।[৩২৭] সুনান গ্রন্থকারগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৬৬ ও মুসলিম হা/২৩৮৭ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِئَ فِيهِ، فَقَالَ: ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا، ثُمَّ قَالَ: يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»

“যেদিন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, সেদিনই তিনি বললেন, তোমার পিতা ও তোমার ভাইকে আমার কাছে ডেকে আনো। আবু বকরের জন্য আমি একটি চিঠি লিখে যাবো। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা ও মুসলিমগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কারো খলীফা হওয়াকে অস্বীকার করে।[৩২৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, অন্য কেউ এই বিষয়ে লালসা করবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি আমার কাছে আব্দুর রাহমানকে ডাকো। আমি আবু বকরের জন্য খিলাফতের এমন একটি সনদ লিখে দিবো, যাতে তার খলীফা হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ না হয়। অতঃপর তিনি বললেন, আবু বকরের খিলাফতের ব্যাপারে মুমিনদের মতভেদ হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ছ্বলাতের ইমামতিতে আবু বকরকে প্রাধান্য দেয়ার হাদীছগুলো খুবই প্রসিদ্ধ। মৃত্যু রোগে

---

[৩২৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৫৯, মুসলিম হা/২৩৮৬।

[৩২৭] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৬২৩, ছ্বহীহাহ হা/১২৩৩

[৩২৮] মুসলিম, অধ্যায়: ফাযায়িলুস সাহাবাহ।

আক্রান্ত হয়ে তিনি সেদিন বলেছিলেন, «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» "তোমরা আবু বকরকে বলো সে যেন মানুষের ইমামতি করে"।[৩২৯] তাকে একাধিকবার এ বিষয়ে বলা হলে, তিনি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ থাকার দিনগুলোতে ছ্বলাতে মুসলিমদের ইমামতি করেছেন।

ছ্বহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ»

"একদা স্বপ্নের মধ্যে আমি নিজেকে একটি কূপের পাশে দেখতে পেলাম। কূপের পাশেই ছিল একটি বালতি। আল্লাহ তা'আলা যা চাইলেন, আমি কূপ থেকে সেই পরিমাণ পানি উঠালাম। অতঃপর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বালতি নিলেন। তিনি কূপ থেকে এক বালতি বা দুই বালতি পানি টেনে তুললেন। তার বালতি টানার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এ জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তারপর ঐ বালতিটা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ধরলেন। তিনি বালতিটা হাতে নিতেই তা একটি বিরাট বালতিতে পরিণত হলো। তিনি এত শক্তির সাথে পানি উঠাচ্ছিলেন যে, আমি কোনো বাহাদুর লোককে তার মত শক্তিসহকারে কাজ করতে দেখিনি। তিনি এত পানি উঠালেন যে, লোকেরা তাদের উটগুলোকে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল"।[৩৩০]

ছ্বহীহ বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একদা মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন,

«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ، إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ»

"পৃথিবীবাসীর কাউকে যদি আমি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। আজ থেকে যেন আবু বকরের দরজা ব্যতীত এই মাসজিদের সকল ছোট দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়"।

[৩২৯] ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: আহাদীছুল আম্বীয়া।

[৩৩০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৩৩, অধ্যায়: স্বপ্নে কূপ থেকে এক বা দুই বালতি পানি উঠানো। মুসলিম হা/২৩৯২

সুনানে আবু দাউদ এবং অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে রয়েছে, আশআছ হাসানের সূত্রে আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বললেন যে,

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا رَأَيْتُ مِيزَانًا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ، فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:"خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ»

"আজ তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছো কি? এক ব্যক্তি বলল, আমি দেখলাম, আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নামানো হলো। অতঃপর আপনাকে এবং আবু বকরকে দাঁড়িপাল্লায় উঠানো হলো। এতে আপনার ওজন বেশী হলো। তারপর আবু বকর ও উমারকে ওজন করা হলো। এবার আবু বকরের ওজন বেশী হলো। অতঃপর উমার ও উছমানকে ওজন করার সময় উছমানের তুলনায় উমারের ওজন বেশী হলো। তারপর দাঁড়িপাল্লা উঠিয়ে নেয়া হলো। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় অপছন্দের ছাপ দেখতে পেলাম"।[৩৩১] অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যা দেখলে, তা হলো নবুওয়াতের খিলাফত। অর্থাৎ তাদের খিলাফত নবুওয়াতের তরীকায় পরিচালিত হবে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্বের মালিক বানাবেন।[৩৩২]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের খিলাফত হবে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায়। অতঃপর তাদের খিলাফতকাল শেষ হয়ে গেলে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা চলে আসবে।

উপরোক্ত হাদীছে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা উল্লেখ না থাকার কারণ হলো, তার খিলাফতকালে লোকেরা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। তারা দলে দলে বিভক্ত ছিল। তাতে নবুওয়াতের তরীকায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং রাজত্বও প্রতিষ্ঠা হয়নি।

ইমাম আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, জাবের বলতেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«رَأَى اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ، وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ»

---

[৩৩১] রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় অপছন্দের ছাপ পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ হলো, তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নবুওয়াতের ধারায় খিলাফত অব্যাহত থাকবে না। বরং তার পতন ঘটবে এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরপরই ফিতনা শুরু হবে।

[৩৩২] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ। ইমাম হাকেম হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

"আজ রাতে একজন সৎলোককে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আবু বকরকে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জোড়া দেয়া হয়েছে। জাবের বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বের হয়ে এসে বলাবলি করলাম যে, সৎ লোক বলতে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। আর পরস্পরের সাথে জড়িত লোকেরা হলেন ইসলামের খলীফা"।[৩৩৩]

সামুরা বিন জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম আবু দাউদ আরো বর্ণনা করেন যে, জনৈক লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আকাশ থেকে একটি বালতি নামানো হয়েছে। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই বালতির কিনারায় ধরে তা হতে সামান্য পানি পান করলেন।[৩৩৪] তারপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে সেই বালতির কিনারায় ধরে তা হতে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলেন। তারপর উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে সেই বালতির কিনারায় ধরে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন। তারপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে সেই বালতির কিনারায় ধরলেন। কিন্তু বালতি কাপতে শুরু করল এবং তা থেকে কিছু পানি ছিটে এসে তার শরীরে লাগল"।[৩৩৫]

সাঈদ বিন জুমহান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সাফীনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ أَوِ الْمُلْكَ»

"ত্রিশ বছর পর্যন্ত খেলাফতে নবুওয়াত চলতে থাকবে। এরপর আল্লাহ যাকে চান রাজত্ব দান করবেন"।[৩৩৬]

যারা বলে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খলীফা নিযুক্ত করে যাননি, তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তার পিতা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যদি কাউকে খলীফা নিযুক্ত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি ভালো ছিলেন, তিনিও খলীফা নিযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা করেছেন। আর যদি খলীফা নিযুক্ত না করে যাই,

---

[৩৩৩] যঈফ: আবু দাউদ হা/৪৬৩৬, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ, ইমাম হাকেম হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। তবে ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) যঈফ বলেছেন।

[৩৩৪] সামান্য পরিমাণ পানি পান করার দ্বারা তার খেলাফতকাল সংক্ষিপ্ত হওয়া উদ্দেশ্য। তার খিলাফতকাল ছিল মাত্র দুই বছর কয়েক মাস। স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, উপরোক্ত ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবু বকর, উমার, উছমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) খলীফা হবেন। বালতি হতে প্রত্যেকের কমবেশী পানি পান করা খেলাফতের সময়সীমার প্রমাণ বহন করে।

[৩৩৫] যঈফ: আবু দাউদ হা/৪৬৩৬, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।

[৩৩৬] ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৬৪৬, অধ্যায়: কিতাবুস্ সুন্নাহ।

তাহলে আমার চেয়ে যিনি ভালো তিনিও খলীফা নিযুক্ত করে যাননি। অর্থাৎ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে যাননি। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তিনি যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করলেন, তখন আমি তা থেকে বুঝে নিলাম যে, তিনি কাউকে খলীফা নিযুক্ত করবেন না। তারা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা আরো দলীল গ্রহণ করেছেন যে, তাকে প্রশ্ন করা হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি খলীফা নিযুক্ত করতেন, তাহলে কাকে নিযুক্ত করতেন?[৩৩৭]

তাদের দলীলের জবাবে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত হাদীছগুলো থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে লিখিতভাবে খলীফা নিযুক্ত করে যাননি। লিখিতভাবে কাউকে নিযুক্ত করলে আবু বকরকেই করতেন। তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে বাদ দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ও মুসিলমগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কারো খলীফা হওয়াকে অস্বীকার করেন। শুধু লিখিত নিয়োগপত্র প্রদান করার চেয়ে এই কথাই অধিক পূর্ণাঙ্গ।

আবু বকরকে খলীফা নির্বাচন করার জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন কথা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে এই পথই প্রদর্শন করেছেন। সেই সঙ্গে তার খিলাফতের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েই সংবাদ দিয়েছেন এবং তার খিলাফতের প্রশংসা করেছেন। এই মর্মে লিখিত সনদও দিতে চেয়েছিলেন। অতঃপর যখন তিনি জানতে পেরেছেন যে, মুসলিমগণ তার খিলাফতের উপর ঐকমত্য হবে, তখন সেটাকেই যথেষ্ট মনে করে লিখা পরিত্যাগ করেছেন। অতঃপর বৃহস্পতিবার দিন অসুস্থ অবস্থায় পুনঃরায় লিখার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন কারো কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো, তিনি কি অসুখের কারণেই এমন কথা বলছেন? না কি এটি এমন কথা, যার অনুসরণ করা জরুরী? তাই তিনি লিখা বর্জন করলেন। বিশেষ করে তিনি যখন আল্লাহর পক্ষ হতে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এবং মুমিনগণ আবু বকরকেই খলীফা হিসাবে মনোনিত করবেন, তখন তিনি ইহাকেই যথেষ্ট মনে করলেন।

আবু বকরের মনোনয়নের বিষয়টি নিয়ে উম্মতের মধ্যে যদি সন্দেহ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকতো, তাহলে তিনি সন্দেহ দূর করার জন্য অকাট্য ঘোষণা দিতেন। কিন্তু তিনি যখন বিভিন্নভাবে নির্দেশনা দিলেন যে, আবু বকরই মনোনিত খলীফা, আর মুসলিমগণ তা বুঝেও নিল, এতেই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

এ জন্যই উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুহাজির ও আনসারদের উপস্থিতিতে আবু বকরকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, আপনি আমাদের নেতা এবং রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমাদের মধ্য হতে

[৩৩৭] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/২৩৮৫।

সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আনসার ও মুহাজিরদের কেউ এই কথার প্রতিবাদ করেননি। ছাহাবীদের কেউ বলেননি যে, মুহাজিরদের মধ্যে আবু বকরের চেয়ে খিলাফতের অধিক হকদার অন্য কেউ রয়েছেন। আনসারদের কতিপয় লোক ব্যতীত অন্য কেউ বিরোধীতা করেননি। বিরোধীতাকারীদের কথা ছিল, আনসারদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন এবং মুহাজিরদের মধ্য হতে আরেকজন আমীর হবেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীছগুলো এই কথাকে বাতিল সাব্যস্ত করে।

সা'দ বিন উবাদাহ ব্যতীত আনসারদের সকলেই আবু বকরের নিকট খিলাফতের বাইআত করেছে। সাদের বিরত থাকার কারণ হলো তিনি নিজেই খিলাফতের দাবিদার ছিলেন। কোনো ছাহাবীই এই কথা বলেননি যে, আবু বকর ব্যতীত আলী কিংবা আব্বাস অথবা অন্য কাউকে সুস্পষ্ট করে খিলাফতের হকদার বলেছেন। যেমন বলে থাকে বিদ'আতীরা।

ইমাম ইবনে বাত্তা স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনে আব্দুল আযীয মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর হানযালীকে হাসান (রহিমাহুল্লাহু আনহু) এর কাছে পাঠালেন। মুহাম্মাদ হাসানকে জিজ্ঞাসা করলো, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আবু বকরকে খলীফা নিযুক্ত করে গেছেন? হাসান বললেন, এতে কি তোমার সাথীর কোনো সন্দেহ রয়েছে? সে বলল, হ্যাঁ। সেই আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি আবু বকরকে খলীফা নিয়োগ করে গেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে এত ভয় করেন যে, যা তাকে খিলাফত হাসিলের লালসা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

সার কথা হলো, যারাই আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে খলীফা নির্বাচনের দাবি করেছে, তাদের কেউই তার দাবির পক্ষে শরী'আতের একটি দলীলও পেশ করতে পারেনি। সেই সঙ্গে এই কথাও বলতে পারেনি যে, আবু বকরের চেয়ে অন্য কেউ অধিক উত্তম কিংবা তার চেয়ে খিলাফতের অধিক হকদার। যারা আবু বকরকে বাদ দিয়ে অন্যকে খলীফা নির্বাচনের দাবি তুলেছিল, তারা নিজের গোত্রীয় ও জাতীয় প্রীতির কারণেই করেছিল। অথচ তারা আবু বকরের ফযীলত এবং তার প্রতি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা সম্পর্কে অবগত ছিল।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আমর বিন আস (রহিমাহুল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। ফেরত এসে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

«أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ: أَبُوهَا. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً»

"মানুষের মধ্যে কোন্ লোকটি আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে হতে কে? তিনি বললেন, আয়েশার পিতা। আমি বললাম,

তারপর কে? তিনি বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাব। অতঃপর তিনি আরো কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করলেন”।[৩৩৮]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

«كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ، ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلاثًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ: أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: لا. فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي؟ مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا»

“একদা আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার লুঙ্গির একপাশ এমনভাবে ধরে উপস্থিত হলেন যে, তার জানু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের এই সাথীটি রাগ করেছে। অতঃপর আবু বকর সালাম করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল আমার ও উমার ইবনে খাত্তাবের মধ্যে সামান্য ঝগড়া হয়ে গেছে। আমার মনে হয় আমি প্রথমেই তাকে কটু কথা বলে ফেলেছি। পরে আমি অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুতপ্ত হয়ে আবু বকরের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আবু বকর আছেন কি? ঘরের লোকেরা বলল, না। অতঃপর তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে সালাম দিলেন। উমারকে দেখে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। এতে আবু বকর ভয় পেয়ে গেলেন এবং বিনয়ী হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমিই দ্বিগুন অন্যায় আচরণ করেছি। কথাটি দুইবার বললেন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। তোমরা বলেছ, তুমি মিথ্যুক। আর আবু বকর বলেছে, আপনি সত্যবাদী। সে তার জান-মাল দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছে। সুতরাং তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে না? কথাটি দু’বার বলেছেন”।[৩৩৯] হাদীছে বর্ণিত শব্দ غامر অর্থ হচ্ছে

[৩৩৮] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৬২।

[৩৩৯] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৬১।

রাগান্বিত হলো এবং ঝগড়া করলো। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ফযীলতসমূহ এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَتْ: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ، فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قد هَيَّأْتُ فِي نَفْسِي كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي، خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ! ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ فَقَالَ حُبَابُ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَلَكِنَّا الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ وَأَعَزُّهُمْ أَحْسَابًا فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ، فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْد فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللَّهُ»

“রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা গেলেন, তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনার আওয়ালী নামক স্থানে ছিলেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এই দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তখন আনসারগণ বনী সায়েদার ছাউনীতে সা'দ বিন উবাদাহর নিকট একত্রিত হলো। তারা বলল, আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবে এবং আপনাদের মুহাজিরদের মধ্য হতে আরেকজন আমীর হবে। অতঃপর আবু বকর, উমার এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাদের কাছে গিয়ে হাযির হলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে থামিয়ে দিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি মনে মনে একটি সুন্দর কথা প্রস্তুত করেছিলাম, যা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল এবং আমার আশঙ্কা ছিল, আবু বকরের কাছে সেই কথাটি নাও পৌঁছতে পারে। অতঃপর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কথা বললেন। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুস্পষ্টভাষী। তিনি সেদিন আনসারদেরকে লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে এও ছিল যে, আমরা হলাম আমীর আর তোমরা হলে উযীর (সহযোগীতাকারী)। হুবাব ইবনুল মুনযির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা তা করতে যাবো না। আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবে। আর আপনাদের মধ্য হতে আরেকজন আমীর হবে। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, না, তা হবে না। আমরাই হবো আমীর তোমরা হবে উযীর। কেননা কুরাইশরা হলো আরবদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং তারাই সর্বাধিক মর্যাদাবান। সুতরাং তোমরা উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট বাইআত করো অথবা আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহর নিকট বাইআত করো। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, বরং আমরা আপনার হাতেই বাইআত করবো। কেননা আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমাদের

মধ্যে আপনিই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এই বলে উমার তার হাত ধরলেন এবং বাইআত করলেন। লোকেরাও বাইআত করলো। তখন কেউ কেউ বলল, তোমরা সা'দকে বঞ্চিত করলে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহই তাকে বঞ্চিত করেছেন।[৩৪০]

হাদীছের শব্দ السنح দ্বারা আলীয়া নামক স্থান উদ্দেশ্য। এটি ছিল মদীনার একটি সুপ্রসিদ্ধ বাগান।

(৯৮) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অতঃপর আবু বকরের পরে আমরা উমার ইবনুল খাত্তাবের জন্য খিলাফত সাব্যস্ত করি।

.....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমরা আবু বকরের পরে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত সাব্যস্ত করি। কেননা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আবু বকরের মৃত্যুর পর মুসলিমগণ তার খিলাফতের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ফযীলতগুলো এত প্রসিদ্ধ যে, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই, সেগুলো গণনা করেও শেষ করা যাবে না। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে (আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে) জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার পিতা! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! তুমি কি জানো না? মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়া বলেন, আমি বললাম, না। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বোত্তম মানুষ হলেন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়া বলেন, আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, উমার। মুহাম্মাদ বলেন, আমার আশঙ্কা হলো, আবার প্রশ্ন করলে তিনি হয়তো বলে ফেলবেন, উছমান। তাই আমি বললাম, অতঃপর আপনি? জবাবে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি একজন সাধারণ মুসলিম মাত্র"।[৩৪১]

---

[৩৪০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৬৭।

[৩৪১] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৭১। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন, শাইখের তাখরীজ ও তাহকীকসহ শারহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হা/৬৯০।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

«اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»

"আমার পরে তোমরা আবু বকর এবং উমার, -এই দুই জনের অনুসরণ করবে"।[৩৪২] সুনান গ্রন্থকারগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মত্যু বরণ করলেন, তখন গোসল দেয়ার জন্য তাকে খাঁটে রাখা হলো। তার লাশ উঠানোর পূর্বে লোকেরা এসে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরলো, সকলেই তার জন্য দু'আ করছিল, তার প্রশংসা করছিল এবং তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল। ইবনে আব্বাস বলেন, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। আমি সেখানে আশ্চর্যের কিছুই দেখলাম না। তবে একজন লোক পিছন থেকে আমার স্কন্ধে হাত রাখলো। আমি পিছনের দিকে ফিরে আলী ইবনে আবু তালিবকে দেখতে পেলাম। তিনি উমারের জন্য আল্লাহর নিকট রহমত প্রার্থনা করলেন অর্থাৎ উমারকে লক্ষ্য করে يرحمك الله বললেন। তিনি আরো বললেন, আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় এমন কাউকে ছেড়ে যাননি, যার অনুরূপ আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করি। আল্লাহর শপথ! আমার ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আপনার সাথীদ্বয়ের সাথেই রাখবেন। তার কারণ হলো, আমি প্রায়ই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনতাম, আমি, আবু বকর এবং উমার আসলাম। আমি, আবু বকর এবং উমার প্রবেশ করলাম। আমি, আবু বকর এবং উমার বের হলাম।[৩৪৩] এই ধরণের কথা শুনেই আমি কামনা করতাম অথবা ধারণা করতাম যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকরের সাথেই রাখবেন।

একটু পূর্বে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্নের ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে কূপ থেকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকরের পানি উঠানোর পর বালতিটি বিশাল আকার ধারণ করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব সেই বালতি ধরলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি মানুষের মধ্যে এমন কোন শক্তিশালী পুরুষ দেখিনি, যে তার মত শক্তি সহকারে কাজ করতে পারে। তিনি এত পানি উঠালেন যে, লোকেরা তাদের উটগুলোকে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেলো।[৩৪৪]

---

[৩৪২] ছ্বহীহঃ সুনানে তিরিমিযী হা/৩৬৬২।

[৩৪৩] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৮৫, মুসলিম হা/২৩৮৯।

[৩৪৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৬৪।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। সেখানে কুরাইশদের মহিলারা উপস্থিত ছিল। তারা আওয়াজ উঁচু করে তার সাথে কথা বলছিল। তারা যখন উমারের আওয়াজ শুনতে পেল, তখন দ্রুত নিজেদেরকে পর্দায় জড়িয়ে নিল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র উমার! ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, শয়তান যখনই কোন রাস্তা দিয়ে তোমাকে চলতে দেখে, তখনই সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা অবলম্বন করে"।[৩৪৫]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে অনেক ইলহাম বা ঐশী ইঙ্গিত প্রাপ্ত লোক ছিল। এই উম্মতের মধ্যে তাদের কেউ থেকে থাকলে, তিনি হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ইবনে ওয়াহাব হাদীছের শব্দ, محدثون এর ব্যাখ্যা করেছেন ملهمون (ঐশী ইঙ্গিতপ্রাপ্ত) শব্দ দ্বারা।[৩৪৬]

---

[৩৪৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২৯৪, অধ্যায়: ছাহাবীদের ফযীলত। মুসলিম হা/২৩৯৭।

[৩৪৬] ইলহাম অর্থ সম্পর্কে আলেমদের থেকে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন, ইলহাম হলো সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হওয়ার নাম। আল্লাহ তা'আলা যাকে সবসময় সত্য ও সঠিক কথা বলার তাওফীক দান করেন, তিনিই ইলহাম প্রাপ্ত। কেউ কেউ বলেছেন, ইলহাম এবং কাশফ একই জিনিস। আর সৎ-অসৎ উভয় শ্রেণীর লোকের কাশফ হতে পারে। সুতরাং কারো ইলহাম বা কাশফ হতে দেখলে আমরা তাকে ভালো লোক হিসাবে সাব্যস্ত করতে পারি না, যতক্ষণ না তার আক্বীদা ও আচার-আচরণ শরী'আতের সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। তার আক্বীদা যদি বিশুদ্ধ হয় এবং আচার-আচরণ সঠিক হয়, তাহলে তার কাশফ ও ইলহামকে কারামত হিসাবে গণ্য করা হবে। কিন্তু সে যদি বাতিল আক্বীদা পোষণকারী হয় এবং তার আচার-আচরণও যদি সঠিক না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, এটি তার জন্য ফিতনা স্বরূপ। এই জন্যই সালাফদের কতিপয় আলেম বলেছেন,

إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة

"তোমরা যদি কোনো লোককে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে দেখো অথবা বাতাসের সাথে উড়তে দেখো, তাতেই প্ররোচিত হয়ো না, যতক্ষণ না তার আমল-আক্বীদা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে দেখবে"। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)।

(৯৯) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

উমারের পর আমরা উছমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য খিলাফত সাব্যস্ত করি।

.....

ব্যাখ্যা: ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকান্ড, পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ছাহাবীদের পরামর্শ এবং উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য খিলাফতের বাই'আতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী স্বীয় সনদে যেভাবে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, আমি এখানে হুবহু তা উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

আমর ইবনে মাইমুন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় যখন আহত হলেন, তার কয়েকদিন আগে আমি তাকে দেখেছি যে, তিনি হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান এবং উছমান হুনাইফের নিকট দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমরা ইরাকবাসীদের উপর কী পরিমাণ খিরাজ (খাজনা বা কর) ধার্য করেছো? তোমরা কি মনে করো, ইরাকের যমীনের উপর তোমরা এমন কিছু নির্ধারণ করেছো, যা তার সাধ্যের বাইরে? তারা উভয়েই বললেন, আমরা কেবল সে পরিমাণ করই ধার্য করেছি, যা ঐ ভূ-খণ্ড বহন করতে সক্ষম। এতে বাড়াবাড়ি কিছুই করা হয়নি। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার বললেন, তোমরা আবার ভেবে দেখো, তোমরা এমন কর আরোপ করে ফেললে কি না, যা ঐ ভূ-খণ্ড বহন করতে অক্ষম। তারা উভয়েই বললেন, আমরা সামর্থের বাইরে কিছুই নির্ধারণ করিনি।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে নিরাপদ রাখেন, তাহলে ইরাকবাসীদের দুঃস্থ ও বিধবা মহিলাদের আর্থিক অবস্থা এমন পর্যায়ে উন্নীত করে দিবো যে, আমার পর তারা অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না। আমর বিন মাইমুন বলেন, এর চারদিন পর তিনি আক্রান্ত হলেন। আমর আরো বলেন, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আমি সেদিন মাসজিদে তার এত কাছাকাছি ছিলাম যে, আমার মাঝে এবং তার মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন মুসল্লীদের দুই কাতারের মধ্য দিয়ে চলতেন, তখন বলতেন, আপনারা কাতার সোজা করুন।[৩৪৭] যখন কাতারের মধ্যে কোন রূপ ফাঁক ও এলোমেলোভাব পরিলক্ষিত হতো না, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে আল্লাহু

---

[৩৪৭] জামা'আত শুরু করার আগে তিনি কাতারগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতেন। এমনকি পিছনের কাতারগুলোর মাঝখান দিয়ে হাটতেন এবং দেখতেন কোথাও কাতার আঁকা-বাঁকা হয়ে গেল কি না। কারো পা কাতার থেকে একটু সামনে বা পিছনে চলে গেলে বলতেন, হে অমুক সামনে আগাও, হে অমুক একটু পিছাও...ইত্যাদি। বর্ণিত হয়েছে যে, কখনো কখনো তিনি কাতার বাঁকা করার কারণে দুররাও ব্যবহার করতেন।

আকবার বলে ছ্বলাত শুরু করতেন। কখনো কখনো তিনি ছ্বলাতের প্রথম রাকআতে সূরা ইউসুফ, সূরা নাহাল অথবা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন, যাতে অধিক সংখ্যক লোক জামা'আতে হাযির হতে পারে। কিন্তু সেদিন তাকবীর বলার পর পরই যখন তাকে আঘাত করা হলো তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে হত্যা করে ফেলেছে অথবা বললেন, দংশন করেছে। অতঃপর হত্যাকারী সে অনারব কাফের দুই দিকে ধার বিশিষ্ট চাকু হাতে দ্রুত পালাবার পথে ডানে বামে যাকেই পেল তাকেই আঘাত করলো। এভাবে সে ১৩জন লোককে আঘাত করল। তাদের মধ্য হতে ৭ জন মারা গেল। এই দৃশ্য দেখে মুসলিমদের এক লোক তার উপর মাথা ওয়ালা একটি লম্বা কোট নিক্ষেপ করলো। আত্তায়ী যখন বুঝতে পারলো, সে ধরা পড়ে গেছে, তখন সে আত্মহত্যা করলো।

ঐদিকে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আব্দুর রাহমান ইবনে আওফের হাত ধরে ইমামতি করার জন্য সামনে ঠেলে দিলেন। যারা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছাকাছি ছিল, তারা আমার মতই সবকিছু দেখতে পেল। কিন্তু মাসজিদের প্রান্তদেশে ও পিছনের কাতারগুলোতে যারা ছিল কিছুই আঁচ করতে পারছিল না। তারা কেবল উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল না। তারা শুধু বলছিল, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! আব্দুর রহমান ইবনে আওফ লোকদেরকে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ছ্বলাত শেষ করলেন। ছ্বলাত শেষ হলে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে ইবনে আব্বাস! দেখো তো কে আমাকে ছুরিকাঘাত করলো? ইবনে আব্বাস কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে এসে বললেন, মুগীরা ইবনে শু'বার দাস আপনাকে ছুরিকাঘাত করেছে। তিনি বললেন, সেই কারিগরটি? ইবনে আব্বাস বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে নিপাত করুন! আমি তো তার জন্য ভাল কথাই বলেছিলাম। এরপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে আমার মৃত্যু ঘটাননি। হে ইবনে আব্বাস! তুমি এবং তোমার পিতা মদীনায় অনারব দাসের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করতে। আর আব্বাসের দাসের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। তখন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, আপনি চাইলে আমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবো। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমার কথা ঠিক নয়। বিশেষ করে যখন তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলেছে, তোমাদের কিবলার দিকে ফিরে ছ্বলাত পড়েছে এবং তোমাদের মতই হাজ্জ করেছে, তখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পারো না।

অতঃপর তাকে উঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমরাও তার সাথে গেলাম। সেদিন শোকে দুঃখে লোকদের অবস্থা এমন হলো যে, মনে হচ্ছিল ইতিপূর্বে এমন মুছীবতে তারা আর কখনই নিপতিত হয়নি। কেউ বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই। কেউ বলল, আমি তার বেঁচে থাকার ব্যাপারে আতঙ্কিত। অতঃপর খেজুরের শরবত আনা হলে তিনি তা পান করলেন। কিন্তু পেট হতে তা বের হয়ে গেল। অতঃপর দুধ আনা হলে তিনি তা পান করার সাথে সাথেই আহত স্থান দিয়ে বের হয়ে গেল। এতে তারা বুঝতে পারলো যে, তিনি মারা যাবেন।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, অতঃপর আমরা তার কাছে প্রবেশ করলাম। অন্য লোকেরাও আসতে লাগল। লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন একজন যুবক এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি আল্লাহর রসূলের ছাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং প্রথমভাগে ইসলাম গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেছেন, যা আপনি নিজেই অবগত রয়েছেন। অতঃপর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে শাহাদাতের মর্যাদাও লাভ করেছেন।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আমি চাই, এগুলো যেন আমার পাপ-পূণ্যের যোগ-বিয়োগে সমান হয়ে যায়। অতঃপর যুবকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন তার লুঙ্গি মাটি স্পর্শ করছিল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যুবকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। তাকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তোমার পরিধেয় কাপড় উপরে উঠাও। এতে যেমন তোমার কাপড় অধিক পরিচ্ছন্ন থাকবে, তেমনি তোমার প্রতিপালকের ভয় অর্জনে অধিক সহায়ক হবে। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! দেখো, আমার উপর ঋণের বোঝা কী পরিমাণ? তারা হিসাব করে দেখলো, ৮৬ হাজার অথবা তার কাছাকাছি। তিনি বললেন, উমারের পরিবারের সম্পদ হতে যদি এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়, তাহলে সে সম্পদ হতেই পরিশোধ করবে। তা দিয়ে যদি পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে আদী ইবনে কা'বের বংশধরদের কাছ থেকে চেয়ে নিবে। যদি তাদের সম্পদ দ্বারাও পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কুরাইশদের কাছ থেকে চেয়ে নিবে। আমার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে হাত বাড়াবে না; বরং তুমি নিজেই আমার পক্ষ হতে এই ঋণ পরিশোধ করে দিবে। আর তুমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে যাও এবং বলো যে, উমার আপনার উপর সালাম পাঠিয়েছেন। সেখানে গিয়ে আমীরুল মুমিনীন বলো না। কারণ আমি আজ মুমিনদের আমীর নই; বরং তুমি বলো, খাত্তাবের পুত্র উমার তার দুই সাথীর পাশে সমাধিস্থ হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন।

ইবনে উমার আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে গিয়ে সালাম দিলেন এবং অনুমতি চাইলেন। অতঃপর অনুমতি নিয়ে তার কাছে প্রবেশ করে দেখলেন, তিনি বসে কাঁদছেন। ইবনে উমার বললেন, খাত্তাবের পুত্র উমার আপনার কাছে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তার দুই বন্ধুর পাশে সমাধিস্থ হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, এই স্থানটি আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করেছিলাম, কিন্তু আজ আমি উমারকে আমার নিজের উপর প্রাধান্য দিলাম।

ইবনে উমার ফিরে আসলে বলা হলো, এই তো আব্দুল্লাহ ইবনে উমার এসেছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমাকে উঠাও। এক ব্যক্তি তাকে নিজের সাথে হেলান দিয়ে বসালেন। অতঃপর তিনি ইবনে উমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী উত্তর নিয়ে এসেছো?

তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যেমন সংবাদ শুনতে পছন্দ করেন, আমি ঠিক তেমন একটি সংবাদই নিয়ে এসেছি। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আপনাকে সেখানে সমাধিস্থ হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমার কাছে এটা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই ছিল না। আমি যখন মৃত্যু বরণ করবো, তখন আমাকে উঠিয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। অতঃপর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে সালাম জানিয়ে পুনরায় বলবে, খাত্তাবের পুত্র উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার সাথীদ্বয়ের সাথে সমাধিস্থ হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমাকে সেখানে দাফন করবে। আর তিনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আমাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করবে।[৩৪৮]

এ সময় উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং তার সাথে অন্য মহিলারাও আসলেন। তাদেরকে দেখে আমরা উঠে গেলাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করলেন। তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পাশে কিছুক্ষন কাঁদলেন। এবার কিছু পুরুষ লোক তার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে হাফসা পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমরা ভিতর থেকে তার ক্রন্দনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। লোকেরা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! অসীয়ত করুন, কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি খিলাফতের ব্যাপারে ঐ লোকগুলোর চেয়ে অন্য কাউকে অধিকতর যোগ্য মনে করি না, যাদের প্রতি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুকাল পর্যন্ত সন্তুষ্টি ছিলেন। অতঃপর তিনি আলী, উছমান, যুবাইর, তালহা, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর নাম উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তোমাদের মধ্যে মজলিসে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু খিলাফতে তার কোন অংশ নেই। তিনি ইবনে উমারকে সান্তনা দেয়ার জন্যই এ কথা বলেছেন। খিলাফতের দায়িত্ব যদি সাদের উপর ন্যস্ত হয়, তাহলে তিনি এই কাজের জন্য সর্ম্পূন যোগ্য। নতুবা তোমাদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হলে তিনি যেন খিলাফতের কাজে সাদের সাহায্য গ্রহন করে। আমি তাকে অযোগ্যতার কারণে কিংবা খিয়ানতের কারণে কূফার গর্ভণরের পদ থেকে বরখাস্ত করিনি।

তিনি বলেন, আমার পরে যে খলীফা হবে, তার প্রতি আমার অসীয়ত হলো, সে যেন সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে এবং তাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করে। আমি তাকে আরো উপদেশ দিচ্ছি, সে যেন ঐসব আনসারদের প্রতি সদাচরণ

---

[৩৪৮] জীবিত থাকতে যেহেতু একবার অনুমতি দিয়েই দিয়েছেন, তারপরও দ্বিতীয়বার অনুমতি চাওয়ার রহস্য সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আশঙ্কা ছিল, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) লজ্জা-শরমের কারণে প্রথমবার অনুমতি দিয়ে থাকতে পারেন। তাই মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার কথার উপর অটল রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তিনি ইবনে উমারকে দ্বিতীয়বার অনুমতি চাওয়ার আদেশ করেছেন। কেননা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ইচ্ছার বাইরে তিনি সেখানে সমাধিস্থ হতে চাননি। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

করে, যারা মুহাজিরদের পূর্বেই দারুল ঈমান তথায় মদীনায় বসবাস করেছে। তাদের উত্তম ব্যক্তিদের উত্তম কাজকর্মগুলোকে যেন মূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো যেন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়। আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে শহরবাসী মুসলিম জনসাধারণের প্রতি সদাচরণ করার অসীয়ত করছি। কেননা তারাই হলো ইসলামের সাহায্যকারী, রক্ষক, গণীমতের মাল সংগ্রহকারী এবং শত্রুদের ক্রোধের কারণ। তাদের কাছ থেকে যেন তাদের সন্তুষ্টিতে এবং তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আদায় করা হয়। আমি পরবর্তী খলীফাকে গ্রামবাসীদের প্রতিও সদাচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তারাই আরবদের মূল জনগোষ্ঠি এবং ইসলামের মূল শিকড়। তাদের উত্তম সম্পদগুলোকেই যেন বেছে বেছে যাকাতের মাল হিসাবে আদায় না করা হয় এবং তাদের ধনীদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করার পর তাদের গরীবদের মধ্যেই তা বণ্টন করা হয়। এমনি আমি পরবর্তী খলীফাকে আল্লাহ ও তার রসূলের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি সদাচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। তাদেরকে প্রদত্ত অঙ্গিকার যেন পূর্ণ করা হয়, তারা যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে যেন তাদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধ করা হয় এবং তাদের উপর যেন সাধ্যাতীত (কর বা অন্য) কিছু চাপিয়ে দেয়া না হয়।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মৃত্যুবরণ করলেন, আমরা তাকে বহন করে নিয়ে চললাম। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে সালাম দিয়ে বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে নিয়ে যাও। অতঃপর তাকে সেখানে তার বন্ধুদ্বয়ের সাথে সমাধিস্থ করা হলো।

দাফন শেষে শুরা পরিষদের সদস্যগণ একস্থানে সমবেত হলেন। আব্দুর রাহমান বিন আওফ বললেন, তোমরা খিলাফতের ব্যাপারটি মাত্র তিনজনের উপর সোর্পদ করে দাও। যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন আমার অধিকার উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রদান করলাম। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমার অধিকার আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সর্মপন করলাম।

অতঃপর আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আলী ও উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের দুই জনের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এই বিষয়টি গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করবে, আমরা তাকেই খিলাফতের দ্বায়িত্বভার প্রদান করবো। এরপর আল্লাহ তা'আলা এবং ইসলাম হবে তার রক্ষাকবচ। আর প্রত্যেকেই যেন মনে মনে চিন্তা করে, খিলাফতের জন্য কে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি? এই কথা শুনে উছমান এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সর্ম্পূণ চুপ রইলেন। তখন আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি কি আপনারা আমার উপর সোপর্দ করবেন? আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তা করা হলে আমি আপনাদের মধ্য হতে যোগ্যতম ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করবো না। আলী ও উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হ্যাঁ, বিষয়টি আপনার উপরই সোপর্দ করলাম। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের একজনের হাত ধরে বললেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়তা রয়েছে। ইসলাম গ্রহনের দিক থেকে আপনি অগ্রনী, যা আপনি নিজেই অবগত রয়েছেন। আল্লাহই আপনার রক্ষক। আমি যদি আপনাকে খলীফা নির্বাচন করি, তাহলে অবশ্যই ইনসাফ কায়েম করবেন। আর যদি উছমানকে নির্বাচন করি, তাহলে অবশ্যই তার কথা শুনবেন এবং তার আনুগত্য করবেন।

অতঃপর তিনি উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে একান্তে মিলিত হলেন এবং তার সাথেও অনুরূপ কথা বললেন। অতঃপর এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করা শেষ হলে আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে উছমান! হাত উত্তলন করুন। তিনি হাত উঠালে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ সর্বপ্রথম উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট খিলাফত ও আনুগত্যের বাইআত গ্রহণ করলেন। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাইআত গ্রহণ করলেন। এরপর মদীনা বাসীগণ একে একে সকলেই উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আনুগত্যের বাইআত করলেন।[৩৪৯]

হুমাইদ বিন আব্দুর রাহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিসওয়ার বিন মাখরামাহ তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাদেরকে শুরা পরিষদের সদস্য নিয়োগ করেছিলেন, তারা একত্রিত হলো এবং পরার্মশ করলো। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাদেরকে বললেন, খিলাফতের বিষয়ে আমি তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নই, তবে তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য একজনকে খলীফা নির্বাচন করবো। তাই তারা খলীফা নির্বাচনের দায়ভার আব্দুর রহমানের উপর ন্যস্ত করলো। মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ বলেন, তারা যখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফের উপর খলীফা নির্বাচনের দায়ভার ছেড়ে দিল, তখন লোকেরা তার দিকেই ঝুকে পড়লো। এমনকি আমি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নির্বাচিত শুরা পরিষদের বাকী সদস্যদের প্রতি ফিরে তাকাতেও কাউকে দেখিনি। শুধু তাই নয় তাদের পিছনে কাউকে হাটতেও দেখিনি। পরার্মশ দেয়ার জন্য তারা শুধু ঐ রাতগুলো আব্দুর রহমান ইবনে আওফের নিকটেই যাওয়া আসা করতে লাগলো। পরিশেষে যেই রাতের সকালে আমরা উছমানের হাতে খিলাফতের বাইআত করলাম, সেই রাতের অবস্থা সর্ম্পকে মিসওয়ার বলেন, রাতের একাংশ পার হওয়ার পর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ আমার কাছে আসলেন এবং ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। এতে আমি জাগ্রত হলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমার মনে হয় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আল্লাহর কসম! তিন রাত ধরে আমি বেশী একটা ঘুমাতে পারছি না। উঠো এবং যুবাইর এবং সা'দকে আমার কাছে ডেকে আনো। মিসওয়ার বলেন, আমি তাদের দুইজনকে তার কাছে ডেকে আনলাম। তিনি তাদের সাথে পরার্মশ করলেন। পরার্মশ শেষে তিনি বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে আনো। আমি তাকেও ডেকে আনলাম। তিনি তার সাথে অর্ধেক রাত পর্যন্ত নিরবে কথা বললেন। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আশা নিয়ে আব্দুর রহমানের নিকট থেকে বের হয়ে চলে গেলেন যে, তাকেই খলীফা নিয়োগ করা

[৩৪৯] ছহীহ বুখারী, হা/৩৭০০।

হবে!! আব্দুর রহমান ইবনে আওফ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ হতে কিছু একটার (বাইআত ও আনুগত্য না করার) আশঙ্কাও করতেন।

অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিসওয়ারকে বললেন, উছমানকে আমার নিকট ডেকে আনো। মিসওয়ার বললেন, আমি তাকে ডেকে আনলাম। তিনি তার সাথে নিরবে কথা বললেন। ফজরের সময় মুআযযিনের আযানই তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালো। লোকেরা যখন ফজরের ছ্বলাত সমাপ্ত করলো, তখন মিম্বারের নিকট শুরা পরিষদের লোকেরা সমবেত হলো। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য হতে যারা জামা'আতে হাজির ছিল, তাদের সকলকে ডাকলেন। যেসব সেনাপতি মক্কায় আগমন করে উমারের সাথে হাজ্জ করেছিলো, তাদেরকেও ডাকলেন। সকলেই যখন সমবেত হলো, তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ আল্লাহর প্রসংশা গুণাবলী বর্ণনা করলেন এবং তার একত্বের ঘোষনা দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আলী! আমি লোকদের কথা র্বাতার মধ্যে গভীর দৃষ্টি দিয়েছি। আমি দেখলাম, তারা কাউকে উছমানের সমান মনে করছে না। সুতরাং তোমার রায় তাদের অনুরূপ না হলে তোমার মনে যেন কোন প্রকার ক্রোধ না থাকে।

অতঃপর তিনি উছমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনার নিকট আল্লাহ ও তার রসূলের সুন্নাতের উপর এবং রসূলের পরের দুই খলীফার সুন্নাতের উপর বাইআত করছি। এই বলে তিনি উছমানের নিকট বাইআত করলেন। লোকেরাও বাইআত করলো, মুহাজিরগণ বাইআত করলো, আনসারগণও বাইআত করলো, যুদ্ধের সেনাপতিগণও বাইআত করলো এবং সাধারণ মুসলিমগণও বাইআত করলো।[৩৫০]

উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বিশেষ ফযীলতের মধ্যে এও রয়েছে যে, তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছেন। ছ্বহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তার উরু কিংবা পায়ের নলা উন্মুক্ত করে শুয়েছিলেন। তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেভাবেই থেকে গেলেন। তিনি আবু বকরের সাথে আলাপ করলেন। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি প্রবেশ করলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেভাবেই থেকে গেলেন এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে আলাপ করলেন। অতঃপর উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অনুমতি চাইলেন। এবার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। অতঃপর উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশ করলেন এবং রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলাপ

[৩৫০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭২০৭।

করলেন। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন বের হলেন, তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আবু বকর প্রবেশ করলেন, আপনি নড়াচড়া করলেন না এবং কোন পরোয়া করলেন না। অতঃপর উমার প্রবেশ করলেন। তখনো আপনি কাপড় ঠিক করলেন না। কিন্তু যখন উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশ করলেন, তখন সোজা হয়ে বসলেন এবং কাপড় ঠিকঠাক করে নিলেন? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ» "আমি কি এমন একজন লোক থেকে লজ্জাবোধ করবো না, যার থেকে ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ করে?[৩৫১]

ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, বাইআতুর রিদ্বওয়ানের দিন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উছমানকে মক্কায় পাঠালেন। উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু চলে যাওয়ার পর বাইআত সম্পাদিত হয়েছিল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটি উছমানের হাত। অতঃপর তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বললেন, এটি হলো উছমানের বাইআত।[৩৫২]

(১০০) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহু) বলেন,

ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অতঃপর আমরা আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত সাব্যস্ত করি।

.....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ উছমানের পরে আমরা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খলীফা হিসাবে স্বীকার করি। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হওয়ার পর লোকেরা যখন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট বাইআত করলো, তখন তিনি ন্যায়সঙ্গত ইমাম ও খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হলেন এবং তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে গেল। তিনিই ছিলেন নবুওয়াতের তরীকায় তখনকার খলীফা। পূর্বে অতিক্রান্ত সাফীনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীছ এ কথারই প্রমাণ করে। সাফীনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ»

ত্রিশ বছর নুবুওয়াতে খিলাফতে চলবে। তারপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দিবেন।[৩৫৩]

---

[৩৫১] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৪০১।

[৩৫২] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৯৮।

[৩৫৩] হাসান-ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৬৪৭, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর খিলাফতকাল দুই বছর তিন মাস, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খেলাফতকাল ছিল দশ বছর ছয় মাস, উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকাল ছিল বারো বছর এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকাল ছিল চার বছর নয়মাস এবং হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকাল ছিল ছয় মাস।

মুসলিমদের প্রথম বাদশাহ ছিলেন মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি ছিলেন মুসলিমদের সর্ব প্রথম ও সর্বোত্তম রাজা। কিন্তু হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন তার নিকট খিলাফতের দায়ভার সমর্পন করলেন, তখন থেকে তিনিও মুসলিমদের ন্যায়সঙ্গত ইমামে পরিণত হলেন। হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পিতা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর পর ইরাকবাসীরা হাসানের হাতে খিলাফতের বাই'আত করেছিল। বাই'আতের ছয়মাস পর তিনি মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট ক্ষমতা ছেড়ে দেন। এতে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হাদীছের সত্যতা প্রমাণিত হলো, সেখানে তিনি বলেছেন,

«إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

"নিশ্চয়ই আমার এই নাতী নেতা হবে। অচিরেই আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলিমদের বড় দু'টি দলের মধ্যে আপোস-মিমাংসার ব্যবস্থা করবেন"।[৩৫৪] এই উভয় দলের বিবাদের ঘটনা ইতিহাসের কিতাবগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরে ছাহাবীদের বাইআতের মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত স্বীকৃত ও সাব্যস্ত হয়েছে। শুধু মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং সিরিয়াবাসীগণই তার খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা থেকে বিরত ছিল। এ ক্ষেত্রে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দাবীই সঠিক ছিল। কেননা উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন নিহত হলেন, তখন তার উপর এবং আলী, তালহা, যুবাইর ও মদীনার বড় বড় ছাহাবীদের উপর মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ খুব বেড়ে গিয়েছিল। প্রকৃত অবস্থা যাদের জানা ছিল না, তাদের নিকট সন্দেহ প্রবল আকার ধারণ করলো এবং সুদূর সিরিয়াবাসী ও যাদের বাড়ীঘর মদীনা থেকে দূরে ছিল তাদের মধ্যকার কু-প্রবৃত্তির অনুসারী এবং স্বার্থান্বেষী মহলের অন্তরের লোভ-লালসা প্রকট হলো। তবে বড় বড় ছাহাবীদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা হতে আল্লাহ তা'আলা উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হিফাযত করেছেন। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে ছাহাবীদের সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ পৌঁছতো। এসব সংবাদের কিছু ছিল মিথ্যা, কিছু ছিল বিকৃত এবং তার মধ্যে এমন সংবাদও ছিল, যার সঠিক অবস্থা জানা যায়নি। তার সাথে এমন লোকদের ষড়যন্ত্রও যুক্ত হয়েছিল, যারা সত্যের অনুসরণের পরিবর্তে পৃথিবীতে অহংকার ও বিপর্যয় সৃষ্টি করাকেই প্রাধান্য দিতো।

---

[৩৫৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭০৪।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সৈনিকদের মধ্যে সীমালংঘনকারী খারেজীরাও ছিল। এই খারেজীরাই উছমানকে হত্যা করেছিল। তবে নির্দিষ্ট করে হত্যাকারীকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বাহিনীর মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা ছদ্মবেশে তাদের গোত্রীয় লোকের জন্য প্রতিশোধ নিতে এসেছিল। সেই সাথে এমন অপরাধী ও কুচক্রী লোকও তার ছাউনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের অপকর্মের সঠিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দলের মধ্যে এমনসব মুনাফিক বিদ্যমান ছিল, যাদের নিফাকীসমূহ তিনি জানতে পারেননি।

অপর পক্ষে তালহা এবং যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মনে করলেন, যদি মাযলুম শহীদের (উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যাকান্ডের) প্রতিশোধ না নেয়া হয় এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও যালেমদের মূলোৎপাটন না করা হয়, তাহলে তারা আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। এই ধারণা থেকেই উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যদিও এতে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কিংবা তালহা ও যুবাইরের কোনো ইচ্ছা ছিল না।[৩৫৫]

---

[৩৫৫] **উষ্ট্রের যুদ্ধ:** উছমান বিন আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হওয়ার পর উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝিই এই যুদ্ধের মূল কারণ। এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলেন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অপর পক্ষে ছিলেন আয়েশা, তালহা ও যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। এখানে যে কথাটি আমি বলতে চাই তা হলো কোন পক্ষেরই যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যুদ্ধের জন্য বের হননি। তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসার জন্য বের হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তার বের হওয়ার মধ্যেই মুসলিম উম্মতের জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতঃপর তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, বের না হওয়াটাই তার জন্য ভাল ছিল। তাই তিনি যখনই বের হওয়ার কথা স্মরণ করতেন তখন কেঁদে ওড়না ভিজিয়ে ফেলতেন। এমনিভাবে যারাই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং মুআবিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাই পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বের হওয়া সম্পর্কে নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বনী আমেরের বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তাকে দেখে কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল। তিনি বললেন, এই জলাশয়টির (পুকুরটির) নাম কি? লোকেরা বললো, এটির নাম 'হাও-আব'। একথা শুনে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমার ফেরত যেতে ইচ্ছে করছে। যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, অগ্রসর হোন! যাতে মানুষেরা আপনাকে দেখতে পায় এবং হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। তিনি পুনরায় বললেন: মনে হচ্ছে আমার ফেরত যাওয়া উচিত। কেননা আমি রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি আমাদেরকে (নাবী পত্নীদেরকে) লক্ষ্য করে বলেছেন, "কেমন হবে তখনকার অবস্থা যখন তোমাদের কাউকে দেখে হাও-আবের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করবে?"। {(মুস্তাদরাকুল হাকীম। ইমাম ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: হাদীছের সনদটি বুখারীর শর্ত অনুযায়ী, ফাতহুল বারী, (১২/৫৫)} হাদীছের সরল ব্যাখ্যা এই যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "হে আয়েশা! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে? যেদিন তোমাকে দেখে 'হাওআব' নামক জলাশয়ের নিকটস্থ কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীটি মুখস্থ রেখেছিলেন। তিনি যখন ইরাকের বসরা শহরের নিকটবর্তী স্থানে পৌছলেন তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণীটি স্মরণ করে জিজ্ঞেস করলেন এটি কোন জলাশয়? লোকেরা বলল: এটি হাও-আবের জলাশয়। এই কথা শুনে তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে সক্ষম হলেন যে তিনি ফিতনায় পড়ে গেছেন এবং বার বার ফেরত আসার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে তিনি নিরাপদে মদীনায় ফেরত আসলেন। তিনি নিজেও যুদ্ধ করেননি এবং কাউকে যুদ্ধের আদেশও দেননি।

প্রথম সারির আনসার ও মুহাজিরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফিতনাবাজ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোকেরাই এই যুদ্ধের উস্কানি দিয়েছিল। অতঃপর সংঘটিত হয় সিফফীনের যুদ্ধ। সে সময় রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে এবং উম্মতের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার বিচার করা সম্ভব হয়নি। এটিকে সিরিয়াবাসীদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়নি বলে ধরে নেয়া হলো। যার ফলে তারা বাইআত করতে অস্বীকার করে। এই কারণেই সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উছমান

সিফ্ফীনের ফিতনা:

উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি নিহত হওয়ার পর গোলোযোগের মধ্য দিয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা নির্বাচিত হন। মদীনার বিজ্ঞ ছাহাবীগণ তার নিকট খিলাফতের বাইআত করেন। তাদের বাইআতের মাধ্যমেই তিনি মুসলিম উম্মাহর চতুর্থ ন্যায়পরায়ণ খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং সিরিয়াবাসী আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আনুগত্য বর্জন করে। এখানে বিশেষভাবে স্বরণ রাখা দরকার যে, খিলাফতের দাবিতে তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আনুগত্য বর্জন করেননি, যেমন দাবি করে থাকে ইসলাম বিদ্বেষী এবং সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা। বরং তার দাবি ছিল প্রথমে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যার বিচার হবে, অতঃপর তিনি বাইআত করবেন। ঐদিকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা ছিল, তিনি যেহেতু নির্বাচিত খলীফা, তাই আগে তার প্রতি মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহ আনুগত্য প্রকাশ করবেন। অতঃপর শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং প্রকৃত হত্যাকারীদেরকে সনাক্ত করা সম্ভব হলে হত্যার বিচার হবে। এ ক্ষেত্রে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অবস্থানই সঠিক ছিল। কিন্তু মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা এই যুক্তিতে মানতে পারলেন না যে, ন্যায়পরায়ণ খলীফা এবং আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম ছাহাবীর রক্তের বদলা নেয়ার পূর্বে কোনোভাবেই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বাইআত করা যায় না। এতে করে কুরআনের আয়াতে হত্যার বদলে হত্যার ফরযিয়াতই বাতিল হয়ে যায়। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দাবির উপর অটল থাকার কারণেই মূলত এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় পক্ষই ইজতেহাদ করেছিলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় ইজতেহাদে সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাই তিনি দু'টি পুরস্কার পাবেন। আর মুআবিয়ার ইজতেহাদ ভুল ছিল। তাই তিনি একটি বিনিময় পাবেন। এখানে কোনো পক্ষই দুনিয়ার স্বার্থে যুদ্ধ করেননি। উভয়ের দাবিই ছিল এক ও অভিন্ন। সুতরাং আলী ও মুআবিয়ার কাউকেই দোষারোপ করা যাবে না। এতে শুধু পাপের বোঝাই বৃদ্ধি পাবে। এ সম্পর্কে নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ»

"আমার উম্মতের দু'টি বিশাল দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। কিন্তু উভয়ের দাবী হবে একটাই"। (ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান)

এখানে দুইটি দল বলতে আলী ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর দলকে বুঝানো হয়েছে। হিজরী ৩৬ সালে ইরাকের ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সিফ্ফীন নামক স্থানে এই দল দু'টি পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের প্রায় ৭০ হাজার লোক নিহত হয়"। {(মু'জামুল বুলদান, (৩/ ৪১৪)}

আলী ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাঝে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে তার কোন একটিও তাদের ইচ্ছায় হয়নি; বরং উভয় দলের মধ্যে কিছু পথভ্রষ্ট, কুপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং কুচক্রী লোক ছিল। তারা সর্বদাই মানুষকে যুদ্ধের প্রতি উস্কানি দিতো। এতে করে বিষয়টি উভয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আলী ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর দলের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই আলী বা মুয়াবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর কারো আনুগত্য করতো না। আলী বা মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কখনই মুসলমানদের রক্তপাত কামনা করেননি। কিন্তু যা কাম্য ছিল না অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা হয়েই গেল। কথায় আছে ফিতনা যখন শুরু হয়ে যায় জ্ঞানীরাও তার আগুন নিভাতে অক্ষম হয়ে যায়"। (মিনহাজুস্ সুন্নাহ (২/২২৪)

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নেয়া অসম্ভব হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, হত্যাকারীরা যেহেতু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল, তাই তাদের পক্ষ হতে বিদ্রোহ করার আশঙ্কা ছিল, যেমন তারা বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করেছিল উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে। ঐদিকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দেখলেন, তিনি হলেন হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তার আনুগত্য করা আবশ্যক এবং তার আনুগত্যের উপরই মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব। সুতরাং তার বিশ্বাস ছিল সিরিয়াবাসীদের উচিত তার প্রতি অনুগত থাকা এবং মুসলিমদের ঐক্য ঠিক রাখা। এই ওয়াজিব পালনে বাধ্য করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিকল্প নেই। সুতরাং তিনি মনে করলেন, যুদ্ধ করলেই সেই ওয়াজিব আদায় হবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং তার পরের দুই খলীফার যুগে মুসলিমদের প্রতি নরম ও কোমল ব্যবহার করে যেমন তাদের মন জয় করা হতো এবং মুসলিমদের ঐক্য ঠিক রাখা হতো, সিরিয়াবাসীদের প্রতি তেমন নরম ও কোমল করা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবশ্যক মনে করেননি।

সুতরাং তাদের প্রতি কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন না করে শাস্তি দেয়া এবং বল প্রয়োগ করে তাদেরকে গোলযোগ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখাটাই উচিত মনে করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ফিতনার সময় যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকার আদেশ সম্বলিত হাদীছগুলো শুনে বড় বড় ছাহাবীদের অধিকাংশই তা থেকে বিরত থাকলো তারা দেখলো যে, যুদ্ধ করতে গেলে লাভের চেয়ে ফিতনা ও ক্ষতির পরিমাণই হয় অধিক।

আমাদের উপর আবশ্যক হলো, আমরা উভয় পক্ষ সম্পর্কে ভাল ধারণাই পোষণ করবো এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সম্পর্কে যা বলার আদেশ দিয়েছেন, তাই বলবো,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

"যারা অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখোনা। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু"। *(সূরা আল হাশর: ১০)*

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে যেই ফিতনা ও রক্তপাত সংঘটিত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে আমাদের হাতকে হিফাযত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা দু'আ করি, তিনি যেন তার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের জবানকে সে বিষয়ে কথা বলা থেকে রক্ষা করেন। আমীন

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অনেক ফযীলত রয়েছে। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي»

"তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনি, যেমন মূসার কাছে হারুনের মর্যাদা? তবে কথা হচ্ছে, আমার পরে আর কোন নাবী নেই।[৩৫৬]

সা'দ বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি এমন একজন লোকের নিকট পতাকা দিবো, যে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসে। আল্লাহ এবং তার রসূলও তাকে ভালোবাসেন। সা'দ বলেন, আমরা সবাই এর জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে আনো। তাকে ডেকে আনা হলো। তখন তিনি চোখের যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। তিনি তার চোখে থুথু ফেললেন। তৎক্ষণাৎ তার চোখ এমন ভাল হয়ে গেল যে, মনে হচ্ছিল তার চোখে কোন অসুখই ছিল না। এরপর তিনি আলীকে ঝান্ডা দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার হাতেই খায়বারের বিজয় দান করলেন।[৩৫৭] বর্ণনাকারী আরো বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলার এই বাণী অবতীর্ণ হলো,

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾

"এই জ্ঞান এসে যাওয়ার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করে, তুমি তাকে বলো, এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে। আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে আর আমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর আল্লাহর কাছে এই দু'আ করি, যে মিথ্যাবাদী হবে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৬১)*

তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইনকে ডেকে এনে বললেন, "হে আল্লাহ! এরাই হলো আমার আহ্‌ল তথা পরিবার"।[৩৫৮]

[৩৫৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৭০৬, মুসলিম হা/২৪০৪।

[৩৫৭] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৩৭০২, মুসলিম হা/২৪০৭।

[৩৫৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪০৪, তিরমিযী হা/২৯৯৯।

(১০১) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ

তারাই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, সুপথগামী খলীফা এবং হিদায়াত প্রাপ্ত ইমাম।

.....

ব্যাখ্যা: সুনানের কিতাবসমূহে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ইরবায বিন সারিয়া থেকে বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী ছ্বহীহ বলেছেন। ইরবায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

“একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি প্রভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন, যাতে আমাদের চোখের পানি প্রবাহিত হলো এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। তখন একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হচ্ছে এটি বিদায়ী উপদেশ। আপনি আমাদেরকে আর কিসের উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করা, আমীরের কথা শ্রবণ করা এবং তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা সে সময় আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকে মাটীর দাঁতগুলো দিয়ে কামড়িয়ে ধরবে। আর তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ‘আত। আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী”।[৩৫৯]

ফযীলতের ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীনের ক্রমধারা ঠিক খিলাফতের মধ্যে তাদের ক্রমবিন্যাসের মতই। তবে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) দের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যদের নেই। তা হলো, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আবু বকর ও উমার ব্যতীত অন্য কারো কাজ-কর্মের অনুকরণ করার আদেশ দেননি। তিনি বলেছেন,

«اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا »

---

[৩৫৯] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪২, আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস্ সুন্নাহ, তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল ইল্ম। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ। মুসনাদে আহমাদ, (৪/১২৬)।

"আমার পরে তোমরা আবু বকর এবং উমার এই দু'জনের অনুসরণ করবে"।[৩৬০]

সুতরাং তাদের সুন্নাতের অনুসরণ এবং তাদের কাজ-কর্মের অনুসরণ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) দের অবস্থা উছমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) দের অবস্থার অনেক উর্ধ্বে।

আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) হতে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উপর প্রাধান্য দেয়ার কথা বর্ণিত হলেও তার প্রকাশ্য মাযহাব হলো উছমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দেয়া। এটিই অধিকাংশ আহলে সুন্নাতের মত।

ইতিপূর্বে আব্দুর রহমান বিন আওফের কথা অতিক্রান্ত হয়েছে, তিনি আলীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমি মানুষের মতামত শুনেছি, তারা মর্যাদায় উসমানের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। আইয়্যুব সুখতিয়ানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি উছমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দিবে না, সে মুহাজির এবং আনসারদেরকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞার পাত্র হিসাবে গণ্য হবে।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে জীবিত থাকাবস্থায় আমরা বলাবলী করতাম,

«أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ»

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এই উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, অতঃপর উমার, অতঃপর উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।[৩৬১]

[৩৬০] ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৬৬২।

[৩৬১] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৩৬৫৫।

(১০২) ইমাম ত্বহাবী রাহীমাহুল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ العَشرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُم رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَبشَّرَهُم بِالجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُم بِالجَنَّةِ، عَلَى مَا شَهِدَ لَهُم رَسُولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وَقَوْلُهُ الحقُّ، وَهُمْ: أَبُوبَكْرٍ، وَعُمَرُ، وعُثْمَانُ، وَعَليٌّ، وَطَلْحَة، والزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُالرَّحمنِ بن عَوْفٍ، وأبُوعُبَيْدةَ بنُ الجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِين

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশ জন ছাহাবীর নাম উল্লেখ করে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। কারণ তার কথা সত্য ও সঠিক। তারা হলেন, (১) আবু বকর (২) উমার (৩) উছমান (৪) আলী (৫) তালহা (৬) জুবাইর (৭) সা'দ (৮) সাঈদ (৯) আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ এবং (১০) এই উম্মতের আমানতদার আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

.....

ব্যাখ্যা: ইতিপূর্বে চার খলীফার কতিপয় ফযীলত অতিক্রান্ত হয়েছে। আশারায়ে মুবাশশারার বাকী ছয়জনের ফযীলতেও অনেক হাদীছ রয়েছে। ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাতের বেলায় নবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম আসছিল না। তিনি তখন বললেন, আজ রাতে আমার ছাহাবীদের কোনো সৎ লোক যদি আমাকে পাহারা দিতো! আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমরা সেই রাতে মদীনায় অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনেছিলাম। অতঃপর সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তি কে? সা'দ তখন বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দ বলেন, একদা রাতে আমি মনে মনে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশঙ্কা করলাম। তাই আমি তাকে পাহারা দেয়ার জন্য গেলাম। তিনি সা'দের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর নিদ্রা গেলেন।[৩৬২]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের জন্য তার পিতা-মাতাকে একত্র করে বলেছেন, «**ارم سعد فداك أبي وأمي**» "হে সা'দ তুমি তীর নিক্ষেপ করো। আমার মা-বাপ তোমার জন্য কোরবান হোক"[৩৬৩]

---

[৩৬২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৩১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪১০।

[৩৬৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৪৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪১৫।

ছ্বহীহ বুখারীতে কাইস ইবনে আবু হাযেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন তালহা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এত আহত হয়েছিলেন যে, তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল।[৩৬৪]

ছ্বহীহ মুসলিমে আবু উছমান আন নাহদী হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব যুদ্ধ করেছেন, সেগুলোর মধ্য হতে কতিপয় যুদ্ধে তার সাথে তালহা ও সাদ ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।[৩৬৫]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, খন্দকের যুদ্ধের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য বের হওয়ার আহবান জানালেন। এতে যুবাইর সাড়া দিল। তিনি দ্বিতীয়বার আহবান জানালে। এবারও যুবাইর সাড়া দিলেন। তিনি তৃতীয়বার আহবান জানালেন। এবারও যুবাইর সাড়া দিলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, প্রত্যেক নাবীর একজন করে হাওয়ারী (শিষ্য) ছিল। আমার শিষ্য হলো যুবাইর।[৩৬৬]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বললেন, এমন কে আছে, যে বনী কুরাইযায় গিয়ে আমার জন্য তাদের খবর নিয়ে আসবে? যুবাইর বলেন, তখন আমি বনী কুরাইযায় চলে গেলাম। আমি যখন ফিরে আসলাম,তখন তিনি আমার জন্য তার পিতা-মাতাকে একত্রে বললেন, আমার মা-বাপ তোমার জন্য কোরবান হোক![৩৬৭]

ছ্বহীহ মুসলিমে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»

“প্রত্যেক উম্মতের একজন করে আমীন আমনতদার লোক ছিল। হে আমার উম্মত! আমাদের আমীন হলো আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ।[৩৬৮]

---

[৩৬৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৭২৪।

[৩৬৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৭২৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪১৪।

[৩৬৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৪৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪১৫।

[৩৬৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৭২০, কারো প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এই বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। এটি আরবী ভাষার অন্যতম রীতি।

[৩৬৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৭৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৪১৯।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নাজরানের লোকেরা আগমন করে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠান। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন একজন লোক পাঠাবো। হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, অনেকেই এই সম্মান জনক কাজটি পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলো। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে পাঠালেন।[৩৬৯]

সাঈদ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

«عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ"، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ، قَالَ: فَقَالُوا: مَنْ هُوَ ؟ قَالَ:"سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ»

"দশজন লোক জান্নাতী। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী, আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, উছমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, জুবাইর জান্নাতী, সা'দ ইবনে মালেক জান্নাতী এবং আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ জান্নাতী। আমি ইচ্ছা করলে, দশম লোকটির নামও বলতে পারবো। তিনি বলেন, লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, দশম লোকটি কে? তিনি বললেন, সে হলো সাঈদ ইবনে যায়েদ"। তিনি আরো বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছাহাবীদের কারো কোনো একটি যুদ্ধে শরীক হয়ে স্বীয় চেহারাকে ধুলোমাখা করা তোমাদের কারো সারা জীবনের ভালো আমল থেকে উত্তম। যদিও তাকে নূহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমান বয়স দেয়া হয়। ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ছ্বহীহ বলেছেন এবং হাদীসটি তিনি আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন"।[৩৭০]

আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (১) আবু বকর জান্নাতে যাবে (২) উমার জান্নাতে যাবে (৩) উছমান জান্নাতে (৪) আলী জান্নাতে যাবে (৫) তালহা জান্নাতে যাবে (৬) জুবাইর ইবনুল আওয়াম জান্নাতে যাবে (৭) আব্দর রাহমান বিন আওফ জান্নাতে যাবে (৮) সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতে যাবে (৯) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস জান্নাতে এবং (১০) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ্ জান্নাতে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন। ইমাম

[৩৬৯] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৩৮১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪২০।

[৩৭০] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৬৪৯, কিতাবুস সুন্নাহ, মেশকাত হা/৬১১০।

আহমাদ স্বীয় মুসনাদে এবং আবু বকর ইবনে খাইছমা হাদিছটি বর্ণনা করেছেন। আবু বকর ইবনে আবী খাইছামা আলীকে উছমান রাদ্বিয়াল্লাহুর পূর্বে উল্লেখ করেছেন।[৩৭১]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমার, উছমান, আলী, তালহা এবং জুবাইর হেরা পাহাড়ের উপরে ছিলেন। তখন তাদেরকে নিয়ে পাহাড়টি কেঁপে উঠল। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, হে পাহাড়! শান্ত হও। তোমার উপর নাবী, সিদ্দীক এবং শহীদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ইমামগণ হাদিছটি বর্ণনা করেছেন। একাধিক সনদে তা বর্ণিত হয়েছে।[৩৭২]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই দশজন ছাহাবীকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেননা তাদের রয়েছে অনেক ফযীলত ও মহৎ গুণাবলী। সুতরাং যে ব্যক্তি দশ সংখ্যা উচ্চারণ করাকে অপছন্দ করে অথবা দশ সম্পর্কীয় কিছু করা অপছন্দ করে, তার চেয়ে অধিক মূর্খ আর কে হতে পারে? রাফেযীরা দশ সংখ্যাকে ঘৃণা করে। কারণ ছাহাবীদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম দশজন লোককে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তবে তারা এই দশজন থেকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আলাদা করেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তারা নয় সংখ্যাকে ভালোবাসে। অথচ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন থেকে নয়জনকেই তারা ঘৃণা করে। শুধু তাই নয়; তারা আনসার ও মুহাজিরদের ঐসব ছাহাবীকেও ঘৃণা করে, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছে এবং হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নীচে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করেছেন। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাইআত করছিলো। তিনি তাদের মনের অবস্থা জেনেছেন। তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন, পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে আশু বিজয় দান করেছেন"। *(সূরা ফাতাহ: ১৮)*

ছ্বহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» "হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নীচে বাইআতকারী কোন লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"।

[৩৭১] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ।

[৩৭২] ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ২৪৯৫, ছাহাবীদের ফযীলত অধ্যায়।

ছ্বহীহ মুসলিমে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হাতেব বিন আবু বালতাআর দাস একদা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হাতেব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তুমি ভুল বলছো। সে বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছেন।[৩৭৩]

রাফেযীরা এসব অধিকাংশ ছাহাবীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকে। বলতে গেলে দশ বারো জন ছাহাবী ছাড়া বাকী সবার সাথেই তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে!! আর এটা জানা বিষয় যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্য হতে যদি দশজন নাস্তিকের নাম নির্বাচন করা হয়, তাতেই দশ সংখ্যা গণনা করা অপছন্দনীয় হবে না এবং এটিকে বাদ দেয়াও যর্থাথ হবে না। এমনি নয় সংখ্যাটিকে নিন্দা করা ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾

"সে শহরে ছিল নয়জন দলপতি, যারা দেশের মধ্যে বির্পযয় সৃষ্টি করতো এবং কোন গঠনমূলক কাজ করতো না"। *(সূরা আন নামাল: ৪৮)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা নয়জন সন্ত্রাসীর কথা বলেছেন। তাই বলে নয় সংখ্যাকে বর্জন করা মোটেও ন্যায়সঙ্গত হবে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক স্থানেই দশ সংখ্যার প্রসংশা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি হাজ্জের সাথে উমরাকে মিলিয়ে (তামাত্তু হাজ্জ) করার সুযোগ লাভ করে সে যেন সার্মথ অনুযায়ী কুরবানী করে। আর যদি কুরবানীর যোগার না হয়, তাহলে হাজ্জের দিনসমূহে তিনটি ছ্বিয়াম রাখবে। আরো সাতটি ছ্বিয়াম রাখবে ঘরে ফিরে গিয়ে। এভাবে পুরো দশটি রাখবে"। *(সূরা আল বাকারা: ১৯৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾

"মূসাকে আমি ত্রিশ রাতের জন্য সিনাই পর্বতের উপর ডাকলাম এবং দশ দিন আরো বাড়িয়ে দিলাম *(সূরা আল আরাফ: ১৪২)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ "ফজরের কসম এবং দশ রাতের কসম!" *সূরা আল ফাজর:১-২।*

---

[৩৭৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৯৫, ছাহাবীদের ফযীলত অধ্যায়।

ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন। লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان" তোমরা রামাযানের শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করো।[৩৭৪]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ يَعْنِي عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ»

"যুল হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের চেয়ে উত্তম এমন কোনো দিন নেই, যার সৎ আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দশ দিনের আমলের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়"।[৩৭৫] অর্থাৎ জিলহাজ্জের প্রথম ১০ দিন।

রাফেযীরা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর বদলে বারোজন ইমামকে তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাদের প্রথম হলেন, আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তারা দাবী করে, আলী হলেন অসীউন্ নাবী অর্থাৎ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে নির্বাচিত খলীফা। তাদের এই দাবির পক্ষে কোনো দলীল নেই। তাদের বাকী ইমামগণ হলেন, পর্যায়ক্রমে, হাসান ইবনে আলী, হুসাইন ইবনে আলী, যাইনুল আবেদীন আলী ইবনুল হুসাইন, মুহাম্মাদ ইবনে আলী বাকের, জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ সাদেক, মুসা ইবনে জা'ফর কাযেম, আলী ইবনে মুসা রেযা, মুহাম্মাদ ইবনে আলী যাওয়াদ, আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাদী, হাসান ইবনে আলী আল-আসকারী এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান। রাফেযীরা এদের প্রতি ভালোবাসা পোষণে বাড়াবাড়ি করে এবং সীমালংঘন করে থাকে। ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যেই গুণাবলী সম্পন্ন বারোজন ইমামের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা রাফেযীদের তালিকাকে বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করে।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে একদা আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম। তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি, "যতদিন বারোজন লোক মুসলিমদের শাসনকার্য পরিচালনা করবে, ততদিন তাদের অবস্থা ভালো থাকবে। অতঃপর তিনি এমন কিছু কথা বললেন, যা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে গেল। তাই আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন? তিনি বললেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তাদের প্রত্যেকেই হবে কুরাইশ বংশ থেকে"। অন্য বর্ণনায় আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বারোজন খলীফার যুগ পর্যন্ত

[৩৭৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/২০২১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১১৬৫।

[৩৭৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৬৯, সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায়: যুল হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ছ্বিয়াম, হা/২৪৩৮।

ইসলাম শক্তিশালী থাকবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, বারোজন খলীফার যুগ পর্যন্ত এই দীন বিজয়ী থাকবে।[৩৭৬]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনি হয়েছে। হাদীসের ভাষ্য মতে বারো জন খলীফা হলেন: চারজন সুপথগামী খলীফা ও মুআবীয়া(রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তার ছেলে ইয়াযীদ, আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান এবং তার চারজন পুত্র, উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন এই বারো জনের সর্বশেষ খলীফা। অতঃপর ইসলাম দুর্বল হতে থাকে।

রাফেযীদের মতে এদের খেলাফতকালে উম্মতের অবস্থা অস্থির ও বিপর্যস্ত ছিল। যালেম ও সীমালংঘনকারীরা তখন ক্ষমতায় ছিল। বরং তারা ছিল মুনাফেক ও কাফের। (নাউযুবিল্লাহ) হকপন্থীরা ইয়াহূদীদের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট!!! তাদের এই কথা সুস্পষ্ট ভুল। আসল কথা হলো এই বারোজনের খিলাফতকালে ইসলামের শক্তি ও সম্মান বেড়েই যাচ্ছিল।

(১০৩) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ، فَقَدَ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবী, তার পূত-পবিত্র নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীগণ, কদর্যতা হতে পবিত্র তার সন্তান-সন্ততিগণ সর্ম্পকে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম কথা বলবে, সেই কেবল নিফাকী হতে নিষ্কৃতি পাবে।

.....

ব্যাখ্যা: ছাহাবীদের ফযীলতে কুরআন ও সুন্নাহয় যা বর্ণিত হয়েছে, তার কিয়দাংশ ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ছ্বহীহ মুসলিমে যায়েদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি জলাশয়ের নিকট দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। ঐ জলাশয়কে খুম্মের জলাশয় বলা হয়। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ মাত্র। অচিরেই আমার রবের দূত মালাকুল মাওত আমার কাছে চলে আসবে। তখন তার ডাকে সাড়া দেয়া ছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় থাকবে না। আর আমি তোমাদের মাঝে

[৩৭৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২১।

দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। তাতে রয়েছে হিদায়াত ও নুর। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে ধারন করো এবং তাকে মজবুত ভাবে আঁকরে ধরো। এভাবে তিনি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহ দিলেন। অতঃপর বললেন, আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে কথা হলো, আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের অধিকার সংরক্ষণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।[৩৭৭] এই কথাটি তিনি তিনবার উল্লেখ করলেন।

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, তোমরা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইতের অধিকার সংরক্ষণ করবে।[৩৭৮]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবী, তার স্ত্রীগণ, তার সন্তান-সন্ততিগণ সম্পর্কে যারা সর্বোত্তম কথা বলবে, তারাই কেবল নিফাকী থেকে নিস্কৃতি পাবে। ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে এই কথা বর্ণিত হয়েছে। কারণ ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য একজন নাস্তিক মুনাফেক রাফেযীদের মাযহাব তৈরী করেছে। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন, নাসারাদের দীনকে সাউল বিন কিসায়ী যেমন ধ্বংস করেছে, ঠিক তেমনি ইয়ামানের ইয়াহূদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা স্বীয় কুট-কৌশলের মাধ্যমে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ছদ্মবেশে মুসলিমদের কাতারে ঢুকে পড়ে মুখে মুখে ইসলাম যাহির করলো। প্রথমে সে ধার্মিকতা এবং ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে প্রসিদ্ধি অর্জন করলো। অতঃপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বুলি আওড়িয়ে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন যোগালো। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন কুফায় আগমন করলেন, তখন এই কুচক্রী স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি ভালোবাসা প্রর্দশনে বাড়াবাড়ি প্রকাশ করলো এবং তার সর্মথন ও সাহায্য করার দাবী উঠালো। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে এই খবর পৌঁছলে তিনি তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। প্রাণের ভয়ে সে সিরিয়ার কারকিসিয়ায় পলায়ন করলো। ইতিহাসের কিতাবগুলোতে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৩৭৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪০৮। আলেমগণ বলেন, এখানে সর্বোচ্চ যা পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আহলে বাইতের প্রতি নরম ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করতে ও তাদের হক নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। শিয়াদের দাবি মোতাবেক এখানে কোনাভাবেই খিলাফতের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না। বরং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরেছেন যে, তার পরে অচিরেই তার পরিবারের সদস্যগণ উম্মতের লোকদের দ্বারা কষ্ট পাবেন এবং তাদের কারণে মানুষ ফিতনায় পড়বে। তাই তিনি তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য উম্মতকে অসীয়ত করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

[৩৭৮] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৭১৩।

ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, যারা ফযীলতের ক্ষেত্রে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) দের উপর প্রাধান্য দিতো, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে মিথ্যা অপবাদের দুররা মারতেন। বর্তমানে যত বাতিল ফির্কা রয়েছে, তাদের সবগুলোর মধ্যেই খারেজী ও শিয়াদের বিদআতের ছাপ রয়েছে।[৩৭৯] আর নাস্তিক-মুনাফেকদের দরজা দিয়েই রাফেযী মাযহাব ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। শিয়াদের বাতেনী সম্প্রদায় এবং ইসলাম ধ্বংসে তাদের কলাকৌশল সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে আবু বকর ইবনুত তাইয়্যিব আল বাকেল্লানী এই কথা উল্লেখ করেছেন। বাকেল্লানী আরো বলেন, শিয়াদের পন্ডিতরা তাদের দাঈকে বলে দেয় যে, তুমি যাকে তোমার মাযহাবের দিকে দাওয়াত দিবে, সে যদি মুসলিম হয়ে থাকে, তাহলে তুমি তার সামনে আলী ও আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা প্রর্দশনকে তোমার দীন ও নির্দশন হিসাবে পেশ করো এবং সালাফদের পক্ষ হতে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি যুলুম করা এবং হুসাইনকে হত্যা করার বিষয়টি তুলে ধরো, আবু বকর, উমার, বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের প্রতি ঘৃণাবোধ প্রকাশ করো এবং বলো যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং তিনি গায়েব জানতেন! সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার দায়িত্ব তার উপর সোপর্দ করা হয়েছে!! শিয়াদের থেকে এ রকম আজব আজব কথা-বার্তা তাদের অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। বাকেল্লানী আরো বলেন, তাদের মতবাদের প্রচারককে তারা শিখিয়ে দেয় যে, তুমি যখন দেখতে পাবে, কোনো লোক তোমার দাওয়াত ও নির্দেশনা কবুল করে নিয়েছে, তখন তাকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সন্তানদের কিছু দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করো। বাকেল্লানীর কথা এখানেই শেষ।

কোনো সন্দেহ নেই যে, ছাহাবীদেরকে গালি দেয়ার কারণেই আহলে বাইতকে গালি দেয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। অতঃপর স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[৩৮০] কেননা পথভ্রষ্ট ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীরা আহলে বাইত এবং ছাহাবীগণকে তাদের নিজেদের মতই মনে করে।

---

[৩৭৯] প্রত্যেক পীর-মুরীদি ও বিদ'আতী তরীকার গুরুর কাছে তার থেকে শুরু করে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত শাজারা নামীয় একটি সনদ রয়েছে। এসব শাজারানামার গোড়ার দিকে রয়েছেন শিয়া ইমামগণ। প্রত্যেক বিদ'আতীই যে শিয়া মাযহাব দ্বারা প্রভাবিত, এটিই তার প্রমাণ।

[৩৮০] রাফেযীরা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ঘৃণা করে এবং গালি দেয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আবু বকরের কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করেছেন, তাই তারা এই কারণে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও দোষারোপ করে। (নাউযুবিল্লাহ)

(১০৪) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ

পূর্বসুরী সালাফদের মধ্যকার আলেম, তাদের পরে আগমনকারী তাবেঈ, সৎকর্মশীল, মুহাদ্দিছ, ফকীহ, এবং জ্ঞানী ও গবেষকদের যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। যারা অসম্মানের সাথে তাদেরকে স্মরণ করবে, তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হবে।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে কেউ রসূলের বিরোধীতা করবে এবং ঈমানদারদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলবে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।" *(সূরা আন নিসা: ১১৫)*

সুতরাং কুরআনের বিবরণ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করার পর মুমিনদেরকে ভালোবাসা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক। বিশেষ করে ঐসব মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা রাখা জরুরী, যারা নাবীদের উত্তরাধিকারী। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঐসব নক্ষত্রের পর্যায়ে রেখেছেন, যাদের মাধ্যমে জল ও স্থলভাগের অন্ধকারে পথে সন্ধান পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের পূর্বেকার প্রত্যেক উম্মতের আলেমগণই যেখানে ছিলেন সর্বাধিক নিকৃষ্ট, সেখানে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম যুগের আলেমদের জ্ঞান ও হিদায়াতের উপর মুসলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর মুসলিমদের আলেমগণই হলেন সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ। তারা হলেন উম্মতের মধ্য হতে নায়েবে রসূল। তারাই তার বিলুপ্ত সুন্নাতের প্রচার ও প্রসার করেছেন। তাদের মাধ্যমেই আল্লাহর কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারাই পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব কথা বলেছে এবং তারাও তার মাধ্যমে কথা বলেছেন। তারা সকলেই রসূলের অনুসরণ আবশ্যক হওয়ার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছন। তবে তাদের কারো কোনো কথা যদি ছ্বহীহ হাদীছের খেলাফ হয়, তাহলে সেই হাদীছ বর্জন করার পিছনে অবশ্যই তার নিকট কোনো না কোনো কারণ রয়েছে। এই কারণগুলো মোট তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত। (১) ছাহাবীর বিশ্বাস ছিল না যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বলেছেন অথবা (২) ছাহাবী বিশ্বাস করতেন না যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীছ দ্বারা নির্দিষ্টভাবে সেই মাসআলাটি উদ্দেশ্য করেছেন অথবা (৩) ছাহাবীর এই বিশ্বাস ছিল যে, হাদীছে বর্ণিত হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে।

সৎকাজে অগ্রগামিতা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনকে পরবর্তীদের জন্য পৌঁছিয়ে দেয়া এবং দীনের অস্পষ্ট বিষয়গুলো আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করার কারণে আমাদের উপর ছাহাবী ও তাবেঈদের রয়েছে অনেক ফযীলত। হে আল্লাহ তুমি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং উত্তম বিনিময় দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করো।

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

“হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু”। আমীন

(১০৫) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ

আমরা কোনো অলীকে কোনো নাবীর উপর প্রাধান্য দেই না; আমরা বলি, মাত্র একজন নাবী সমস্ত অলী থেকে শ্রেষ্ঠ।[৩৮১]

.....

ব্যাখ্যা: এখানে ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) ঐসব মূর্খ সুফী এবং ওয়াহদাতুল উজুদ বা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করেছেন, যারা তাদের অলীদেরকে নাবী-রসূলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তবে সুফীদের মধ্যে যারা ঈমান ও আমলের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত তারা ইলম অর্জন ও শরী'আতের উপর আমল করার উপদেশ দিয়ে থাকে, তাদের কথা ভিন্ন। তারা নাবী-রাসূলদের আনুগত্য করাকেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র মাধ্যম মনে করে।

---

[৩৮১] নাবী-রসূলগণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্বাচিত এবং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাদেরকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছেন, তাই তারা সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান। এখানে ইমাম তাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) ঐসব শিয়া ও সুফীদের প্রতিবাদ করেছেন, যারা তাদের ইমাম ও অলীদেরকে নাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"আমি কেবল এ উদ্দেশ্যেই রসূল পাঠিয়েছি, যাতে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের উপর যুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তোমাদের কাছে আসতো অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো আর রসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও মেহেরবান হিসেবে পেতো। তোমার রবের কসম, তারা কখনো মুনিন হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে তোমাকে ফায়ছালাকারী হিসেবে মেনে নেবে, অতঃপর তুমি যা ফায়ছালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা পাবে না এবং সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নিবে"। *(সূরা আন নিসা: ৬৪-৬৫)* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলো, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু"। *(সূরা আলে-ইমরান: ৩১)*

আবু উছমান নিসাপুরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি তার কথা ও কাজের ব্যাপারে নিজের নফসকে আমীর নিযুক্ত করবে, তার কথা হিকমত সম্পন্ন হবে, আর যে ব্যক্তি তার নফসের উপর স্বীয় প্রবৃত্তিকে আমীর বানাবে তার মুখ থেকে কেবল বিদ'আতী কথাই বের হবে।

আলেমদের কেউ কেউ বলেছেন, সুফীদের মধ্য হতে যারা সুন্নাতের কিছু অংশ পরিত্যাগ করেছে, তারা কেবল আত্ম অহমিকার বশবর্তী হয়েই তা করেছে। মুসলিম যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দীনের অনুসারী না হবে, তখন সে নিজের ইচ্ছা অনুসারেই আমল করবে। এতে সে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হিদায়াতের অনুসরণের বদলে নিজের নফসের পূজারীতে পরিণত হবে। এটিকেই নফসের খিয়ানত এবং অহংকার হিসাবে গণ্য করা হয়। শুধু তাই নয়; বরং এটি ঐসব লোকদের কথার অংশ হবে, যারা বলেছিল,

﴿لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾

"আল্লাহর রসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তার অনুরূপ আমাদের দেয়া হয় ততক্ষণ আমরা ঈমান আনয়ন করবো না। আল্লাহ নিজের রিসালতের দায়িত্ব কাকে দিবেন তা তিনি নিজেই সর্বাধিক জানেন। অপরাধীরা অচিরেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা এবং কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে"। *(সূরা আল আন'আম: ১২৪)*

সুফীদের কেউ কেউ ধারণা করে যে, তারা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থেকে নিজেদের নফসকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমেই নাবী-রসূলদের স্তরে পৌঁছতে পারে। এ জন্য তাদেরকে নাবী-রসূলদের তরীকার অনুসরণ করতে হয় না।

তাদের কেউ কেউ আবার ধারণা করে থাকে যে, নাবী-রসূলগণ সর্বশেষ অলীর প্রদীপ থেকেই আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে থাকে!! তাদের কেউ কেউ আরো দাবি করে যে, সে নিজেই সর্বশেষ অলী!! আর ফেরাউন যা বলেছিল, তাই হলো সেই ইলমের প্রকৃত রূপ। ফেরাউন মনে করেছিল, আমরা যেই পৃথিবী প্রত্যক্ষ করছি, তা নিজে নিজেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। সৃষ্টিজগতের এমন কোনো স্রষ্টা নেই, যিনি সৃষ্টিজগৎ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর ভন্ড সুফী দাবি করে যে, সে নিজেই আল্লাহ। (নাউযুবিল্লাহ) ফেরাউন মুখে মুখে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও গোপনে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতো এবং আল্লাহ সম্পর্কে সুফীদের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতো।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ফেরাউন স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতো। আর এই সুফীরা ধারণা করছে, সৃষ্টির অস্তিত্বই আল্লাহর অস্তিত্ব। যেমন ধারণা করতো ইবনে আরাবী এবং তার অনুরূপ সুফীরা। এই নাস্তিক-মুরতাদ যখন দেখলো, নাবী-রসূলদের বাহ্যিক শরী'আত পরিবর্তন করা সম্ভব নয় তখন সে বলল, নবুওয়াত খতম হয়ে গেছে, কিন্তু বন্ধুত্ব বা বেলায়াত খতম হয়নি। তাই সে বেলায়াতের দোহাই দিয়ে নবুওয়াতের চেয়ে বড় কিছু দাবি করেছে। সেই সঙ্গে নাবী-রসূলদের অনুরূপ বিষয়ও দাবি করেছে। সে আরো বলেছে নাবীগণ বেলায়াত (বন্ধুত্ব) দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন। ইবনে আরাবী প্রখ্যাত সুফী সাধক হাকীম আত্ তারমুযীর বরাত দিয়ে বলেন,

مَقَامُ النُّبُوَّةِ فِي بَرْزَخٍ... فُوَيْقَ الرَّسُولِ وَدُونَ الْوَلِيِّ !

নাবীর মর্যাদা রসূল ও অলীর মাঝখানে। আর নাবীর মর্যাদা অলীর মর্যাদার চেয়েও নিম্নস্তরে!! নাউযুবিল্লাহ।[৩৮২]

সুফীদের এই কথা ইসলামি শরী'আত পরিবর্তন করার আহবান ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা মুত্তাকীর জন্য বেলায়াত (বন্ধুত্ব) সাব্যস্ত। কিন্তু এই বন্ধুত্ব কখনো নবুওয়াতের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[৩৮২] সুফীদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী ও অজ্ঞ, তাদের মতে আদম সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম হলেন আওলীয়াগণ, অতঃপর নাবীগণ অতঃপর রসূলগণ। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের মতে আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা হলেন রসূলগণ, অতঃপর নবীগণ অতঃপর অলীগণ।

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

"জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারা এমন লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে"। *(সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)*

বেলায়াতের চেয়ে নবুওয়াতের বিশেষত্ব ও মর্যাদা অধিক। আর নবুওয়াতের চেয়ে রিসালাতের মর্যাদা আরো উচ্চে। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইবনে আরাবী তার কিতাব "ফুসুসুল হিকাম"এ বলেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যখন নবুওয়াতকে ইট দ্বারা নির্মিত প্রাচীরের সাথে তুলনা করে দেখানো হলো, তখন তিনি দেখলেন, মাত্র একটি ইটের জায়গা ব্যতীত তার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বারা সেই এক ইটের ফাঁকা স্থানটি পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।[৩৮৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে সর্বশেষ অলী বলে দাবি করে, তার জন্যও অনুরূপ একটি স্বপ্ন থাকা জরুরী। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে যেই প্রাচীর দেখেছিলেন, তাতে মাত্র একটি ইটের জায়গা খালি ছিল। আর সর্বশেষ বেলায়াতের মিথ্যুক দাবিদার ইবনে আরাবী স্বপ্নে বেলায়াতের প্রাচীরের মধ্যে দু'টি ইটের জায়গা খালি দেখল। সে দেখল, ইট দু'টির খালি জায়গায় তার ছায়া পড়ছে। এতে দেয়ালটির নির্মাণ পূর্ণতা লাভ করেছে। দু'টি ইটের জায়গা খালি দেখার কারণ হলো প্রাচীরটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে তৈরী। রৌপ্যের ইটের উপর স্বর্ণের ইট স্থাপন করা হয়েছিল। রৌপ্যের ইট ছিল উপরে। স্বর্ণের ইট ছিল নীচে। অর্থাৎ স্বর্ণের ইটের উপর রৌপ্যের ইট স্থাপন করে প্রাচীরটি নির্মিত ছিল। রৌপ্যের ইট দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই যাহেরী শরী'আতের হুকুম-আহকাম, যা সে মেনে চলে। সুতরাং সে আল্লাহর পক্ষ হতে বাহ্যিক সুরতে যেই শরী'আত প্রাপ্ত হয়েছে, সে তা মেনে চলে। কেননা সে প্রত্যেক বস্তুকে আসল ও প্রকৃত অবস্থাতেই দেখে। এভাবে দেখাই তার জন্য আবশ্যক। আর সেই স্বর্ণের ইটখানা হলো সে নিজেই, যা রয়েছে রোপার ইটের নীচে। (নাউযুবিল্লাহ)

---

[৩৮৩] জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ»

"আমার ও আমার পূর্ববর্তী নাবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ, যেমন একজন লোক একটি ঘর তৈরী করেছে। ঘরটি সে পূর্ণরূপে সুন্দর করে নির্মাণ করার পর মাত্র একটি ইঁটের স্থান খালি রেখেছে। অতঃপর লোকেরা তাতে প্রবেশ করতে লাগল এবং বিস্ময়ের সাথে কথা বলতে লাগল: ঐ ইঁটের স্থানটি যদি খালি না থাকত! (তাহলে কতই না ভাল হত)

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অন্য বর্ণনায় একটু বেশী করে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "কিন্তু এক কোণে একটি ইঁটের জায়গা খালি রয়ে গেল"। হাদীছের শেষে রয়েছে, আমি হলাম সেই ইঁট এবং আমি শেষ নাবী।

মোটকথা, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তিনি যেই শরী'আত নিয়ে এসেছেন, তাকে ইবনে আরাবী রৌপ্যের ইটের সাথে তুলনা করেছে। আর সে নিজেকে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যে বাতেনী ইলম হাসিল করেছে, তাকে তুলনা করেছে স্বর্ণের ইটের সাথে। (নাউযুবিল্লাহ) ইবনে আরাবী আরো দাবী করেছে যে, সে স্বয়ং সেই ভান্ডার থেকে সরাসরি অহী প্রাপ্ত হয়, যা থেকে শরী'আত গ্রহণ করে থাকেন নাবী রাসূলগণ ফেরেশতার মাধ্যমে। সে বলেছে, হে ভক্ত! আমি তোমাকে যা বললাম,তা যদি বুঝতে সক্ষম হও, তাহলে তুমি বিরাট উপকারী ইলম অর্জন করতে পারবে।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে নিজেকে স্থাপন করল স্বর্ণের স্থলে আর রসূলদের জন্য পেশ করে রৌপের ইটের দৃষ্টান্ত। তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কাফির আর কে হতে পারে? মোট কথা, ইবনে আরাবী নিজের নিকৃষ্ট নফসকে নাবী-রাসূলদের উপরে রেখেছে এবং নিজেকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করেছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এই হলো গোমরাহ সুফীদের মনোবাসনা। তাদের মন অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। তারা যে বড়ত্বের অহঙ্কার করে, তার ধারেকাছেও তারা পৌঁছতে পারবে না। ইবনে আরাবী থেকে এই ধরণের কথা আসার পরও তার কুফরীর বিষয়টি কিভাবে অস্পষ্ট হতে পারে? এই ধরণের আরো অনেক নিকৃষ্ট কথা তার থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার কথাসমূহের মধ্যে রয়েছে অস্পষ্ট কুফুরী এবং কিছু কিছু কথার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট কুফুরী। এ জন্যই তার মিথ্যাগুলোর মুখোশ উম্মোচন করার জন্য তীক্ষ্ণদর্শী গবেষকের প্রয়োজন। কেননা এমন কিছু জালিয়াতি ও প্রতারণা রয়েছে, যা সাধারণ গবেষকের পক্ষে সনাক্ত করা সম্ভব। আবার এমন কিছু জালিয়াতি ও মিথ্যাচার রয়েছে, যা সনাক্ত করার জন্য অভিজ্ঞ, সুচতুর এবং বিচক্ষণ গবেষকের দরকার।

যারা বলেছিল, আল্লাহর রসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছিল, যতক্ষণ না তার অনুরূপ আমাদের দেয়া হবে, ততক্ষণ আমরা ঈমান আনয়ন করবো না" তাদের এই কথার চেয়ে ইবনে আরাবী এবং তার অনুরূপ সুফীদের কুফুরী ভয়াবহ। তবে ইবনে আরাবী এবং তার অনুরূপরা ছিল সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মুনাফেক ও নাস্তিক। জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থান হবে তাদের ঠিকানা। আর মুনাফিকদের ব্যাপারে কথা হলো, তাদের সাথে মুসলিমদের মতই আচরণ করা হবে। কারণ তারা মুখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুনাফিকরা ইসলাম প্রকাশ করতো ঠিকই, কিন্তু তারা অন্তরে কুফুরী গোপন রাখতো। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাহ্যিক রূপ দেখে তাদের সাথে মুসলিমদের মতই আচরণ করতেন। তারা অন্তরে যেই কুফুরী গোপন রাখতো, তাদের কারো থেকে তা প্রকাশ পেলে তিনি তার উপর মুরতাদের হুকুম জারি করতেন। এই শ্রেণীর মুনাফেকের তাওবা কবুল হবে কি না, এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক কথা হলো, তাদের তাওবা কবুল হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে মুআল্লা (রহিমাহুল্লাহ) এটাই বর্ণনা করেছেন।

(১০৬) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ

অলীদের কারামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বিশ্বস্ত লোকদের থেকে ছ্বহীহসূত্রে যেসব বর্ণনা এসেছে, তার উপরও আমরা ঈমান রাখি।[৩৮৪]

---

[৩৮৪] শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লামা ইমাম তাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) কারামতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বর্ণনার শর্ত আরোপ করে অত্যন্ত সুন্দর কাজ করেছেন। কেননা পরবর্তী কালের লোকেরা কারামত বর্ণনার ক্ষেত্রে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা কারামতের নামে এমন বাতিল ঘটনা বর্ণনা করেছে, যা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সামান্য বোধশক্তি সম্পন্ন লোকও সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। শুধু তাই নয়; তারা কারামত হিসাবে কখনো কখনো এমন জিনিসও বর্ণনা করে থাকে, যা আল্লাহর রুবুবীয়াতের ক্ষেত্রে বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যেসব কিতাবে ঐসব বাতিল কারামত প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে শারানীর তাবাকাতুল আওলীয়া নামক কিতাবটি অন্যতম। তাতে এক অলীর ঘটনায় এই কথা বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহর সাথে আদব রক্ষার্থে সে বিশ বছর পর্যন্ত কোন জিনিসের ব্যাপারে كن فيكون বলা বাদ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যালেমদের এইসব কথার অনেক উর্ধ্বে। তবে কথা হলো গণক, যাদুকর ও ধোঁকাবাজদের হাতে প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে অলৌকিক ঘটনা সদৃশ যা কিছু জারী হয়, সেগুলো শয়তানের প্রতারণা ও কারসাজি ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষের জন্য ফিতনা ও পরীক্ষা স্বরূপ এগুলো ফাঁকিবাজদের হাতে প্রকাশ করা হয়। যাদুকর, গণক ও ফাঁকিবাজরা কখনো শূন্যে উড়তে পারে, পানির উপর দিয়ে চলতে পারে, আগুনে ঝাপ দিতে পারে এবং এমনি আরো অস্বাভাবিক কাজ-কর্ম করতে পারে। মূলত এগুলো তারা নিজেরা করে না; এগুলো শয়তানের কাজ। এগুলো এবং অলীদের কারামতের মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড হলো, আমরা তার কাজ-কর্মগুলো দেখবো। তার কাজ-কর্ম যদি ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী হয়, তাহলে বুঝবো যে, তার হাতে যা প্রকাশিত হয়েছে, তা কারামত। আর যদি তার কাজ-কর্ম ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী না হয়, তাহলে বুঝবো যে, শয়তান তার খেদমত করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾

"যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্র করবেন সে দিন তিনি বলবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছো। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্য থেকে একজন অন্যজনের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি।"। (সূরা আল আনআম: ১২৮)

মানুষ দ্বারা জিন এভাবে উপকৃত হয় যে, মানুষ জিনের সামনে নত হয় এবং তার আনুগত্য করে। জিন দ্বারা মানুষের উপকৃত হওয়ার ধরণ হলো, যেই মানুষ জিনের সামনে নত হয় এবং তাঁর আনুগত্য করে, জিনও তার খেদমত করে এবং তার কাছে মানুষ যায় চায়, সে তা এনে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"আগুন হল তোমাদের ঠিকানা। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু আল্লাহ অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। এভাবেই আমি কতক যালেমকে অন্যসব যালেমের উপর শক্তিশালী করে দেই। তাদের কৃতকর্মের কারণে"। (সূরা আল আনআম: ১২৯)

এগুলোই হলো শয়তানের ফাঁকিবাজি। শয়তানের ধোঁকাবাজি এবং কারামতের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। যার মধ্যে ঈমান ও সৎ আমল বিদ্যমান থাকবে তার হাতে প্রকাশিত অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাই কেবল কারামত হিসাবে গণ্য হবে। যার মধ্যে ঈমান ও সৎআমল নেই, তার হাতে প্রকাশিত অস্বাভাবিক ঘটনা কারামত সদৃশ হলেও তা কারামত নয়। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বাইরের

.....

ব্যাখ্যা: স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে যা কিছু সংঘটিত হয়, তাকেই আভিধানিক অর্থে معجزة বলা হয়। পূর্বসূরী আলেমদের ইমামগণের পরিভাষায় অনুরূপ ঘটনাকে কারামতও বলা হয়। তবে পরবর্তী কালের অনেক আলেম কারামত ও মু'জেযার মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য করে থাকেন। নাবী থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে তারা মু'জেযা বলেন এবং অলী থেকে যা প্রকাশিত হয়, তাকে তারা কারামত

লোকদের মধ্যে কারামত সম্পর্কে বিভ্রান্তি রয়েছে। মুতাযেলা এবং তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী লোকেরা সর্বদাই অলীদের কারামত অস্বীকার করে আসছে। এমনকি তাদের মধ্যকার সীমালংঘনকারীরা নাবীদের কিছু কিছু মুজেযাকেও অস্বীকার করেছে। তারা যেহেতু নাবী-রসূলদের উপর নাযিলকৃত অহীর উপর নিজেদের বোধশক্তিকে প্রাধান্য দেয়, তাই তারা বলে থাকে এগুলোকে বিবেক ও বোধশক্তি সাব্যস্ত করে না। নাউযুবিল্লাহ কবর পূজারী এবং এক শ্রেণীর সুফী কারামত সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করে। এমনকি তারা শয়তানের অলীদের জন্যও কারামত সাব্যস্ত করে। তাই দেখা যায়, তারা ঐসব লোকের জন্যও কারামত সাব্যস্ত করে, যারা ছ্বলাত পড়ে না এবং ছিয়ামও রাখে না। তাদের হাতে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশিত হলে তা শয়তানের ধোঁকাবাজি হিসাবে গণ্য হবে। সুফীদের কেউ আবার সৎকর্মশীল অলীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং আল্লাহর সাথে অলীকেও মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন করে থাকে কবর পূজারীরা। প্রিয় পাঠক! আপনি শারানীর তাবাকাতুল আওলীয়া নামক কিতাবটি অধ্যায়ন করেন, তাহলে সেখান বহু আজব ও বাতিল ঘটনা দেখতে পাবেন। তাদের মতে অলীগণ শরী'আতের হুকুম-আহকাম পালনে বাধ্য নন এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতিও তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। নাউযুবিল্লাহ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষের হালত ও মর্যাদা যতই উন্নত হোক না কেন, সে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় না। এমনকি ফেরেশতাগণ, নাবীগণ এবং অলীগণও আল্লাহর উবুদীয়াতের বাইরে নন। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচুর পরিমাণ ইবাদত দেখে যখন বলা হলো, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দেন নি? তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী হতে চাই এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু হতে চাই। (ছ্বহীহ মুসলিম) অথচ তিনি ছিলেন বনী আদমের সরদার এবং পৃথিবী বাসীর মধ্যে সর্বাধিক উত্তম। তারপরও তিনি ইবাদত বর্জন করেননি। আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ "এবং মৃত্যুর আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করো"। (সূরা হিজর: ৯৯) ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

"মসীহ কখনো আল্লাহর এক বান্দা হতে লজ্জাবোধ করে না এবং নৈকট্যশীল ফেরেশতারাও আল্লাহর বান্দা হওয়া নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে না। যদি কেউ আল্লাহর বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জাকর মনে করে এবং অহংকার করতে থাকে তাহলে এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে হাযির করবেন। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা বন্দেগীকে লজ্জাকর মনে করেছে ও অহংকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যকারী ও বন্ধু হিসাবে পাবে না"। (সূরা আন নিসা: ১৭২-১৭৩) সুতরাং অলীদের কারামতের ব্যাপারটি খুব বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। বিশেষ করে যখন জানা গেল যে, দীন সম্পর্কে বর্তমান সময়ে মূর্খতা, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার ও বিদআত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

বলেন।[৩৮৫] আর সবগুলোকেই একত্রে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গকারী বিষয় বলা হয়। সুতরাং পূর্ণতার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য মোট তিনটি। (১) ইলম, (২) কুদরত ও (৩) অমুখাপেক্ষিতা।

উপরোক্ত তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিশেষিত করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টিকে স্বীয় ইলমের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন, তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং তিনিই সমগ্র সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে এই তিনটি বিষয়ের দাবী করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, আমি তোমাদের এ কথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডর আছে, আর আমি গায়েবের খবর রাখিনা এবং তোমাদের এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবলমাত্র সে অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?" *(সূরা আল আনআম: ৫০)*

নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতির লোকদের জন্য একই কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন উলুল আযম তথা আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ইচ্ছা সম্পন্ন রাসূলদের মধ্যে প্রথম এবং আল্লাহর পক্ষ হতে পৃথিবীবাসীদের জন্য প্রেরিত সর্বপ্রথম রাসূল।

আর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বশেষ প্রেরিত রসূল এবং উলুল আযমদের মধ্যে সর্বশেষ। তারা উভয়েই উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্টের দাবী করা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছেন। নাবী-রাসূলগণ এগুলোর দাবী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার কারণ হলো, তাদের জাতির লোকেরা কখনো গায়েবের ইলম প্রকাশ করার আবেদন করেছে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾

"এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কখন আসবে?" *(সূরা নাযিআত: ৪২)* আবার কখনো তারা প্রভাব ও ক্ষমতা প্রকাশ করার দাবী জানিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা বানী ইসরাঈলের ৯০ নং আয়াতে বলেন,

---

[৩৮৫] নাবী-রাসূল এবং আওলীয়াদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার সীমাহীন কুদরত থেকে যা কিছু প্রকাশ করেছেন, কুরআন ও হাদীছের ভাষায় সেগুলোকে মু'জেযা কিংবা কারামত বলে উল্লেখ করা হয়নি; বরং সেগুলোকে আয়াত বা নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾

"তারা বলে, আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি ভূমি বিদীর্ণ করে আমাদের জন্য একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করবে"। আবার কখনো তারা নাবী-রসূলদের মধ্যে মানবিক প্রয়োজন ও স্বভাব থাকার কারণে তাদেরকে দোষারোপ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানের ৭ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾

"তারা বলে, এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ায়? কেন তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়নি, যে তার সাথে থাকতো এবং সতর্ক করতো?"

এখানে রসূলকে আদেশ দেয়া হয়েছে, তিনি যেন লোকদেরকে জানিয়ে দেন যে, তিনি গায়েবের খবর রাখেন না, আল্লাহর ধন-ভান্ডারের তিনি মালিক নন এবং তিনি অমুখাপেক্ষীও নন। উপরোক্ত তিনটি বিষয় থেকে বান্দা কেবল ঐ টুকুই অর্জন করতে পারে, যা আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেন। সুতরাং সে গায়েবী বিষয় থেকে কেবল ঐ পরিমাণই জানতে পারে, যা আল্লাহ তাকে জানান, সে কেবল তা থেকেই অমুক্ষাপেক্ষী হতে পারে, যা থেকে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন এবং স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে অথবা অধিকাংশ লোকের স্বভাব-রীতির বাইরে সে কেবল তাই করতে সক্ষম, যা করতে আল্লাহ তাকে সক্ষম করেন। সুতরাং কোনো মু'জেযা ও কারামতই এই তিনটি বিষয়ের বাইরে নয়। ইলম, কুদরত ও অমুখাপেক্ষীতা।

অতঃপর কারামত ও অলৌকিক বিষয় দ্বারা যদি কোনো দীনি উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তাহলে তা শরী'আতের আদিষ্ট সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। তা ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য হবে না। আর যদি কারামত দ্বারা বৈধ বিষয় অর্জিত হয়, তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার ঐসব নিয়ামতের মধ্যে গণ্য হবে, যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দরকার।

আর কারামত যদি কোন হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়, তাহলে তা আল্লাহর আযাব অথবা তার ক্রোধ ডেকে আনবে। যেমন বুলআম বিন বাউরাকে কারামত দেয়া হয়েছিল, কিন্তু সে তা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। ইজতেহাদ অথবা তাকলীদ কিংবা বোধশক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা জ্ঞানের কমতি কিংবা বিশেষ পরিস্থিতির স্বীকার কিংবা অপারগতা কিংবা বিশেষ প্রয়োজনেই বুলআম কারামত থেকে দূরে সরে গিয়েছিল[৩৮৬]।

---

[৩৮৬] আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ১৭৫ নং আয়াতে বালআম বিন আউরার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾

"আর হে মুহাম্মাদ! এদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করো যাকে আমি দান করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী। কিন্তু সে তা থেকে দূরে সরে যায়। অবশেষে শয়তান তার পিছনে লাগে। শেষ পর্যন্ত সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত

সুতরাং কারামত তিন প্রকার। (১) এমন কারামত, যা দ্বারা দীনি ফায়দা হাসিল এবং যা দীনের মধ্যে প্রশংসনীয়। (২) এমন কারামত, যা দ্বারা দীনের ক্ষতি হয় এবং যা নিন্দনীয় এবং (৩) এমন কারামত, যা বৈষয়িক ও বৈধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বৈধ কারামতের মধ্যে যদি বৈষয়িক কোন উপকার থাকে, তাহলে তা আল্লাহর নিয়ামত সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাতে কোন উপকার না থাকলে তা ঐসব বৈধ বৈষয়িক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত হবে, যাতে কোন উপকার নেই[৩৮৭]।

হয়েই যায়"। বুলআম ছিল নবী ইসরাঈলের একজন আলেম ও আবেদ। আল্লাহ তা'আলার নিকট তার দু'আ কবুল হতো। কারণ সে ইসমে আযম জানতো।

আমালেকা ও কেনআনীদের হাত থেকে মাকদিস উদ্ধার করার জন্য বনী ইসরাঈলরা মূসা (আলাইহিস সালাম) এর নেতৃত্বে যখন বাইতুল মাকদিস আক্রমণ করল তখন তারা মূসা আলাইহিস সালামের নিকট পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা করল। তাই তারা বুলআমের নিকট আগমন করে মূসা আলাইহিস সালামের বিরূদ্ধে বদ দু'আ করার আবেদন করল। কেননা তারা জানত যে, বুলআমের দু'আ কবুল করা হয়। বুলআম প্রথমে দু'আ করতে অস্বীকার করলো। কিন্তু তারা যখন দু'আ করার জন্য পীড়াপিড়ি করলো অথবা কিছু ধন-সম্পদ বা অন্য কিছু দিল, তখন সে মূসার বিরূদ্ধে দু'আ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার কারামত ছিনিয়ে নিলেন। সুতরাং সে যখন আল্লাহর অলীদের বিরূদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করলেন এবং তাকে নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুরের সাথে তুলনা করলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, মূসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাইতুল মাকদিস জয় করার জন্য বনী ইসরাঈলদেরকে সাথে নিয়ে তথাকার যালিমদের বিরূদ্ধে লড়াই করতে আসলেন, তখন বুলআমের চাচাতো ভাইয়েরা এবং তার গোত্রীয় লোকেরা তার নিকট এসে বলল, মূসা একজন কঠিন প্রকৃতির লোক। তার সাথে রয়েছে প্রচুর সেনাবাহিনী। সে যদি আমাদের উপর জয়লাভ করে, তাহলে আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে দু'আ করো, তিনি যেন আমাদের থেকে মূসা এবং তার বাহিনীকে ফিরিয়ে দেন। বুলআম বলল, আমি যদি মূসা এবং তার বাহিনীকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখিরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু লোকেরা দু'আ করার জন্য জোর দাবী জানালো, তখন সে দু'আ করল। এতে আল্লাহ তা'আলা তার নিকট থেকে সম্মানের বিষয়গুলো ছিনিয়ে নিলেন এবং সে ইসমে আযমও ভুলে গেল। (দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাছীর) বুলআম সম্পর্কে আরো অনেক কথাই তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে হিদায়াতের পর গোমরাহীর দিকে ফিরিয়ে না দেন। আমীন।

[৩৮৭]. মোটকথা কারামত দীনি ও দুনিয়াবী উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। দীনি বিষয়ে কারামত বলতে ঐসব বিষয় উদ্দেশ্য, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার দীনকে সাহায্য করেন এবং তার শত্রুদেরকে পরাজিত করেন। এটি আল্লাহর পথে জিহাদকারী, আলিম ও দাঈদের জন্য হয়ে থাকে। যেমনটি হয়েছিল বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈনিকদের জন্য, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং অন্যান্য আলেমদের জন্য। খালকে কুরআনের ফিতনার সময় যখন তাকে মামুনের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি আল্লাহর কাছে মামুনের ধ্বংস কামনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন এবং তাকে সুদৃঢ় রাখলেন। পার্থিব বিষয়াদিতেও কারামত হয়। যেমন আসমান থেকে খাবার অবতীর্ণ করা, দুনিয়াবী বিভিন্ন বিষয় সহজ করে দেয়া ইত্যাদি।

মোট কথা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমে যা সংঘটিত হয়, তা তিন প্রকার। (১) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাবী-রসূলদের হাতে তা সংঘটিত হয়ে থাকে। (২) আল্লাহর মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের জন্য তা হতে পারে। (৩) সেই সঙ্গে ফাসেক, পাপিষ্ঠ, কাফের, মিথ্যুক, জিন এবং শয়তানদের হাতেও স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু সংঘটিত হতে পারে। এ ধরণের কারামত (স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয়) ফাসেক ও পাপিষ্ঠদের সম্মানের কারণে হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিগত বিধানের অধীনেই এগুলো ফাসেক দ্বারা সংঘটিত করেন।

আবু আলী জাওযাজানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তুমি দীনের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো, তার কাছে কারামত চাইতে যেয়ো না। কেননা তোমার নফ্স সৃষ্টিগত স্বভাবের কারণেই কারামত অনুসন্ধান করে। কিন্তু তোমার রব চান, তুমি দীনের উপর সুদৃঢ় থাকো[৩৮৮]।

শাইখ সাহরাওয়ারদী তার কিতাব 'আওয়ারিফুল মাআরিফ'এ বলেছেন, কারামত প্রার্থনা না করে দীনের উপর অটল রাখার প্রার্থনা করা আক্বীদার ক্ষেত্রে একটি বিরাট মূলনীতি। পূর্বসূরীদের নেককার লোকদেরকে যেসব কারামত ও প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয় দান করা হয়েছিল, তা শুনে পরবর্তীদের মন ঐ রকম কিছু কামনা করতে থাকে। তারা তা থেকে কিছু পাওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করতে থাকে। কারামত না পেয়ে তাদের কেউ তার আমল সঠিক হচ্ছে কি না, এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আজীবন মনক্ষুন্ন থাকা অস্বাভাবিক নয়। কারামত না পাওয়ার রহস্য যদি সে জানতে পারতো, তাহলে বিষয়টি সহজ হয়ে যেত। সে জানতে পারতো যে, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যারা একনিষ্ঠভাবে জিহাদ করে, তাদের কতিপয়কে তিনি কারামত থেকে কিছু জিনিস দান করেন। তাদেরকে কারামত দেয়ার হিকমতে ইলাহী হলো, যাতে কারামত এবং মহান আল্লাহর সীমাহীন কুদরতের প্রভাব দেখে তাদের ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধি পায়, পরকালের জন্য আমল করার প্রতি দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের দাবী পরিহার করতে সক্ষম হয়।[৩৮৯] সুতরাং সত্যনিষ্ঠ মুমিনের পথ হচ্ছে নফ্সকে দীনের উপর সুদৃঢ় থাকতে বাধ্য করা। এতেই তার সকল কারামত (সম্মান ও ফযীলত) অর্জিত হবে।

নিঃসন্দেহে মানুষের শরীর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে অন্তরের প্রভাবই হয় বেশী। সুতরাং অন্তর যদি পরিশুদ্ধ হয়, তাহলে তার প্রভাব ভালো হয়। আর অন্তর যদি নষ্ট হয়, তাহলে তার প্রভাবও হয় মন্দ। সুতরাং অন্তরের অবস্থা অনুপাতেই তার প্রভাব কখনো আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হয়, আবার কখনো তার কাছে অপছন্দনীয় হয়।

---

[৩৮৮] সুতরাং কারামত চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা বিনা চাওয়াতেই তার প্রিয় বান্দাদের তা দান করেন। আল্লাহর প্রকৃত অলীগণ তাদের কারামত মানুষের জন্য প্রচার করেন না। এমনকি অনেকেই তাদের কারামত সম্পর্কে জানতেও পারেন না। অন্যরা সেটি বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী কালের ভন্ড অলীরাই মিথ্যা কারামতের দাবী করে থাকে। এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর অলী হওয়ার জন্য বাহ্যিক কারামত প্রকাশিত হওয়া জরুরী নয়। যেমন দাবী করে থাকে পরবর্তী কালের ভন্ড অলীরা। অলী হওয়ার জন্য কেবল ঐ পরিমাণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করাই যথেষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ ছাহাবী ও তাবেয়ীর বাহ্যিক কারামত বা অলৌকিক ঘটনা ছিল না। এমনকি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীদের অধিকাংশেরই ঈমান ও তাকওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারামত ছিল না। আর কারো নিকট থেকে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু প্রকাশিত হলেই সে আল্লাহর অলী বনে যায় না। বিশেষ করে যখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কারণে কাফিদের হাতেও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন।

[৩৮৯] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কারামত পাওয়ার জন্য মজবুত ঈমান ও প্রচুর আমলের অধিকারী হওয়া জরুরী নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা দুর্বল মুমিনের ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য এবং কারো অভাব পূরণ করার জন্য কারামত দিয়ে থাকেন।

যে ব্যক্তি বাতেনী (গোপন) শক্তির মাধ্যমে অন্যকে হত্যা করবে, ফিকাহবিদগণ তার থেকে কিসাস নেয়ার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।[৩৯০] আর সুফীরা দাবী করে যে, তারা তাদের বাতেনী অবস্থা এবং অন্তরের মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারে। কারো জন্য প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত কিছু সংঘটিত হওয়াকেই সুফীরা আল্লাহর পক্ষ হতে তার কারামত মনে করে। তারা আসলে জানে না যে, দীনের উপর সুদৃঢ় থাকতে পারাই হলো প্রকৃত কারামত। আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দাকে এমন কোন কারামত দিয়ে সম্মানিত করেননি, যা তার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয় আমলের চেয়ে বড়। আর সেটি হলো আল্লাহর ও তার রাসূলের আনুগত্য করা, আল্লাহর বন্ধুদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা এবং তার শত্রুদেরকে শত্রু মনে করা। যাদের বৈশিষ্ট্য ঠিক এরকমই হবে, তারাই আল্লাহর প্রকৃত অলী। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

"আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই। তাদের চিন্তারও কোন কারণ নেই। তারাই যারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে"। *(সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩)*

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যদি তার কোন বান্দাকে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কিছু দিয়ে সুখ-শান্তির মধ্যে রাখেন তাহলে এটি যেমন আল্লাহ তা'আলার কাছে বান্দার সম্মান বা মর্যাদার প্রমাণ বহন করে না, ঠিক তেমনি তিনি যদি কাউকে বিপদাপদ ও পরীক্ষার মধ্যে ফেলে কষ্ট দেন, তাহলে এটিও আল্লাহর নিকট বান্দার লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রমাণ বহন করে না। বরং এগুলো পেয়ে একদল লোক আল্লাহর আনুগত্য করে সাফল্য লাভ করেছে, আরেকদল তা পেয়ে আল্লাহর নাফরমানী করার কারণে হতভাগ্য হয়েছে[৩৯১]।

---

[৩৯০] ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) এর এই বাক্যের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি তার নিজের সম্পর্কে জানতে পারে যে, অন্যের উপর তার নযরের প্রভাব পড়ে কিংবা তার অন্তর খুব হিংসুক, এরূপ ব্যক্তি জানতে পারে যে, তার অন্তরের হিংসার ক্ষতিকর প্রভাব অন্যের উপর গিয়ে পতিত হলে হিংসার শিকার ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে, তাহলে বদনযর, হিংসা এবং যাদু ও শয়তানী অবস্থার মাধ্যমে হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হবে।

উপরোক্তভাবে শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা অস্পষ্টতা থেকেই গেল। আসলে কোন পীর বা অলী কি বাতেনী শক্তি অর্থাৎ রূহানী অস্ত্রের মাধ্যমে তার শত্রুকে হত্যা করতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম কিংবা তাবেয়ীদের জীবনীতে কি এমন কিছু পাওয়া যাবে? বর্তমানে দখলদার ইয়াহূদীদের কবলে পড়ে ফিলিস্তীনি মুসলিম জনগোষ্ঠি এবং অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিমরা যে মারাত্মক যুলুমের শিকার হচ্ছে, তার মোকাবেলায় পীর-ফকীর এবং অলী-আওয়ালিয়াদের রূহানী শক্তি কোথায়? বস্তুতঃ বাতেনী শক্তির মাধ্যমে সুফী-সাধক ও পীর-ফকীররা শত্রুকে ঘায়েল করার ক্ষমতা রাখে, এই বিশ্বাস পোষণ করা শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[৩৯১]. যেমন আমরা ইতিপূর্বে বালআম বিন বাউরার কথা আলোচনা করেছি।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾

"কিন্তু মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন" *(সূরা ফাজর: ১৫-১৭)*

এই জন্যই কারামতের ব্যাপারে লোকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) এক শ্রেণীর লোক অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কিছু পাওয়ার পর তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। (২) আরেক প্রকার লোক কারামত পেয়ে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয়েছে। (৩) আরেক শ্রেণীর লোকের নিকট কারামত মুবাহ বা বৈষয়িক বিষয়ের মতই। এটি তাদের মর্যাদা বা অমর্যাদা কোনটিরই প্রমাণ বহন করে না। যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।[৩৯২]

আল্লাহ তা'আলার কালেমার প্রকারভেদ অনুসারেই অলীদের কারামত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। আল্লাহর কালিমা দু'প্রকার। (১) সৃষ্টি সম্পর্কিত কালিমা এবং (২) শরী'আত ও দীন সম্পর্কিত কালিমা। সৃষ্টি সম্পর্কিত কালেমা বলতে সেই প্রকার কালেমা উদ্দেশ্য, যা দ্বারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তিনি বলেন,

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির অনিষ্ট হতে ঐ সমস্ত কালেমার উসীলা দিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলো অতিক্রম করা কোন নেককার কিংবা বদকারের পক্ষেই অসম্ভব"। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে এই বলে আদেশ করেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়"। *(সূরা ইয়াসীন: ৮২)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১১৫ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

---

[৩৯২] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ অভাবে পড়ল কিংবা ক্ষুধার্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে খাদ্য পাঠিয়ে তার ক্ষুধা নিবারণ করলেন। এই খাদ্য পাঠানো তার সম্মান বা অসম্মান কোনটিরই প্রমাণ বহন করে না। বরং আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন মেটানোর জন্যই খাদ্য পাঠিয়েছেন।

"সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কালেমা পূর্ণাঙ্গ, তার কালেমাসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। সৃষ্টিজগতের সবকিছুই এই প্রকার কালেমার অধীনস্ত। সুতরাং অপ্রাকৃতিক ও অস্বাভাবিক নিয়মে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, তাও এই প্রকার কালেমার অন্তর্ভুক্ত।

আর দ্বিতীয় প্রকার কালিমা বলতে শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও বিধানাবলী উদ্দেশ্য। কুরআনুল কারীম এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে প্রেরিত আল্লাহর শরী'আত এই প্রকার কালিমার মধ্যে শামিল। আল্লাহর আদেশ, নিষেধ এবং খবরা-খবরও তার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার কালিমার ব্যাপারে বান্দার কর্তব্য হলো, এগুলোর জ্ঞান অর্জন করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম অন্যদের কাছে প্রচার করবে।

আর সৃষ্টি সম্পর্কিত কালিমা ও বিষয়সমূহের প্রতি বান্দাদের করণীয় হলো, তারা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং তার দ্বারা উপকৃত হবে।

সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি ও দীন সম্পর্কিত কালিমাসমূহের প্রকারভেদ অনুসারে অলীদের কারামত মোট চার প্রকার হতে পারে।

(১) সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াদি অবগত হওয়ার কারামত (২) শরী'আতের বিষয়াদি অবগত হওয়ার কারামত (৩) সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াদিতে ক্ষমতা ও প্রভাব ফেলার কারামত (৪) শরী'আতের বিষয়াদিতে ক্ষমতা ও প্রভাব ফেলার কারামত।

আল্লাহর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পরিচালনার সাথে সংশিষ্ট বিষয়াদি জানতে পারার মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর কারামত অর্জিত হয়। সুতরাং অলীদের জন্য সৃষ্টির এমন বিষয় উন্মুক্ত করা হয়, যা অন্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয় না। যেমন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সারিয়া ও তার সেনাদলের অবস্থা উন্মুক্ত করা হয়েছিল। খিযির আলাইহিস সালাম যেই শিশুটিকে হত্যা করেছিলেন, তার আসল অবস্থা জানতে পেরেছিলেন, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছিলেন যে,তার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে।

আর শরী'আতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জানতে পারা দ্বিতীয় প্রকার কারামত বা কাশফ হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার অলীগণকে শরী'আতের মাসআলাসমূহ মুখস্থ করা ও বুঝার জন্য এমন জ্ঞান দান করেন, যা অন্যদেরকে প্রদান করেন না।[৩৯৩]

সৃষ্টির মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারা তৃতীয় প্রকার কারামতের অন্তর্ভুক্ত। এ রকম প্রভাব অলী কখনো তার নিজের মধ্যে দেখাতে পারে। যেমন পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলা, শুণ্যে

[৩৯৩] এটি বাস্তব ও পরীক্ষিত। সৌদি আরবের সাবেক মুফতি আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীছ গ্রন্থসহ আরো বহু কিতাব মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উড়াল দেয়া এবং আগুনের উপর বসে থাকা ইত্যাদি।[৩৯৪] এমনি অন্যের উপরও ফেলতে পারে। যেমন কাউকে সুস্থ করা বা ধ্বংস করা, ধনী করা বা অভাবী করা ইত্যাদি।[৩৯৫]

---

[৩৯৪] আসহাবে কাহাফের যুবকগণ একটানা তিনশ নয় বছর ঘুমিয়ে থাকা, তাদের শরীর নষ্ট না হওয়া অতঃপর জাগ্রত হওয়াও এই প্রকার কারামতের অন্তর্ভুক্ত।

[৩৯৫] যেমন অর্জিত হয়েছিল, ইউশা ইবনে নূনের জন্য। তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐদিকে সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তখন তিনি সূর্যকে সম্বোধন করে বললেন, (أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم فاحبسها علينا) "হে সূর্য! তুমি আল্লাহর অনুগত ও তার পক্ষ হতে আদিষ্ট। আমিও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আদিষ্ট। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য সূর্যকে আটকিয়ে রাখো। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন এবং সূর্যকে অনেকক্ষণ আটকিয়ে রাখলেন। ইউশা ইবনে নূন যখন যুদ্ধে জয়লাভ করলেন, তখন সূর্য অস্ত গেল।

বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হলেন, তখন তার যুলুম-নির্যাতন ও অহংকারের মাত্রা বেড়ে গেল। তার যুলুমের বর্ণনা ইতিহাসের কিতাবসমূহে খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি অনেক ছাহাবীকে হত্যা করেছেন বলে ইতিহাসের কিতাবগুলোতে লিখিত রয়েছে। হাসান বসরী ছিলেন সে সময়ের প্রখ্যাত আলেম ও আবেদ। তিনি হাজ্জাজের যুলুমের কড়া প্রতিবাদ করতেন। এতে হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে হাসান বসরীকে ধরে নিয়ে আসার জন্য তার পুলিশ বাহিনীকে হুকুম করলেন। তারা হাসানকে নিয়ে আসলো। হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) এর প্রাণ নাশের আশঙ্কায় উপস্থিত সকলের হৃদয় কেঁপে উঠলো। তিনি যখন তলোয়ার, রশি এবং হাজ্জাজের জল্লাদকে দেখলেন, তখন তিনি ঠোঁট নাড়িয়ে কি যেন পাঠ করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার উপর সুদৃঢ় ঈমান, ভরসা এবং শক্ত মনোবল নিয়ে হাজ্জাজের দিকে এগিয়ে গেলেন। হাসানকে দেখা মাত্রই হাজ্জাজের মনে ভয় ঢুকে গেল। তিনি হাসানকে অত্যন্ত সম্মান করতে লাগলেন এবং তাকে খুব কাছে টানতে লাগলেন। লোকেরা এই দৃশ্য দেখে হতবাক হলো। অতঃপর হাজ্জাজ হাসানকে তার পাশে বসালেন এবং একদম কাছে টেনে নিলেন ও তার দাঁড়িতে আতর-খোশবু মাখিয়ে দিলেন। এখানেই শেষ নয়; হাজ্জাজ তার কাছে দীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। হাসান বসরী নির্ভয়ে সুমধুর ও দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্নগুলোর জবাব দিলেন। হাজ্জাজ সেদিন হাসান বসরীকে হত্যা করবে তো দূরের কথা, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেলেন এবং প্রশংসা করলেন। হাসান বসরী হাজ্জাজের দরবার থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাকে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে সম্মানের সাথে বিদায় করলেন।

হাজ্জাজের নিকট থেকে হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হাজ্জাজের এক প্রহরী তার পিছনে চলল। সে হাসানকে জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে হাজ্জাজ যে উদ্দেশ্যে ডেকে এনেছিলেন, তার বিপরীত ব্যবহার করে আপনাকে বিদায় দিয়েছেন। আচ্ছা বলুন তো আপনি যখন হাজ্জাজের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং জল্লাদ ও তার তলোয়ার দেখতে পেলেন, তখন আমি দেখলাম আপনি ঠোঁট নাড়িয়ে কি যেন বলছেন। এবার আমাকে বলুন তো আপনি কী পাঠ করছিলেন? তিনি বললেন, আমি বলেছি,

يا وليَ نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا و سلاما عليَّ كما جعلت النارَ بردا وسلاما على إبراهيم

"হে আল্লাহ! আমার নিয়ামতের মালিক এবং মুছীবতের আশ্রয়স্থল! হাজ্জাজের শাস্তিকে আমার জন্য ঐরকম শীতল ও শান্তিময় করে দাও, যেমন তুমি আগুনকে ইবরাহীমের উপর শান্তিময় ঠান্ডা করে দিয়েছিল।

হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজের লোকেরা তাকে ধরার জন্য একাধিকবার তার ঘরে প্রবেশ করেছিল। প্রত্যেকবারই তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করার ফলে তারা তাকে দেখতে পায়নি অথচ তিনি ঘরেই ছিলেন।

তাতারী সম্রাট কাযানের সামনে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) নির্ভয়ে কথা বলা এবং কাযান শাইখের বক্তৃতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও এই প্রকার কারামতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণী জগতের মধ্যেও অলীগণ আল্লাহর ক্ষমতা বলে এ রকম প্রভাব ফেলতে পারেন। বর্ণিত আছে যে, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কোনো এক সফরে বের হলেন। এই সফরটি ছিল দীর্ঘ এবং ছাহাবীদের মালপত্রও ছিল বেশী। এই সফরে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম কাইসও ছিলেন। তিনি

আর শরী'আতের বিষয়াদি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে চতুর্থ প্রকার কারামত অর্জিত হয়। আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে বান্দাদের কেউ কেউ বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। বান্দা তার নিজের মধ্যে এই প্রকার কারামত দেখতে পারে এবং অন্যকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ করলে তাতে যদি শরী'আতের নিয়ম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হয়, তাতেও সে এই প্রকার কারামত লক্ষ্য করতে পারে।[৩৯৬]

কাইসকে বললেন, তোমার চাদর বিছাও। কাইস চাদর বিছালে ছাহাবীগণ তাদের বাড়তি মালপত্র রাখলেন। চাদর ভর্তি হয়ে গেলে তিনি কাইসকে আদর করে বললেন, নৌকার মতই তুমি এগুলো বহন করো। নৌকার মতই তিনি প্রচুর মালপত্র বহন করলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাইসকে সাফীনা বা নৌকা বলে সম্বোধন করার কারণেই তাকে পরবর্তীতে সাফীনা বলেই ডাকা হতো। রসূলের পবিত্র জবানীতে এই নাম পেয়ে কাইস অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কাইসের উক্তি, আমি যদি সেদিন ছয়টি উটের বোঝাও বহন করতাম, তাহলেও আমার কোন কষ্ট অনুভব হতো না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ, তার দু'আর বরকত এবং সাথীদের খেদমত করার কারণে সাফীনার এই কারামত হাসিল হয়েছিল। পরবর্তীতেও তিনি নৌকার মত প্রচুর বোঝা বহন করতে পারতেন।

আরেক সফরের ঘটনা। সাফীনা নৌকাযোগে সাগর পথে ভ্রমণ করছিলেন। সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে তার নৌকাটি অতিক্রম করছিল। হঠাৎ নৌকাটি ভেঙ্গে গেলো। তিনি ভাঙা নৌকার একটি কাঠ ধরে ফেললেন। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সাগরের ঢেউ কাঠটি তীরে নিয়ে ঠেকিয়ে দিল। সাফীনা নিরাপদে সাগরের তীরে উঠলেন।

সাফীনা চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি বৃক্ষাচ্ছাদিত একটি বনের ভিতরে এসে পৌছে গেছেন। এ সময় হঠাৎ তিনি ভয়ঙ্কর একটি আওয়াজ শুনলেন। তিনি আওয়াজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটি সিংহ তার উপর আক্রমণ করার জন্য তেড়ে আসছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে সাফীনা (رضي الله عنه) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন মুখলিস বান্দাদেরকে বিশেষভাবে হেফাযত করেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ তা'আলার। তিনি যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। সিংহ যতই শক্তিশালী হোক, সে আল্লাহর সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং আল্লাহর হুকুমের বাইরেও নয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে যেই হুকুম করবেন, সে তা মানতে বাধ্য।

অতঃপর সাফীনা আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং সাহসের সাথে সিংহের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, হে আবুল হারেস! আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রীতদাস। সিংহটি সাফীনার এই কথা শুনে মাথা নত করে অনুগত বিড়ালের মত হয়ে গেল। অতঃপর সিংহটি সাফীনার দিকে এগিয়ে এসে বন থেকে বের করে রাস্তা দেখিয়ে দিল। অতঃপর সাফীনাকে বিদায় জানালো। সাফীনা আল্লাহ তা'আলার এই বিরাট নিয়ামতের প্রশংসা করলেন। সাথীদের কাছে ফিরে এসে তিনি এই ঘটনা বললেন। তাতে তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার এই বিরাট নিয়ামতের প্রশংসা করলেন। সাথীদের কাছে ফিরে এসে তিনি এই কারণে ঘটনাটি বললেন, যাতে তারা সকলেই আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করে তার মত ভাগ্যবান হতে পারেন। (তথ্যসূত্রঃ মূল ঘটনাটি হাকেম মুসলিমের শর্তে বর্ণনা করেছেন, হাদীছ নং ৬৬২৭, দালায়েলুন নুবুওয়াহ, হাদীছ নং ২২৯৪। বিস্তারিত এসেছে ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবসমূহে)

[৩৯৬] এটি বাস্তব এবং পরীক্ষিত। আমরা দেখতে পাই যে, কতিপয় আলেম সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমন অস্বাভাবিক প্রভাব ফেলতে পারেন, যা অন্যরা পারেন না। তারা যখন কাউকে আদেশ করেন তখন তার এমন প্রভাব পড়ে যে, আদেশ বাস্তবায়ন না করার কোনো উপায় থাকেনা। অথচ অন্যদের ক্ষেত্রে তেমনটি লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং দেখা যায়, কারো আলোচনা শুনে মন গলে যায়।, অপরাধীরা তাওবা করে এবং তার আদেশ নিষেধ মেনে চলে। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

সুতরাং বিষয়টি যেহেতু এ রকমই, তাই প্রিয় পাঠক! আপনি জেনে রাখুন যে, ইলম ও আমল সম্পর্কিত বাহ্যিক কোনো কারামত অর্জিত না হলেও মুসলিমের দীনের জন্য ক্ষতিকর নয়।

যার জন্য গায়েবের কোন খবর উন্মুক্ত করা হয়নি কিংবা সৃষ্টিজগতের কোন কিছুই যার জন্য বশিভূত করে দেয়া হয়নি, এ কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা কমে না। শুধু তাই নয়; বরং কখনো কখনো কারামত অর্জিত না হওয়াই মুমিনের জন্য বেশী উপকারী। কেননা কারামত লাভ করার পর যদি মুসলিমের দীন ঠিক থাকে, তাহলে তো ভাল, অন্যথায় তার দীন ও দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস হবে। কেননা কারামত কখনো দীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য অর্জিত হয়, আবার কখনো বেদীন, বিভ্রান্ত এবং পাপীর জন্যও অর্জিত হয়। সুতরাং উপকারী কারামত দীনের অনুগামী হয় এবং দীনের খেদমত করে। যেমন উপকারী শাসনব্যবস্থা দীনের জন্য উপকারী হয়ে থাকে। উপকারী মালের ব্যাপারটিও ঠিক এ রকমই। যেমন ছিল নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা এবং উপকারী মাল।

সুতরাং কারামত অর্জন করাই যার মূল উদ্দেশ্য, দীনকে কারামতের অধীন করাই যার লক্ষ্য, দীনকে যে ব্যক্তি কারামত লাভের মাধ্যম বানায় এবং দীনের স্বার্থে যে মূলত কারামতকে ব্যবহার করে না, সে ঐ ব্যক্তির মতই যে দুনিয়ার বদলে দীনকে বিক্রি করে দেয়। তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত নয়, যে আল্লাহর আযাবের ভয়ে অথবা জান্নাত লাভের আশায় দীন মেনে চলে। মূলত আল্লাহর আযাব থেকে বাচাঁর জন্য এবং জান্নাত লাভ করার জন্যই দীন পালনের আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যেই দীন পালন করবে, সেই নাজাতের পথে থাকবে এবং সঠিক দীনের পথেই চলবে।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কিছু গোমরাহ সুফী লোক রয়েছে, যারা মনে করে, জাহান্নামের আগুনের ভয়ে কিংবা জান্নাতের আশায় ইবাদত-বন্দেগী করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই; বরং পার্থিব জীবনে সামান্যতম অলৌকিক বিষয় অর্জন করাই তাদের দীন পালনের মূল উদ্দেশ্য।

অতঃপর কারো দীন যখন ইলম ও আমলের দিক থেকে সঠিক হবে, তখন তার সাহায্যের প্রয়োজন হলে সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম বিষয় দিয়ে সাহায্য করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

"আর যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক প্রদান করেন"। *(সূরা তালাক: ২-৩)*

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী বিষয় দান করবেন এবং তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল"। *(সূরা আনফাল: ২৯)* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (٦٦) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (٦٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

"আমি যদি হুকুম দিতাম, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো অথবা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তাদের খুব কম লোকই এটাকে কার্যকর করতো। অথচ তাদেরকে যে নসীহত করা হয় তা যদি তারা কার্যকর করতো তাহলে এটি তাদের জন্য অধিকতর ভালো হতো এবং তাদেরকে অধিকতর দৃঢ় করতো। এমনটি করলে আমি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে অনেক বড় পুরস্কার দিতাম এবং তাদেরকে সত্য সরল পথ দেখাতাম"। *(সূরা আন নিসা: ৬৬-৬৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"আল্লাহর অলীদের কোনো ভয় নেই। তাদের চিন্তারও কোনো কারণ নেই। তারাই যারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য"। *(সূরা ইউনুস: ৬২-৬৪)*

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ»

'তোমরা মুমিনের ফিরাসাত (অন্তদৃষ্টি) থেকে সাবধান থাকো। কেননা সে আল্লাহর নূর দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে থাকে'।[৩৯৭]

---

[৩৯৭] মানুষের মুখ, হাবভাব ও তার বাহ্যিক অন্যান্য অবস্থা দেখে ভিতরের অবস্থা ও স্বভাব-চরিত্র নির্ণয় করাকে ফিরাসাত বা অন্তদৃষ্টি বলা হয়। তিরমিযীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা মুবারকপুরী (রহিমাহুল্লাহ) নেহায়াহ ও খাযানের উদ্ধৃতি

অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন, ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ "প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ লোকদের জন্য এ ঘটনার মধ্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে"। *(সূরা হিজর: ৭৫)*

ইমাম তিরমিযী আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[৩৯৮]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে কুদসীতে বলেন,

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ» (بخاري: ٦٥٠٢)

"যে ব্যক্তি আমার কোন অলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমার বান্দা যেসব ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ফরয ইবাদতই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার এতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যার কারণে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে স্পর্শ করে এবং তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি মুমিন ব্যক্তির জান

দিয়ে বলেন, ফিরাসাত এমন একটি যোগ্যতার নাম, যা আল্লাহ তা'আলা তার অলীদের অন্তরে ঢেলে দেন। এর মাধ্যমে তারা মানুষের ভিতরের অবস্থা জানতে পারেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা মুমিনের ফিরাসাত থেকে বেঁচে থাকো। কেননা সে আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে, -এর অর্থ হলো মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নূর দ্বারা আলোকিত অন্তরের চক্ষুর মাধ্যমে দেখে। সুতরাং তোমরা গোপনে পাপের কাজ করা থেকে দূরে থাকো। কারণ তা করে যদি কোন মুমিন মুত্তাকী বান্দার সামনে যাও, তাহলে তিনি অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে জেনে ফেলবেন। ফলে তোমরা তার সামনে লজ্জিত হবে। মানুষের বোধশক্তি এবং রূহ যদি নফসের দাবী পূরণের আবেদন থেকে মুক্ত থাকে, তখন সে তার রূহ দ্বারাও দেখতে পায়। রূহ যা দেখতে পায়, তা বোধশক্তিও দেখতে পায়। কিন্তু সাধারণ লোকেরা নফস ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে যেহেতু মশগুল থাকে, তাই তাদের অন্তরও তাতে যোগদান করে। তাই অস্পষ্ট জিনিসগুলো তাদের অন্তর আয়ত্ত করতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত বর্জন করে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে ব্যক্তির অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিভাবে সে অস্পষ্ট জিনিস দেখতে পাবে? উল্লেখ্য যে, ইসলামের পরিভাষায় উপরোক্ত বিষয়কে ইলহাম হিসাবে নাম দেয়া হয়েছে। এটি কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। ইহা ইলমুল গায়েবের পর্যায়ে পড়ে না। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)।

[৩৯৮] ইমাম তিরমিযী যঈফ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, সিলসিলা যঈফা, হাদীছ নং- ১৮২১। তবে অর্থ সঠিক।

বের করতে যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি, অন্য কোন কাজ করতে ততটা দ্বিধা-সংকোট করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে (দীর্ঘ হায়াত দিয়ে অতি বৃদ্ধ করে) কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি, কিন্তু মৃত্যু তার জন্য অবধারিত'।[৩৯৯] সুতরাং জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা চান, বান্দা দীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুক, আর মানুষের নফ্স কারামত অনুসন্ধান করে থাকে। আমরা সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহর তাওফীক চাচ্ছি।

অলীদের কারামতের ব্যাপারে মুতাযিলাদের অভিমতঃ

কারামত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মুতাযিলাদের কথা সুস্পষ্ট বাতিল। কেননা তাদের পক্ষ হতে কারামত অস্বীকার করার বিষয়টি চাক্ষুস বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসকে অস্বীকার করার মতই। তাদের দলীল হলো, যদি অলীদের কারামত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তা মুজেযার সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে অলী এবং নাবীর মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যাবে। সুতরাং অলীকে নাবীর সাথে মিশিয়ে দিয়ে কারামতে বিশ্বাস করা নাজায়েয।

মুতাযিলাদের এই দাবী তখনই সঠিক হবে, যখন জানা যাবে যে, কারামত পেয়ে অলী নবুওয়াতের দাবী করে বসেছে। অথচ এমন হওয়া অসম্ভব। কোনো অলী যদি নবুওয়াতের দাবী করে, তখন সে অলী থাকবে না। বরং সে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার তথা মিথ্যুক বলে গণ্য হবে।

শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম ত্বহাবীর উক্তি, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা এবং তার মনোনিত নাবী এই অংশের ব্যাখ্যা করার সময় সত্য নাবী ও ভন্ড নাবীর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে।

---

[৩৯৯] যদি প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দার কান, চোখ ইত্যাদি হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তর হচ্ছে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তার ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায় এবং ইবাদত করতে করতে তার ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়, তখন তার শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরী'আতের অনুগামী হয়ে যায়। তখন কান দিয়ে শুধু আল্লাহর আনুগত্যের কথাই শুনে এবং তা দিয়ে কোন হারাম নিষিদ্ধ আওয়াজ শুনার চিন্তাও করেনা। চোখ দিয়ে শুধু আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসই দেখে। হাত দিয়ে শুধু ভাল জিনিসই স্পর্শ করে এবং পা দিয়ে শুধু আনুগত্যের পথেই চলে। এক কথায় আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সন্তুষ্টজনক কাজ করার তাওফীক দিয়ে থাকেন। যারা এ হাদীছ থেকে স্রষ্টা সৃষ্টিতে বিলীন হওয়ার কথা সাব্যস্ত করে এক পর্যায়ে সৃষ্টিকেই পূজা শুরু করে, যা গুরুবাদের নামান্তর। তাদের ধারণা আত্মা+পরমাত্মার মিশ্রণে সব একাকার হয়ে গেছে। তাই তো তারা বলে বেড়ায় "আল্লাহর নাইরে ছায়া, কায়া স্বরূপ ধইরাছে মায়, মানুষ হইয়া খোদা খুঁজো এ মন্ত্রনা কে শিখাইয়াছে?" (নাউযুবিল্লাহ)।

ফিরাসাত বা অন্তদৃষ্টি এবং তার প্রকারভেদঃ

এখানে যে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করা আবশ্যক, তা হলো ফিরাসাত মোট তিন প্রকার।

(১) ঈমানী ফিরাসাতঃ ঈমান ও তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার অন্তরে এক প্রকার নূর ঢুকিয়ে দেন। এর স্বরূপ হলো, এটি মুমিন বান্দার এমন অন্তদৃষ্টি, যা অন্যের অন্তরে প্রবেশ করে এবং শিকারের উপর সিংহের ঝাপিয়ে পড়ার মতই ঝাপিয়ে পড়ে। فريسة শব্দ থেকেই فراسة শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। বান্দার ঈমানী শক্তি অনুযায়ীই ফিরাসাত হয়ে থাকে। যার ঈমান শক্তিশালী হয়, তার ফিরাসাতও অধিক তীক্ষ্ণ হয়। আবু সুলায়মান আদ্ দারানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ফিরাসাত হলো নফসের মধ্যে লুকায়িত বিষয় كشف (উন্মুক্ত) হওয়া।[৪০০] এবং গায়েবী বিষয়কে চোখ দিয়ে দর্শন করা। এটি ঈমানের ফযীলত অনুপাতেই অর্জিত হয়।

(২) অনুশীলন, চর্চা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত ফিরাসাতঃ ক্ষুধার্ত থাকা, নিদ্রাহীন থাকা এবং মানব সমাজ পরিত্যাগ করে নির্জনে বসবাস করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। কেননা নফ্স যখন দুনিয়ার মায়া-মমতা ও বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে, তখন সেই অনুপাতেই তাতে ফিরাসাত ও কাশফ সৃষ্টি হয়। এই ফিরাসাত (অন্তদৃষ্টি) মুমিন কাফের উভয়েরই হয়ে থাকে। এটি কারো ঈমান বা বেলায়াতের প্রমাণ বহন করে না।[৪০১] এমনি এটি কোন উপকারী সত্যকে উন্মুক্ত করে না এবং সঠিক পথের সন্ধানও দেয় না। বরং এটি শাসক, গোষ্ঠি, তাদের পূজারী, চিকিৎসক এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের ফিরাসাত।[৪০২]

---

[৪০০] উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত অর্থে সালাফগণ কাশফ শব্দটি ব্যবহার করেননি। সালাফদের পরিভাষায় এটিকে ইলহাম বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা মুমিন-মুত্তাকীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে ইলহাম করেন, সঠিক বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা দেন এবং তাওফীক দান করেন। এটি কুরআন ও হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের মাতার প্রতি ইলহাম করেছেন। অন্যদের জন্যও ইলহাম হয়ে থাকে। সুফীরা ইলহামের বদলে কাশফ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। সৃষ্টির গোপন তথ্য ও রহস্য অবগত হওয়ার অর্থে সুফীদের ভাষায় এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সুফীরা যে অর্থে তা ব্যবহার করে, তা কুরআন-হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত।

[৪০১] এটি শরী'আতসম্মত কাশফ নয়; বরং এটি যাদুকর, গণক, জ্যোতিষ, প্রতারক ও ভন্ড সুফীদের কাজ।

[৪০২] সুফীদের অনেক লোক ফিরাসাতের (অন্তদৃষ্টির) বিষয়ে চরম বাড়াবাড়ি করেছে এবং কুরআন-হাদীছ ও শরী'আতের সীমালংঘন করেছে। মুমিন মুত্তাকী এবং অলীদের জন্য ফিরাসাত (অন্তদৃষ্টি) সাব্যস্ত হলেও কোন ক্রমেই এ বিষয়ে শরী'আতের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। মানুষের চেহারা এবং তাদের বাহ্যিক অন্যান্য বিষয় দেখে ভিতরের কিছু কিছু অবস্থা অবগত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অন্তরের মধ্যে লুকায়িত সব বিষয় জানা সম্ভব। সৃষ্টিজগতের কিছু কিছু গোপন তথ্য ও রহস্য আল্লাহ তা'আলা তার কতিপয় অলীকে বিশেষ উদ্দেশ্যে জানিয়ে থাকেন। এটি কোনক্রমেই গায়েব জানার পর্যায়ে পড়ে না। সকল প্রকার গায়েবের খবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। সুতরাং এক শ্রেণীর সুফীদের দাবী, অলীরা কাশফের মাধ্যমে আসমান-যমীনের সকল গোপন বিষয় জানতে পারে... তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল। তাদের কথা নাবী-রাসূলদের দীন ও সকল আসমানী শরী'আত বাতিল করে দেয়ার

(৩) সৃষ্টি ও গঠন সম্পর্কিত ফিরাসাত: এ বিষয়ে প্রাচীন চিকিৎসাবিদ এবং অন্যরা কিতাবাদি লিখেছেন। হিকমতে ইলাহীর দাবী অনুযায়ী দৈহিক গঠনের সাথে যেহেতু মানুষের স্বভাব-চরিত্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাই তারা শারীরিক গঠনপ্রণালীর উপর ভিত্তি করে ভিতরগত স্বভাব-চরিত্র এবং অবস্থা নির্ধারণ করেছে। যেমন তারা বলেছে, অস্বাভাবিক ছোট মাথা মানুষের বোধশক্তি কম হওয়ার প্রমাণ, বড় সাইজের মাথা মানুষের বিবেক ও বোধশক্তি বেশী হওয়ার প্রমাণ, প্রশস্ত বক্ষ ব্যক্তির উদার ও মহান চরিত্রের প্রমাণ, সংকীর্ণ বক্ষ সীমিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন, চোখের স্থবিরতা ও দুর্বল দৃষ্টিশক্তি বোকামি, স্থূলবদ্ধি এবং মানুষের অন্তরের কঠোরতার পরিচায়ক।[৪০৩]

(১০৭) ইমাম ত্বহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَ

"আমরা কিয়ামাতের আলামতসমূহ যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান হতে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ, পশ্চিম গগনে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর স্বীয় স্থান হতে বের হওয়া ইত্যাদির প্রতি ঈমান রাখি।

.....

ব্যাখ্যা: আওফ বিন মালেক আল আশজাঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি চামড়ার নির্মিত একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন বললেন,

---

আহবান ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তার মনোনীত কোন রাসূল ব্যতীত। (সূরা জিন: ২৬-২৭)

মোট কথা শাইখ এখানে যা উল্লেখ করেছেন, তা ফিরাসাত নয়। কারণ ফিরাসাত এমন নূর, যা আল্লাহ তা'আলা মুমিনের অন্তরে ঢেলে দেন। আর এগুলো শয়তানের ছলছাতুরি ও ধোঁকাবাজি ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

[৪০৩]. শাইখ ইবনে আবীল ইয্ (রাহিমাহুল্লাহ) এখানে চিকিৎসা বিদ্যার বিষয়কে ফিরাসাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অথচ এগুলো অভিজ্ঞতা ও গবেষণার বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাছাড়া তিনি এখানে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন, তার ব্যতিক্রমও হতে পারে। মোট কথা, শাইখ ফিরাসাতের যেই সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তাতে বুঝা যায় উপরোক্ত বিষয়গুলো কোনভাবেই মুমিনের ফিরাসাত এবং আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহামের পর্যায়ে পড়ে না।

«اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ، مَوْتِى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفا»

“কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি আলামত প্রকাশ পাবে। আমার মৃত্যু, বাইতুল মাকদিস বিজয়, মানুষের মধ্যে এমন একটি মহামারি ছড়িয়ে পড়বে যেমন কুআস[৪০৪] নামক ব্যাধি বকরীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এমনকি কাউকে একশত দীনার দেয়া হলেও সে অসন্তুষ্ট থেকে যাবে। অতঃপর এমন ফিতনার আগমন ঘটবে যা প্রত্যেক আরবের ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর তোমাদের ও রোমকদের মধ্যে চুক্তি হবে, কিন্তু তারা চুক্তি ভঙ্গ করে আশিটি পতাকার নীচে সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের প্রতিটি পতাকার নীচে বার হাজার সৈন্য থাকবে”। হাদীছে غاية শব্দের গাইন বর্ণের স্থলে রা বর্ণ দিয়েও পড়া হয়েছে। উভয় বর্ণনা অনুসারে অর্থ একই। ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তাবারানী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[৪০৫]

হুযায়ফা বিন উসায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِم»

“একদা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আগমন করলেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখো ততদিন কিয়ামত হবে না। (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আগমন (৩) দাববা (ভূ-গর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত একটি প্রাণীর আগমন) (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারিয়ামের আগমন ৬) ইয়াজুয-মাজুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধস (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে”।[৪০৬]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একবার দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন তিনি বললেন,

---

[৪০৪] কুআস এমন অজ্ঞাত এক রোগের নাম, যাতে আক্রান্ত গরু-ছাগল এবং অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু হঠাৎ মারা যায়।

[৪০৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৭৬।

[৪০৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০১, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান।

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يخفى عليكم إن الله ليس بِأَعْوَرَ و إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তোমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্ধ নন। আর দাজ্জালের ডান চোখ হবে অন্ধ। দেখলে মনে হবে, তার ডান চোখটি কপালের মধ্যে বেড়ে উঠা আঙ্গুর সদৃশ"।[৪০৭]

আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَأَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الدَّجَّالَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر»

"একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে সাবধান করছি। সকল নাবীই তাদের উম্মাতকে কানা দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। তোমাদের রব কিন্তু অন্ধ নন। দাজ্জালের দু'চোখের মাঝখানে ك ف ر লিখা থাকবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য বর্ণনায় এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সে হবে কাফির।[৪০৮]

ইমাম বুখারী এবং অন্যরা আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ» ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾

"ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। অচিরেই ন্যায় বিচারক শাসক হিসাবে ঈসা আলাইহিস সালাম তোমাদের মাঝে আগমন করবেন। তিনি ক্রুশচিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযইয়া প্রত্যাখ্যান করবেন। ধন-সম্পদ প্রচুর হবে এবং তা নেয়ার মত কোন লোক পাওয়া যাবে না। এমনকি মানুষের কাছে একটি সিজদা দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ হবে। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন, তোমরা চাইলে আল্লাহর এই বাণীটি পাঠ কর,

[৪০৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪০, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৬৯।

[৪০৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৩২১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৯৩৩।

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾

"আহলে কিতাবদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং উত্থান দিবসে তিনি তাদের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন"।[৪০৯]

দাজ্জালের আলোচনা এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম আসমান থেকে নেমে দাজ্জালকে হত্যা করার পর তারই সময়কালে ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে ঈসা আলাইহিস সালামের দু'আর বরকতে এক রাতেই আল্লাহর পক্ষ হতে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার বিষয় এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

দাব্বাতুল আরদ্ বের হওয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সূরা নামলের ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

"যখন প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী নির্গত করবো। সে মানুষের সাথে কথা বলবেঃ এ বিষয়ে যে, মানুষ আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করতো না"।

আর পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ﴾

"তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন। অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। যে দিন তোমার পালনকর্তার কোন নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবে না যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি। হে নাবী! বলো, তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম"। *(সূরা আনআম: ১৫৮)*

[৪০৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৮, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৫৫।

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসীরে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾

“যতদিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে না ততদিন কিয়ামত হবে না। যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখতে পাবে তখন সকলেই ঈমান আনবে। তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যে ইতিপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকাজ করেনি”।[৪১০]

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে একটি হাদীছ স্মরণ রেখেছি, তা হলো তিনি বলেছেন,

«إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا»

“কিয়ামতের প্রথম আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় এবং সকাল বেলা মানুষের সামনে দাব্বাতুল আরয বের হওয়া। এ দু’টির কোন একটি তার সাথীর পূর্বে বের হলেই অপরটি তার সামান্য পরেই বের হবে”।[৪১১]

অর্থাৎ এখানে প্রথম আলামত বলতে এমন আলামত উদ্দেশ্য, যা মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এর আগে দাজ্জালের আগমন, আসমান থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের নেমে আসা, অনুরূপ ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়া, এসব কিছুই সাধারণ ও পরিচিত বিষয়। কেননা তারা হবে মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের অনুরূপ দেখে লোকেরা আগে থেকেই অভ্যস্থ হবে। কিন্তু অদ্ভুত আকৃতিতে দাব্বাতুল আরয বের হওয়া মানুষের কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন বিষয় ও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম। আর এটি হবে যমীনের ভিতর থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম অস্বাভাবিক নিদর্শন। ঐদিকে সাধারণ অভ্যাসের ব্যতিক্রম নিয়মে পশ্চিম আসমান থেকে সূর্যোদয় আসমানের আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম। আলেমগণ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে হাদীছগুলো একত্র করে অনেক সুপ্রসিদ্ধ কিতাব লিখেছেন। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা অসম্ভব।

---

[৪১০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৬৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৫৭।

[৪১১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৪১।

(১০৮) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلاَ نُصدِّقُ كَاهِنًا وَلاَ عَرَّافاً وَلاَ مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ

আমরা কোনো গণক ও জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না এবং ঐ ব্যক্তিকেও সত্য বলে মনে করি না, যে আল্লাহর কিতাব, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও উম্মতের ইজমার বিপরীত কিছু দাবী করে।

.....

ব্যাখ্যা: ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) সাফিয়া বিনতে উবাইদের সূত্রে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»

"যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, অতঃপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছ্বলাত কবুল হবে না"।[৪১২]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় মুসনাদে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصدَّقَهُ بِمَا يَقولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلى مُحَمَد»

"যে ব্যক্তি গণক অথবা জ্যোতিষীর কাছে আসল, অতঃপর গণক যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল সে মূলত মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল"।[৪১৩]

কতক আলেমের মতে المنجم (জ্যোতিষী) এবং العراف (ইলমে গায়েবের দাবীদার) শব্দের একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, المنجم শব্দটি العراف এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। জিজ্ঞাসাকারীর অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে যাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তার অবস্থা কেমন হতে পারে?

ছ্বহীহ বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ওসব কিছুই নয়। অর্থাৎ তাদের কথা বিশ্বাস করো না। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কখনো কখনো এমন কথা বলে, যা সত্য হয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, ঐ সত্য কথাটা জিন ফেরেশতাদের নিকট থেকে

---

[৪১২] ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: গণকের কাজ নিষিদ্ধ এবং গণকের কাছে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

[৪১৩] ইমাম আলবানীও হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হাদীছ নং-৩৩৮৭।

দ্রুত শুনে ফেলে। অতঃপর সে তার মানব বন্ধুর কানে তা ফুঁকে দেয়। অতঃপর গণকরা তার সাথে আরো একশটি মিথ্যা যোগ করে”।

ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ خَبِيْثٌ»

“কুকুরের মূল্য অপবিত্র, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জন করা অর্থ অপবিত্র এবং গণকের ভাগ্য গণনার বখশিশ অপবিত্র (হারাম)।[৪১৪]

লোকেরা গণকের মজুরীকে বখশিশ বলে থাকে। জ্যোতিষী, ভাগ্য গণনাকারী তীর ওয়ালা যেই তীর দ্বারা ভাগ্য গণনা করে, অনুরূপ কাঠের উপর ا–ب–ج–د লিখে ভাগ্য নির্ধারণকারী, পাথর নিক্ষেপকারী এবং বালুর উপর লিখে গায়েব জানার দাবীদার, এসব লোককে যা প্রদান করা হয়, তার সবই হারাম।[৪১৫] একাধিক আলেম এসব হারাম হওয়ার উপর আলেমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»

“রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়াতে আমাদের সামনে একবার ভাষণ দিলেন। সে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ভাষণে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? আমরা বললাম, ‘আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক জানেন’। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আজ সকালে আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হয়েছে আবার কেউ কাফের হয়েছে। যে ব্যক্তি বলেছে, ‘আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়াতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর বৃষ্টি বর্ষনে নক্ষত্রের প্রভাবকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, ‘অমুক অমুক নক্ষত্রের

[৪১৪] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২১২২।

[৪১৫] মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা, হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যৎ বাণী করা, টিয়া পাখি দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ধারণ করা গণকদের প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। মূলত যাদুকর ও গণকদের কাছে শয়তান আগমন করে থাকে। তারা কেবল শয়তানের কথা মতই কাজ করে। গণকরা বাহ্যিকভাবে যা দেখায় তা ভেলকিবাজি ও মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উসীলায় বৃষ্টি হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে”।[৪১৬]

ছ্বহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদে আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ" وَقَالَ: "النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»

“জাহেলী যুগের চারটি কু-স্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না। (এক) আভিজাত্যের অহংকার করা। (দুই) বংশের বদনাম করা। (তিন) তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা এবং (চার) মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। তিনি আরও বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনী মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার পরনে থাকবে আলকাতরার প্রলেপযুক্ত লম্বা জামা এবং খোস-পাঁচড়াযুক্ত কোর্তা।[৪১৭]

উপরোক্ত কাজগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ, ছাহাবী ও ইমামদের উক্তিসমূহ এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। যেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিভিন্ন বিধি-বিধান ও প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়, যেমন যমীনের বিভিন্ন ঘটনায় আকাশের বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব রয়েছে বলে ধারণা করা অথবা যমীনের ধ্বংসাত্মক ঘটনাগুলোর উপর নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। শুধু আমাদের শরীয়াতে নয়; বরং অন্যান্য সকল নাবী-রসূলের শরী‘আতের এটাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা সূরা তোহার ৬৯ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾

“যাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না”। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾

“তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত এবং ‘তাগুতকে বিশ্বাস করে। *(সূরা নিসা: ৫১)* উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘জিবত’ হচ্ছে যাদু।

---

[৪১৬] ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: হুদায়বিয়ার যুদ্ধ।

[৪১৭] ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: বিলাপ করার ভয়াবহতা।

ছ্বহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي مِمَّ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي، فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ»

"আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর একটি গোলাম ছিল। তিনি সেই গোলামের উপার্জন থেকে খেতেন। সে একদিন কিছু উপার্জন করে নিয়ে আসলে তা থেকে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কিছু খেলেন। চাকরটি তখন বলল, আপনি কি জানেন কী থেকে তা অর্জন করা হয়েছে? আবু বকর বললেন, তা কী? চাকর বলল, আমি জাহেলী যামানায় একজনের ভাগ্য গণনা করে উপার্জন করেছি। তবে আমি এই পেশা সম্পর্কে অভিজ্ঞ নই। আমি তাকে ধোঁকা দিয়েই তা অর্জন করেছি। সে আমার সাথে আজ সাক্ষাৎ করে সেই কাজের বিনিময়ে যা দিয়েছে, আপনি তা থেকেই খেয়েছেন। এই কথা শুনে আবু বকর তার গলায় হাত ঢুকালেন এবং বমি করে পেটের মধ্যে যা ছিল সবকিছুই বের করে ফেললেন।[৪১৮]

সুতরাং মুসলিম শাসক এবং ক্ষমতাবান প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো, এ সব জ্যোতিষী, গণক, গায়েব জানার দাবীদার, পাথর নিক্ষেপ করে ভাগ্য গণনাকারী, বালুর উপর লিখে ভবিষ্যৎ নির্ণয়কারী ও কঙ্কর নিক্ষেপ করে শুভ-অশুভ নির্ধারণকারীদেরকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালানো এবং তাদেরকে রাস্তা-ঘাট ও দোকানপাটে বসতে নিষেধ করা। একই সাথে মানুষের বাড়িঘরে ঢুকে এ জাতিয় জিনিস দ্বারা তাদের সাথে প্রতারণাকারীদেরকে প্রতিহত করা উচিত। যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকার পর এগুলো নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জেনেও তা অপসারণের চেষ্টা করবে না, তার পরিণতি কী হতে পারে, তা অনুধাবন করার জন্য আল্লাহ তা'আলার এই বাণীই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

"বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যারা কুফুরী করেছে তাদের উপর দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং পাপাচারে সীমালংঘন করেছিল। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, তাদের গৃহীত সেই কর্ম ছিল বড়ই জঘন্য"। *(সূরা মায়িদা: ৭৯-৮০)*

[৪১৮] ছ্বহীহ বুখারী, হাদীছ নং- ৩৮৪২।

মুসলিমদের ঐকমত্যে এসব অভিশপ্তরা অন্যায় কথা বলে এবং হারাম ভক্ষণ করে। সুনানের কিতাবসমূহে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»

"মানুষেরা অন্যায় কাজ দেখেও প্রতিহত না করলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই তার পক্ষ হতে শাস্তি পাঠিয়ে ধ্বংস করে দিবেন"।[৪১৯]

এসব লোক কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী যেসব কাজ করছে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তাদের মধ্যে রয়েছে এমন মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ, যাদের কেউ কেউ প্রকাশ করে যে, জিনেরা তার অনুগত। কোন কোন ফাঁকিবাজ শাইখ, মিথ্যুক ফকীর-দরবেশ এবং তরীকাপন্থী প্রতারক অসাধ্য সাধন করার দাবী করে। এসব লোক এবং তাদের অনুরূপদেরকে মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া দরকার। এদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাদেরকে হত্যা করা দরকার। যেমন এসব ফাঁকিবাজির মাধ্যমে কেউ নবুওয়াতের দাবী করলো কিংবা শরী'আত বিরোধী কিছু দাবী করলো অথবা অনুরূপ কিছু দাবী করলো।

যাদুর স্বরূপ এবং যাদুকরের হুকুম:

আরেক শ্রেণীর লোক প্রকৃত পক্ষেই বিভিন্ন প্রকার যাদুর মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে যাদুকরকে হত্যা করা আবশ্যক। এটিই ইমাম আবু হানীফা, মালেক এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) এর প্রকাশ্য মত। ছাহাবীদের থেকে এই মতই বর্ণিত হয়েছে। উমার, ইবনে উমার, উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সহ আরো অনেকের মতেই যাদুকরকে হত্যা করা আবশ্যক।

যাদের মতে যাদুকরকে হত্যা করা আবশ্যক, তারা আবার এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, যাদুকরকে তাওবা করতে বলা হবে কিনা? তাকে কি যাদু চর্চার কারণে কাফের বলা হবে? না কি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করার কারণে তাকে হত্যা করা হবে? একদল আলেমের মতে যাদুকর যদি কাউকে যাদুর মাধ্যমে হত্যা করে, তাহলে যাদুকরকেও হত্যা করা হবে। আর যাদুর প্রভাবে যাদুগ্রস্ত লোক মারা না যায়, তাহলে যাদুকরকে হত্যা না করে অন্য কোন শাস্তি দিতে হবে। বিশেষ করে যখন যাদুকরের কথায়

[৪১৯] শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর তাহকীকসহ মিশকাত, হাদীছ নং- ৫১৪২।

ও কাজে কোনো প্রকার শির্ক না পাওয়া যাবে। ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে এই কথাই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অন্য একমতেও এই কথা এসেছে।[৪২০]

যাদুর স্বরূপ এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ আলেম বলেন, যাদুকরের পক্ষ হতে যাদুগ্রস্তের কাছে বাহ্যিক কিছু পৌঁছা ব্যতীতই যাদুর প্রভাবে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে পারে কিংবা অসুস্থ হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, যাদু এক প্রকার কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।[৪২১] তবে সকলেই একমত যে, যাদু করতে গিয়ে যদি সাত তারকাকে অথবা অন্যকিছুকে আহবান করা হয় কিংবা তাকে সম্বোধন করা হয় অথবা তারকা বা অন্যকিছুর জন্য সেজদাহ করা হয় অথবা মূল্যবান পোশাক, আংটি, ধূপ এবং অনুরূপ বস্তুর মাধ্যমে তারকা বা অন্য কিছুর নৈকট্য কামনা করা হয়, তাহলে উক্ত কাজ কুফুরী বলে গণ্য হবে। এগুলো হচ্ছে মানুষের মধ্যে শির্ক প্রবেশের অন্যতম বৃহৎ দরজা। এসব দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা দরকার। তারকার পূজা করা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের গোত্রের শির্ক ছিল। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾

"অতঃপর তিনি তারকাদের দিকে একবার তাকালেন এবং বললেন, আমি অসুস্থ" (সূরা সাফফাত: ৮৮-৮৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"অতঃপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন একটি নক্ষত্র দেখে তিনি বললেন, এ আমার রব!! কিন্তু যখন তা ডুবে গেলো, তখন বললেন, যারা ডুবে যায় আমি তো তাদের ভক্ত নই। তারপর যখন চাঁদকে আলো বিকীরণ করতে দেখলেন, তখন বললেন,

---

[৪২০] মজবুত ঈমান, সঠিক আক্বীদাহ, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত এবং অন্যান্য যিকির-আযকার পাঠ করাই যাদু ও তার কুফল থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

[৪২১] মুতাযিলারা যাদুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে থাকে। তবে সঠিক কথা হলো যাদুর অস্তিত্ব ও প্রভাব রয়েছে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ করতেন না।

এটি আমার রব। কিন্তু যখন তাও ডুবে গেলো তখন বললেন, আমার রব যদি আমাকে পথ না দেখান তাহলে আমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। এরপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমান দেখলেন তখন বললেন, এটিই আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়! কিন্তু তাও যখন ডুবে গেলো তখন ইবরাহীম বলে উঠলেন, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। তার সম্প্রদ্রায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তাতে তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনি আমাকে সত্য-সরল পথ দেখিয়েছেন এবং তোমরা যাদেরকে তার সাথে শরীক করছো তাদেরকে আমি ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে অবশ্যই তা হতে পারে। আমার রবের জ্ঞান সকল জিনিসের উপর পরিব্যাপ্ত। এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না? যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং ঈমানের সাথে যুলুম মিশ্রিত করেনি, নিরাপত্তা তাদের জন্যই এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত"। *(সূরা আল আন'আম: ৭৬-৮২)*

আলেমগণ আরো একমত হয়েছেন যে, যেসব ঝাড়-ফুঁক, তাবীয এবং কসমের মধ্যে শির্ক রয়েছে, তা উচ্চারণ করা যাবে না। এর কারণে যদিও জিন বা অন্যরা তার আনুগত্য করে। এমনি যেসব কথার মধ্যে কুফুরী রয়েছে তাও উচ্চারণ করা জায়েয নয়।

অনুরূপ যেসব কথার অর্থ বোধগম্য নয়, তাও উচ্চারণ করা বৈধ নয়। কেননা তাতে এমন শির্ক থাকতে পারে, যা অজ্ঞাত। এ জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» "যেই কথার মধ্যে শির্ক নেই, তা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাতে কোন অসুবিধা নেই"।[৪২২]

জিনদের কাছে আশ্রয় চাওয়া বৈধ নয়। জিনদের কাছে আশ্রয় চাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে দোষারোপ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

"মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জিনের কাছে আশ্রয় চাচ্ছিল। এর ফলে তারা জিনদের অহমিকা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল"। *(সূরা জিন: ৬)*

আলেমগণ বলেন, জাহেলী যামানায় কোন মানুষ যখন উপত্যকায় অবতরণ করতো, তখন সে বলতো, আমি এই উপত্যকার জিনদের নেতার কাছে এখানকার মূর্খ ও দুষ্ট জিনদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এভাবে সে জিনের আশ্রয়ে সারা রাত নিরাপদে কাটিয়ে দিতো। এভাবে মানুষেরা জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে

[৪২২] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২০০।

জিনদের দাপট আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। رَهَقاً শব্দের অর্থ হলো, পাপকর্ম, যুলুম, সীমালংঘন, দাপট এবং অনিষ্টতা। কেননা জিনদের নেতারা মানুষের উপরোক্ত কথা শুনে বলেছিল, আমরা জিন ও মানুষ উভয়ের উপর নেতৃত্ব লাভ করেছি। জিনদের প্রতি মানুষের এহেন সম্বোধনের কারণে তারা তাদের আত্ম অহমিকা আরো বাড়িয়ে দিতো এবং তাদের কুফুরীও আরো বৃদ্ধি করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾

"যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করতো? ফেরেশতারা বলবে, আপনি পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত আপনিই আমাদের বন্ধু; বরং তারা জিনের পূজা করতো। তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী"। *(সূরা সাবা: ৪০-৪১)*

এদের যেসব লোক ফেরেশতাদেরকে আহবান করে, ঝাড়-ফুঁক ও তাবীযের মাধ্যমে ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আগমন করে বলে দাবী করে, তারা বিভ্রান্ত। তাদের নিকট শয়তান ছাড়া অন্য কেউ আগমন করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيم﴾

"যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্র করবেন সে দিন তিনি বলবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছো। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্য থেকে একজন অন্যজনের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন, আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু আল্লাহ অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী"। *(সূরা আল আন'আম: ১২৮)*

মানুষ জিনদের দ্বারা উপকৃত হয়, এর অর্থ হলো জিনেরা মানুষের প্রয়োজনীয় কাজ করে দেয়, মানুষ তাদেরকে যেই আদেশ করে, তারা সেই আদেশ বাস্তবায়ন করে, কিছু কিছু গায়েবের খবর সংগ্রহ করে দেয় এবং অনুরূপ আরো সেবা প্রদান করে। আর জিনেরা মানুষদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার ধরণ হলো, মানুষেরা জিনদের সেবার মোকাবেলায়

জিনদের সম্মান করে, তাদের কাছে সাহায্য চায়, তাদের নিকট ফরীয়াদ করে এবং তাদের বশীভূত হয়।

আরেক শ্রেণীর ফাঁকিবাজ সুফী রয়েছে, যারা শয়তানী প্রভাব ও কাশফের মাধ্যমে এবং গায়েবের দাবিদার লোকদেরকে সম্বোধন করে থাকে। তারা মনে করে যে, তাদের রয়েছে এমনসব কারামত, যা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর অলী! আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকেই সাহায্য করে।[৪২৩] তারা বলে থাকে, মুসলিমরা যখন পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আদেশ দেন, তারা যেন মুশরিকদের দলে যোগ দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে!! এই ধরণের সুফী ও ফাঁকিবাজরা আসলে শয়তান ও মুশরিকদের ভাই।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার সময় মুসলিমদের মধ্যে একটি কথা ছড়িয়ে পড়ল যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুশরিক ও আহলে কিতাবদের সাথে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যাদেরকে 'রিজালুল গায়েব' বা গায়েব সম্পর্কে অবগত লোক বলা হয়। তখন এই লোকগুলো সম্পর্কে লোকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল।

(১) এক শ্রেণীর লোক এই গায়েব ওয়ালাদের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করলো। কিন্তু আসল কথা হলো, মানুষ তাদেরকে দেখেছে এবং যারা দেখেছে তাদের থেকে নির্ভরযোগ্য লোকদের মাধ্যমে সংবাদ এসেছে কিংবা বিশ্বস্ত লোকেরা দেখার পর সংবাদ দিয়েছে। তাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীরা যখন তাদেরকে দেখেছে এবং তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে তখন তারা এই গায়েব ওয়ালাদের বশীভূত হয়ে গেছে।

(২) আরেক শ্রেণীর লোক গায়েব ওয়ালাদেরকে চিনতে পেরেছে এবং তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করেছে যে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য নাবীর তরীকা ব্যতীত আরেকটি তরীকা রয়েছে।[৪২৪]

(৩) আরেক শ্রেণীর লোক রসুলের তরীকার বাইরের কাউকে অলী হিসাবে সাব্যস্ত করতে প্রস্তুত নয়। তবে তারা বলেছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শত্রু ও বন্ধু উভয় দলের জন্য মদদকারী হতে পারেন। এরা একদিকে রসূলকে সম্মান করে, কিন্তু তারা রসূলের দীন ও শরী'আত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

---

[৪২৩] ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিদ'আতী এবং ভ্রান্ত সুফীরা যুগে যুগে হকপন্থী মুসলিমদের বিরোধিতা করে আসছে। তারা কখনো সুন্নী আলেমদের বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিয়ে শাসক গোষ্ঠিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, কখনো অজ্ঞ লোকদের দ্বারা হক্কানী আলেমদেরকে কষ্ট দিয়েছে আবার বহিঃশত্রুদেরকেও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে। ইবনুল আলকামী এবং তুসীর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে বাগদাদের খলীফা বর্বর তাতারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন এবং মুসলিম জাতির উপর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ও পৈশাচিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়।

[৪২৪] সুফীদের একদল মূর্খ লোক এই ধরণের আরো অনেক বাতিল বিষয় বিশ্বাস করে থাকে, যা সুস্পষ্ট কুফরী।

সঠিক কথা হলো এই তিন শ্রেণীর লোকই শয়তানের অনুসারী। এখানে رجال الغيب বা গায়েব ওয়ালা বলতে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে, তারা হলো জিন। জিনেরা মানুষের চোখের আড়ালে থাকলেও তাদেরকে যেহেতু কখনো কখনো সুফী সাধকদের আকৃতিতে দেখা যায় তাই তাদেরকে রিজাল বা লোক বলে নামকরণ করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

"মানুষদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জিনদের কাছে আশ্রয় চাচ্ছিল, এর ফলে তারা জিনদের অহমিকা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।" *(সূরা জিন: ৬)*

অন্যথায় যারা সব সময় দৃশ্যমান থাকে তাদের الإنس (মানুষ) বলা হয়। তারা খুব কম সময়ই লোক চোখের আড়ালে থাকে। উপরোক্ত গায়েব ওয়ালাদেরকে যারা মানুষ মনে করেছে, তারা ভুল ও অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে। আল্লাহর অলী এবং শয়তানের অলীদের মধ্যে পার্থক্য না করাই উপরোক্ত লোকদের গোমরাহী এবং তাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার কারণ।

কতিপয় লোক বলে থাকে, মারেফতের ফকীর-দরবেশদেরকে[৪২৫] তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল। বরং তাদের কথা ও কাজগুলো মুহাম্মাদী শরী'আত দ্বারা যাচাই করতে হবে। তাদের যেসব কথা শরী'আতের সাথে মিলবে, তা গ্রহণ করা হবে এবং যা শরী'আতের বিরোধী হবে, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৪২৫] এখানে ফকীর-দরবেশ বলতে অজ্ঞ সুফীসাধক এবং তাদের অনুরূপ লোক উদ্দেশ্য। সঠিক দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ইবাদতকারী লোকদেরকেও এ নামে নামকরণ করা হয়। তবে এভাবে নামকরণ করা ঠিক নয়। কোন মুসলিমকে সুফী হিসাবে নামকরণ করাও ঠিক নয়। ইবাদতকারী বলা যেতে পারে। পীর, ফকীর ও দরবেশ বলা ঠিক নয়। এগুলো বিদ'আতী নাম। তাদের মধ্যে রয়েছে মূর্খতা ও বিদ'আত। তাদেরকে তাদের অবস্থাসহ ছেড়ে দিতে হবে। তারা বলে থাকে যে, তারা কেবল ভাল কাজই করে। তারা আরো বলে, তাদের প্রত্যেক কাজেরই এমন ব্যাখ্যা রয়েছে, যাতে তাদেরকে দোষারোপ করা যায় না। ফকীর-দরবেশদের ব্যাপারে এ কথা প্রচলিত থাকার কারণে অনেকেই বিভ্রান্তিতে পড়েছে। মুরীদরা মনে করে, তাদের মাশায়েখদের দ্বারা শরী'আত বিরোধী কাজ হলেও তার একটা বাতেনী ব্যাখ্যা রয়েছে। তারা আরো মনে করে, ফকীর-দরবেশদের দ্বারা যেসব বড় বড় অপরাধ সংঘটিত হয়, তা তাদের কারামতের অংশ বিশেষ এবং তাদের দ্বারা যেসব বড় বড় অপরাধ সংঘটিত হয়, তা তাদের কারামতের অংশ বিশেষ এবং আল্লাহ তা'আলাই তাদের বিনা উপলব্ধিতেই তাদের দ্বারা এগুলো ঘটিয়ে থাকেন। এ কারণেই আপনি দেখবেন যে, তাদের কেউ কেউ ফরয ছ্বলাতও আদায় করে না। কিন্তু মুরীদরা মনে করে, তাদের পীরের রূপ ছ্বলাতের সময় হলে মক্কায় চলে যায় এবং কাবা ঘরের পাশে ছ্বলাত আদায় করে। এক শ্রেণীর সুফী মুরীদের সামনেই মদ পান করে এবং প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হয়। তারপরও ভক্তরা মনে করে তাদের শাইখের রূহ কাবা ঘরে রয়েছে এবং তারা এটিকে কারামত মনে করে ও তার জন্য রহমতের দু'আ করে। (নাউযুবিল্লাহ) মোট কথা ফকীর-দরবেশদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে না, তাদের দ্বারা যেসব অন্যায় কাজ সংঘটিত হয়, তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে হবে। আল্লাহ সহায় হোন।

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমাদের অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত"। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত"।[৪২৬]

সুতরাং রসূলের তরীকা ব্যতীত আর কোন সঠিক তরীকা নেই, তিনি যেই সত্য দীন নিয়ে এসেছেন, তা ব্যতীত আর কোন সত্য দীন নেই, আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি যেই শরী'আত প্রাপ্ত হয়েছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন শরী'আত নেই এবং তিনি যেই আক্বীদাহ শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোন সঠিক আক্বীদাহ নেই। সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তার সুন্নাতের অনুসরণ বর্জন করে অন্য কারো সুন্নাতের অনুসরণ করে কারো পক্ষে আল্লাহর নৈকট্য, তার সন্তুষ্টি, তার জান্নাত ও কারামত হাসিল করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদকে সত্যায়ন করবে না, অন্তরের বাতেনী বিষয়গুলোতে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ্য আমলগুলো সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তার আদেশের আনুগত্য করবে না, আল্লাহ তা'আলার অলী হওয়া তো দূরের কথা, সে মুমিন হিসাবেও গণ্য হবে না। যদিও সে বাতাসের সাথে উড়তে পারে, পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে, আগুনে প্রবেশ করতে পারে, গায়েবের খবর বলতে পারে, কাঠ ও পাথর থেকে স্বর্ণ বের করতে পারে এবং যত ইচ্ছা অলৌকিক ও অসাধারণ ঘটনা দেখাতে পারে।[৪২৭] কেননা যে ব্যক্তি শরী'আতের

---

[৪২৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮১৮।

[৪২৭] ইতিপূর্বে কারামত সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি যে, অলৌকিক ও অসাধারণ ঘটনাগুলো তিন প্রকার। (১) নাবী-রাসূলদের হাতে যেসব অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশিত হয়, তাকে মু'জেযাহ বলা হয়। কোন মানুষের পক্ষেই নাবী-রাসূলদের অনুরূপ মু'জেযা আনয়ন করা সম্ভব নয়। (২) আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দা ও তার অলীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, রক্ষা করা, তাদের ঈমান শক্তিশালী করা এবং তাদেরকে সম্মানিত করার জন্য যা দেয়া হয়, তাকে কারামত বলা হয়। এগুলো বাহ্যিকভাবে অলীদের কর্ম বলে মনে হলেও মূলত তাতে অলীদের কোন হাত নেই। আল্লাহ তা'আলাই অলীদের মাধ্যমে এগুলো প্রকাশ করেন। এগুলো বিশ্বাস করা আবশ্যক। (৩) আর যাদুকর, গণক, ফাঁকিবাজ, ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের হাতে যেসব অলৌকিক ও অসাধারণ ঘটনা প্রকাশিত হয়, তাকে আহওয়াল শায়তানীয়া বা শয়তানী অবস্থা ও কাজ-কারবার বলা হয়। শয়তান কতক মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য আজব আজব ঘটনা ও কর্ম দেখায়। শাইখ বিন জিবরীন বলেন, যারা এ ধরণের আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের অনেকেই এ বিষয়ে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। যেমন একজনের ব্যাপারে বলা হয় যে, শয়তান তার সামনে প্রকাশিত হলো। শয়তান প্রজ্বলিত একটি আগুনের দিকে আসলো। তাতে ছিল পাথরের মত আগুনের অসংখ্য অঙ্গার। শয়তান এগুলো হাতে নিয়ে মুখে দিচ্ছিল এবং তার পেট ভর্তি করে ফুলে উঠছিল। একদিকে যেমন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল, অন্যদিকে আগুনের প্রচুর পাথর পেটে ঢুকানোর কারণে শয়তান ফুলে উঠছিল। শয়তানের দ্বারা এ ধরণের ঘটনা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ শয়তান ও জিন আগুনের তৈরী। সুতরাং দুনিয়ার আগুন তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। যাদুকর, গণক, ভেলকিবাজ ও

আদেশ বর্জন করে, হারাম কাজে লিপ্ত হয়, সে শয়তানের ঐসব অবস্থার অনুসরণকারী হয়, যা তাকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার অসন্তুষ্টি ও আযাবের দিকে নিয়ে যাবে।

পাগল ও শিশুরা যেহেতু শরী'আতের হুকুম-আহকাম পালনের আওতাধীন নয়, তাই তাদের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তাদের দ্বারা শরী'আত বিরোধী কাজ হলে তাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না। তাদের কাছে অন্তরের ঈমান ও স্বীকারোক্তি থেকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য এমন কোন আমল নেই, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্যশীল অলী, তার সফলকাম দল এবং বিজয়ী সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে তারা বাপ-দাদাদের হুকুমে মুসলিম হিসাবেই গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করে দেব। আর আমি তাদের আমল থেকে কোন কিছুই কমাবো না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী"। *(সূরা তূর: ৩১)*

যারা ধারণা করে, হাবলা, পাগল ও নির্বোধরা কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ্য শরী'আতের বিরোধিতা ও রসূলের আনুগত্য বর্জন করলেও তারা আল্লাহর অলীদের মধ্যে গণ্য এবং তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকার অনুসরণকারীদের চেয়ে উত্তম, তারা বিদ'আতী ও গোমরাহ। তাদের আক্বীদার মধ্যে মারাত্মক ভুল রয়েছে। তারা হাবলাদেরকে আল্লাহর অলী মনে করে। অথচ তারা শয়তান, নাস্তিক কিংবা মুনাফেক হতে পারে অথবা হতে পারে ধোঁকাবাজ, প্রতারক অথবা আসলেই তারা পাগল ছাড়া অন্য কিছু নয়। তারা যদি আসলেই নির্বোধ ও হাবলা হয়ে থাকে, তাহলে তারা নির্দোষ। তবে কথা হলো, কিভাবে এসব পাগলদেরকে রাসূলের অনুসারী আওলীয়াদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিংবা তাদের সমপর্যায়ের মনে করা যেতে পারে?

কেউ কেউ বলে থাকে, হাবলা ও পাগলরা প্রকাশ্যে শরী'আত বিরোধী কাজ করলে কিংবা যাহেরী শরী'আত না মানলেও গোপনে গোপনে শরী'আত মেনে চলে। এ কথা মারাত্মক ভুল। বরং সকলের উপর আবশ্যক হলো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অবস্থাতেই

ফাঁকিবাজরা কারামতের দোহাই দিয়ে শয়তানকে কাজে লাগিয়ে এসব ঘটনা দেখিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে। এমনি শয়তান তার মানব খাদেমকে বাতাসের সাথে উড়িয়ে নিয়ে বহুদূরে চলে যেতে পারে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে তাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। সুতরাং যাদের থেকে এ ধরনের অলৌকিক ও অসাধারণ কিছু প্রকাশিত হবে, তা দেখে যেন কেউ প্রতারিত না হয়; বরং কুরআন ও হাদীছের সাথে তাদের আমলকে মিলিয়ে দেখে। তাদের আমল-আক্বীদাহ যদি কুরআন ও হাদীছের সাথে মিলে, তাদেরকে আল্লাহর অলী বলে ধরা হবে। অন্যথায় তারা যাদুকর, মিথ্যুক ও ফাঁকিবাজ হিসাবে গণ্য হবে।

শরী'আত মেনে চলা। ইউনূস ইবনে আব্দুল আ'লা সুদফী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) কে বললাম, আমাদের কাছে লাইছ বিন সা'দ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, কোন মানুষকে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে দেখলেই তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হবে না এবং তার কাজ-কর্মগুলো আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে না দেখে তাকে আল্লাহর অলী মনে করবে না। ইমাম শাফেঈ তখন বললেন, লাইছ খুব সামান্যই বলেছেন, বরং তোমরা যদি কাউকে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে দেখো এবং শুণ্যে উড়তে দেখো,..... তাহলেও তার কাজ-কর্ম এবং অবস্থাগুলো আল্লাহর কিতাবের সাথে না মিলিয়ে তার দ্বারা ধোঁকা খাবে না।

কিছু লোক রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে থাকে যে, তিনি বলেছেন, "আমি জান্নাত দেখতে পেলাম। আমি দেখতে পেলাম সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই হলো হাবলা"।[৪২৮] এই হাদীছটি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় এবং তার দিকে এর সম্বোধন করাও অনুচিত।

কেননা জান্নাত ঐসব জ্ঞানী ও বিবেকবানদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, রসূলদের প্রতি এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি পথপ্রদর্শন করেছে। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে জান্নাতবাসীদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় হাবাগুবা হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। হাবাগুবা হলো ঐসব লোক, যাদের বোধশক্তি কম। তবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছন,

«اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ»

"আমি জান্নাত দেখতে পেলাম। আমি দেখতে পেলাম সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই হলো ফকীর"।[৪২৯] তিনি এটি বলেননি যে, জান্নাতে হাবাগুবাদের সংখ্যাই দেখলাম বেশী।

সুফীবাদের নামে মিথ্যুক ও ফাঁকিবাজদের আরেকটি দল রয়েছে, যারা প্রচার করে মানুষের মধ্যে এমন অলী-আওলীয়া আছে, যাদের বাহ্যিক কাজগুলো ছাড়াও আরেক প্রকার বাতেনী আমল রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, তারা প্রকাশ্যে এক ধরণের কাজ করে, কিন্তু তাদের অন্তর ও বাতেনী আমলগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই এবং তা শরীয়াতে মুহাম্মাদীর মোটেই বিরোধী নয়। এদেরকে মুলামিয়া সম্প্রদায় বলা হয়। লোকেরা তাদের বাহ্যিক কাজ-কর্মের তিরস্কার ও নিন্দা করে থাকে। এই শ্রেণীর সুফীরা বলে, আমাদের কাজ-কর্ম বাহ্যিকভাবে শরী'আতের বিপরীত হলেও গোপনে আমরা শরীয়াতে মুহাম্মাদীর অনুসরণ করি। লোকদের দৃষ্টি ও শ্রবণ থেকে আমাদের আমলগুলো গোপন রাখার জন্যই আমরা এমনটি করে থাকি এবং রিয়াকারীদের বিপরীত করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

---

[৪২৮] যঈফ: যঈফ আল জামে হা/ ১০৯৬।
[৪২৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৩২৪১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৭।

রিয়াকারী হলো তারাই, যারা মানুষকে দেখানোর জন্য ভাল আমল করে, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আমল খুবই নিকৃষ্ট। তাই সুফীদের মুলামিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকাশ্যভাবে মদ্য পান করাসহ নানা ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাদের কারো যুক্তি হলো, আমি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হই যাতে মানুষ প্রশংসার বদলে আমাকে তিরস্কার ও দোষারোপ করে। এতে আমি রিয়াকারীদের মত মানুষের প্রশংসা কুড়ানো হতে বেঁচে যাই। কিন্তু আমার বাতেনী অবস্থা সম্পূর্ণ সঠিক।

এই শ্রেণীর লোকদের বিভ্রান্তির জবাবে বলা হবে, তোমরা রিয়াকারীদের বাতিলকে আরেকটি বাতিলের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছো। বাতিলের মাধ্যমে বাতিল প্রতিহত করা অবৈধ। উপরোক্ত উভয় পন্থার মাঝখানে রয়েছে সীরাতুল মুস্তাকীম। সীরাতুল মুস্তাকীমের প্রকাশ্য দিক খুব সুন্দর। যেমন রিয়াকারীদের সৎ আমল বাহ্যিকভাবে খুব সুন্দর, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব নিকৃষ্ট। সীরাতুল মুস্তাকীমের অভ্যন্তরীণ আমলও খুব সুন্দর। যেমন মুলামীয়া সম্প্রদায়ের বাতেনী আমল খুব সুন্দর, আসলে গোপনে তারা সৎ আমল করে কি না, তাতে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু তাদের বাহ্যিক কাজ-কর্ম খুব নিকৃষ্ট। সুতরাং আল্লাহর জন্য অন্তরের ইখলাস ঠিক রেখে এবং রিয়া পরিহার করে বাহ্যিকভাবে সৎআমল করাই হলো সীরাতুল মুস্তাকীম।

অনুরূপ সুফীদের মধ্য হতে যারা সুন্দর কণ্ঠ শুনে বেহুশ হয়ে যায়, তারা বিদ'আতী ও বিভ্রান্ত। মানুষের জন্য এমন কাজ করা উচিত নয়, যা তার বোধশক্তিকে দূর করে দেয়। ছাহাবী কিংবা তাবেয়ীদের কেউ এরূপ করতেন না। সুন্দর ও সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনেও তাদের কেউ বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন না। কুরআন শুনে তাদের অন্তরের অবস্থা কেমন হতো, আল্লাহ তা'আলা কুরআনেই তা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে"। *সূরা আনফাল:২।*

আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ২৩ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾

"আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন। তিনি নাযিল করেছেন এমন একটি কিতাব, যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যার বিষয়াবলী পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এসব শুনে

সেসব লোকের লোম শিউরে উঠে, যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি বিনম্র হয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ যাকে পথহারা করেন, তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই"।

আর আলেমগণ যেসব পাগলের প্রশংসা করেছেন, তাদের প্রকৃত অবস্থা হলো, জ্ঞান-বুদ্ধি ঠিক থাকার সময় তারা কেবল ভাল আমলই করতেন। অতঃপর অসুখ-বিসুখের কারণে বা অন্য কোন কারণে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। এই শ্রেণীর পাগলদেরকে চেনার আলামত হলো, তাদের থেকে সামান্য সময়ের জন্য পাগলামী দূর হলেই তারা অন্তরের ঈমান অনুপাতে কথা বলে। এমনকি পূর্ণরূপে আকল ফিরে পেলেই তারা হিদায়াতের পথে চলে। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি চলে যাওয়ার পূর্বে যেই পাগল পাপাচারী কিংবা কাফের ছিল, পাগল হয়ে যাওয়ার কারণে তার কুফুরী ও পাপাচার দূর হয়ে যায়নি। সে আল্লাহর অলীও বনে যায়নি।

এমনি যেই মুমিন মুত্তাকী জ্ঞানহারা হয়ে পাগলে পরিণত হবে, সে কিয়ামতের দিন মুমিন মুত্তাকীদের সাথেই পুনরুত্থিত হবে। বোধশক্তি চলে যাওয়া বা অন্য কোন কারণে পাগল হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাকে আশেক বা উদভ্রান্ত-উন্মাদ যাই বলা হোক না কেন, পাগলামী তার অবস্থার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু আবশ্যক করে না। বরং তার ঈমান ও তাকওয়ার অবস্থা পূর্বের ন্যায় ঠিক থাকবে এবং পাগল হওয়ার পূর্বে তার মধ্যে যে ভাল বা মন্দ ছিল, পাগলামী শুরু হওযার পর তাতে কোন পরিবর্তন আসবে না। বোধশক্তি চলে যাওয়া তার নেকী হতে কিছুই কমায় না কিংবা তাতে কিছুই বৃদ্ধি করে না। তবে বোধশক্তি হারানোর কারণে সে নেকীর পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এমনি জ্ঞান চলে যাওয়ার পর তার দ্বারা যেসব অন্যায় কাজ হয়, জ্ঞানহীনতা তার সেই অন্যায়ের শাস্তির প্রতিবন্ধক। তবে বোধশক্তি চলে যাওয়ার পূর্বে যেসব অন্যায় তার দ্বারা হয়েছে, বোধশক্তিহীনতা তাকে মোচন করে দেয় না।

সুফীদের কতিপয় লোক সুমধুর কণ্ঠের গান শুনে যে ধরণের বকবকানি শুরু করে এবং তাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার ব্যতিক্রম যে ধরণের ভাষা উচ্চারণ করে, তা সুফীর নিজস্ব কথা নয়; বরং শয়তান তার ভাষায় কথা বলে। যেমন জিনেধরা রোগীর ভাষায় শয়তান কথা বলে থাকে। এগুলো শয়তানের কলা-কৌশল ও কারসাজি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বোধশক্তি চলে যাওয়া কোন ক্রমেই আল্লাহর বেলায়াত পাওয়ার কারণ অথবা শর্ত কিংবা তার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে না। যেমন ধারণা করে থাকে অনেক বিভ্রান্ত লোক। কোন এক গোমরাহ কবি বলেছে,

هُمْ مَعْشِرٌ حَلُّوا النِّظَامَ وَخَرَّقُوا... السِّيَاجَ فَلاَ فَرْضٌ لَدَيْهِمْ وَلا نَقْلُ

مَجَانِيْنُ إِلاَّ أَنَّ سِرٌّ جُنُنِهِمْ ... عَزِيْزٌ عَلَى أَبْوَابِهِ يَسْجُدُ الْعَقْلُ

"তারা ঐসব লোক, যারা শরী'আতের নিয়ম-কানুন ও বেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলেছে। তাদের নাই কোনো ফরয নাই কোনো নফল। তারা হলো এমন পাগল, যাদের পাগলামীর মর্যাদা এতই বেশী, যার দরজায় বিবেক-বুদ্ধি সেজদাবনত হয়।

গোমরাহ ব্যতীত এই কথা অন্য কেউ বলতে পারে না; বরং সুস্পষ্ট কাফেরই কেবল এই ধরণের কথা বলে থাকে। এগুলো গোমরাহ লোকটি যখন কতক পাগলের পক্ষ হতে কাশফ জাতিয় কিছু দেখেছে কিংবা আশ্চর্য ধরণের অস্বাভাবিক আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে, তখন এই ধারণা করেছে যে, পাগলের পাগলামীর মধ্যে এমন মর্যাদা ও নিগুঢ় তথ্য রয়েছে, যার সামনে জ্ঞানীরা ও বিবেকবানগণও সেজদাবনত হয়। অর্থাৎ তাদের এমন মর্যাদা রয়েছে, জ্ঞানীরা যার ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারে না।

পাগল থেকে কাশফ জাতিয় যা কিছু সংঘটিত হয় কিংবা তার থেকে যে অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হয়, তার কারণ হলো শয়তান তার সাথে যোগদান করতে পারে। যেমন যাদুকর ও গণকরা শয়তানের সাহায্য নিয়ে তাদের কারসাজি দেখিয়ে থাকে। উপরোক্ত গোমরাহ কবি মনে করেছে যার কাশফ হয় অথবা যে ব্যক্তি অলৌকিক কিছু দেখাতে পারে সেই আল্লাহর অলী হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই ধারণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾

"হে নাবী বলো, আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার উপর অবতীর্ণ হয়? তারা তো প্রত্যেক মিথ্যুক ও বদকারের প্রতি অবতীর্ণ হয়। আসমান থেকে শোনা কথা ওরা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং তাদের বেশীর ভাগই হয় মিথ্যাবাদী"। *(সূরা শুআরা: ২২১-২২৩)*

সুতরাং যার কাছে শয়তানেরা আগমন করে, তার দ্বারা মিথ্যা ও পাপাচার সংঘটিত হবেই। আর সুফীদের একদল লোক জুমু'আ ও জামা'আত বর্জন করে নিরালায় সাধনা ও ধ্যানে মগ্ন থাকাকেই পছন্দ করে। তারা ঐসব লোক, যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অথচ তারা মনে করতো, তারা সবকিছু সঠিক করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে সীল মেরে দিয়েছেন।

ছ্বহীহ হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِه»

"যে ব্যক্তি বিনা কারণে তিনটি জুমু'আ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে সীল মেরে দিবেন"।[৪৩০]

[৪৩০] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১০৫২, ছ্বহীহ আল জামে হা/৬১৪৩।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত সম্পর্কে অবগত হয়েও যে ব্যক্তি তার অনুসরণ থেকে সরে যাবে, সে যদি আলেম হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর ক্রোধ নাযিল হবে। আর সে যদি আলেম না হয়, তাহলে গোমরাহ হবে। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক ছ্বলাতেই আমরা যেন তার কাছে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সীরাতুল মুস্তাকীমের পথ দেখিয়ে দেন। ঐসব লোকদের পথ যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন, নাবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। কতই না উত্তম বন্ধু তারা। তিনি যেন আমাদেরকে তাদের পথ না দেখান, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাদের পথও নয়, যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শরী'আত নিয়ে এসেছেন, তা বর্জন করতে গিয়ে যারা খিযির আলাইহিস সালামের সাথে মূসার ঘটনাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে এবং ইলমে লাদুন্নীর যেসব দাবীদার অহীর অনুসরণ করার বদলে ইলমে লাদুন্নীর অনুসরণ করাকে যথেষ্ট মনে করে, তারা সঠিক পথের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে নাস্তিকে পরিণত হয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলে থাকে খিযির আলাইহিস সালাম যেমন মূসার শরী'আতের বদলে আল্লাহর পক্ষ হতে সরাসরি প্রাপ্ত ইলমের অনুসরণ করেছেন, আমিও তেমন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরী'আতের বদলে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত ইলমের অনুসরণ করি।

তার এই যুক্তি ঠিক নয়। কারণ মূসা আলাইহিস সালাম খিযির আলাইহিস সালামের প্রতি প্রেরিত ছিলেন না। আর খিযির আলাইহিস সালাম মূসার অনুসরণ করার জন্য আদিষ্টও ছিলেন না। এ জন্যই খিযির মূসাকে বলেছিলেন, আপনি কি বনী ইসরাঈলের মূসা? মূসা আলাইহিস সালাম জবাবে বলেছিলেন, হ্যাঁ। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সমস্ত জিন-ইনসানের প্রতি। মূসা এবং ঈসা আলাইহিস্ সালাম এখন জীবিত থাকলে তারা উভয়েই মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম এর অনুসারী হয়ে যেতেন। কিয়ামতের পূর্বে আখেরী যামানায় ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে নেমে এসে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের শরী'আত মেনে চলবেন এবং শরীয়াতে মুহাম্মাদী দ্বারাই ফায়ছালা করবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দাবী করবে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে তার অবস্থান ঠিক সেরকমই, যেমন ছিল খিযির আলাইহিস সালামের অবস্থান মূসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হবে। যে ব্যক্তি এ রকম মনে করবে কিংবা এই উম্মতের অন্য কারো জন্য এই পথকে জায়েয মনে করবে, তার উচিত নতুনভাবে ইসলামে প্রবেশ করা এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। কেননা আল্লাহর অলীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তো দূরের কথা, সে দীন ইসলাম থেকেই সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে গেছে এবং শয়তানের অলীতে পরিণত হয়েছে।

খিযির আলাইহিস সালামের বিষয়টিই সুফীদের মধ্যকার বিভ্রান্ত নাস্তিক মুনাফেক এবং তাদের মধ্যকার সঠিক পথের অনুসরণকারীদের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। আপনি যদি এই

কথার সত্যতা যাচাই করতে চান, তাহলে তাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দেখুন।

এমনি সুফীদের মধ্য থেকে যারা বলে থাকে যে, তাদের কতিপয় মাশায়েখরা কাবা ঘরের তাওয়াফ করার জন্য মক্কাতে যায় না; বরং কাবা ঘরই তাদের তাওয়াফ করার জন্য তাদের নিকট চলে যায়, তারা নাস্তিক ও কাফের। এই গোমরাহদের জবাবে আমরা বলবো, সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর বান্দা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম হুদায়বিয়ার দিন যখন মক্কায় প্রবেশের পথে বাধাপ্রাপ্ত হলেন, তখন কাবা ঘর সেখানে আসলো না কেন? যাতে তিনি কাবার তাওয়াফ করতে পারতেন অথবা হুদায়বিয়ায় এসে স্বয়ং কাবা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামের তাওয়াফ করতে পারত। কারণ তিনি তো ছয়বছর যাবৎ কাবাকে এক নযর দেখার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। সুফীদের এই শ্রেণীর লোকদেরকে মক্কার ঐসব কাফেরদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যাদের স্বভাব আল্লাহ তা'আলা সূরা মুদ্দাছছিরের শেষের আয়াতগুলোতে উল্লেখ করছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (٥٢) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٥٣) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٥٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾

"বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি পাঠানো হোক।[৪৩১] তা কখনো হবে না। আসল কথা হলো, এরা আখিরাতকে আদৌ ভয় করে না। কখনো না, এতো একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ ইচ্ছা করলে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে না[৪৩২]। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী"।

---

[৪৩১] অর্থাৎ প্রত্যেকেই চায় যে, তার নামে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি চিঠি আসুক, যাতে লিখা থাকবে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সুতরাং তুমি তার আনুগত্য করো।

[৪৩২] অর্থাৎ নসীহত গ্রহণ করা শুধু কোন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে না বরং নসীহত গ্রহণ করার সৌভাগ্য সে তখনই লাভ করে যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে নসীহত গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। অন্য কথায় এখানে এ সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, কোন কাজই এককভাবে বান্দার নিজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না। বরং প্রতিটি কাজ কেবল তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছার অনুকূল হয়। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি সঠিকভাবে না বুঝার কারণে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই হোঁচট খায়। অল্প কথায় বিষয়টি এভাবে বুঝানো যেতে পারে যে, প্রতিটি মানুষ যদি পৃথিবীতে এতটা শক্তির অধিকারী হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তাহলে গোটা পৃথিবীর নিয়ম শৃংখলা ভেঙ্গে পড়তো। বর্তমানে এ পৃথিবীতে যে নিয়ম শৃংখলা আছে তা এ কারণেই আছে যে, আল্লাহর ইচ্ছা সব ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ যা-ই করার ইচ্ছা করুক না কেন সে কেবল তখনই তার ইচ্ছা পুরণ করতে পারবে যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয় যে, সে তা করুক।

হিদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটাও অনুরূপ। নিজের জন্য হিদায়াত কামনা করাই মানুষের হিদায়াত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সে হিদায়াত কেবল তখনই লাভ করে যখন সে হিদায়াতের পথে চলার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তার এ আকাঙ্খা পূরণ করার ফায়ছালা করেন। একইভাবে বান্দার পক্ষ থেকে গোমরাহীর পথে চলার ইচ্ছাই তার গোমরাহীর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার মধ্যে গোমরাহীর প্রবল আকাঙ্খা দেখে আল্লাহর ইচ্ছা

(১০৯) ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا

আমরা মুসলিমদের জামা'আতবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করি এবং জামা'আত[৪৩৩] থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে গোমরাহী ও আযাবের কারণ মনে করি।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রুজ্জুকে মজবুতভাবে আকঁড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়েছো। তোমরা একটি অগ্নিকুন্ডের কিনারায় ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ নির্দশনসমূহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেন। যাতে তোমরা এর মাধ্যমে সোজা সরল পথ দেখতে পারো"। *(সূরা আলে ইমরান: ১০৩)*

যখন তাকে ভ্রান্তির পথে চলার ফায়ছালা দেন তখনই কেবল সে গোমরাহীর পথে চলতে থাকে। এভাবে সে গোমরাহীর সেসব পথে চলতে পারে যেসব পথে চলার অবকাশ আল্লাহ তাকে দেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি চোর হতে চায়, তাহলে তার ইচ্ছাই এ জন্য যথেষ্ট নয় যে সে যেখানে ইচ্ছা, যে ঘর থেকে ইচ্ছা চুরি করতে পারবে; বরং চুরি করার প্রতি তার চোরের অন্তরে প্রবল ইচ্ছা দেখেই আল্লাহ তা'আলা চোরের চুরি করার পথে বাধা সৃষ্টির ইচ্ছা করেন না।

[৪৩৩] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) جماعة (জামা'আত) এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা সত্যের অনুসরণ করে, তারাই জামা'আত। যদিও সত্যের অনুসারী মাত্র একজন হয়, তাহলেও সে একাই একটি জামা'আত তুল্য। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবীগণ যেই সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, তারাই জামা'আত বা তারাই ফির্কায়ে নাজিয়া, তারাই আহলে হাদীছ এবং চার মাযহাব ও অন্যান্য দলের লোকদের যারাই তাদের পথে চলবে, তারাই জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত হবে। সুতরাং এখানে জামা'আত বলতে আদর্শিক জামা'আত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যারা কুরআন-সুন্নাহ্ ও ছাহাবীদের পথে চলে, তারাই জামা'আত। তাদের সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়াত পাওয়ার পরও দলাদলি ও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১০৫)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ রয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের আমল সম্পর্কে জানাবেন"। *(সূরা আনআম: ১৫৯)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾

"তোমার রব ইচ্ছা করলে সমগ্র মানব জাতিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারতেন,[৪৩৪] কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে। তবে তোমার রব যাদের উপর রহমত করবেন, একমাত্র তারাই মতভেদ থেকে বাঁচবে"। *(সূরা হুদ: ১১৯)*

সুতরাং আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত লোকেরাই কেবল মতভেদ থেকে বাঁচতে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾

---

[৪৩৪] পশু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্টির মত মানুষকেও প্রকৃতিগতভাবে একটি নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে এবং সেই পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো পথে সে চলতে পারবে না, -মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এটা কখনোই চাননি। যদি এটাই তার ইচ্ছা হতো, তাহলে ঈমানের দাওয়াত, নবী-রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষ মুমিন ও মুসলিম হিসাবে সৃষ্টি হতো এবং কুফরী ও পাপাচারের কোনো সম্ভবনাই থাকতো না। কিন্তু মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন যে, তাকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রদান করা হবে। তারপর প্রত্যেক মানুষকে ভালো বা মন্দ যে কোনো একটি পথ নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়ে তার উপর চলবে। এর ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রচেষ্টা ও উপার্জনের ফল হিসাবেই জান্নাত লাভ করবে কিংবা শাস্তি ভোগ করবে। ঈমানের উপর সকল মানুষকে বাধ্য করলে মানুষ সৃষ্টির পিছনে যেই হিকমতে ইলাহী রয়েছে, তাও বাস্তবায়ন হতো না। অর্থাৎ পরীক্ষা করা সম্ভব হতো না। সেই সঙ্গে ঈমানের উপর বাধ্য করে মানুষকে ছাওয়াব দেয়ারও কোনো অর্থ হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা সকলকে এক জাতিতে পরিণত না করে, তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেই মানুষ তাওহীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হচ্ছে। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

"আল্লাহ তো যথার্থ সত্য অনুযায়ী কিতাব নাযিল করেছেন। কিন্তু যারা কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করেছে, তারা নিজেদের বিরোধের ক্ষেত্রে সত্য থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে"। *(সূরা আল বাকারা: ১৭৬)*

পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা তাদের দীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এর দ্বারা তিনি সমস্ত বিদ'আতী দল উদ্দেশ্য করেছেন। মাত্র একটি দল ব্যতীত বাকীসব দলই জাহান্নামে যাবে। আর সেই নাজাতপ্রাপ্ত দলটিই হলো জামা'আত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি কোন্ দল? জবাবে তিনি বললেন, আমি যেই হকের উপর রয়েছি এবং আমার ছাহাবীগণ যেই হকের উপর রয়েছে, যারা সেই হকের অনুসরণ করবে, তারাই হবে জান্নাতী জামা'আত।[৪৩৫] এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, মতভেদকারীরা সবাই ধ্বংস হবে। তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই কেবল ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে। এ হাদীছ থেকে আরো জানা গেল যে, উম্মতের মধ্যে মতভেদ হবেই, এ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বকরীর পালের জন্য নেকড়ে যেমন বিপদজনক, শয়তান তেমনি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিমের জন্য বিপদজনক। পাল ছেড়ে যেই বকরী পিছনে চলে যায়, নেকড়ে তাকেই নিয়ে যায়। সুতরাং তোমরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী চলা থেকে বেঁচে থাকো। তোমরা জামা'আতের সাথে থাকবে, সকলের সাথে থাকবে এবং জামা'আত ও জুমু'আয় শামিল হওয়ার জন্য মাসজিদে উপস্থিত হবে।[৪৩৬]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো,

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾

"হে নাবী! তুমি বলো, তিনি তোমাদের উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে অবশ্যই সক্ষম"। *(সূরা আনআম: ৬৫)*

তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার মহান চেহারার উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আয়াতের পরের অংশ

﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾

---

[৪৩৫] মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন, শাইখের তাহকীকসহ শারহুল আক্বীদাহ আত তাহাবীয়া, হাদীছ নং- ৪৩১।

[৪৩৬] হাদীছের সনদ দুর্বল। দেখুন, যঈফুত তারগীব হাদীছ নং- ২০৬।

অথবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং একে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদ করাবেন, নাযিল হলে তিনি বললেন, এটি আগের দু'টির চেয়ে অধিক সহজ।[৪৩৭]

এটি প্রমাণ করছে যে, তিনি অবশ্যই বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দিবেন। তবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ ভুল বুঝাবুঝির কারণেই তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম যুহরী (রহমাহুল্লাহ) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু ছাহাবী জীবিত থাকতেই ফিতনা শুরু হয়েছে। ছাহাবীগণ একমত হয়েছেন যে, তাদের যামানায় ফিতনার সময় যত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে অথবা ধন-সম্পর্দের যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিংবা যত লোক আহত হয়েছে, কুরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা ছিল বৃথা ও নিস্ফল।

ইমাম ছ্বহীহ সনদে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন, লোকেরা এই আয়াতের প্রতি আমল করা বাদ দিয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর প্রতি তারা আমল করছে না। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"মুমিনদের দুই দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও"।[৪৩৮] *(সূরা আল-হুজরাত: ৯-১০)*

মুসলিমগণ যখন দলাদলি ও মারামারিতে লিপ্ত হলো, তখন আবশ্যক ছিল যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ মোতাবেক তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। তারা যখন এই কাজটি করলো না, তখনই তাদের মধ্যে ফিতনা ও মূর্খতাসুলভ কর্ম-কান্ড সংঘটিত হলো। অতঃপর মতভেদ ও ঝগড়া ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকলো।

---

[৪৩৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭৩১৩।

[৪৩৮] এখানেও আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের দু'টি বিবাদরত দলকে মুমিন এবং তারা পরস্পর ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, মুসলিমগণ পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলেও তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না।

উম্মতের লোকেরা দীনের যেসব মূলনীতি ও শাখাগুলোতে মতভেদ করেছে, সেগুলোকে যদি আল্লাহ এবং তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে না দেয়া হয়, তাহলে তাতে কোন্‌টি সত্য তা প্রকাশিত হবে না। বরং মতভেদকারীগণ অস্পষ্টতার মধ্যেই থেকে যাবে। মতভেদকারীদের উপর যদি আল্লাহর রহমত হয়, তাহলে তারা পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং তাদের একজন অন্যজনের উপর যুলুম করবে না। যেমন ছিল উমার ও উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর খেলাফতকালের সময় ছাহাবীদের অবস্থা। তারা কতিপয় ইজতেহাদী মাসআলায় পরস্পর মতভেদ করতেন। এতে তাদের একজন অন্যজনের মতকে সমর্থন করতেন এবং তাদের একজন অন্যজনের উপর যুলুম করতেন না। তাদের প্রতি যদি আল্লাহর পক্ষ হতে রহম না করা হতো, তাহলে তাদের মধ্যে নিন্দনীয় মতভেদ সৃষ্টি হতো এবং তাদের একজন অন্যজনের উপর সীমালংঘন করতেন। এই সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি কথার মাধ্যমে হতো, যেমন তাদের কেউ অন্যজনকে কাফের ও ফাসেক বলতেন অথবা কর্মের মাধ্যমে, যেমন তাদের একজন অন্যজনকে বন্দী করতেন, প্রহার করতেন এবং হত্যা করতেন। যারা খালকে কুরআনের মাসআলায় লোকদেরকে ফিতনায় ফেলেছিল, তারা এই প্রকার লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল। তারা নিজেদের পক্ষ হতে একটি বিদ'আত তৈরী করেছিল। অতঃপর যারা সেই মাসআলায় তাদের বিরোধীতা করেছে, তাদেরকে কাফের বলেছে, তাদের অধিকার হরণ করেছে এবং শারীরিক শাস্তিও দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেই দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তা থেকে তারা যেসব মাসআলার মধ্যে মতভেদ করেছে, মতভেদকারীগণ তাতে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। এক শ্রেণীর লোক বিভেদপূর্ণ বিষয়ে ইনসাফ করতে সক্ষম হয়েছে এবং অন্য শ্রেণীর লোক যালেমে পরিণত হয়েছে। যে ব্যক্তি নাবী-রসূলদের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে, সে অন্যের উপর যুলুম করে না। যালেম তো ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের উপর চড়াও হয়। যালেমদের অধিকাংশই জেনেবুঝে যুলুম করে থাকে। তারা ভালো করেই জানে যে, তারা যুলুম করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

"ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর তারা বিদ্বেষ বশত পরস্পর মতবিরোধ করেছিল। আর যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তার জেনে রাখা উচিত যে নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী"। *(সূরা আলে ইমরান: ১৯)*

তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে যেই ইলম এসেছে, সে অনুযায়ী তারা যদি ইনসাফ করতো এবং তারা পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করতো, তাহলেই তারা দলাদলি ও মতভেদ করা হতে বেঁচে যেতো। যেমন করে থাকে মাযহাবের ইমামদের ঐসব মুকাল্লিদ, যারা

নিজেদের ব্যাপারে জানতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোতে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূলের সঠিক হুকুম জানতে অক্ষম। অতঃপর তারা নিজেদের ইমামগণকে রসূলের নায়েব হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। তারা বলেছে, আমরা এর বেশী আর কিছু করতে সক্ষম নই। সুতরাং মাযহাবপন্থী এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ, তারা অন্যের উপর যুলুম করে না এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যের উপর চড়াও হয় না। তাদের কেউ এই দাবি করে না যে, তার ইমামের কথাই সঠিক এবং ভিন্ন মতের লোকের মতকে সে নিন্দা করে না। অথচ সে তা করলেও তার কথা যুক্তিসংগত হতো।

অতঃপর জেনে রাখা দরকার যে, মতভেদ মূলত দু'প্রকার। (১) اختلاف تنوع বা একই বিষয়ে একাধিক মত সমর্থনযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ এবং (২) اختلاف تضاد বা পরস্পর সাংঘর্ষিক মতভেদ। একই বিষয়ে একাধিক মত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ কয়েকভাবে হতে পারে। এমন হতে পারে যে, দু'টি কথা বা কাজের প্রত্যেকটিই সত্য এবং শরী'আত সম্মত। যেমন ছাহাবীদের ঐসব কিরাআত, যাতে তারা পরস্পর মতভেদ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেছেন, তোমরা উভয়েই সঠিকভাবে পড়েছো। এর অনুরূপ হলো বিভিন্ন প্রকার শব্দ বা পদ্ধতিতে আযান ও ইকামত দেয়া, ছ্বলাতের শুরুতে বিভিন্ন প্রকার ছানা পাঠ করা, সাহু সিজদার স্থানগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত, তাশাহুদে বসার ধরণ ও তার বাক্যসমূহ, ছ্বলাতুল খাওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, দুই ঈদের ছ্বলাতে তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ এবং অনুরূপ আরো অনেক বিষয়ে এই প্রকার মতভেদের মধ্যে পড়তে পারে। যার সবগুলোই শরী'আত সম্মত। যদি তার কিছু কিছু পদ্ধতি ও প্রকার অন্যান্য প্রকার ও পদ্ধতির উপর প্রাধান্যযোগ্য কিংবা উত্তম।

এই ধরণের মতভেদ গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এই উম্মতের অনেক লোকের মধ্যে এমন মতবিরোধ দেখা যায় যে, যাদের একাধিক দল জোড় শব্দে কিংবা বেজোড় শব্দে একামত দেয়া অথবা অনুরূপ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। এটি সম্পূর্ণ নিষেধ। আপনি আরো দেখতে পাবেন যে, এগুলোর কোনো একটি প্রকারের প্রতি তাদের অন্তরে অতিরিক্ত আসক্তি ও টান রয়েছে এবং অন্যটি প্রত্যাখ্যান ও তা থেকে লোকদেরকে নিষেধ করার অভ্যাস রয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা থেকে নিষেধ করেছেন, এর মাধ্যমে তারা তাতেই প্রবেশ করেছে।

যে শ্রেণীর মতভেদ গ্রহণ করা যেতে পারে, তার মধ্যে এমন বিষয়ও রয়েছে, হতে পারে কোনো মাস'আলায় দু'টি মতের অর্থ মূলত একই। শুধু মত দু'টির ভাষা ও বাক্য ভিন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নেই। যেমন শরী'আতের শাস্তি ও দণ্ডবিধির শব্দসমূহ, প্রমাণাদির উপস্থাপনা, শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়কে একাধিক নামে পেশ করা ইত্যাদির ব্যাপারে অনেক লোকই মতভেদ করে থাকে। অতঃপর মূর্খতা অথবা যুলুম দু'টি মতের একটিকে

প্রশংসা এবং অন্যটিকে নিন্দা করার দিকে নিয়ে যায়। পরিণামে মতভেদটি এ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর আক্রমণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

দু'টি মতের একটি অপরটির পরিপন্থী হওয়ার কারণে যেই মতভেদ তৈরী হয়, তাকে اختلاف تضاد বা পরস্পর সাংঘর্ষিক মতভেদ বলা হয়। অধিকাংশ আলেমের নিকট এটি দীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে হতে পারে এবং শাখা মাসআলাসমূহের মধ্যেও হতে পারে। তারা বলেছেন, এ ক্ষেত্রে দু'টি কথা থেকে সঠিক হবে মাত্র একটি। এই প্রকার মতভেদের পরিণাম হয় কঠিনতর। কেননা এতে দু'টি কথা পরস্পর বিরোধী হয়। আমরা এই প্রকার মতভেদে লিপ্ত অনেক মানুষকে দেখতে পাই বিবাদমান একদলের প্রতিপক্ষের সাথে যেই বাতিল মতটি রয়েছে, তার কিছু অংশ সত্য অথবা তাদের কাছে এমন দলীল রয়েছে, যা তাদের কথার অংশ বিশেষ সত্য হওয়ার দাবি জানায়। এই বাতিল মতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে, তার সাথে সত্যের যে অংশ রয়েছে, তাও প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর ফলে প্রতিবাদী দলটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুলের মধ্যে থেকে যায়। যেমন প্রথম দলটি মূলতই ভুলের মধ্যেই ছিল। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের দ্বারা প্রায়ই এমনটি হয়ে থাকে।

আর বিদ'আতীদের ব্যাপারটি তো খুবই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তারা পরস্পর মতভেদের সময় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে কোনো পরোয়া করে না। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত করেন এবং যার অন্তরে নূর প্রদান করেন, মতভেদের সময় তার সামনে সত্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে মতভেদ করা এবং অনুরূপ অন্যান্য যেসব বিষয় হতে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকার উপকারীতাও উপলব্ধি করতে পারে। পরিশুদ্ধ অন্তর এমনিতেই মতভেদ ও বিবাদ করাকে অপছন্দ করে। কিন্তু তারপরও যখন তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নূর প্রদান করা হয়, তখন আলোর সাথে আলো একত্রিত হওয়ার কারণে মতভেদের সময় মূল সত্যটি বেছে নিতে সক্ষম হয়।

প্রথম প্রকার মতভেদ অর্থাৎ মতভেদপূর্ণ যেসব মাস'আলার একই বিষয়ে একাধিক মত ও পদ্ধতি সঠিক হতে পারে, তাতে এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর যুলুম করলে যুলুমকারীকে তিরস্কার ও নিন্দা করা হবে। কেননা কুরআন অনুরূপ ক্ষেত্রে মতভেদকারী দুই দলের পরস্পরের মধ্যে যুলুম ও সীমালংঘন না হলে প্রত্যেকেরই প্রশংসা করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾

"খেজুরের যেসব গাছ তোমরা কেটেছো কিংবা যেসব গাছকে তার মূলের উপর আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তা সবই ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে। আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছিলেন যাতে তিনি ফাসেকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন"। *(সূরা আল-হাশর: ৫)*

কেননা ছাহাবীগণ বনী নাযীর গোত্রের খেজুরের বাগানের বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার ব্যাপারে মতভেদ করেছিলেন। তাদের একদল বৃক্ষগুলো কেটে যাচ্ছিলেন এবং অন্যদল সেগুলো রেখে দিচ্ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালামের ফায়ছালার ব্যাপারে বলেন,

﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾

"আর আমি দাউদ ও সুলাইমানকে নিয়ামত দান করেছিলাম। স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তারা উভয়ই একটি শস্য ক্ষেতের ব্যাপারে ফায়ছালা করছিল, যেখানে রাতের বেলা ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য লোকদের ছাগল এবং আমি নিজেই দেখছিলাম তাদের বিচার। সে সময় আমি সুলাইমানকে সঠিক ফায়ছালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, অথচ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আমি উভয়কেই দান করেছিলাম"। *(সূরা আল-আম্বীয়া: ৭৮-৭৯)*

সুলায়মানকে বিশেষভাবে বুঝানোর কথা বলা হয়েছে আর তাদের উভয়ের ইলম ও হিকমতের প্রশংসা করা হয়েছে। এমনি বনী কুরায়যার দিন যারা আসরের ছ্বলাত নির্ধারিত সময়ে পড়ে নিয়েছিলেন এবং যারা বনী কুরায়যায় পৌঁছানো পর্যন্ত দেরী করেছিলেন, তাদের উভয় দলের কাজকেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমর্থন করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীছেও একই কথা এসেছে। তিনি বলেন,

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

"বিচারক যদি ইজতিহাদ করে সঠিক ফায়ছালা দেয়, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে, আর যদি ইজতিহাদ করে ফায়ছালা দিতে গিয়ে ভুল করে, তাহলে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে"।[৪৩৯]

দ্বিতীয় প্রকার মতভেদ হলো, এমন মতভেদ, যাতে বিবাদমান দু'দলের মধ্য হতে একদলের প্রশংসা করা হয় এবং অন্য দলকে নিন্দা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার কিতাবে এই প্রকার মতভেদের বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

"আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে রাসূলদের পরবর্তীরা তাদের নিকট পরিষ্কার নিদর্শনসমূহ আসার পর কখনো পরস্পর লড়াই করত না। কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তাদের কেউ ঈমান এনেছে, আর কেউ কাফের হয়েছে। আল্লাহ

[৪৩৯] ছ্বহীহ বুখারী, হাদীছ নং- ৭৩৫২।

যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পরে লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন”।[৪৪০] *(সূরা আল-বাকারা: ২৫৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

“এ দুটি পক্ষের মধ্যে রয়েছে এদের রবের ব্যাপারে বিরোধ। এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী হয়ে গেছে, তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, যার ফলে শুধু তাদের চামড়াই নয়, পেটের ভেতরের অংশও গলে যাবে। আর তাদের শাস্তি দেবার জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবার চেষ্টা করবে তখনই আবার তার মধ্যে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে। বলা হবে, এবার দহন জ্বালার স্বাদ গ্রহণ করো”। *(সূরা আল-হজ্জ: ১৯-২২)*

এই উম্মতের মধ্যকার যেসব মতভেদ তাদেরকে বিদ'আত ও প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকে নিয়ে যায়, তা মূলত প্রথম প্রকারের মতভেদের অন্তর্ভুক্ত। এমনি এই মতভেদ তাদের মধ্যে প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়েছে। পরস্পরের ধন-সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করা হালাল মনে করার কারণ মনে করা হয়েছে এবং পারস্পরিক শত্রুতা ও ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করেছে। কেননা এই প্রকার মতভেদের ক্ষেত্রে বিরোধরত দু'টি দলের একটির সাথে যেই সত্য রয়েছে, অপর দল তা স্বীকার করে না এবং তার প্রতি ইনসাফও করে না। শুধু তাই নয়; বরং তার কাছে সত্যের যেই অংশ রয়েছে, তার সাথে আরো বাতিল যোগ করে নেয়। প্রতিপক্ষও একই দোষে আক্রান্ত। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা যুলুম ও সীমালংঘনকেই মতভেদের মূল কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

---

[৪৪০] অর্থাৎ রাসূলদের মাধ্যমে দীন ও তাওহীদের জ্ঞান লাভ করার পর মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং মতবিরোধ থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক হানাহানি ও রক্তপাত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এর কারণ এই ছিল না যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ অক্ষম ছিলেন এবং এই মতবিরোধ ও হানাহানি থেকে মানুষকে বিরত রাখার শক্তি তার ছিলনা। তিনি চাইলে নবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাধ্য কারো থাকতোনা। কেউ কুফরী ও বিদ্রোহের পথে চলতে পারতো না। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিপর্যয় ঘটানোর ক্ষমতা কারো থাকতো না। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্প ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটি বিশেষ কর্মনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করা তার ইচ্ছাই ছিল না। তিনি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই তাকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও বাছাই করার স্বাধীনতা দান করেছেন। নাবীদেরকে তিনি মানুষের উপর দারোগা বানিয়ে পাঠাননি। কাজেই জোর-জবরদস্তি করে তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তারা করেননি। বরং নাবীদেরকে তিনি পাঠিয়েছেন যুক্তি-প্রমাণের সাহায্য মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানানোর জন্য। কাজেই যত বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, তার পিছনে এই একটি মাত্র কারণ রয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন আর ইচ্ছার অপব্যবহার করে মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। এই মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোর কারণ এই ছিল না যে, আল্লাহ তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চালানোর ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু (নাউযুবিল্লাহ) এ ব্যাপারে সফলকাম হতে পারেননি। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারার ২১৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

"সব মানুষ একই জাতি (তাওহীদের অনুসারী) ছিল। অতঃপর যখন তাদের মধ্যে মতভেদ শুরু হলো তখন আল্লাহ সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে নাবীদেরকে পাঠালেন। আর তাদের সাথে কিতাব নাযিল করেন সত্যভাবে যাতে তিনি মানুষের মধ্যে ঐ সত্য সম্পর্কে ফায়ছালা দেন, যে সম্পর্কে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। সত্য সম্পর্কে মতভেদ তারাই করেছিল, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল। সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর কেবল পারস্পরিক যুলুম ও বাড়াবাড়ির কারণেই তারা মতবিরোধ করেছিল। অতঃপর যারা নাবীদের উপর ঈমান এনেছে, তাদেরকে আল্লাহ স্ব-ইচ্ছায় নিজের করুনায় সেই সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতভেদ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেন"।

উক্ত আয়াতে البغي শব্দের অর্থ হলো সীমা অতিক্রম করা। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা অতীত জাতিসমূহের সীমালংঘনের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যাতে করে এই উম্মতের লোকেরা তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, তা প্রায় কুরআনের বর্ণনার কাছাকাছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

"আমি তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না বলি, ততক্ষণ তোমরা চুপ থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, বেশী বেশী প্রশ্ন করার কারণে এবং তাদের নাবীদের সাথে মতভেদ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যখন কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করি, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকো। আর যখন তোমাদেরকে কোনো আদেশ করি, তখন সাধ্য অনুযায়ী তা মেনে চলো"।[৪৪১]

তাদেরকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়নি, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

[৪৪১] ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৪১২।

পূর্বের জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণ হলো অধিক প্রশ্ন করা এবং পাপাচার ও অবাধ্যতার মাধ্যমে নাবী-রসূলদের সাথে মতভেদ করা।

যারা আল্লাহর কিতাবের স্বীকৃতি প্রদান করেছে, তারা কিতাবের ব্যাপারে দু'ধরণের মতভেদ করেছে। কুরআন নাযিল করা বা না করার ব্যাপারে এক প্রকার মতভেদ করা হয়েছে এবং আরেক প্রকার মতভেদ করা হয়েছে কুরআনের ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে। উভয় শ্রেণীর মতভেদের মাধ্যমে কুরআনের এক অংশকে বাদ দিয়ে অন্য অংশের প্রতি বিশ্বাস করা হয়েছে।

উপরোক্ত দু'দলের একদল বলেছে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও ইচ্ছার মাধ্যমেই এই কুরআন তৈরী হয়েছে। তিনি এটাকে অন্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, তার সত্তার সাথে তা মিলিত ও যুক্ত ছিল না। আরেক দল বলেছে, কুরআন আল্লাহর সিফাত। এটা আল্লাহর সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত এবং এটা মাখলুক নয়। তবে তিনি স্বীয় ইচ্ছা ও ক্ষমতার মাধ্যমে কথা বলেন না। উভয় দলই তাদের কথার মধ্যে হক ও বাতিলকে একত্র করেছে। তাদের এক দল সত্যের অংশ বিশেষের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং অন্যদলের কাছে সত্যের যেই অংশ রয়েছে, তাকে মিথ্যা বলেছে।

আর কুরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে যে মতভেদ তার এক অংশ বাদ দিয়ে অন্য অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন করাকে আবশ্যক করে, তার উদাহরণ অনেক। আমর বিন শুআইব তার পিতা, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীদের কাছে বের হয়ে আসলেন। তখন তারা তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করছিল। এক ব্যক্তি একটি আয়াত দিয়ে দলীল দিচ্ছিল, আরেকজন অন্য আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করছিল। এ দৃশ্য দেখে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা ক্রোধে এত লাল হয়ে গিয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল, তার চেহারা মোবারকে ডালিমের দানা ফুড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তোমরা কি এই জন্য আদিষ্ট হয়েছো? তোমাদেরকে কি এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে? তোমাদেরকে কি কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য আদেশ করা হয়েছে? তোমাদেরকে যে বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে, তার প্রতি গুরুত্ব দাও এবং তার অনুসরণ করো। আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকো"।[৪৪২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে লোক সকল! এই কারণেই পূর্বের জাতিসমূহ পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা তাদের নাবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে এবং তাদের প্রতি যেই কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, তার একাংশকে অন্য অংশের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করার কারণেই তারা ধ্বংস হয়েছে। কুরআন এই জন্য নাযিল হয়নি যে, তোমরা এর এক অংশকে অন্য অংশের বিরোধী মনে করবে। বরং এভাবে নাযিল হয়েছে যে, তার এক অংশ অন্য অংশকে সত্যায়ন করে। তোমরা কুরআন থেকে যা

[৪৪২] হাদীছটির তথ্যসূত্র ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুঝতে সক্ষম হও, তা অনুযায়ী আমল করো। আর যা তোমাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করো।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতীতের জাতিসমূহ যতক্ষণ নাবী-রসূলদের বিরোধীতা করেনি, ততক্ষণ তারা অভিশপ্ত হয়নি। আর কুরআন নিয়ে অন্যায় তর্ক-বিতর্ক করা কুফুরী। এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে ইহা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম তার ছ্বহীহগ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন রাবাহ থেকে হাদীছের অংশটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, একদা আমি দুপুর বেলা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গমণ করলাম। তখন তিনি দুইজন লোকের আওয়াজ শুনলেন। তারা কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ ও ঝগড়া করছিল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। তার চেহারা মোবারকে ক্রোধের আলামত পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করার কারণেই তারা ধ্বংস হয়েছে।[৪৪৩]

সমস্ত বিদ'আতী কুরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। তারা কুরআনের একাংশ বাদ দিয়ে অন্য অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। আয়াতের যেই অংশ তাদের মনমত হয়, তারা তা স্বীকার করে। আর যা তাদের মতের বিরোধী হয়, তার ব্যাপারে তারা একাধিক তারীকা অবলম্বন করে থাকে। কখনো তারা তার এমন তাবীল করে, যাতে তারা কুরআনের শব্দকে তার নিজস্ব স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে। আবার কখনো বলে যে, এটি মুতাশাবেহ। এর অর্থ কেউ জানে না। এর মাধ্যমে তারা কুরআনের ঐ অর্থকে অস্বীকার করে থাকে, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। এটি কুরআনের অর্থের প্রতি কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। কেননা অর্থ বাদ দিয়ে শুধু কুরআনের শব্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের ঈমান আনয়নের মতই।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি তাদের উপমা হলো সেই গাধার মত, যে বই-পুস্তকের বোঝা বহন করে। এর চেয়েও নিকৃষ্ট উপমা সেসব লোকের যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ এ রকম যালেমদের হিদায়াত দান করেন না"। *(সূরা আল-জুমআ: ৫)*

[৪৪৩] ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৬৯৪৭।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

"এদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি দল হচ্ছে নিরক্ষরদের। তাদের কিতাবের জ্ঞান নেই, নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাংখাগুলো নিয়ে বসে আছে এবং নিছক অনুমান ও ধারণার উপর নির্ভর করে চলছে"। *(সূরা আল-বাকারা: ৭৮)*

অর্থাৎ অর্থ না বুঝেই শুধু তিলাওয়াত করে থাকে। তারা ঐসব মুমিনদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না, যারা কুরআনের অর্থ বুঝে। অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করে। তাদের কাছে কুরআনের কিছু আয়াত অস্পষ্ট হলে তার ইলম আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিয়েছেন যে, কুরআন থেকে তোমরা যা বুঝতে সক্ষম হও, তা মেনে চলো। আর যা তোমরা বুঝতে পারো না, সে সম্পর্কে যে অবগত, তার দিকে তা ফিরিয়ে দাও।[৪৪৪] সুতরাং তারা এ ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ বাস্তবায়ন করে।

(১১০) আল্লামা ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَ التَّقْصِيرِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ

নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল আল্লাহর দীন এক ও অভিন্ন। তা হলো ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম"। *(সূরা আলে ইমরান: ১৯)* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ "এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম"। *(সূরা আল-মায়েদা: ৩)*

দীনের বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের অবস্থান হলো বাড়াবাড়ি ও বিয়োজনের মাঝখানে, আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তার অবস্থান তাশবীহ ও তা'তীলের মাঝখানে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলীকে সৃষ্টির কোনো নাম ও সিফাতের সাথে তুলনা করা যাবে না কিংবা তা থেকে

[৪৪৪] মুসনাদে আহমাদ। হাদীছ নং- ৪৬২। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

কোনো কিছুই অস্বীকার বা বাতিল করা যাবে না। তাক্বদীর সাব্যস্ত করা কিংবা তা অস্বীকার করা এবং আল্লাহর রহমতের উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা কিংবা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যম পন্থার নীতি অবলম্বন করেছে।

.....

ব্যাখ্যা: আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছ্বহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের তথা নাবীদের দীন মাত্র একটি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো দীন অবলম্বন করতে চায় তার পক্ষ হতে কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। *(সূরা আলে ইমরান: ৮৫)*

আল্লাহ তা'আলার এই কথা প্রত্যেক যামানাতেই প্রযোজ্য। তবে সকল নাবীর দীনের মূলনীতি এক হলেও শরী'আত বিভিন্ন হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরী'আত ও একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছি"। *(সূরা-মায়িদাহ: ৪৮)*

সুতরাং দীন ইসলাম সেটাই, যা আল্লাহ তা'আলা নাবী-রাসূলদের মাধ্যমে তার বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এই দীনের মূল ও শাখা-প্রশাখাগুলো নাবী-রসূলদের মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। দীন ইসলাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিবেকবান ছোট-বড়, আরব-অনারব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই অতি অল্প সময়ে এর মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব। তবে তার চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে এ থেকে বের হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। তা হতে পারে ইসলামের কোনো একটি কথাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কিংবা ইসলামের কোনো বিষয়কে মিথ্যা মনে করা অথবা ইসলামের কোনো বিষয়ের বিরোধিতা কিংবা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা কিংবা আল্লাহ তা'আলার কথার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করা কিংবা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তাতে সন্দেহ পোষণ করা অথবা উপরোক্ত অর্থে অনুরূপ অন্যান্য বিষয় অস্বীকার করার মাধ্যমে।

আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের বিবরণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইসলাম খুবই সুস্পষ্ট এবং ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত সহজ-সরল। একজন লোক খুব সহজেই অতি অল্প সময়ে তা শিখতে পারে এবং এ শিক্ষা থেকে বের হয়ে যাওয়াও খুব সহজ। ইসলাম সম্পর্কে লোকদেরকে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থা অনুপাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন শব্দ ও পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। শিক্ষার্থী যদি দূরদেশ থেকে

আগমন করতো, যেমন যিমাম বিন ছা'লাবা, আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধি প্রমুখের কথাই বলা যেতে পারে। তাদেরকে তিনি দীনের এমনসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তিনি ভালো করেই জানতেন যে, তার দীন দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং তিনি তাদের কাছে এমনসব দাঈ প্রেরণ করবেন, যারা তাদেরকে দীনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় শিক্ষা দিবেন।

আর যাদের ঘরবাড়ি নিকটে ছিল, তাদের পক্ষে সবসময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসা সম্ভব ছিল। সেই হিসাবে তাদের পক্ষে পর্যায়ক্রমে দীনের বিষয়াদি শিক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল। অথবা যার ব্যাপারে তিনি জানতেন যে, সে দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা নিয়েছে, তাকে তার প্রশ্ন, অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা দিতেন। প্রশ্নকারীর অবস্থা থেকে তিনি অনুমান করতে পারতেন যে, দীনি বিষয়ে তার কতটুকু পারদর্শিতা রয়েছে। যেমন তিনি কাউকে বলেছেন, «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ» তুমি বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম। অতঃপর তুমি এই কথার উপর অনঢ় থাকো।[৪৪৫]

তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই এমন দীন তৈরী করলো, তার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যে, তার দীনের মূলনীতিগুলো মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য কোনো নাবী-রাসূলের দীন থেকে গৃহিত নয়। সুতরাং তার দীনের মূলনীতিগুলো বাতিল। বাতিলের উপর ভিত্তিশীল বিষয়ও বাতিল। যেমন সত্যের দাবিও সত্য এবং সঠিক হয়।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, দীনের বিভিন্ন বিষয়ে অতিরঞ্জিত ও সংকোচন করার মাঝখানে সঠিক ইসলামের অবস্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ [الْمَائِدَةِ: ٧٧]

বল, হে কিতাবীরা, সত্য ছাড়া তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না এবং এমন সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ বিচ্যুত হয়েছে। *(সূরা আল-মায়েদা: ৭৭)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

[৪৪৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৭।

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন সেগুলো হারাম করে নিয়ো না। আর সীমালংঘন করো না, সীমালংঘনকরীদেরকে আল্লাহ মোটেই ভালোবাসে না। আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দিয়েছেন তা থেকে পানাহার করো এবং সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো যার উপর তোমরা ঈমান এনেছো"। *(সূরা আল-মায়েদা: ৮৭-৮৮)*

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَآكُلُ اللَّحْمَ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

"নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদের মধ্য হতে কিছু লোক তার গোপন আমল সম্পর্কে জানার জন্য তার স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করলো। তাদেরকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হলে, তাদের কেউ বলল, আমি গোশত খাওয়া পরিহার করবো, কেউ বললো, আমি স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকবো। আরেকজন বলল, আমি সারা জীবন রাতের বেলা ছ্বলাত আদায় করবো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনার পর বললেন, তাদের কী হলো? তাদের কেউ এরূপ এরূপ বলে থাকে। আমি তো ছ্বিয়াম রাখি, ছ্বিয়াম রাখা থেকে বিরত থাকি, ছ্বলাত পড়ি নিদ্রা যাই, গোশত খাই এবং স্ত্রীদের সাথেও মিলিত হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৪৬]

বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো এবং তা জানতে পেরে তারা কম মনে করলো।

সূরা মায়েদার ৮৭ নং আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইবনে জুরাইজ ইকরিমা হতে বর্ণনা করেন যে, উছমান বিন মাযউন, আলী বিন আবু তালেব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মিকদাদ বিন আসওয়াদ এবং আবু হুরায়রার গোলাম সালেম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস বর্জন করে ঘরে বসলেন, স্ত্রীদের থেকে দূরে সরে আসলেন, পশমের পোশাক পড়লেন এবং পবিত্র খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ নিজেদের উপর হারাম করে নিলেন। তবে বনী ইসরাঈলের সংসার ত্যাগী লোকেরা যেমন সামান্য খাদ্য গ্রহণ করে এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করে থাকে, তারা কেবল সেরকমই করতে চাইলেন। সে সঙ্গে তারা

[৪৪৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০১। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি মূলত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত নয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এটা বর্ণিত হয়েছে।

অন্ডকোষ কেটে পুরুষত্বহীন হয়ে যাওয়া এবং সারা রাত নফল ছ্বলাত পড়া ও সারা জীবন নফল ছ্বিয়াম রাখার ইচ্ছা পোষণ করলো। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন, সেগুলো হারাম করে নিয়ো না। আর সীমালংঘন করো না। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ মোটেই ভালোবাসেন না।

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেছেন যে, তোমরা মুসলিমদের সুন্নাতের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে চলো না। তারা যখন স্ত্রী সহবাস ও হালাল খাদ্য-পানীয় নিজেদের উপর হারাম করলো এবং বিরামহীনভাবে সারা জীবন ছ্বিয়াম রাখা, নিদ্রা বর্জন করে সারা রাত ছ্বলাত পড়া ও পুরুষত্বহীন হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো, তখন উপরোক্ত আয়াতে তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে যখন আয়াতটি নাযিল হলো, তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তাদেরকে ডেকে তিনি বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের নফসের হক রয়েছে এবং তোমাদের উপর তোমাদের চোখের হক রয়েছে। তোমরা মাঝে মধ্যে ছ্বিয়াম রাখো ও তা থেকে বিরত থাকো, রাতের একাংশে ছ্বলাত পড়ো এবং তার অপরাংশে নিদ্রা যাও। জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে বর্জন করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। তখন তারা বলল, হে আল্লাহ! আমরা মেনে নিলাম এবং তুমি যা নাযিল করেছো, তা অনুসরণ করলাম।[৪৪৭]

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তার অবস্থান হলো তাশবীহ ও তা'তীলের মাঝখানে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীকে সৃষ্টির কোনো নাম ও বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করা যাবে না কিংবা তা থেকে কোনো কিছুই অস্বীকার বা বাতিল করা যাবে না।

পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে যেসব গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র সত্তার জন্য যেই গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, সৃষ্টির সাথে তুলনা করা ব্যতীত তা দ্বারা তাকে গুণান্বিত করা আবশ্যক। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহর শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মতই, তার দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টির মতই। অনুরূপ অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলী থেকে কোনো কিছুই অস্বীকার কিংবা বাতিল করা ব্যতীতই তা সাব্যস্ত করতে হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে যেসব গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন এবং সকল মানুষের মধ্যে তার সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার জন্য যে বিশেষণ নির্ধারণ করেছেন, তার কোনো কিছুই অস্বীকার করা যাবে না। কারণ এটাই হলো তা'তীল

[৪৪৭] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি এই বর্ণনায় দুর্বল। দেখুন, শাইখের তাহকীকসহ শারহুল আক্বীদাহ আত তাহাবীয়া, হাদীছ নং- ৫৮৭।

বা আল্লাহ তা'আলাকে তার সিফাত থেকে খালি করে দেয়ার নামান্তর। ইতিপূর্বে এই অর্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে শাইখ এই কথার অনুরূপ বলেছেন, যে ব্যক্তি নাকচ ও তাশবীহ অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করা ও তার সিফাতকে সৃষ্টির সিফাতের সাথে তুলনা করার সমস্যা থেকে বাঁচতে পারবে না, সে ভুল করবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ত্রুটিযুক্ত বৈশিষ্ট্য ও সিফাত থেকে পবিত্র করার ব্যাপারে সঠিক সিদ্বান্তে পৌঁছাতে অক্ষম হবে। আল্লাহর জন্য সুউচ্চ সিফাত সাব্যস্ত করা এবং তাকে মাখলুকের সাথে তুলনা না করার মূলনীতিটি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। সূরা শুরার ১১ নং আয়াত।

আল্লাহর বাণী, তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই -এর মাধ্যমে মুশাব্বেহা তথা আল্লাহর সিফাতকে বান্দার সিফাতের সাথে তুলনাকারীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা -এর মাধ্যমে মুআত্তেলা তথা আল্লাহর সিফাতকে বাতিলকারীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

ইমাম ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাক্বদীর সাব্যস্ত করা কিংবা তা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে দীন ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে, -এই অংশের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ইসলামের কথা হলো, বান্দা তার কথা ও কার্যকলাপ সমূহে বাধ্যগত নয়। এমনকি তার কাজগুলো জ্বরে আক্রান্ত রোগীর ঐ কম্পনের মতও নয়, যাতে রোগীর কোনো ইচ্ছা থাকে না এবং তা ঐ গাছের নড়াচড়াও মতও নয়, যাকে বাতাস বা অন্যরা নড়ায়, যাতে গাছের কোনো ভূমিকা থাকে না। অপর পক্ষে বান্দাদের কাজগুলো তাদের নিজস্ব সৃষ্টিও নয়। বরং তা বান্দার কর্ম ও উপার্জন। আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন।

ইমাম ত্বহাবীর উক্তি, আল্লাহর রহমতের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করা কিংবা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়ার ক্ষেত্রেও ইসলাম মধ্যপন্থী নীতি অবলম্বন করেছে। এ অংশের ব্যাখ্যাও ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই যে, বান্দার উপর আবশ্যক হলো, সে তার রবের আযাবের ভয় করবে এবং একই সঙ্গে তার রহমতের আশা রাখবে। মোট কথা আল্লাহ তা'আলা এবং আখিরাতের ঘরের উদ্দেশ্যে চলার পথে আল্লাহর আযাবের ভয় করা এবং তার রহমতের আশা রাখা বান্দার দু'বাহুর মতই।

(১১১) আল্লামা ত্বহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ، مِثْلِ الْمُشَبِّهَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْجَبْرِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَغَيْرِهِا، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ والْجَمَاعَةَ، وَحَالَفُوا الضَّلَالَةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَاءُ وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ

এগুলোই হচ্ছে আমাদের যাহেরী (প্রকাশ্য) এবং বাতেনী (অপ্রকাশ্য)[৪৪৮] দীন ও আক্বীদাহ। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলোকেই দীন হিসাবে গ্রহণ করি। উপরে যা আমরা উল্লেখ করলাম এবং বর্ণনা করলাম, যারাই তার কোনো কিছুর বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল আল্লাহর দিকেই ফিরে যাই। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং ঈমানের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করেন। আমরা আরো প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত, প্রবৃত্তির অনুসরণ, নানা রকম মতবাদ এবং ঐ সব মুশাব্বিহা, মুতাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কাদারিয়া এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য বাতিল মতবাদসমূহ থেকে, যারা সুন্নাত ও জামা'আতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং বিভ্রান্তদের পক্ষ নিয়েছে। আমরা তাদের থেকে আমাদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি। তারা আমাদের মতে পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট। আল্লাহর নিকটেই যাবতীয় বিভ্রান্তি হতে নিরাপত্তা এবং সৎপথে চলার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আমীন

.....

[৪৪৮] এ কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেসব বিষয় আলোচনা করা হলো, তাই আমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দীন ও আক্বীদাহ। এগুলোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ হিসাবে সাব্যস্ত। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের মাধ্যমে এগুলো সুপ্রমাণিত। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আমরা এগুলোকেই বিশ্বাস করি। বাতেনী সম্প্রদায়ের মত আমাদের যাহেরী-বাতেনী বলতে কিছুই নেই। তাদের রয়েছে যাহেরী এবং রয়েছে বাতেনী। তারা শরী'আতের দলীল ও সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলোকে এমন বিষয় দ্বারা ব্যাখ্যা করে, যা সেগুলোর বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। যেমন বাতেনীরা বলে থাকে পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাতের যাহেরী ও বাতেনী তাৎপর্য রয়েছে। লোকেরা যে পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করে, এটি হলো যাহেরী ছ্বলাত। আর তাদের মতে বাতেনী ছ্বলাত হলো, পাঁচজন লোকের নাম গণনা করা। তারা হলেন হাসান, হুসাইন, আলী ও ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। তাদের মতে ছ্বিয়ামেরও যাহেরী এবং বাতেনী অর্থ রয়েছে। মানুষেরা যে ছ্বিয়াম রাখে, তা হলো যাহেরী ছ্বিয়াম। তাদের বাতেনী ছ্বিয়াম হলো, মাশায়েখদের তথ্য গোপন রাখা। তাদের মতে হাজ্জের যাহেরী ও বাতেনী অর্থ রয়েছে। আল্লাহর ঘরের হাজ্জ করাকে যাহেরী হাজ্জ বলে থাকে। মাশায়েখদের কবরের উদ্দেশ্যে হাজ্জ করাকে বাতেনী হাজ্জ হিসাবে নাম দিয়ে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ)

এ হলো বাতেনী সম্প্রদায়ের যাহেরী ও বাতেনীর মূল তথ্য। এ কিতাবে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, তাই আমাদের যাহেরী ও বাতেনী আক্বীদাহ। আমাদের কাছে এমন কোনো বাতেনী বিষয় নেই, যা আমাদের যাহেরী দীনের বিরোধী। আমাদের যাহেরী বিষয়গুলো বাতেনী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতিপূর্ণ। এমনি আমাদের কাছে যে বাতেনী বিষয় রয়েছে, তা যাহেরী আমলের সাথে সংগতিপূর্ণ। এক কথায় বাতেনী সম্প্রদায়ের ন্যায় অসংগতি যাহেরী-বাতেনী আমাদের কাছে নেই।

ব্যাখ্যাঃ فهذا ইসেম ইশারা দ্বারা এই কিতাবের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, সেসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুশাব্বেহা সম্প্রদায় বলতে এ উম্মতের ঐসব লোক উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ সিফাতগুলোকে মানুষের সিফাতের সাথে তুলনা করে। এরা খ্রিস্টানদের বিপরীত। খ্রিস্টানরা সৃষ্টিকে অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সাথে তুলনা করে এবং তাকে ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করে। আর এ উম্মতের এক শ্রেণীর লোক স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে। যেমন দাউদ আল-জাওয়ারেবী এবং তাদের অনুরূপ লোকেরা।

মুতাযিলা মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণঃ

মুতাযিলা সম্প্রদায় বলতে আমর বিন উবাইদ এবং ওয়াসেল বিন আতা আল-গায্যাল ও তাদের অনুসারীরা উদ্দেশ্য। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) মৃত্যুবরণ করার পর তারা যখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বেরিয়ে গেল, তখন তাদেরকে এ নামে নামকরণ করা হয়। তারা যখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমদের দারস্-শিক্ষা ত্যাগ করে মাসজিদের একপ্রান্তে আলাদা হয়ে বসতে শুরু করলো, তখন কাতাদাহ এবং অন্যান্য আলেম তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন, এরা হলো মুতাযিলা। কেউ কেউ বলেছেন, ওয়াসেল বিন আতাই মুতাযিলা মাযহাবের মূলনীতিগুলোর প্রতিষ্ঠাতা। হাসান বসরীর শিষ্য আমর বিন উবাইদ ছিল ওয়াসেলের অনুসারী।

মুতাযিলাদের মূলনীতিসমূহঃ

আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশিদের খিলাফতকালে আবু হুযাইল মুতাযিলাদের জন্য দু'টি কিতাব রচনা করেন। এতে তিনি মুতাযিলাদের মাযহাবের বিবরণ দিয়েছেন এবং পাঁচটি মূলনীতির উপর তাদের মাযহাবের ভিত্তি রচনা করেছেন। মূলনীতিগুলো হচ্ছে, (ক) العدل (ন্যায়বিচার), (খ) التوحيد (তাওহীদ), (গ) إنفاذ الوعيد (কবীরাহ গুনাহকারীদের ব্যাপারে বর্ণিত শাস্তির ভয়ভীতি ও ধমক অবশ্যম্ভাবি বলে আখ্যা দেয়), (ঘ) المنزلة بين المنزلتين (ঈমান ও কুফরীর মধ্যকার স্তর) এবং (ঙ) الأمربالمعروف والنهي عن المنكر (সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ)।

এই মূলনীতিগুলোর মাধ্যমে তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে। এটিই হলো বিদ'আতীদের স্বভাব। হক ও বাতিল মিলেই বিদ'আত তৈরী হয়। মুতাযিলারা আল্লাহর কাজ-কর্মের সাদৃশ্য স্থাপনকারী।[৪৪৯] বান্দারা যেসব ভালো কাজ সম্পাদন করে

[৪৪৯] অর্থাৎ তারা প্রথমে আল্লাহর কাজগুলোকে বান্দার কাজের উপর কিয়াস করেছে। অতঃপর তারা যখন দেখল, বান্দার মধ্যে কুফরী, পাপাচার ও ভালো-মন্দ সবই রয়েছে, ঐদিকে আল্লাহ তা'আলা কুফুরী ও পাপাচার কে মোটেই

থাকে, সেগুলোকে তারা ভালো মনে করেছে। বান্দার ভালো কাজগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। তাই এগুলোকে তারা ভালো হিসাবে নির্ধারণ করেছে। বান্দার খারপ কাজগুলোর স্রষ্টাও আল্লাহ তা'আলা। বান্দারা কেবল নিজস্ব ইচ্ছা ও শক্তি ব্যবহার করে তা সম্পাদন করে থাকে। মুতাযিলাদের কথা হলো বান্দারা খারাপ কাজ করলে যেহেতু তারা নিকৃষ্ট কাজ করেছে বলে তাদেরকে নিন্দা করা হয়, অতএব যদি বলা হয় আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন ধরে নিলে আল্লাহর কাজের মধ্যে মন্দ থাকার ধারণা চলে আসে।[৪৫০] (নাউযুবিল্লাহ)

উপরোক্ত কিয়াসের দাবি অনুযায়ী তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলার উপর এটি করা আবশ্যক ছিল, তার জন্য এটি করা উচিত নয়। তাদের বাতিল কিয়াসের দাবি অনুযায়ী তারা আরো বলেছে যে, বনী আদমের কোনো প্রভাবশালী মনিব তার চাকরকে তার দাসীর সাথে যেনা করতে দেখেও যদি এ কাজ থেকে নিষেধ না করে, তাহলে মনিবের দু'টি অবস্থা হতে পারে। হতে পারে মনিব তার চাকরের কাজকে পছন্দ করে। এ কারণেই সে তাকে নিষেধ করে না। এও হতে পারে যে, মনিব তার চাকরের এ কাজকে নিকৃষ্ট মনে করে। কিন্তু তিনি নিষেধ করার ক্ষমতা রাখেন না বলেই নিষেধ করা হতে বিরত থাকেন।[৪৫১] সুতরাং কিভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজগুলোকে বান্দার কাজের সমতুল্য মনে করা হবে![৪৫২] এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

মুতাযিলারা তাদের প্রথম মূলনীতি ন্যায়বিচারের ছত্রছায়ায় আল্লাহ তা'আলার তাক্বদীরকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলাকে বান্দার মন্দকর্মের স্রষ্টা মনে

পছন্দ করেন না, তাই তারা আল্লাহর প্রতি মন্দের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব মনে করলো। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, বান্দার কাজ বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে। তাতে আল্লাহর কোনো দখল নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

[৪৫০] মুতাযিলারা মনে করেছে, যদি বলা হয় বান্দার খারাপ কাজগুলোর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা, তাহলে তার দিকে খারাপের সম্বন্ধ করা আবশ্যক হয়। অথচ মন্দের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা শোভনীয় নয়। তাই আল্লাহ তা'আলার প্রতি মন্দের ধারণা যাতে না হয়, তাই বলতে হবে, বান্দার কাজের স্রষ্টা বান্দা নিজেই; আল্লাহ তা'আলা নন। তারা আরো বলে, বান্দার কাজটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা জানতেও পারেন না। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের এ কথা শরী'আত ও বিবেক-বুদ্ধির দলীলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে তার অবগতি ব্যতীত অন্য কিছু সংঘটিত হওয়ার ধারণা করা সুস্পষ্ট কুফরী। আল্লাহ তা'আলা কী উদ্দেশ্যে ভালো-মন্দ উভয়ই সৃষ্টি করেছেন, তা বুঝতে না পেরেই তারা এমন কথা বলেছে। বান্দা খারাপ কাজ করলে বান্দাকে দোষারোপ করা হলেও সে কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে দোষারোপ করা চলে না। কারণ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে খারাপ কিছু নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মন্দ সৃষ্টি করে খারাপ কিছু করেননি। কারণ খারাপ উদ্দেশ্য তা সৃষ্টি করেননি। বরং তা সৃষ্টি করার পিছনে হিকমতে ইলাহীয়া হচ্ছে, বান্দাকে পরীক্ষা করা। তাই বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, বান্দার খারাপ কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। তাতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মন্দের ধারণা হওয়া আবশ্যক নয়। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[৪৫১] মুতাযিলারা এ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি মন্দ ও অপারগতার সম্বোধন করা যেহেতু প্রশংসনীয় ও শোভনীয় নয় এবং তা যেহেতু তিনি পছন্দ করেন না, তাই তারা আল্লাহ তা'আলাকে বান্দাদের কাজের স্রষ্টা মনে করে না।

[৪৫২] অর্থাৎ কিভাবে এই ধারণা করা যেতে পারে যে, বান্দার খারাপ কাজগুলোর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা!!

করে না। তারা বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা মন্দ সৃষ্টি করেন না এবং মন্দের ফায়ছালাও প্রদান করেন না। তিনি যদি মন্দের স্রষ্টা হয়ে থাকেন অতঃপর মানুষ সে মন্দ কাজ করার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহলে যুলুম হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারী এবং তিনি বিন্দু মাত্র যুলুম করেন না। মুতাযিলাদের জবাব হলো, তাদের এ বাতিল মূলনীতির দাবি হচ্ছে, আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে এমন কিছু সৃষ্টি হয়, যা তিনি ইচ্ছা করেন না। সে সঙ্গে তিনি এমন কিছু ইচ্ছা করেন, যা সংঘটিত হয় না। (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এ মূলনীতিতে আল্লাহ তা'আলাকে অপারগতা ও অক্ষমতার বিশেষণে বিশেষিত করা হয়!! আল্লাহ তা'আলা এমন ধারণার বহু উর্ধ্বে।

আর তারা তাদের তাওহীদের পতাকার নীচে কুরআনকে মাখলুক বলার আক্বীদাহ লুকিয়ে রেখেছে। কেননা তারা বলেছে, কুরআনকে যদি মাখলুক না বলা হয়, তাহলে একাধিক কাদীম তথা অনাদি-অবিনশ্বর সত্তার চিরন্তনতা আবশ্যক হয়!![৪৫৩] মুতাযিলাদের এ পঁচা আক্বীদাহ অনুযায়ী কুরআনকে মাখলুক বলা হলে আল্লাহর ইলম, কুদরত এবং অন্যান্য সকল সিফাতকেই মাখলুক বলা আবশ্যক হয়। অথবা আল্লাহর সিফাতগুলো পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়।

আর তারা وعيد বা আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ব্যাখ্যায় বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেখানে তার কতিপয় বান্দাকে শাস্তির ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন, সেখানে আল্লাহর জন্য জায়েয নেই যে, তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না এবং তার জন্য সে ভয়-ভীতি বাস্তবায়নের খেলাফ করাও জায়েয নয়।[৪৫৪] কেননা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা-অঙ্গিকার ভঙ্গ করেন না। সুতরাং মুতাযিলাদের মতে আল্লাহ তা'আলা চাইলেই কাউকে মাফ করতে পারেন না এবং তিনি ইচ্ছা করলেই কাউকে ক্ষমা করতে পারেন না।

---

[৪৫৩] তাদের বাতিল ধারণা মতে আল্লাহর সত্তার সাথে যদি সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে একাধিক চিরন্তন সত্তা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্তা অনাদি-অবিনশ্বর ও চিরন্তন, তার শ্রবণ চিরন্তন, তার দৃষ্টিও চিরন্তন এবং তার সকল সিফাতই চিরন্তন। এভাবে বহু চিরন্তন সত্তা সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে সিফাত সাব্যস্ত করা হলে তাদের বাতিল ধারণা মোতাবেক আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ব ঠিক থাকে না। তাই তারা তাওহীদ ঠিক রাখার দোহাই দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সিফাতকেই অস্বীকার করেছে। মুতাযিলাদের নির্বোধরা আল্লাহর সিফাতকে তার সত্তা থেকে আলাদা করে বুঝার কারণেই এ সন্দেহে নিপতিত হয়েছে। মূলত আল্লাহর সিফাত তার সত্তা থেকে আলাদা কোনো বিষয় নয়। মোটকথা সিফাত বিহীন কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি সিফাত বিহীন স্রষ্টার অস্তিত্বও অকল্পনীয়। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[৪৫৪] এ মূলনীতির আলোকে তারা আরো বলে থাকে, অপরাধের কারণে কাউকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে সে আর সেখান থেকে বের হতেও পারবে না। কুরআন ও হাদীছের বহু দলীল তাদের এ মূলনীতিকে বাতিল করেছে। বরং আল্লাহর উপর আবশ্যক বলতে কিছু নেই। সুতরাং পাপীকে শাস্তি দেয়াও তার উপর আবশ্যক নয়। তাকে শাস্তি না দিয়ে তিনি ক্ষমা করে দেয়ারও অধিকার রাখেন। ইচ্ছা করলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য শাস্তি দিলেও দিতে পারেন। এটিই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ। অনেক ছুহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, বহু সংখ্যক গুনাহগার জাহান্নামে প্রবেশ করার পরও রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফা'আতের কারণে কিংবা অন্যদের শাফা'আতের কারণে জাহান্নাম থেকে বের হবে।

আর তারা দুই স্তরের মধ্যবর্তী যেই স্তর আছে বলে বিশ্বাস করে, তার ব্যাখ্যা হলো, কোনো ব্যক্তি কবীরাহ গুনাহ্য় লিপ্ত হলেই সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু কুফরীতে প্রবেশ করে না। বরং ঈমান ও কুফরীর দুই স্তরের মধ্যবর্তী একটি স্তরে ঝুলতে থাকে।[৪৫৫]

তাদের আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনিল মুনকারের মূলনীতি বলতে তারা বলে থাকে, আমাদেরকে মানুষেরা যে বিষয়ের আদেশ করবে, আমরাও তাদেরকে সে বিষয়ের আদেশ প্রদান করবো। আমাদের উপর তারা যা আবশ্যক করবে, আমরাও তাদের উপর তা আবশ্যক করবো। এটিই হলো তাদের সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ। এই মূলনীতির কারণেই শাসকরা যুলুম করলে তারা শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করা জায়েয মনে করে।[৪৫৬]

মুতাযিলাদের এ পাঁচ মূলনীতির জবাব ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে প্রদান করা হয়েছে। তাদের মতে তাওহীদ এবং আদল বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তি দ্বারা অর্জিত ঐসব মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত, যার দ্বারা যাচাই করার পূর্বে শরী'আতের দলীলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানা অসম্ভব। কোনো কিছু সাব্যস্ত করার সময় বোধশক্তি ও বিবেকের দলীলের সাথে যখন তারা শরী'আতের দলীল যোগ করতে চায়, তখন বিবেকের দলীলকে শক্তিশালী করার জন্যই তা করে থাকে। যদিও তাদের মতে কুরআন-হাদীছের দলীল কোনো মৌলিক দলীল নয়।

মুতাযিলারা বলে থাকে, আমরা নাবী-রসূলদের মাধ্যমে প্রাপ্ত দলীল দ্বারা আল্লাহর তাওহীদ এবং আদল সাব্যস্ত করি না। বরং শরী'আতের দলীলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানার আগেই বোধশক্তি দ্বারা আল্লাহর তাওহীদ ও আদল সম্পর্কে জানা গেছে। মুতাযিলাদের কেউ কেউ কুরআন-সুন্নাহ্র দলীলকে মূলনীতি হিসাবে গণ্যই করে না। কেননা তাদের মতে এতে কোনো লাভ নেই। তাদের কেউ কেউ বোধশক্তির দলীলকে সমর্থন করার কারণে এবং লোকদের জন্য তাদের বিবেক প্রসূত কথাগুলো গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যই শরী'আতের দলীলগুলো উল্লেখ করে থাকে। সেগুলোর উপর নির্ভর করার জন্য নয়! নির্ধারিত নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর অতিরিক্ত সাক্ষীর উপস্থিতি যেমন গুরুত্বহীন এবং সাহায্যের প্রতি অমুখাপেক্ষী সেনাবাহিনীর কাছে নতুন করে সাহায্য পাঠানোর যেমন কোনো মূল্য নেই, মুতাযিলাদের বোধশক্তির কাছে কুরআন ও হাদীছের মর্যাদা ঠিক সেরকমই।[৪৫৭] শুধু তাই নয়, তাদের কেউ আরো বলে থাকে, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির

---

[৪৫৫] কুরআন ও হাদীছে ঈমান এবং কুফুরী ব্যতীত আর কোনো পরিভাষা নেই। সুতরাং এটি একটি বিদ'আতী পরিভাষা, যা মুতাযিলারা নিজেদের পক্ষ হতে তৈরি করেছে।

[৪৫৬] তারা বলে, প্রথমে আমরা আমাদের মতের বিরোধিতাকারীদেরকে নসীহত করবো। নসীহত কবুল না করলে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো। সে শাসক হোক বা সাধারণ জনগণের অন্তর্ভুক্ত হোক। এ মূলনীতির কারণেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তাদের পক্ষ হতে ভয়াবহ যুলুমের শিকার হয়েছেন। অসংখ্য আলিমকে তারা হত্যাও করেছে।

[৪৫৭] এসব বুলি আওড়ানোর কারণ হলো, তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তিকে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অনুসরণ করে এবং নিজের পছন্দকেই শরী'আত বানিয়ে নেয়, তার নিকট যেমন কুরআন-হাদীছের দলীলের কোনো দাম নেই, তেমনি মুতাযিলাদের বোধশক্তির দলীলের কাছে কুরআন-হাদীছের দলীল মূল্যহীন। উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যারা প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক হলে সত্যের অনুসরণ করে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক না হলে সত্যের বিরোধিতা করে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তুমি যদি এ রকম করো, তাহলে তুমি যেই সত্যের অনুসরণ করলে, তাতে কোনো ছাওয়াব পাবে না এবং প্রবৃত্তির বিরোধী হওয়ার কারণে যেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলে তার কারণে শাস্তি পাবে। কারণ তুমি উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছো। নাবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

"প্রতিটি আমল কবুল হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যার নিয়্যাত সে করে"।[৪৫৮]

বান্দা যেসব আমল করে, তা তার উদ্দেশ্য ও নিয়্যাতের অনুগামী হয়। অনুরূপ বান্দার ইলম অনুযায়ী তার সুদৃঢ় আক্বীদাহ ও বিশ্বাস নির্মাণ হয়ে থাকে। সুতরাং আক্বীদাহ যখন সঠিক বিশ্বাসের অনুগামী হয়, তখন ঐ আক্বীদাহ শরী'আত সম্মত ঈমানে পরিণত হয়। যেমন পরিশুদ্ধ নিয়্যাতে যখন ভালো আমল করা হয়, তখন তা আমলে সালেহ হিসাবে পরিগণিত হয়। আর তা না হলে মুমিনদের আমল ঈমানের অনুগামী হয় না। যেমন সৎকর্মপরায়ণদের ঐ আমল, যা সৎকর্মশীলদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয় না।

মুতাযিলাদের মধ্যে রয়েছে অনেক নাস্তিক ও মুনাফেক। তাদের মধ্যে রয়েছে আরো এমন অনেক লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভালো কর্মই করে যাচ্ছে।

জাহমীয়া সম্প্রদায়কে জাহাম বিন সাফওয়ান সামারকান্দীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। জাহাম বিন সাফওয়ান সর্বপ্রথম আল্লাহর সিফাতসমূহকে অস্বীকার ও বাতিল করার মাযহাব প্রকাশ করেছে। সে গ্রহণ করেছে এই মাযহাব জা'দ বিন দিরহাম থেকে। এই জাদ বিন দিরহামকেই ইরাকের ওয়াসেত নামক স্থানে খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আলকাসারী যবেহ করেছেন।[৪৫৯] তার হত্যাকান্ডের ঘটনা হলো, খালেদ বিন আব্দুল্লাহ লোকদের জন্য ঈদুল আযহার খুতবা দিলেন। অতঃপর বললেন, হে লোকসকল! তোমরা কুরবানী করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কুরবানী কবুল করুন। আমি জা'দ বিন দিরহামকে এখনই কুরবানী করবো। কেননা সে ধারণা করছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহি

[৪৫৮] ছহীহ বুখারী হা/১।
[৪৫৯] খালেদ বিন আব্দুল্লাহ ছিলেন উমাইয়া শাসনামলে ওয়াসেত অঞ্চলের গভর্ণর। ১২৪ হিজরী সালে বা তা কয়েকবছর আগে ওয়াসেতের গভর্ণর থাকা কালে তিনি জা'দকে হত্যা করেন।

সালামকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেনি এবং মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেননি। আল্লাহ তা'আলা জা'দের ধারণার বহু উর্ধ্বে। এ বলে খালেদ মিম্বার থেকে নামলেন এবং যা'দ দিরহামকে যবেহ করে ফেললেন। সে সময়ে সালাফে সালেহীন আলেমদের ফতোয়া গ্রহণ করেই তাকে যবেহ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন। জা'দ নিহত হওয়ার পর জাহাম খোরাসানে পলায়ন করে এবং সেখানে জাহমীয়া মাযহাব প্রকাশ করতে থাকে। সেখানে তার একদল অনুসারী তৈরী হয়ে যায়।

বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে জাহাম একটানা চল্লিশ দিন পর্যন্ত ছ্বলাত ছেড়ে দিয়েছিল। এর কারণ হলো সে ভারতের এমন এক শ্রেণীর মুশরিক দার্শনিকদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যাদেরকে সুমানিয়া বলা হতো। এরা ছিল বস্তুবাদী। গায়েবী কোনো বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ছিল না। যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য জাহাম তাদের সাথে আলোচনায় বসলো। দার্শনিকরা জাহামকে প্রশ্ন করলো, তুমি যে রবের ইবাদত করো, তাকে কি দেখা যায়? তার ঘ্রাণ পাওয়া যায়? তার স্বাদ গ্রহণ করা যায়? তাকে কি স্পর্শ করা যায়?...ইত্যাদি। জাহাম না সূচক জবাব দিল। এতে ভারতীয়রা বলল, তাহলে তোমার রবের কোনো অস্তিত্ব নেই!! এতে জাহাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোনো কিছুর ইবাদত না করেই থেকে গেল।[৪৬০] অতঃপর তার অন্তরে যখন ইবাদত করার মত কোনো মাবুদের অস্তিত্বের বিশ্বাস রইল না, তখন শয়তান তার চিন্তার মধ্যে মাবুদ সম্পর্কে এমন একটি নকশা খোদাই করে দিল, যার আলোকে সে বলল, মাবুদের এমন একটি সাধারণ অস্তিত্ব রয়েছে, যার কোনো সিফাত নেই।[৪৬১] সুতরাং এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সমস্ত সিফাতকে অস্বীকার করলো এবং জা'দ বিন দিরহামের সাথেও যোগাযোগ করলো।

---

[৪৬০] বলা হয়েছে যে, জাহাম ভারতের সুমানিয়া নাস্তিকদেরকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝাতে গিয়েছিল। জাহাম তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। বিতর্কের ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জাহাম নিজেই সন্দেহে পড়ে গেল।

[৪৬১] জাহমীয়ারা আল্লাহর সকল সিফাতকেই অস্বীকার করে। তারা শুধু আল্লাহর সিফাত বিহীন অস্তিত্বকে স্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর গুণবাচক নামগুলোর ক্ষেত্রে তারা বলে যে, এগুলো দ্বারা আল্লাহর সত্তা উদ্দেশ্য। এ নামগুলো থেকে যেসব সিফাত বুঝা যায়, তা থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তা দ্বারা তিনি আদৌ বিশেষিত নন। বরং এর দ্বারা ঐসব সিফাত উদ্দেশ্য, যা তিনি মাখলুকের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তারা বলে থাকে, যেখানে আল্লাহ তা'আলাকে الكريم আলকারীম বা দয়ালু নামে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার সত্তা উদ্দেশ্য। তা দ্বারা যেই দয়ার অর্থ বুঝায়, তা ঐ দয়া উদ্দেশ্য, যা তিনি মাখলুকের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এমনি তারা আল্লাহ তা'আলার القوي (শক্তিশালী) নামকে ঐ শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করে, যা তিনি মাখলুকের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য নামের ক্ষেত্রেও তারা অনুরূপ কথা বলে। কুরআন ও সুন্নাহ্য় উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার নামগুলোর মধ্যকার সিফাতকে তারা আলাদা মাখলুক বলে থাকে। তাদের মতে আল্লাহর নামগুলো তার কোনো সিফাতকে বুঝায় না। কারণ তারা আল্লাহর সিফাতকে একবাক্যে অস্বীকার করে থাকে। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

বলা হয়েছে যে, জা'দ বিন দিরহাম হার্‌রানের নাস্তিক দার্শনিকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সে এমন কতিপয় ইয়াহূদী থেকেও কিছু শিখেছিল, যারা তাদের দীনের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছিল। এ শ্রেণীর ইয়াহূদীদের সম্পর্ক ছিল যাদুকর লাবীদ বিন আ'সাম। এ লাবীদই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদু করেছিল। অতঃপর জাহাম খোরাসানে নিহত হয়। সাল্‌ম বিন আহওয়ায তাকে হত্যা করে।[৪৬২] তবে এর আগেই তার মতবাদ মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল। জাহামের পরে মুতাযিলারা এ মাযহাবের তাকলীদ শুরু করে। কিন্তু জাহাম মুতাযিলাদের মধ্যে তা'তীল অর্থাৎ আল্লাহর অতি সুন্দর নামগুলো বাতিল করার আক্বীদাহ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কেননা জাহাম প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার নামগুলো অস্বীকার করতো। তবে মুতাযিলারা শুধু আল্লাহর সিফাতগুলো অস্বীকার করে; নামগুলোকে অস্বীকার করে না।

জাহমীয়ারা এ উম্মতের মধ্যকার ৭২ ফির্কার মধ্যে পড়বে কি না, আলেমগণ এই ব্যাপারে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছেন। যারা বলেছেন জাহমীয়ারা ৭২ দলের মধ্যে পড়বে না, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং ইউসুফ ইবনে আসবাত অন্যতম। মামুনের শাসনকালে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য আলিমের ফিতনার সময় থেকেই জাহমীয়াদের মাযহাব প্রসার লাভ করে। সে হিসাবে মামুনের যুগেই তারা শক্তিশালী হয় এবং তাদের অনুসারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কেননা মামুন বেশ কিছু সময় খোরাসানে অবস্থান করেছিলেন। খোরাসানে অবস্থানকালে তিনি জাহমীয়াদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের ফিতনার সময় খোরাসানের তারতুস সীমান্তে অবস্থানকালেই মামুন ২১৮ হিজরী সালে ইমামকে তারতুসে স্থানান্তর করার ফরমান লিখে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মামুনের সামনে উপস্থিত হওয়ার আগেই তিনি তারতুসে অজ্ঞাত রোগে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৬৩] অতঃপর রক্ষীরা ইমাম আহমাদকে ২২০ হিজরী সালে বাগদাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে ফেরত পাঠায়। এখানে খলীফা মুতাসেম বিল্লাহ্‌র সাথে নতুন করে ইমামের ফিতনা শুরু হয় এবং মুতাসেমের উপস্থিতিতেই মুতাযিলাদের সাথে তার বহু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ইমামের বিরুদ্ধে মুতাযিলারা যেসব যুক্তি পেশ করেছিল, ইমাম সেগুলোর জবাব দিলেন এবং সুস্পষ্ট করে বলে দিলেন, তাদের মতের পক্ষে কোনো দলীল নেই। সুতরাং তাদের মতের উপর

---

[৪৬২] এটি বনী উমাইয়ার শাসনকালের শেষের দিকে ঘটনা। সাল্‌ম বিন আহওয়ায ছিলেন খোরাসানের গভর্ণর নাসর বিন সাইয়ারের সুযোগ্য সেনাপতি। উল্লেখ্য যে, ১৩২ হিজরী সালে উমাইয়া শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে। বনী উমাইয়ার খলীফাগণ বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। অপর দিকে আব্বাসীয় খলীফাগণ তাদের বিরুদ্ধে মোটেই কঠোর ছিলেন না। শুধু তাই নয়, আব্বাসী খলীফা মামুনের যুগেই বিদ'আতী মুতাযিলা সম্প্রদায় তাদের বিদ'আত প্রচার ও প্রসারে সুযোগ পেয়ে যায়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) মুতাযিলা আলেমদের বিভ্রান্তির কারণেই খালকে কুরআনের ফিতনায় পড়েন এবং অমানবিক যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন।

[৪৬৩] বর্ণিত হয়েছে যে, গভীর রাতে ইমাম তাহাজ্জুদ ছ্বলাত শেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মামুনের সামনে উপস্থিত করো না। আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেছেন এবং প্রহরীরা তাকে তারতুসে হাযির করার আগেই মামুনের মৃত্যুর সংবাদ আসে।

মানুষের সমর্থন চাওয়া এবং তার উপর তাদেরকে বাধ্য করা যুলুম ও অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তখন মুতাসেম ইমামকে ছেড়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু স্বার্থপর একশ্রেণীর আলেম মুতাসেমকে বুঝালো যে, তাকে ছেড়ে না দিয়ে বন্ধী রাখা এবং প্রহার করার মধ্যেই রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষিত হবে। কারণ তাকে ছেড়ে দিলে খেলাফাতের ভাব-মর্যাদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাদের পরামর্শ মোতাবেক জল্লাদরা যখন তাকে প্রহার করলো, তখন জনসাধারণের মধ্যে এক বিরূপ প্রভাব পড়লো। এতে মুতাসেম জনগণের পক্ষ হতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করলো এবং ইমামকে ছেড়ে দিল। ইতিহাসের কিতাবসমূহে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

জাহাম বিন সাফওয়ান আরো যেসব আক্বীদাহ পোষণ করতো, তার মধ্যে এও ছিল যে, জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে, মুমিন হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য শুধু অন্তর দিয়ে আল্লাহর মারেফত হাসিল করাই যথেষ্ট, স্রষ্টা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাই কুফুরী এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। মানুষের দিকে কেবল রূপকার্থেই তাদের কাজ-কর্মগুলো সম্বোধন করা হয়। যেমন বলা হয়, বৃক্ষটি নড়াচড়া করেছে, তারকাটি অস্তমিত হলো, সূর্য ডুবে গেল ইত্যাদি। কবি খুব সুন্দর কথা বলেছেন,

عَجِبْتُ لِشَيْطَانٍ دَعَا النَّاسَ جَهْرَةً... إِلَى النَّارِ وَاشْتُقَّ اسْمُهُ مِنْ جَهَنَّمَ

"আমি এমন এক শয়তানের জন্য আশ্চর্যবোধ করি, যে মানুষকে প্রকাশ্যে জাহান্নামের দিকে আহবান করেছে এবং جهنم (জাহান্নাম) শব্দের যেই নূন অক্ষর রয়েছে তা বাদ দিয়ে নিজের নাম জাহাম রেখেছে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) কে যখন আরায ও আজসাম[৪৬৪] সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি বলেছেন, আমর বিন উবাইদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক! কারণ সে সর্বপ্রথম মানুষের জন্য ইলমে কালামের (যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রের) দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

জাবরীয়ারা তাদের আক্বীদার মূল বিষয়গুলো জাহাম বিন সাফওয়ান থেকে নিয়েছে। যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের মতে বান্দার ক্রিয়া-কর্ম, বান্দার লম্বা-খাটো হওয়া বিভিন্ন রঙ্গের মতই। অর্থাৎ লম্বা হওয়া কিংবা খাটো হওয়াতে মানুষের যেমন কোন হাত নেই, তেমনি তাদের কাজ-কর্ম নিজস্ব ইচ্ছাতে হয় না। বরং তা আল্লাহ তা'আলাই করেন। এরা তাকদীরে অবিশ্বাসী কাদারীয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাদার বা তাকদীরের

[৪৬৪] আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলী এবং বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ ও দার্শনিকরা আরায ও আজসাম শব্দ দু'টি ব্যবহার করে থাকে। তাদের মতে যে জিনিস স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অন্যের উপর নির্ভর না করা ব্যতীত নিজেই অস্তিত্বশীল হয়, তাকে জিসিম বলা হয়। আর যে বস্তু ও বিষয় অন্যের উপর নির্ভর করা ব্যতীত অস্তিত্বশীল হতে পারে না, তাকে আরায বলা হয়। তাদের মতে মানুষ হলো জিসিম এবং রোগ-ব্যাধি ও সুস্থতাসহ তাদের শরীরের বিভিন্ন অবস্থা হলো আরায। কারণ দেহ ছাড়া শুধু সুস্থতা-অসুস্থতার অস্তিত্ব অকল্পনীয়। এমনকি তাদের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্য জিসিম এবং তার সুউচ্চ সিফাতগুলোর জন্য আরায শব্দ ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে যুক্তিবিদ ও দার্শনিকরা এ রকম আরো অনেক বিদ'আতী পরিভাষা ইসলামী পরিভাষাগুলোর মধ্যে ঢুকিয়েছে, যা সালাফে সালেহীনের যুগে ব্যবহৃত হয়নি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

দিকে সম্বন্ধ করেই তাদেরকে কাদারীয়া বলা হয়। কারণ তারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। যেমন কবীরাহ গুনাহ্কারীকে শাস্তি দেয়া বা না দেয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত إرجاء বা বিলম্বিত করাকে অস্বীকার করার কারণে মুরজিয়া সম্প্রদায়কে مرجئة (বিলম্বিতকারী) হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।[৪৬৫] তারা আরো বলে, মুমিনদের কারো ব্যাপারেই আল্লাহর ফায়ছালা আসা পর্যন্ত এই জন্য বিলম্বিত হবে না যে, তিনি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন আবার চাইলে তাদের উপর অনুগ্রহ করবেন। অর্থাৎ তারা বলে, কবীরাহ গুনাহ্য় লিপ্ত সকল মুমিনই জান্নাতী হবে। এই কথা বলার দরকার নেই যে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ হবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। জাবরীয়াদেরকে কাদারীয়াও বলা হয়। কেননা তারা তাক্বদীর তথা আল্লাহর ক্রিয়া-কর্ম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। অনুরূপ যারা ছাওয়াব দানের ওয়াদা কিংবা শাস্তির ভয়-ভীতি সংক্রান্ত কোনো কিছুতেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, বরং তারা প্রত্যেক বিষয়ের হুকুমকেই পিছিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে থাকে, তাদেরকেও মুরজিয়া বলা হয়। এমনকি তারা কোনো মানুষের উপরই হুকুম লাগায় না। সুতরাং যারা তাওবা করেছে, তাদেরকে ছাওয়াব দেয়ার অঙ্গিকারে তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয় এবং যারা তাওবা করেনি, তাদের উপর শাস্তির হুমকি-ধমকি বাস্তবায়নের ব্যাপারটিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না। এমনি নির্দিষ্ট করে কারো ব্যাপারে হুকুমই লাগায় না। প্রথম যুগের মুরজিয়ারা উছমান এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর উপর হুকুম লাগানো থেকে বিরত ছিল। তারা তাদের দু'জনের কাউকেই মুমিন বলেনি, কাফিরও বলেনি!

তাক্বদীর অস্বীকারকারীরা এ উম্মতের অগ্নিপূজক:

সুনানের কিতাবসমূহে কাদারীয়াদের নিন্দায় বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সুনানে আব্দুল আযীয বিন আবু হাযেমের সনদে ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ»

[৪৬৫] তবে মুরজিয়াদের পরিচয়ে অন্যান্য আলেমগণ বলেন, إرجاء অর্থ বিলম্বিত করা। তারা যেহেতু ঈমান থেকে আমলকে বের করে দেয় অর্থাৎ ঈমানের সংজ্ঞায় তারা যেহেতু আমলকে দাখিল করে না; বরং বলে যে, অন্তরের বিশ্বাস ও জবানের স্বীকারোক্তিই পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট, তাই তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আরো বলে যে, ঈমান আনয়নের পর পাপাচার ঈমানের কোনো ক্ষতি করেনা, যেমন কুফরীর হালতে সৎকাজ কোনো উপকারী নয়।

"কাদারীয়ারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা যদি অসুস্থ হয়, তাদেরকে দেখতে যাবে না এবং তারা মৃত্যু বরণ করলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না।[৪৬৬]

কাদারীয়াদের নিন্দায় আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে মারফু হিসাবে এসব হাদীছ ছ্বহীহ কি না, সে ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো হাদীছগুলো মাওকুফ সূত্রে ছ্বহীহ। কিন্তু খারেজীদের নিন্দায় বর্ণিত হাদীছগুলোর কথা ভিন্ন। তাদের ব্যাপারে শুধু ছ্বহীহ বুখারীতে ও মুসলিমেই দশটি হাদীছ রয়েছে। সেগুলো থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন তিনটি। বাকীগুলো বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম। অগ্নিপূজকদের সাথে কাদারীয়াদের সাদৃশ্য খুবই সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়; অগ্নিপূজকদের কথার চেয়েও তাদের কথা অধিক নিকৃষ্ট। কেননা অগ্নিপূজকরা দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী আর কাদারীয়ারা বহু স্রষ্টায় বিশ্বাস করে।

পরস্পর বিরোধী এ বিদ'আতগুলো এমনসব ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা উম্মতকে বহু দলে-উপদলে বিভক্ত করে ফেলেছে। যেমন ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার ছ্বহীহ গ্রন্থে বলেন, সর্বপ্রথম যে ফিতনা সংঘটিত হয়, তাতে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর বদরী ছাহাবীদের সকলেই মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর দ্বিতীয় ফিতনার পর অর্থাৎ মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর পর ইয়াযীদ খলীফা হলে যে ফিতনা শুরু হয়, তাতে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকলেই শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় ফিতনা সংঘটিত হওয়ার পর অর্থাৎ ইয়াযীদ বিন মুআবীয়ার মৃত্যুর পর যেই ফিতনা সংঘটিত হয়, তাতে উম্মতের মধ্যকার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রথম ফিতনার পর খারেজী এবং শিয়াদের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় ফিতনার পর মুরজিয়া এবং কাদারীয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। আর তৃতীয় ফিতনার পর জাহমীয়া এবং অন্যান্য বাতিল ফির্কার সূচনা হয়। এরাই হলো ঐসব লোক যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। এরা বিদ'আতের মাধ্যমে বিদ'আতের মোকাবেলা করেছে। একদল আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রশংসায় সীমালংঘন করেছে। আরেক দল তাকে কাফের বলেছে। তাদের একদল আযাব ও শাস্তি, ভয়-ভীতি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলোর ব্যাপারে সীমালংঘন করেছে। এমনকি তারা কতিপয় পাপী মুমিনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছে। অপর দিকে আরেকটি বিদ'আতী সম্প্রদায় কবীরা গুনাহ্র কারণে শাস্তি প্রদানের ভয়-ভীতিকেই অস্বীকার করেছে। এরা হলো মুরজিয়া সম্প্রদায়।

এক শ্রেণীর বিদ'আতীরা আল্লাহ তা'আলাকে দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করতে গিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহকেই অস্বীকার করে ফেলেছে। আরেক শ্রেণীর বিদ'আতী আল্লাহর সিফাত ও কর্ম সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালংঘন করেছে।

---

[৪৬৬] ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন- শাইখের তাহকীকসহ শারহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, হাদীছ নং- ৮০৯।

এরা আল্লাহর সিফাতকে মানুষের সিফাতের সাদৃশ্য করে ফেলেছে! ফলে তারা দীনের মাসায়েল এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র শব্দসমূহের ব্যাখ্যার মধ্যে এমন বিদ'আত ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা মোটেই বৈধ নয়। অথচ তারা শরী'আত সম্মত বিষয়াদি থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিদ'আতীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্ববর্তীদের কিছু কিছু কিতাবের সহায়তা নিয়েছে। যেমন তারা ইয়াহূদী, নাসারা-খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক এবং বেদীনদের কিতাবের উপর নির্ভর করে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছে। এরা যেহেতু পূর্ববর্তী জাতিদের কিতাবগুলো পড়েছে, তাই তাদের মধ্যে পূর্ববর্তীদের ঐসব গোমরাহী ঢুকে পড়েছে, যেগুলো তারা ইসলামী শরী'আতের মাসায়েল ও কুরআনের ব্যাখ্যার মধ্যে দাখিল করেছে। তারা কখনো ইসলামী পরিভাষার মধ্যে শাব্দিক পরিবর্তন করেছে আবার কখনো অর্থের মধ্যে পরিবর্তন করেছে। এর মাধ্যমে তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই সত্য দীন নিয়ে এসেছেন, তা গোপন করেছে। অতঃপর তারা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। পরস্পর মতভেদ করেছে এবং আল্লাহর সত্তা ও সিফাত সাব্যস্ত করা বা না করার ক্ষেত্রে الجسم (দেহ), العرض (অবস্থা), التجسيم ইত্যাদি বিদ'আতী শব্দ ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেই সীরাতুল মুস্তাকীমের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন, তা থেকে সরে যাওয়া উপরোক্ত বিদ'আতী সম্প্রদায় এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের গোমরাহীর কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথের দিকে গমণ করো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপথগামী করে দিবে"। *(সূরা আল আনআম: ১৫৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"তুমি বলে দাও! এটিই আমার পথ। পূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই, আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ্‌ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই"। *(সূরা ইউসুফ: ১০৮)*

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা তার পথকে একবচনের শব্দ صراط ও سبيل ব্যবহার করেছেন। অপর দিকে আল্লাহর পথের বিপরীত পথ উল্লেখ করার সময় বহুবচনের শব্দ سبل (পথসমূহ) উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ ﴿هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ تَلَا» ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

“রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে মাটিতে একটি রেখা টানলেন। সে রেখার উপর হাত রেখে বললেন, এটি হল আল্লাহর পথ। অতঃপর সে রেখার ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো রেখা অঙ্কন করে বললেন, এ সবগুলোই পথ। তবে এ সব পথের মাথায় একটি করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। সে সর্বদা মানুষকে ঐ পথের দিকে আহবান করছে।[৪৬৭] এ কথা বলার পর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

“এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এ সঠিক পথের অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করনা। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপদগামী করে দিবে। *(সূরা আল আনআম: ১৫৩)*

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে সীরাতুল মুস্তাকীমের হিদায়াত চাওয়ার প্রতি বান্দা সর্বাধিক মুখাপেক্ষী। এই জন্যই ফরয কিংবা ওয়াজিব প্রত্যেক ছ্বলাতের প্রত্যেক রাকআতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক করেছেন। যদিও আলেমদের মধ্যে এই মাস'আলায় মতভেদ রয়েছে। কেননা এতে সেই বিরাট ফযীলতময় দু'টি বিষয় রয়েছে, যার প্রতি বান্দার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এবং তাতে সর্বোত্তম ও মহত্তোম কাম্য বিষয়টি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহায় আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন বলি,

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّينَ﴾

“আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে”। *(সূরা ফাতিহা: ৬-৭)*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াহূদীরা হলো অভিশপ্ত এবং খ্রিস্টানরা হলো বিভ্রান্ত। ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[৪৬৭] মুসনাদে আহমাদ, (১/৮৬১), মুস্তাদরাকুল হাকেম, (২/৩১৮)। ইমাম হাকেম বলেন, হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছ্বহীহ। ইমাম যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাসান বলেছেন। দেখুন: মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং- ১৬৬।

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رسول الله، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. قَالَ: فَمَنْ»؟ (بخارى:٣٤٥٦)

“তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের পদে পদে অনুসরণ করে চলবে। যেমন এক বিঘত অন্য বিঘতের সমান হয় এবং এক বাহু যেমন অন্য বাহুর সমান হয়। এমনকি তারা যদি দব-এর (সান্ডার) গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী উম্মত দ্বারা আপনি কি ইয়াহূদী ও নাসারা-খ্রিস্টানদের বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন, তবে আর কারা?[৪৬৮]

সালাফদের একদল আলেম বলেন, এই উম্মতের যে আলেম বিপদগামী হবে, তার মধ্যে ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। আর উম্মতের যেই আবেদ ভ্রান্ত হবে, তার মধ্যে নাসারা-খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকবে। তাই আপনি দেখতে পাবেন অধিকাংশ মুতাযিলা এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য যুক্তিবাদীদের মধ্যে ইয়াহূদীদের স্বভাব রয়েছে। তাই ইয়াহূদী আলেমদেরকে মুতাযিলা শাইখদের কিতাবাদি অধ্যায়ন করতে দেখা যায় এবং তারা মুতাযিলাদের তরীকার প্রশংসা করে থাকে। অনুরূপ মুতাযিলাদের শাইখরা ইয়াহূদীদের প্রতি নমনীয় হয় এবং তাদেরকে নাসারা-খ্রিস্টানদের উপর প্রাধান্য দেয়। আর এই উম্মতের সুফী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইবাদতকারী অধিকাংশ বিপথগামী লোকদের মধ্যে নাসারাদের সাদৃশ্য রয়েছে। এই জন্যই বৈরাগ্যবাদ, সর্বেশ্বরবাদ এবং অনুরূপ অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি তারা বেশী আগ্রহী। এই শ্রেণীর সুফীদের শাইখরা ইলমুল কালাম ও তার অনুসারীদেরকে নিন্দা ও দোষারোপ করে। ঐদিকে যুক্তিবাদীদের শাইখগণ সুফীদের ঘোর বিরোধী। শুধু তাই নয়; সুফীদের গান শ্রবণ করা, নাচানাচি করা এবং অনুরূপ যেসব ইবাদত ও যিকির নিজেদের পক্ষ হতে আবিষ্কার করে নিয়েছে যুক্তিবাদীরা, সেগুলোর কঠোর সমালোচনা করে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে নাবী-রাসূলদের প্রতি যেই অহী প্রেরণ করা হয়েছে, তা থেকে যেসব ফির্কা বিচ্যুত হয়েছে, তাদের বিভ্রান্তির দু’টি পদ্ধতি রয়েছে। (১) তারা অহীর শিক্ষাকে পরিবর্তন করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এবং (২) অহীর শিক্ষাকে তারা মিথ্যায়ন করার চেষ্টা করেছে। প্রথম পদ্ধতি আবার দুই প্রকার। (ক) শুধু ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়ে নাবীদের শিক্ষাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে এবং (খ) তাদের শিক্ষাকে সরাসরি পরিবর্তন কিংবা তাদের শিক্ষার বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে।

যেসব গোমরাহ লোক ধারণা ও কল্পনার সাগরে ডুব দিয়ে নাবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত দীনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে, তাদের কথা হলো নাবীগণ আল্লাহ সম্পর্কে, আখিরাত সম্পর্কে, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে এমনসব সংবাদ পরিবেশন করেছে, যার কোনো বাস্তবতা নেই। তারা কেবল কল্পনা করেই তাদের জাতির লোকদেরকে উক্ত

[৪৬৮] ছহীহ বুখারী হা/৩৪৫৬।

বিষয়সমূহের সংবাদ দিয়েছেন। তারা নিজেদের পক্ষ হতে ধারণা করে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ অনেক বড় এবং মহান। দেহসমূহ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে, তারপর তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিয়ামত কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যদিও বিষয়টি আসলে অনুরূপ নয়। কেননা এভাবে মিথ্যা বলার মধ্যেই জনসাধারণের জন্য কল্যাণ ছিল। সুতরাং যদিও উক্ত কথাগুলো ছিল মিথ্যা, কিন্তু এই মিথ্যার মধ্যে জনগণের স্বার্থ নিহিত ছিল। ইবনে সিনা এবং তার অনুরূপ দার্শনিকরা এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তার দর্শনের মূলনীতি তৈরী করেছে।[৪৬৯]

আর যেসব গোমরাহ লোক নাবী-রাসূলদের অহীকে বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করেছে, তাদের কথা হলো নাবী-রাসূলদের কথার পিছনে এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, বাস্তবে তা সত্য। বাস্তব সত্য হলো, যা আমরা আমাদের বোধশক্তির মাধ্যমে জানতে পেরেছি। অতঃপর তারা নাবী-রাসূলগণের কথাগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, যাতে এই সকল ব্যাখ্যা তাদের রায় মোতাবেক হয়। এই জন্যই তাদের অধিকাংশই নাবী-রাসূলদের কথাসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতো না। বরং তারা বলতো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন হতে পারে...এমন হতে পারে...।

তারা নাবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত অহীর সর্বোচ্চ এই ব্যাখ্যা করতো যে, এই শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে...এর অর্থ এ রকম হতে পারে...ইত্যাদি। আর যেসব ভ্রান্ত ফির্কার লোক নাবী-রাসূলদেরকে মূর্খ ও পথভ্রষ্ট বলেছে, তাদের কথার অর্থ হলো নাবীগণ এবং তাদের অনুসারীগণ মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। যেসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, নাবীগণ তাতে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি এবং আল্লাহ তা'আলা নাবীগণকে যেসব কথা বলেছেন, স্বয়ং নাবীগণও তা বুঝতে পারেননি। (নাউযুবিল্লাহ) তারা বলে থাকে যে, এই আয়াতের এমন ব্যাখ্যা রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারীগণ তো দূরের কথা জিবরীল, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা অন্য কোনো নাবী তার ব্যাখ্যা জানেন না। (নাউযুবিল্লাহ) তারা আরো বলে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার এই বাণীগুলো পড়তেন,

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"দয়াময় আল্লাহ আরশে সমুন্নত হয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

[৪৬৯] এ কারণেই ইবনে সিনাকে বিজ্ঞ আলেমগণ নাস্তিক বলেছেন। অথচ তাকে মুসলিম দার্শনিক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং ইসলামী ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার দর্শনকে ইসলামী দর্শন হিসাবে পড়ানো হয়ে থাকে।

"পবিত্র বাক্যসমূহ তারই দিকেই উঠে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে"। *(সূরা ফাতির: ১০)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ﴾

"আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সেজদাহ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে? না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?" *(সূরা সোয়াদ: ৭৫)*

তিনি উপরোক্ত আয়াতগুলো পড়তেন, কিন্তু এগুলোর অর্থ জানতেন না। (নাউযুবিল্লাহ) সুতরাং আয়াতগুলো থেকে যে অর্থ বুঝা যায়, তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। এ শ্রেণীর নাস্তিক ও বিদ'আতীরা মনে করে যে, এটিই হলো সালাফদের তরীকা। বিদ'আতীদের মধ্যে আরেক প্রকার লোক রয়েছে, যারা ধারণা করে যে, উপরের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশ্যভাবে যা বুঝা যায়, তার বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য। আর সেই বিপরীত অর্থ কেউ জানে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কিয়ামতের সঠিক সময় অন্য কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে থাকে, আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত আয়াতগুলো শুধু বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহার করা হবে। এগুলো থেকে যে, অর্থ বুঝা যায়, তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হবে না। এদের কথা ঐসব লোকদের কথার মতই, যারা বলে, যেসব আয়াতের অর্থ বুঝতে সমস্যা হয় অথবা যেগুলোর অর্থ অস্পষ্ট, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেননি। তাদের কেউ কেউ বলে থাকে, ঐগুলোর অর্থ না জানার কারণেই তিনি উদ্দেশ্য বর্ণনা থেকে বিরত রয়েছেন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি অর্থগুলো জানতেন, কিন্তু উম্মতের জন্য বর্ণনা করেননি।[৪৭০] বরং তা বর্ণনা

---

[৪৭০] ছ্বহীহ মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে মাসরুক হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি একদা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। তিনি তখন আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আবু আয়েশা!

ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قلت ما هن؟ قالت مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قال وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تُعْجِلِينِي أَلَمْ يَقُل اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ وقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى﴾ فقَالَتْ أَنَا أَوَّلُ هذه الأمة سَأَلَ عَنْ ذلك رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا هو جِبْرِيلُ لم أره على الصُّورَةِ الَّتِي خُلِقَ عليها غَيْرُ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الْأَرْضِ قالت وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا من كتاب اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ و اللَّهُ يقول ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يخبر بِمَا يكون فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, সে ব্যাপারে যে ব্যক্তি কথা বলবে, সে আল্লাহর উপর বিরাট এক অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবকে দেখেছেন, সে আল্লাহর উপর বিরাট এক মিথ্যারোপ করল। মাসরুক বলেন, আমি হেলান দিয়ে বসা ছিলাম, কিন্তু তার এই কথা শুনে আমি সোজা হয়ে বসলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে অবকাশ দিন, তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ তা'আলা কি এই কথা বলেন নি, ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ "তিনি তাকে দেখেছেন উজ্জল দিগন্তে"? (সূরা

করার দায়িত্ব আমাদের বিবেক-বুদ্ধির দলীলের উপর এবং যারা ঐ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করবে, তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা জানতে পারেননি অথবা তাকে যা জানানো হয়নি, এ ব্যাপারে তারা এবং রসূলগণ সমপর্যায়ে রয়েছে। সুতরাং আমরা আমাদের বোধশক্তি দ্বারা সত্যকে জানতে পেরেছি। অতঃপর রাসূলের কথাকে আমাদের বোধশক্তি দ্বারা জ্ঞাত অর্থের সমর্থনে আনয়ন করার চেষ্টা করেছি। তারা আরো বলেছে যে, নাবীগণ এবং তাদের অনুসারীরা বোধশক্তি সম্পন্ন ছিলনা কিংবা তারা বোধশক্তি দ্বারা অর্জিত বিষয়গুলো বুঝতেন না!! তারা তাদের উপর নাযিলকৃত অহীর দলীলগুলোও বুঝতেন না। (নাউযুবিল্লাহ) এ সমস্ত কথার মধ্যে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই এবং এগুলো দ্বারা মানুষকে সত্য-সঠিক পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টাই করা হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে এ সমস্ত বানোয়াট কথা থেকে নিরাপত্তা ও মুক্তি চাই। যারা এ সমস্ত কথা বলবে এবং যারা তা বিশ্বাস করবে, এগুলো তাদেরকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করবে।

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"কাফের-মুশরেকরা তোমার রব সম্পর্কে যেসব কথা তৈরি করছে তা থেকে তোমার রব পবিত্র, তিনি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম আল্লাহর রসূলদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই"। *(সূরা সাফফাত: ১৮০-১৮২)*

আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন ফযল ও করমে আজ ১৯/৮/১৪৩৭ হিজরী বৃহস্পতিবার আসরের ছ্বলাত শেষে শারহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়ার অনুবাদ শেষ হলো। হে আল্লাহ! তুমি এই আহকারের দীনি খেদমত কবুল করো এবং এটাকে আখিরাতে নাজাতের উসীলা করো। আমীন।

তাকবীর: ২৭) আল্লাহ তা'আলা কি আরো বলেন নি, ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى﴾ "তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহার কাছে"? (সূরা নাজম: ১২-১৩) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন বললেন, আমিই এই উম্মতের প্রথম ব্যক্তি, যে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি হলেন জিবরীল। আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে যেই আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাতে আমি তাঁকে এই দুইবারের বেশী দেখিনি। আমি জিবরীলকে আসমান থেকে নামতে দেখেছি। তার বিশাল আকৃতি আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সুদূর দিগন্তকে বন্ধ করে দিয়েছিল। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আর যে ব্যক্তি বলল, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কোনো অংশ গোপন করেছেন, সে বিরাট এক মিথ্যা রচনা করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ "হে আল্লাহর রাসূল! তোমার প্রভুর পক্ষ হতে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি তা না করো, তাহলে তোমার প্রভুর রেসালাতের কিছুই পৌছালেনা"। (সূরা আল মায়িদা: ৬৭) তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি মনে করবে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবের খবর জানেন, তাহলে সে আল্লাহর উপর সবচেয়ে বড় মিথ্যা আরোপ করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী! তুমি বলে দাও যে, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর অন্য কেউ জানে না"। (সূরা আন নাহাল: ৬৫)

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন
- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. কিতাবুল ঈমান
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. কিতাবুত তাওহীদ
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৯. কিতাবুত তাওহীদ
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১০. আক্বীদাতুত তাওহীদ
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১১. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১২. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৬. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৯. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২০. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২১. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২২. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৪. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৫. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৬. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৮. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০.মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩১. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৩২. যাকাত ও দান খয়রাত

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৩৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

৩৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শার‘ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩৮. ছ্বিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩৯. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকাহ

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪০. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৪১. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৪২. উসূলুস সুন্নাহ -

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪৩. লুম'আতুল ই'তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাক্বদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৪৪. 'ইতিক্বদ আইয়াম্মাতিল হাদীছ- আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৪৫. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]